বাংলাদেশের লোকসংগ্রহশালা: ইসলামী উপাদান

ফাতিমা তুজ জহুরা রহমান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধীনে পিএইচডি ডিগ্রির
জন্য উপস্থাপিত

তত্ত্বাবধায়ক
ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন

ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জুলাই ২০১৪

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের লোকসংগ্রহশালা: ইসলামী উপাদান

পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের জন্য অভিসন্দর্ভ

ফাতিমা তুজ জহুরা রহমান

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি ঘোষণা করছি যে, বাংলাদেশের লোকসংগ্রহশালা: ইসলামী উপাদান শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব গবেষণার ফল। জানা মতে, এ শিরোনামে ইতিপূর্বে আর কেউ গবেষণা করেননি। পিএইচডি ডিগ্রির জন্য দাখিলকৃত এ অভিসন্দর্ভ বা এর অংশ বিশেষ অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার ডিগ্রি বা ডিপেণ্ঢামা অথবা প্রকাশনার জন্য আমি উপস্থাপন করিনি।

ফাতিমা তুজ জহুরা রহমান

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ফাতিমা তুজ জহুরা রহমান আমার তত্ত্বাবধানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পিএইচডি ডিগ্রির জন্য বাংলাদেশের লোকসংগ্রহশালা: ইসলামী উপাদান শীর্ষক অভিসন্দর্ভ প্রস্তুত করেছেন।

এই অভিসন্দর্ভ তিনি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করেননি।

ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন
অধ্যাপক
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

অনেক প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের বিনিময়ে অবশেষে আমি এই গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে পেরে মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সকলের আন্তরিক সহযোগিতায় আমার গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। আমি অনেকের কাছে এ ব্যাপারে ঋণী। প্রথমেই আমার শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেনের প্রতি ঋণ স্বীকার করছি। তাঁর সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধান,আন্তরিকতা, মহানুভবতা, সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়া এই গবেষণাকর্মটি শেষ করা কখনই সম্ভব হতো না।

আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি। জাদুঘর বিশেষজ্ঞ ড. ফিরোজ মাহমুদের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। তাঁরা সবাই বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরসহ বাংলাদেশের অন্যান্য সংগ্রহশালার অনেক বিষয়ে তথ্য ও উপাত্ত দিয়ে যথেষ্ট সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন ও রাজশাহীর বরেন্দ্র গবেষণা সংগ্রহশালার কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের প্রতি। বাংলাদেশের অন্যান্য সংগ্রহশালাগুলোর মধ্যে ঢাকা মহানগর সংগ্রহশালা, মুক্তিযুদ্ধ সংগ্রহশালা, শিশু সংগ্রহশালা, লালবাগ দুর্গ সংগ্রহশালা, আহসান মঞ্জিল সংগ্রহশালা ও প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের বিভিন্ন কর্মকর্তা, তোফায়েল আহমেদের পরিবার এবং মো. সাইদুরের পুত্র হারেসের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। বাংলা একাডেমির বর্তমান সম্মানিত মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমির পরিচালক শাহিদা খাতুন, ড. মিজানুর রহমানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ড. জালাল ফিরোজের প্রতি। কারণ তিনিই আমার এই গবেষণার শিরোনামটি নির্বাচন করে দিয়েছিলেন। এ ছাড়াও নাট্যকার ও ফোকলোর গবেষক সাইমন জাকারিয়ার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

বাংলাদেশের গন্ডি পেরিয়ে ভারতের বিভিন্ন সংগ্রহশালা থেকে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করতে হয়েছে। ভারতের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মেরোনা মারমোকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভারতের পশ্চিম বাংলার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ সংগ্রহশালা ও গুরুসদয় সংগ্রহশালার কর্মচারীবৃন্দের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি গুরুসদয় সংগ্রহশালার পরিচালক ড. বিজন কুমার মন্ডলকে। এছাড়াও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ভারতের উড়িষ্যার (পুরী) সন্তোষ মল্লিক, বিজয়লক্ষ্মী মল্লিক ও কলকাতার রতনদাকে। গবেষণার কাজে ভারতে অবস্থানকালীন সময় তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের কাজে ওরা আমার সাথে থেকে চলার পথকে অনেক সহজ করে দিয়েছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সকল সম্মানীয় শিক্ষকবৃন্দের কাছে তাঁদের সাহায্য সহযোগিতার জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি

বিভাগের অধ্যাপক ড. পারভীন হাসানের প্রতি বিশেষভাবে ঋণ স্বীকার করছি। এই গবেষণার প্রাথমিক পর্যায়ের সকল কাজে তাঁর আন্তরিক সহযোগিতা পেয়েছি। এছাড়াও প্রফেসর ড. আখতারুজ্জামান, ড. আব্দুল বাসির, মো. জাকারিয়ার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক কাশীনাথ রায়ের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। তিনি আমাকে এই গবেষণা কর্মে সকল প্রেরণা জুগিয়েছেন। আমার মাতৃ সমতুল্য রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. শওকত আরা হোসেনের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান বাদশার কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী। প্রকৌশলী আজিজুল ইসলাম ও বাংলাদেশের বিশিষ্ট কবি ও স্থপতিবিদ রবিউল হুসাইনের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

সামাজিক গবেষণা পরিষদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার গবেষণা কর্মটিকে এগিয়ে নিতে সরকারি বৃত্তি প্রদানের জন্য। এই পরিষদের পরিচালক ড. রহিম খানের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এছাড়াও এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমির গ্রন্থাগার, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের গ্রন্থাগার, বাংলাদেশ বেতারের গ্রন্থাগার, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের গ্রন্থাগার, ঢাকা পাবলিক লাইব্রেরি, ঢাকা আর্কাইভস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কুষ্টিয়া গণগ্রন্থাগার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ভারতের কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগার, ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রিয় গ্রন্থাগারের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের কেন্দ্রিয় গ্রন্থাগারের সকল কর্মকতা ও কর্মচারীর প্রতি। বাংলাদেশে এমন সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারের সংখ্যা খুব কম রয়েছে। অক্ষর বিন্যাসের জন্য রায়হান উদ্দিনের-এর কাছে কৃতজ্ঞ। আমাকে সার্বক্ষণিক সাংসারিক সকল কাজে সুবিধা প্রদানের জন্য আলেয়া খাতুন টুকু খালাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমার মা দিলোয়ারা রহমান জোৎস্নার দোয়া এই গবেষণা কর্মের সকল পর্বে সহায়ক ছিলো। তিনি ২৮ বছর আগে আমাদের সবাইকে ছেড়ে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে গেছেন। আমি তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। এ ছাড়াও যাদের অনুপ্রেরণা আর অকৃত্রিম ভালোবাসায় আমার লক্ষ্যে শেষ পর্যন্ত পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছি- আমার বাবা মো. আব্দুর রহমান, শ্বশুর আলাউদ্দিন চৌধুরী, আমার বড় ভাই ড. মোঃ শাহিনুর রহমান ও সকল ভাইবোন, আমার মেয়ে মালিহা, ছেলে লাবিব এবং নিকট আত্মীয় স্বজনদের একান্ত সহযোগিতায়। আমার স্বামী শহীদ আহমেদ চৌধুরী আমায় পিএইচডি করবার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। আমার এই অভিসন্দর্ভ রচনাকালীন সময় সাংসারিক শত বাঁধা বিপত্তিতে তিনি আমাকে সাহস জুগিয়েছেন। ছায়া দিয়েছেন বটবৃক্ষের মতো। তাই ওঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কোনো ভাষা নেই।

Dhaka University Institutional Repository

ফাতিমা তুজ জহুরা রহমান

সার সংক্ষেপ

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার লোক সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধ একটি দেশ। এদেশীয় লোকশিল্পচর্চার ইতিহাস সহস্রাব্দ প্রাচীন। বস্তুত লোকশিল্পের ভেতর দিয়ে গ্রামীণ সৃজনশীল মানুষের সমাজতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি বিষয়ের সামগ্রিক পরিচয় প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। আর যখন ওই লোকশিল্পের উপাদানগুলো কোনো একটি সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত ও প্রদর্শিত হয় তখন তার ভেতর দিয়ে মূলত স্থানীয় মানুষের সৃজনশীলতার পাশাপাশি একটি জাতির ইতিহাসের বিভিন্ন রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়। কিন্তু বাংলাদেশের লোকসংগ্রহশালার ধারণা অর্বাচীন কালের। তার পরেও এদেশে কিছু লোকসংগ্রহশালায় জাতির পরিচয়বাহী বহু ধর্মের উপাদান সংরক্ষিত ও প্রদর্শিত হচ্ছে। বাংলাদেশের লোকসংগ্রহশালা: ইসলামী উপাদান শীর্ষক অভিসন্দর্ভে এদেশের প্রধান কয়েকটি লোকসংগ্রহশালা ও কিছু লোক ধর্মীয় উপাসনালয়ে সংরক্ষিত ইসলামী উপাদান বিশেণ্ঢষণের মাধ্যমে এদেশীয় সৃজনশীল মানুষের অসাম্প্রদায়িক পরিচয়ের স্বরূপ বিশেণ্ঢষণ করা হয়েছে।

আদিম যুগ থেকে মানুষের মধ্যে শৈল্পিক চেতনার উদ্ভব ঘটেছে। সেই চেতনার আলোকে এক সময় ভাষা, যাদু , ধর্মীয় বিশ্বাস ও তাদের মধ্যে শিল্পকলা জাগ্রত হয়েছিলো। উনিশ শতকের চতুর্থ পর্বে ইউরোপীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে ফোকলোর (Folklore) চর্চার সূত্রপাত ঘটে। ইউরোপে যন্ত্রশিল্পের আবির্ভাবে (১৭৪০-১৭৮০) কুটিরশিল্পের পরিবর্তে বিশ্ব যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদনমূখী হয়ে উঠেছিলো। ফলে দীর্ঘদিনের বংশপরম্পরায় বহমান সংস্কৃতি এ সময় যান্ত্রিক সংস্কৃতিতে পরিণত হয়। এই ঐতিহ্য ও লোককারচশিল্পের নিদর্শনাদি সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও পুনরচ্জ্জীবনের লক্ষ্যে ইউরোপে লোকসংগ্রহশালা গড়ে ওঠে। নিজেদের লোকসংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে লোকসংগ্রহশালা উত্তর ইউরোপের অনেক দেশ ছাড়াও ভারত এবং বাংলাদেশে পর্যন্ড় ছড়িয়ে যায়। বর্তমানে বাংলাদেশের লোকসংগ্রহশালায় সংরক্ষিত প্রতিটি উপাদান পৃথক বৈশিষ্ট্যেমন্ডিত এবং বিদ্যা, জ্ঞান, ঐতিহ্য ও কৃষ্টি প্রত্যেকটি বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ ফোকলোরের প্রতিটি উপাদানের নিজস্ব শিল্পরূপ ও আকৃতি মিলিয়ে বিশেষ উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রাচীন যুগে এদেশে পাল

ও সেন রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠে স্থাপত্যিক নিদর্শন স্তূপ, বিহার, মঠ, মন্দির। ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। বর্তমানে বাংলাদেশে সংখ্যাগোরিষ্ঠ মুসলমানের বসবাস। মুসলমান সমাজে দরবেশ, সূফি ও সাধকরা ছিলেন সম্মানিত ব্যক্তি। সূফিদের মৃত্যর পর এদেশে অনেক সমাধি ও মাজার গড়ে ওঠে। ইসলামে মাজার কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি নিয়ে মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও মাজার সংরক্ষিত হয়েছে পিরের ভক্তদের মাধ্যমে।

সুলতানী শাসনামল থেকে বাংলায় ইসলামী শিল্পকলার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। বাংলার মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন ধর্মীয় ইমারত, প্রাসাদ দুর্গ নির্মিত হয়েছিলো। এর মধ্যে গ্রামীণ সংস্কৃতির অস্তিত্ব লক্ষ করা যায় দো চালা ও চৌচলা বক্রাকৃতির ছাদ নির্মাণের ভেতর দিয়ে। বিহার, মন্দির, ও মসজিদের টেরাকোটায় ও পলেস্তরায় নির্মিত অলংকরণ বাংলার লোকশিল্পীর মনে সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছে। বস্তুত আরবি ভাষায় লিখিত মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ কুরআনের অনুলিপি তৈরি ও প্রচারের প্রয়োজনেই আরবি লিপিমালা (Calligraphy) বিকশিত হলেও পরবর্তীতে এর ব্যবহার কেবল ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং মুসলিম স্থাপত্যে, সিরামিক, কাঁচ, মৃৎশিল্প, ধাতুশিল্প, বয়নশিল্পসহ বিভিন্ন শিল্পমাধ্যমে ব্যবহৃত হয়েছে। ইসলামী নকশাকলার সৃষ্টি হয়েছে বিমূর্ত প্রতীকে আলংকারিক (Decoration) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। এদিক থেকে ইসলামী শিল্পকলা বিশেষভাবেই ধর্মনিরপেক্ষ শিল্পকলা (Secular art)। মসজিদে যে ধরনের অলংকরণ দেখতে পাওয়া যায় সেই একই ধরনের নকশা আলপনা, নকশি কাঁথা, নকশি পাখা, শীতল পাটি ও পিতল কাঁসার তৈরি তৈজসপত্রে দেখা যায়।

বিশ্বব্যাপী দ্রুত শিল্পায়, নগরায়ন এবং প্রযুক্তিগত কলা-কৌশল ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে পৃথিবীর লোক ও কারুশিল্পের উন্নত ও প্রাচীন ঐতিহ্য ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত গ্রামীণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে, বিশেষ করে লোক ও কারুশিল্পগুলোকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে সেগুলো সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবিত করতে লোকসংগ্রহশালা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

mwPcÎ

fwgKv

ক. বাংলাদেশে লোকসংগ্রহশালা ১-২৩

L. বাংলাদেশে লোকসংগ্রহশালার গুরুত্ব

গ. আন্তর্জাতিক বিশ্বে লোকসংগ্রহশালার গুরুত্ব

N. পরিধি

ঙ. যৌক্তিকতা

চ. প্রকাশনা পর্যালোচনা

ছ. গবেষণা পদ্ধতি ও উপাদান

(১) মূখ্য উপাদান সাক্ষাৎকার

(২) মাধ্যমিক বা দ্বিতীয় প্রকার উপাদান

c_g Aa¨vq: †jvKmsMnkvjvi HwZnwmK weeZb 24-105

১(ক) লোকসংগ্রহশালার উৎপত্তি ও বৈশিষ্ট্য, ১(খ) লোকশিল্পভিত্তিক সংগ্রহশালা, ১(গ) বাগাশ্রিত লোককলা, ১(ঘ) বস্তুগত লোকসংস্কৃতি, ১(ঙ) বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিতে সংগ্রহশালা, ১(চ) প্রাচীন বাংলার সংগ্রহশালা, ১(ছ) মধ্যযুগে বাংলার সংগ্রহশালা, ১(জ) সুলতানী ও মুঘল আমল, ১(ঝ) পশ্চিম বাংলার লোকসংগ্রহশালা

wØZxq Aa¨vq: †jvKmsMnkvjvi Kvhµg 106-156

৩(ক) নিদর্শন সংগ্রহ, ৩(খ) নথিভূক্তকরণ, ৩(গ)নিদর্শন পরিচিতি ও ব্যাখ্যাকরণ, ৩(ঘ) উপাদান সংরক্ষণ, ৩(ঙ) পুনরুদ্ধার করা, ৩(চ) গুদামজাতকরণ, ৩(ছ) প্রদর্শনী উপস্থাপন শাখা, (ঝ) জনশিক্ষা বিভাগ, ৩(ঞ) শিক্ষা ও সেবা, ৩(ট) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের বিভিন্ন কক্ষের পরিচয়, ৩(ঠ) বরেন্দ্র গবেষণা সংগ্রহশালার কক্ষ পরিচয়, ৩(ড) সোনারগাঁয়ের কারুপল্লী ফাউন্ডেশন গ্যালরি কক্ষ পরিচয়, ৩(ণ)আহসান মঞ্জিল সংগ্রহশালার গ্যালারি কক্ষ পরিচয়, ৩(ত) মেলার আয়োজন, ৩(থ) বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম, ৩(দ) একটি পূর্ণাঙ্গ সংগ্রশালার বিভাগ ও শাখাসমূহ।

ZZxq Aa¨vq: evsjv‡‘‡ki †jvKmsMnkvjvq msiw¶Z Bmjvgx Dcv‘vb 157-225

৪(ক) বাংলায় প্রাগ মুসলিম শিল্পকলার চর্চার ধারা, ৪(খ) ভারতীয় মুসলিম শিল্পকলা, ৪(গ) ইসলামে বিধি নিষেধ ও বিভিন্ন সভ্যতার প্রভাব, ৪(ঘ) টেরাকোটা, ৪(ঙ) আরবি লিপিশৈলির বিভিন্ন রীতি, ৪(চ) শিলালিপি, ৪(ছ) মুদ্রা, ৪(জ) পুঁথিচিত্র, ৪(ঝ) পাণ্ডুলিপি, ৪(ঞ) মিনিয়েচার, ৪(ট) পিতল- কাঁসার কাজ, ৪(ঠ) বস্ত্রশিল্প ও অলংকার, ৪(ড) দারুশিল্পের নির্দশন, ৪(ঢ) তারজালি কাজে স্থাপত্যশিল্প, ৪(ণ) বয়নশিল্প (গালিচা), ৪(ত) মীনা কাজ, ৪(থ) যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র, ৪(দ) আইভরি খোদাই ৪(ধ) ভাস্কর্য।

PZ_ Aa¨vq: evsjv‡`‡ki †jvKmsMnkvjv †jvKwk‡í Bmjvgx bKkvKjvi cfve 226-277

৫(ক) ইসলামী ও লোক নকশাকলার বৈশিষ্ট্য, ৫(খ) লোকচিত্র আলপনা, ৫(গ) মৃৎশিল্প, ৫(ঘ) নকশি পিঠার ছাঁচ, ৫(ঙ) নকশি পাখা, ৫(চ) নকশি কাঁথা, ৫(ছ) নকশি শিকা, ৫(জ) কাগজের ঝালট ও ঝিনুক নকশা, ৫(ঝ) জামদানি শাড়ি, ৫(ঞ) চিত্রিত শীতলপাটি, ৫(ট) ঝুড়িবোনা শিল্প, ৫(ঠ) শোলা শিল্প (Sponge-wood Work), ৫(ড) দারুশিল্পে নকশা, ৫(ঢ) লোকঅলংকার, ৫(ণ) ধাতব খোদাই শিল্প, ৫(ত) পাথর শিল্প, ৫(থ) লোকবাদ্য, ৫(দ) টেপা পুতুল।

Dcmsnvi 278-287

cwiwkómgn 288-305

mnvqK MšZwjKv 306-321

Dhaka University Institutional Repository

wPÎ ZvwjKv

c_g Aa¨vq

চিত্র-১: নরডাসিকা মিউজিয়াম, চিত্র-২: লুভ্যের মিউজিয়াম, চিত্র-৩: বাংলা একাডেমির বর্ধমান ভবন চিত্র-৪: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লোক ও কারুপল্লী ফাউন্ডেশনের নথিতে স্বাক্ষর -৫: ঢাকা মহানগর সংগ্রহশালা চিত্র-৬: বাউল সম্রাট লালন শাহের মাজার প্রাঙ্গন চিত্র-৭: সোনারগাঁওয়ের পাঁচ পিরের সমাধি চিত্র, চিত্র-৮ ডলম্যানস,চিত্র-৯: গুহা, চিত্র-১০ খুফুর পিরামিড, চিত্র- ১১ মিসরীয়, চিত্র লিপি হায়ারোগ্লাফি, চিত্র-১২-১৩: আরবি আল মাতহাফুল মাসরী জাদুঘর, চিত্র-১৪: সিন্ধু সভ্যতা মৃৎপাত্রের নমুনা, চিত্র-১৫: জিউসের মূর্তি, চিত্র- ১৬: কাবা শরিফ, চিত্র-১৭: কুব্বাত আস সাখরা, চিত্র-১৮: দামেশক মসজিদ, চিত্র-১৯: সাঁচির স্তূপ, চিত্র-২০: সোমপুর বিহার, চিত্র-২১: মহাস্থানগড়, বগুড়া, চিত্র-২২: ঢাকেশ্বরী মন্দির, চিত্র-২৩: আদিনা মসজিদ, চিত্র-২৪: আদিনা মসজিদ, চিত্র -২৫: ছোট সোনা মসজিদ, চিত্র-২৬: ছোট সোনা মসজিদ, চিত্র-২৭: বাঘা মসজিদ রাজশাহী, চিত্র-২৮: বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ, চিত্র-২৯: -কদম রসুল, চিত্র-৩০: নবির সাহাবাদের কবর, চিত্র-৩১: সূফির মাজার, চিত্র-৩২-৩৩: শাহ জালালের মাজার, চিত্র-৩৪: তাজমহল আগ্রা, চিত্র-৩৫: লালবাগ দুর্গ, চিত্র-৩৬: হোসনী দালান, চিত্র-৩৭: কান্দজির মন্দির, চিত্র-৩৮ এশিয়াটিক সোসাইটি ভবন, চিত্র-৩৯: ভারতীয় সংগ্রহশালা, চিত্র-৪০: ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, চিত্র-৪১: আশুতোষ সংগ্রহশালা, চিত্র-৪২: গুরুসদয় সংগ্রহশালা

wØZxq Aa¨vq

চিত্র-১: নলিনীকান্ত ভট্টাশালি চিত্র-২: জয়নুল আবেদিন চিত্র-৩: উয়ারী-বটেশ্বর খনন থেকে প্রাপ্ত উপাদান চিত্র-৪: হানিফ পাঠান চিত্র-৫: সংগ্রাহক মোহাম্মদ সাইদুর চিত্র-৬: সংগ্রাহক তোফায়েল আহমেদ চিত্র-৭: জাতীয় জাদুঘরে মসলিন উপহার গ্রহণের দৃশ্য, চিত্র-৮ : জাতীয় জাদুঘর সংরক্ষণ রসানাগার বিভাগ, চিত্র-৯:পুনরুদ্ধারকৃত ফুলদানি,চিত্র-১০: ডিওরমা লোক ঐতিহ্য সংগ্রহশালা বাংলা একাডেমি, চিত্র-১১: ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল মিউজিয়াম, চিত্র: ১২ কারুপল্লী ফাউন্ডেশনের জয়নুল গ্যালারি,চিত্র-১৩ বরেন্দ্র গবেষণা সংগ্রহশালা চিত্র-১৪-১৫: নির্দশন প্রদর্শনের জন্য ব্যবহৃত শোকেস, চিত্র-১৬: XvKv gnvbMi msMÖnkvjvi শোকেসের মধ্যে প্রদর্শিত নমুনা, চিত্র-১৭-১৮ বরেন্দ্র গবেষণা সংগ্রহশালা চিত্র-১৯:চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, চিত্র-২০: বিদেশী শিক্ষার্থীদের স্কুল প্রোগাম, চিত্র-২১: ভারতীয় কূটনৈতিকের পরিদর্শন, চিত্র-২২-২৩: জাতীয় জাদুঘরের লাইব্রেরি, চিত্র-২৪: ডকুমেন্টেশন সেন্টার, চিত্র-২৫: বাউল গান পরিবেশনের দৃশ্য।

ZZxq Aa¨vq

চিত্র-১: ষাটগম্বুজ মসজিদের টেরাকোটা অলংকরণ, চিত্র-২: পাথরের তৈরি রোজেট নকশা, চিত্র-৩: টেরাকোটা অ্যারাবেকস, চিত্র-৪: টেরাকোটা রোজেট, চিত্র-৫: খিলান নকশা, চিত্র-৬: বাঘা মসজিদ, চিত্র-৭: পাথরের উপর অলংকৃত নকশা, চিত্র-৮: টেরাকোটা নকশা (বাঘা মসজিদ), চিত্র-৯: আরবি লিপিমালা কুব্বাত আস সাকরা, চিত্র-১০: কারতুস নকশা, চিত্র-১১: কুফি লিপি পদ্ধতিতে আল্লাহু লেখা, চিত্র-১২: নাখস লিপিমালার নমুনা, চিত্র-১৩: তুঘরা লিপিমালায় হাতির প্রতিকৃতি, চিত্র-১৪: তুঘরা লিপিমালায় ময়ুরের প্রতিচ্ছবি, চিত্র-১৫: আয়তুল কুরসি, চিত্র-১৬: পবিত্র কোরআন শরিফ, চিত্র-১৭: জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত, চিত্র-১৮: আরবিলিপিমালা, নাস্তালিক, মোহাম্মদ, চিত্র-১৯: বরেন্দ্র গবেষনা সংগ্রহশালা, চিত্র-২০: লোক ঐতিহ্য সংগ্রহশালা, চিত্র-২১: খান জাহান আলীর সমাধি বাগেরহাট, চিত্র-২২: বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, চিত্র-২৩: বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, চিত্র-২৪: লালবাগদুর্গ, চিত্র-২৫ : বাংলা ভাষায় লেখা শিলালিপি, চিত্র-২৬: বরেন্দ্র গবেষণা সংগ্রহশালায় শিলালিপি, চিত্র-২৭: মুদ্রা জাতীয় জাদুঘর, চিত্র-২৮: পুঁথিচিত্র জাতীয় জাদুঘর, চিত্র-২৯: মুঘল, চিত্রকলা, চিত্র-৩০: ল্যাম্প স্টান্ড: লাউলের খোল, চিত্র-৩১: গাজীর পটচিত্র, চিত্র-৩২: শিল্পী মুসাব্বিরের আঁকা ঈদের ছবি, চিত্র-৩৩: ধাতব খোদাইচিত্র, চিত্র-৩৪: চাঁদ ও তারা নকশা, চিত্র-৩৫: পাক পাঞ্জাতন, চিত্র-৩৬: তোফায়েল আহমেদের বাংলা ঘর, চিত্র-৩৭: জায়নামাজ, চিত্র-৩৮: পিতলের তৈরি তাজমহল , চিত্র-৩৯: মসলিন কাপড়, চিত্র-৪০: কারচুপি তৈরি কাজের নমুনা, চিত্র-৪১: বোরগা, চিত্র-৪২: টুপি, চিত্র-৪৪ ৪৫ ৪৬: শেরওয়ানী, চিত্র-৪৭: কাশ্মীরী শাল, চিত্র-৪৮: মুহররমের ঝাণ্ডা, চিত্র ৪৯-৫০: অলংকার, চিত্র-৫১: কাঠে আল্লাহর নাম, চিত্র-৫২: কাঠের গহনার বাক্স, চিত্র-৫৩: কাঠের স্ট্যান্ড কাবা, চিত্র-৫৪: চাঁদতারা কাঠের স্ট্যান্ড, চিত্র-৫৫: আহসান মঞ্জিলের মডেল, চিত্র-৫৬: হোসনী দালান, চিত্র-৫৭: সুরমাদানী, চিত্র-৫৮: গোলাপপাশ, চিত্র-৫৯: তারজালি কাজ, চিত্র-৬০: নবাব সিরাজউদ্দৌলার ব্যবহৃত গালিচা, চিত্র-৬১: জার (সঞ্চয়পাত্র), চিত্র-৬২: জাতীয় জাদুঘর, চিত্র-৬৩: লোক ঐতিহ্য সংগ্রহশালা, চিত্র-৬৪: অলংকৃত ছোরার বাট, চিত্র-৬৫: হাতির দাঁতে তৈরি নকশাকৃত ছোরা, চিত্র-৬৬: হাতির দাঁতের পাটি।

Dhaka University Institutional Repository

PZ_ Aa¨vq

রেখা চিত্র-১: পাম, রেখা চিত্র-২: লিফ, রেখা চিত্র-৩ ওয়াটার লিফ, রেখা চিত্র-৪: স্টার, রেখা চিত্র-৫: রোজেট, রেখা চিত্র-৬: লজেঞ্জ, রেখা চিত্র-৭: রঁসো, রেখা চিত্র-৮: রানিং স্ক্রল, রেখা চিত্র-৯: স্ক্রল , রেখা চিত্র-১০: মেডেলিয়ন, রেখা চিত্র-১১: বিড, রেখা চিত্র-১২: তরসাদ , রেখা চিত্র-১৩: ওয়েভ, রেখা চিত্র-১৪: কারতুস, রেখা চিত্র-১৫: অ্যারাবেস্ক, রেখা চিত্র-১৬: অ্যাকান্থাস, রেখা চিত্র-১৭: নট বা গিট-নকশা রেখা চিত্র-১৮:, চিত্র- টাসেল বা থুপি নকশা, রেখা চিত্র: ১৯ গীলোস, রেখা চিত্র-২০: গালুন বা মতি নকশা, চিত্র-২১: কুব্বাত আস সাকরার অলংকরণ, চিত্র-২২: ব্রত আলপনা, চিত্র-২৩: আলপনা লক্ষ্মীর পা, চিত্র-২৪: কুব্বাত আস সাকরার গম্বুজের অলংকরণ, চিত্র-২৫: ঝাউদিয়া মসজিদের অলংকরণ, চিত্র-২৬: মেহেদি আলপনা নকশা, চিত্র-২৭: আলপনা, চিত্র-২৮: শখের হাঁড়ি ও সুরাই, চিত্র-২৯: শখের হাঁড়ি, চিত্র-৩০: চিত্রশিল্পী সুশান্ত পাল, চিত্র-৩১: চিত্রিত মাটির চাড়ি, চিত্র-৩২: চিত্রিত কলসি, চিত্র-৩৩: মুখশলা পিঠা, চিত্র-৩৪: নকশি পিঠা, চিত্র-৩৫: টেরাকোটা অলংকরণ, চিত্র-৩৬: পিঠার ছাঁচ, চিত্র-৩৭: নকশি পিঠা তৈরি, চিত্র-৩৮: চালের গুড়ি তৈরি, চিত্র-৩৯, ৪০, ৪১: ব্লক ছাঁচ, চিত্র-৪২: নকশি পাখা, চিত্র-৪৩: পাখা শিল্পী, চিত্র-৪৪, ৪৫: নকশিকাঁথা, রেখাচিত্র-৪৬,৪৭,৪৮ ৪৯, চিত্র-৫০: নকশিকাঁথা

রেখাচিত্র-৫১, ৫২, চিত্র-৫৩: তারা মসজিদ, চিত্র-৫৪, ৫৫: পাটের তৈরি দ্রব্য, চিত্র-৫৬: ঝিনুক শিল্প, চিত্র-৫৭: জামদানি তৈরি, চিত্র-৫৮: জামদানি শাড়ি, চিত্র-৫৯: শীতল পাটি, চিত্র-৬০: বোটনী, চিত্র-৬১: জায়নামাজ (বোটনী), চিত্র-৬২: রেখাচিত্র, চিত্র-৬৩: লিখিত শীতল পাটি, চিত্র-৬৪: শতরঞ্জি তৈরি, চিত্র-৬৫, ৬৬: ঝুড়িবোনা, চিত্র-৬৭: মাথাল, চিত্র-৬৮: কর্মরত শোলাশিল্পী, চিত্র-৬৯: তোফায়েল আহমেদের বাংলা ঘর, চিত্র-৭০: কাঠের ন্কশি রেহেল, চিত্র-৭১: সিন্দুকর প্যানেলের নকশা, চিত্র-৭২: কাঠের নকশি পিঁড়ি, চিত্র-৭৩, ৭৪: নৌকার মডেল, চিত্র-৭৫, ৭৬: গলার হার, চিত্র-৭৭: ধাতব খোদাইচিত্র, চিত্র-৭৮: নকশি পানবাটা, চিত্র-৭৯: নকশি জগ, চিত্র-৮০: চিত্রিত কুলা, চিত্র-৮১: নকশি বটি, চিত্র-৮২: নকশি হুক্কা, চিত্র ৮৩: পাথরের ওপর খোদাই নকশাকৃত টেবিল, চিত্র-৮৪: নকশাকৃত কাঠের ঢোল, চিত্র-৮৫: একতারা তৈরি পদ্ধতি চিত্র, চিত্র-৮৬: মহররমের ঢাক, চিত্র-৮৭: নকশি পুতুল, চিত্র-৮৮: কাঠের নকশি পুতুল, চিত্র-৮৯: কাঠের নকশি পুতুল

Dhaka University Institutional Repository

f‚wgKv

সংগ্রহশালা হলো সমাজ ও দেশের দর্পণ। একটি জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে সকলের সামনে তুলে ধরতে সংগ্রহশালার প্রয়োজন। সুতরাং বাংলাদেশের সকল জনগোষ্ঠীর জীবন পরিচর্যায় ব্যবহৃত উপাদান সম্পর্কে রূপরেখা তৈরি করে। লোক বলতে এক শ্রেণির সাধারণ মানুষ নির্দেশ করে যাদের আচার, আচরণ, বিশ্বাস, অনুষ্ঠানাদি, ঐতিহ্য, প্রথা ও উৎসব একই রকমের। এই শ্রেণিটির সাংস্কৃতিক উপকরণ সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে উনিশ শতকের চতুর্থ পর্বে ইউরোপীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্বদেশানুরাগ ও জাতীয়তাবোধ থেকে Folklore চর্চার সুত্রপাত ঘটে। ১৮৪৬ সালে উইলিয়াম থম্স নামক একজন পণ্ডিত ‘দি এ্যাথেনিয়াম’ পত্রিকায় লিখিত একটি পত্রে প্রথম Folklore শব্দটি ব্যবহার করেন।[১] ফোকলোর দুইভাবে ভাগে বিভক্ত। বস্তুকেন্দ্রিক ফোকলোর (Material Folklore) এবং অবস্তুগত ফোকলোর (Formalised Folklore)। চারু ও কারুশিল্পের যাবতীয় নিদর্শন (Material Folklore) বস্তুগত লোক কলার অন্তর্ভুক্ত। লোকসংস্কৃতির লোকশিল্প একটি অন্যতম প্রধান ও বর্ণাঢ্য শাখা। বর্তমানে লোকশিল্প Artifact হিসেবে একে চিহ্নিত করা হয়।[২] বাংলাদেশের লোক সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত প্রতিটি উপাদান পৃথক বৈশিষ্ট্যেমণ্ডিত এবং বিদ্যা, জ্ঞান, ঐতিহ্য ও কৃষ্টি প্রত্যেকটি বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ ফোকলোরের প্রতিটি উপাদানের নিজস্ব শিল্পরূপ ও আকৃতি মিলিয়ে বিশেষ উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত লোকসংগ্রহশালার প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যায় উনিশ শতকের শেষের দিকে যখন বিশ্বে ফোকলোর বিষয়টি সর্বজনীনতা পায়। উনিশ শতকের শেষার্ধ পর্যন্ত ছিল শিল্পবিপ্লব, উদারনীতিবাদ, ও রোমান্টিকতাবাদের (Romaniticism) যুগ। ইউরোপে শিল্পবিল্পবের (১৭৪০-১৭৮০) ফলে দীর্ঘদিনের হস্তশিল্প যখন বিপর্যের মুখে পড়ে। কুটির শিল্পের স্থলে সেখানে কারাখানাভিত্তিক যন্ত্রশিল্পে পরিণত হয়।[৩] উপরন্তু, ইউরোপীয় সমাজে ক্ল্যাসিক্যাল ও লোকশিল্প এ দুটি ভিন্ন ধারার বহিঃপ্রকাশ সমাজে ঘটে। আধুনিক শিল্পকলা থেকে লোকশিল্পের পৃথকীকরণের লক্ষ্যে সুইডিশ লোকসংস্কৃতিবিদ লিনিয়াস (Linnaeus, ১৭০৭-৭৮) বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান আরম্ভ করেন। তাঁকে অনুসরণ করে হিল্টেন ক্যাভেলিয়াস (Hylten-Cavallius,১৮১৮-৭৮) দেশীয় সংস্কৃতির নিদর্শন সংগ্রহে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। হেজেলিয়াস (Hazelius,1833-1901) সুইডেনে একটি লোকসংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠা করেন।[৪] বিশেষ করে ইউরোপে লোকসমাজের প্রয়োজনে দেশীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ধরে রাখার অনন্য উপায় হিসেবে লোকসংগ্রহশালা একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

K. evsjv‡‘‡k †jvKmsMnkvjv

আদিম যুগে মানুষ গুহায় বসবাস করতো। প্রাচীন এই গুহা আবিস্কারের পর বিশ্বের বেশিরভাগ ঐতিহাসিকরা এক মত পোষণ করেছেন যে এ গুহাই ছিলো আদিম মানুষের আশ্রয়স্থল, জাদুটোনা, ধর্মবোধ ও শিল্পচর্চাকেন্দ্র।[৫] গুহা জীবন ত্যাগ করে মানুষ যখন দলবদ্ধভাবে সমাজে বসবাস করা আরম্ভ করে তখন সমাজে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। সুতরাং প্রাচীন অবিভক্ত বাংলায় স্তূপ, বিহার, মন্দির, ইত্যাদি উপাসনালয় ছিলো শিক্ষা, ও মানুষের আত্তিক প্রশান্তির স্থান। ধর্মগত স্থাপত্যের মধ্যে স্তূপ নির্মাণের প্রথা প্রথম চালু হয়। বৈদিক আমলে দেহাস্থি প্রোথিত করবার জন্য শ্মশানের ওপর মাটির স্তূপ তৈরি করা হতো। তবে এই স্থাপত্যরূপকে বিশেষভাবে গ্রহণ করেছিলো বৌদ্ধরাই।[৬] ভগবান বুদ্ধের স্মৃতি এখানে সংরক্ষণ করা হয়েছে। সাঁচি, অমরাবতী এবং ভারহুত এর পাথরের বাঁকা প্যানেলগুলোতে গৌতম বুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ এবং বৌদ্ধধর্মের মর্মবাণী ভক্তদের বোঝানোর জন্য খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় অথবা প্রথম শতকে বৌদ্ধ স্তূপ তৈরি হয়। অতএব এই সময় থেকে বাংলায় বিভিন্ন উপকরণ সংরক্ষণের বিষয়টি প্রথম লক্ষ করা যায়। বৌদ্ধ ধর্মের সাথে জড়িত স্থাপত্যিক নিদর্শনের পরই ছিলো বিহারের স্থান। পরবর্তীকালে মহাযানী বৌদ্ধদের দ্বারা বিহারের 'চৈতন্যগৃহে' নৈবেদ্য স্তূপে গৌতম বুদ্ধের মূর্তি অথবা পবিত্র ধাতু সংরক্ষণের প্রথা চালু হয়।[৭]

আদি ঐতিহাসিক পর্যায়ের শেষপর্বে রচিত শিল্পশাস্ত্রে মন্দিরের স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যকে নরদেহের সাথে তুলনা করে বলা হয়েছে যে, দেহে প্রাণ থাকা যেমন প্রয়োজন তেমনি মন্দিরে দেবতা থাকা প্রয়োজন। সুতরাং বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মালম্বীদের জীবনচর্চায় স্তূপ, মন্দির, ও বিদ্যানিকেতন ছিলো সংগ্রহশালা। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে আলোখ্যগৃহ, দেবকূল, বিশ্বকর্মা, মন্দির, বীথি, চিত্রশালা ইত্যাদি নামের উল্লেখ পাওয়া যায় যেখানে চিত্রকলা, ভাস্কর্য এবং ফলক রাখা হতো। নাট্যকার ভাস-এর 'প্রতিমা' এবং শ্রীহর্ষ রচিত নৈশ ধিয়াচরিত নাটকে উল্লেখ আছে যে, রাজদরবার কক্ষে স্থায়ী এবং চলমান প্রদর্শন গ্যালারির ব্যবস্থা ছিলো।

যা হোক, ৭১২ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ বিন কাশিমের সিন্ধু অভিযানের ভেতর দিয়ে সমগ্র ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা পেলেও ১১৭৩ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ ঘুরি কর্তৃক ভারতে স্থায়ীভাবে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। উপরন্তু, সুলতানী আমলে সমগ্র ভারতে মসজিদ স্থাপত্য নির্মাণের ভেতর দিয়ে ইসলামী শিল্পকলার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। লক্ষণীয় বাংলায় বহিরাগত মুসলমানদের আরবিয় সংস্কৃতি ও বাংলার লোকসংস্কৃতির সংমিশ্রণে ভিন্ন একটি সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য রূপলাভ করে।[৮] সুতরাং প্রতিমাপূজার পরিবর্তে আল্লাহ এক অদ্বিতীয় ইসলাম ধর্মের অনুশাসন বাঙালি মুসলমানদের বিশ্বাসে ও জীবনযাপনে

প্রতিফলিত হয়েছে। ইসলাম ধর্মে যেহেতু দেবদেবী পূজা নিষিদ্ধ সেহেতু মসজিদের ভেতরে কোনো দেবদেবীর স্থান পায়নি। ফলে বাংলাদেশের লোকসংগ্রহশালায় সংরক্ষিত ইসলামী উপাদান বলতে বাঙালি মুসলমানদের ইসলামী শিল্পকলার সাথে সম্পৃক্ত বিষয়বস্তুকে নির্বাচিত করা হয়েছে। এ ছাড়াও বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সাথে সম্পৃক্ত নিদর্শন ও দর্শনীয় স্থান সংগ্রহশালা হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। বাংলাদেশের অনেক জায়গায় পিরের কবরের উপর স্মৃতি সৌধ রয়েছে। যাকে বলা হয় দরগা। পিরের স্মৃতিসৌধ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মসজিদের অনুকরণে তৈরি করা হয়। বাঙালি সমাজে সত্যপির মতবাদ খুবই প্রচলিত ছিলো।[৯]

সুলতানী আমলের অবসানের পর মুঘল শাসকদের রাজত্ব শুরু হয়। মুঘলরা শাসকরা ছিলেন সত্যিকারের শিল্পানুরাগী। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতে শিল্পকলায় নব দিগন্তের সূচনা হয়। রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতে মিনিয়েচার চিত্র (ক্ষুদ্রাকৃতি চিত্র) অংকনের সূচনা করে। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর নবাবী আমলে ইংরেজদের ভারতে তথা বাংলায় ক্ষমতা লাভের ভেতর দিয়ে বিরাট সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটে যায়। ইংরেজ শাসকদের বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পাশাপাশি বাস্তবিক শিক্ষা লাভের জন্য নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান সংগ্রহশালা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা ইংরেজরাই অনুভব করে।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভক্তির পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত বর্তমান বাংলাদেশ ভারতের পূর্ব বাংলা নামে পরিচিত ছিলো। সংগত কারণেই সমগ্র ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সাথে পূর্ব বাংলার সম্পর্ক ছিলো।[১০] ১৭৮৪ সালে কলকাতার পার্ক স্ট্রিটে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের পৃষ্ঠপোষকতায় সুপ্রিম কোর্টের চিফ জাস্টিস উইলিয়াম জোনস শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক গবেষণার জন্যে ভারতের নানা জাতি, জনগোষ্ঠী, ইতিহাস, সাহিত্য, শিল্প ও ঐতিহ্য সর্ম্পকিত বস্তুসামগ্রী সংগ্রহের নানা উদ্যোগ নেয়া হয়।[১১] এশিয়াটিক সোসাইটির সংগৃহীত উপাদানসমূহ নিয়ে ভারতবর্ষে ১৮১৪ সালে ২ ফেব্রুয়ারি প্রথম গড়ে ওঠে ‘ওরিয়েন্টাল মিউজিয়াম অব দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি’। ১৮৬৭ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির এ সংগ্রহশালাটিকে নতুনভাবে উদ্বোধন করে এর নামকরণ করা হয় Indian Museum (ভারতীয় সংগ্রহশালা)।[১২]

ইংল্যান্ডে লোকসংস্কৃতির অনুশীলন উনিশ শতকের চতুর্থ পর্বে শুরু হয়। তবে ফোকলোর সোসাইটি স্থাপিত হয় ১৮৭৮ সালে। ইউরোপ ও ইংল্যান্ডের লোকায়ত সংস্কৃতি চর্চার আধুনিক এই চিন্তাধারাটি ভারতে পৌঁছে যায়।[১৩] ১৯১৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর এখানে বাংলা বিভাগ খোলা

হলে বাংলা বিভাগ অবিভক্ত ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে লৌকিক উপাদান সংগ্রহে উদ্যোগী হয়ে ওঠে। ড. দীনেশ চন্দ্র সেন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় বাংলা বিভাগ থেকে বাঙালি নিরক্ষর সমাজের মৌখিক সাহিত্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তাছাড়া কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থান হতে প্রাপ্ত নানা ধরনের প্রত্নতাত্ত্বিক হাতিয়ার, টেরাকোটা, ভাস্কর্য, চিত্রকলা, মুদ্রা, কাঠখোদাইয়ের কাজ ইত্যাদি বস্তুগত নিদর্শনাদি সংরক্ষণের লক্ষ্যে ১৯৩৭ সালে প্রতিষ্ঠা করে আশুতোষ সংগ্রহশালা।[১৪] ব্যক্তিগত উদ্যোগে গুরুসদয় দত্তের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৬১ সালে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার জোকোর ব্রতচারি গ্রামে গুরুসদয় লোকসংগ্রহশালাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এ লোকসংগ্রহশালায় রয়েছে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার নকশি কাঁথা। এ ছাড়াও এখানে চিত্রকলা, পোড়ামাটির নানারকম ফলক, নিদর্শন, মৃৎশিল্প, তক্ষণশিল্প, বাঁশজাতশিল্প, লোকবাদ্য, দারুশিল্প, ঢোকরা ইত্যাদি শিল্পে এটি সমৃদ্ধ।[১৫]

ভারতে নানা ধরনের সংগ্রহশালা গড়ে ওঠা অব্যহত ছিলো। ইংরেজ শাসকদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এশিয়াটিক সোসাইটি ছাড়াও কলকাতায় চার্লস স্টুয়ার্সের ব্যক্তিগত উদ্যোগে গড়ে ওঠে কেরি সংগ্রহশালা এবং গ্রন্থাগার (১৮১৮), জুয়োলজিক্যাল সংগ্রহশালা, মাদ্রাসা খ্রিষ্টান কলেজ টামবারাম (১৮৩৮), সরকারি সংগ্রহশালা মাদ্রার্স, ভিক্টোরিয়া সংগ্রহশালা করাচি (১৮৫১), এবং ভিক্টোরিয়া এ্যান্ড আলবার্ট সংগ্রহশালা বোম্বে (১৮৫১)। ইংল্যান্ডের রাণীর স্বরণে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল সংগ্রহশালাটি প্রতিষ্ঠা করেন ভারতের বড় লাট লর্ড কার্জন ১৯০১ সালে। হুগলীতে গড়ে ওঠে অমূল্য প্রত্নশালা। শিলিগুড়ি দার্জিলিংয়ের উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অক্ষয় মৈত্রেয় ও রাজা রামনাম সংগ্রহশালা। আচার্য যোগেন চন্দ্র পুরাকীর্তি ভবন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বিষ্ণুপুর বাঁকুড়া। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় লোকসংস্কৃতি বিভাগীয় সংগ্রহশালা উল্লেখ করার মতো। সুতরাং সমগ্র ভারতবর্ষে সংগ্রহশালা গড়ে ওঠার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, দক্ষিণ এশিয়ায় সংগ্রহশালা গড়ার প্রথম পদক্ষেপ ছিলো ইউরোপীয়দের (১৭৯৬-১৮৫৭)। দ্বিতীয় পর্যায়ে ভারতের রাজা ও সামন্তপ্রভুদের মধ্যে (১৮৫৭-১৮৯৯) এবং তৃতীয় পর্যায়ে (১৮৯৯-১৯৪৭) রাজা, সামন্তপ্রভূ এবং স্থানীয় বুদ্ধিজীবিদের সহযোগিতায় সংগ্রহশালার বিস্তরণ ঘটে।[১৬]

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট উপমহাদেশে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়ে দুটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে।[১৭] ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তরপূর্ব অঞ্চলের কিয়দংশ নিয়ে জন্ম হয় পাকিস্তান রাষ্ট্রের। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা নতুনভাবে ঔপনিবেশিক বিচ্ছিন্নতায় আক্রান্ত হয় এবং ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র

অর্জন করে।[১৮] তবে ভারত বিভক্তিকালে পশ্চিমবাংলা ও পূর্ববাংলায় ভৌগোলিক সীমা পরিবর্তন করা হলেও আবহাওয়া, ভূপ্রকৃতি এবং ভাষাগত ঐক্যের কারণে এর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য একই উৎস থেকে জন্ম নেয়। এ কারণে বাংলাদেশের সংস্কৃতি সামগ্রিকভাবে ভারতবর্ষের আবহমানকালের সংস্কৃতির সাথে সম্পৃক্ততা এখনও রয়ে গেছে।[১৯] ভারত বিভক্তির পর পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তান মিলে এদেশে সংগ্রহশালার সংখ্যা ছিলো ১৮টি। এর মধ্যে ৭টি ছিলো পূর্ব পাকিস্তানে। তৎকালিন সময় বর্তমান বাংলাদেশে গড়ে ওঠা সংগ্রহশালার মধ্যে ছিলো বরেন্দ্র গবেষণা সংগ্রহশালা রাজশাহী, ঢাকা সংগ্রহশালা ঢাকা, রংপুর সাহিত্য পরিষদ সংগ্রহশালা রংপুর, ঢাকা সাহিত্য পরিষদ সংগ্রহশালা ঢাকা, শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষদ সংগ্রহশালা সিলেট, বলধা সংগ্রহশালা ঢাকা এবং রামলালা সংগ্রহশালা কুমিল্লা।[২০]

ড. মাহমুদ তাঁর The Museums in Bangladesh গ্রন্থে ঢাকা বিভাগে ৪২টি, চট্টগ্রাম বিভাগে ১৪টি, রাজশাহী বিভাগে ১৭টি এবং খুলনা বিভাগে ৪টি সংগ্রহশালার কথা উল্লেখ করেছেন। জেলাভিত্তিক পর্যবেক্ষণে ঢাকা জেলায় সংগ্রহশালার সংখ্যা সবচেয়ে বেশি রয়েছে। ময়মনসিংহ জেলায় রয়েছে ১২টি। রাজশাহী জেলায় ১২টি, চট্টগ্রাম জেলায় ৬টি, কুমিল্লা জেলায় ৪টি, সিলেট এবং কুষ্টিয়া জেলায় ৩টি সংগ্রহশালা রয়েছে। বগুড়া, দিনাজপুর এবং রংপুরে দুইটি সংগ্রহশালা রয়েছে। পাবর্ত্য চট্টগ্রাম, ফরিদপুর, বরিশাল, পাবনা জেলায় একটি করে সংগ্রহশালা রয়েছে। নোয়াখালী, যশোর, পটুয়াখালীতে কোনোও সংগ্রহশালার উল্লেখ করা হয়নি। বাংলাদেশের সংগ্রহশালার এই জরিপটি করা হয়েছিলো ১৯৮৭ সালে এবং সেখানে এদেশে মাত্র ৭৮টি সংগ্রহশালার চিহ্নিত করা হয়েছে। বহু উদ্দেশ্য সম্বলিত সংগ্রহশালার মধ্যে ছিলো বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, চলনবিল সংগ্রহশালা নাটোর, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহশালা চট্টগ্রাম, ফরিদপুর সংগ্রহশালা ফরিদপুর, কিশোরগঞ্জ সংগ্রহশালা কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ সংগ্রহশালা ময়মনসিংহ, রামলালা সংগ্রহশালা কুমিল্লা, জেলা পরিষদ সংগ্রহশালা বগুড়া। প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা বলতে উল্লেখ করা হয়েছে দিনাজপুর সংগ্রহশালা, কুষ্টিয়া কুঠিবাড়ি সংগ্রহশালা, রংপুর সংগ্রহশালা, সিলেট ইতিহাস এবং প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা, রাজশাহী বরেন্দ্র গবেষণা সংগ্রহশালা। প্রত্নস্থল ও খনন স্থানে গড়ে ওঠা সাইট সংগ্রহশালার মধ্যে ছিল মহাস্থানগড় সংগ্রহশালা (১৯৬৭), ময়নামতি সংগ্রহশালা (১৯৫৬), পাহাড়পুর সংগ্রহশালা (১৯৫৭)।[২১] ঐতিহাসিক যুগের মানুষের ব্যবহৃত নিদর্শন সামগ্রীর তালিকায় লিপি সংবলিত ফলক, মুদ্রা, তৈজসপত্র, আসবাবপত্র, সমরাস্ত্র, গৃহস্থালী দ্রব্যাদি, ভাস্কর্য, অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রপাতি, চারুকারুজাত পণ্য, অংলকার ইত্যাদি প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রশালার সংগৃহীত অন্যতম উপাদান।[২২]

শিল্পকলা বিষয়ক সংগ্রহশালাটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের। স্মৃতিবিজড়িত সংগ্রহশালার মধ্যে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের কুঠিবাড়ি, কাচারি বাড়ি শাহজাদপুর পাবনা। বিষয়ভিত্তিক সংগ্রহশালার মধ্যে কুমিল্লার ময়নামতি সেনানিবাসে অবস্থিত মুক্তিযুদ্ধ সংগ্রহশালা, শহীদ স্মৃতি সংগ্রহশালা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। আগুন, লোক, জীবন্ত, মিলিটারি, ওপেন ইয়ার, পুলিশ, আঞ্চলিক, খেলাধুলা অথবা খেলনা সংগ্রহশালা বাংলাদেশে খুঁজে পাওয়া যায়নি বলে এই গ্রন্থটিতে উল্লেখ করেছেন। সংগ্রহশালার শ্রেণিবিন্যাস করতে গিয়ে ফিরোজ মাহ্‌মুদ ও হাবিবুর রহমান লোকসংগ্রহশালা নামে একটি ভিন্ন শ্রেণির উল্লেখ করলেও তার উদাহরণ হিসেবে বেছে নিয়েছেন স্টকহোমের Skansen সংগ্রহশালাটি। অর্থাৎ জনাব মাহ্‌মুদ ও রহমান চিহ্নিত বাংলাদেশের ৭৮টি সংগ্রহশালার কোনোটিকেই স্বতন্ত্রভাবে লোকসংগ্রহশালার নাম বা মর্যাদা দান করেননি।[২৩] সৈয়দ আমীরুল ইসলাম সম্পাদিত 'বাংলাদেশের জাদুঘর' গ্রন্থটিতে বাংলাদেশে ১১৫টি[২৪] এবং 'বাংলাদেশে মিউজিয়াম' গ্রন্থটিতে সংগ্রহশালার তালিকা রয়েছে ১৪৪টি।[২৫]

যা হোক, সময়ের পরিবর্তনে বাংলাদেশে বর্তমানে ৬টি বিভাগের অনেক জেলায় নব্বই দশক থেকে ব্যক্তিগত উদ্যোগে ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সংগ্রহশালা গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশে উপজাতি জীবনগোষ্ঠীভিত্তিক সংগ্রহশালার মধ্যে উল্লেখযোগ্য জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর (Ethnological Museum) (চট্টগ্রাম ১৯৬৫ উপজাতীয় কালচারাল একাডেমি জাদুঘর বিরিশিরি (নেত্রকনা ১৯৭৭) উপজাতীয় জাদুঘর রাঙ্গামাটি (রাঙ্গামাটি ১৯৭৮)। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সম্বলিত লোকসংগ্রহশালা পাহাড়পুর সংগ্রহশালা নওগাঁ (ময়নামতি সংগ্রহশালা কুমিল্লা মহাস্থানগড় সংগ্রহশালা বগুড়া, ঢাকা নগর জাদুঘর (ঢাকা ১৯৯৬) ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশ পুলিশ প্রশাসন গড়ে তুলেছে পুলিশ মিউজিয়াম, এবং হাইকোর্ট বিভাগে স্থাপন করেছে হাইকোর্ট সংগ্রহশালা।[২৬] মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ব বাংলায় দুই পর্বে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রত্নসম্পদ অন্বেষণের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিলো। ১৯৭২ সালে সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসাবে বাংলাদেশে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়।[২৭]

বহুমাত্রিক সংগ্রহশালার মধ্যে রাজশাহী জেলার ঘোষপাড়ায় ১৯১০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির পৃষ্ঠপোষকতায় দয়ারামপুরের জমিদার শরৎকুমার রায়, ইতিহাসবিদ অক্ষয়কুমার মৈত্র, নৃতত্ত্ববিদ রমাপ্রসাদ চন্দ্রের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বাংলা ভূখণ্ডে প্রথম বরেন্দ্র গবেষণা সংগ্রহশালাটি গড়ে ওঠে। ১৯১৪ সালে ১৮৬০ সালের ভারতীয় সমিতি আইনে সংগ্রহশালাটির নিবন্ধন করা হয়।[২৮] বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এখানে নতুন ভবন নির্মাণ করা হয় এবং ভবনের কিছু অংশ সম্প্রসারণ করা হয়। ঢাকা সংগ্রহশালা বর্তমান ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের (প্রাক্তন সচিবালয়) একটি

রুমে ১৯১৩ সালের ৭ আগস্ট লর্ড কারমাইকেল আনুষ্ঠানিকভাবে সংগ্রহশালাটি উদ্বোধন করেন। দর্শকদের জন্য এটি উন্মুক্ত করা হয় ২৫ আগস্ট। সংরক্ষিত উপাদান রাখার জন্য জায়গা সংকুলান না হওয়ায় অবশেষে ১৯১৫ সালে ঢাকার নিমতলীর বারোদুয়ারীতে ঢাকা জাদুঘর স্থানান্তরিত করা হয়। ১৯৬৬ সালের ১৬ নভেম্বর তৎকালিন গভর্ণর ঢাকা সংগ্রহশালাটির ভিত্তি স্থাপন করেন। ১৯৭০ সালে ঢাকা মিউজিয়াম অধ্যাদেশ অনুযায়ী বোর্ড অব ট্রাস্টিজ গঠিত হয় এবং ঢাকা সংগ্রহশালা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।[২৯]

স্বতন্ত্রভাবে লোকসংগ্রহশালা গড়ে তোলার স্বপ্ন পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলার অনেক বিদ্যোৎসায়ী এবং পণ্ডিতবর্গের মধ্যে দেখা যায়। এঁদের মধ্যে কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শান্তিনিকেতন এবং শিলাইদহের দুটি প্রধান কর্মক্ষেত্রের মধ্যে কুষ্টিয়ার শিলাইদহের কুঠিবাড়ীতে লোকসংস্কৃতির নিদর্শন সংগ্রহের কাজ তিনি বেশি করেছিলেন। রবিঠাকুরের বাংলার নিজস্ব লোকশিল্প সংগ্রহের নিদর্শনের মধ্যে ছিলো বাংলার মাটির ঘরের মডেল ও একচালা, দোচালা, চৌচালা, আটচালা, চালাঘরের নমুনা, কাঁথা, শিকা, সূচি-কর্ম ও রজু-শিল্পের ইত্যাদি নিদর্শন।[৩০] পূর্ব বাংলায় ফোকলোরকে পরিচিত করার ক্ষেত্রে বিদগ্ধজনগণের মধ্যে বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি হয়। পত্র পত্রিকা, সভা সমিতি ও ব্যক্তিগত সংগ্রহ অনুশীলনের মাধ্যমে বাংলা একাডেমির ভূমিকা ছিলো সবচেয়ে বেশি। বাংলা একাডেমির স্বপ্নদ্রষ্টা ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ পূর্ব বাংলার নানা স্থান থেকে পুঁথি, পল্লীগীতি, পল্লীকাব্য ও উপকথা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে সংগ্রহশালা স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছিলেন।[৩১] শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন পূর্ব বাংলায় লোকশিল্পের জন্য আলাদা সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন দীর্ঘদিন ধরে দেখে এসেছিলেন। স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁওয়ে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন গঠনের নথিতে স্বাক্ষর করেন। ১৯৭৪ সালে ১২ মার্চ এক গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ফাউন্ডেশন গঠিত হয়। বাংলা একাডেমির লোক ঐতিহ্য সংগ্রহশালা ও ফোকলোর সংকলন বিভাগে সাহিত্যের উপাদানের সাথে বস্তুগত লোকসংস্কৃতির বিবিধ উপাদান সংরক্ষিত আছে।[৩২]

১৯৫৫ সালে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন ও তদানিন্তন আর্টর্স কাউন্সিলের প্রধান আলতাফ গওহরের প্রচেষ্ঠায় ঢাকার সেগুনবাগানস্থ সাবেক চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় ভবন প্রদর্শনী ও আন্তঃজেলা প্রতিযোগিতা লোক ও কারুশিল্প পুনর্প্রবর্তনের এক সার্থক পদক্ষেপ ছিলো। একদিকে কারুশিল্পে কিছু ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, অপরদিকে শিল্পী কামরুল হাসানের পরিচালনাধীনে আধা সরকারি প্রতিষ্ঠান ডিজাইন সেন্টারের বাংলাদেশে জন্ম হয়। ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ঢাকা ও কুমিল্লার কাঠ, বাঁশ,

খাদি, মৃৎশিল্প প্রভৃতির দোকান পাট ও ছোট ছোট কারখানাগুলোর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।[৩৩] পুরনো ঢাকায় অবস্থিত লালবাগপ্রাসাদ দুর্গ মুঘল আমলের স্থাপত্যকলার অন্যতম নিদর্শন। বর্তমানে লালবাগের সংগ্রহশালায় ইসলামী শিল্পকলার বিবিধ উপাদান সংরক্ষিত রয়েছে। ঐতিহ্যবাহী ঢাকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নির্দশন আহসান মঞ্জিল ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদীর উত্তর তীর ঘেঁষে ইসলামপুর এলাকায় অবস্থিত। ১৯৯২ সালের ২০ সেপ্টেম্বর আহসান মঞ্জিল জাদুঘরটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ও জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়।[৩৪] ঢাকার ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের নগর ভবনের ষষ্ঠ তলায় ১৯৯৬ সালের ২০ জুলাই ঢাকা নগর সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ ছাড়াও প্রতিষ্ঠানগত ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে বাংলাদেশের অনেক জেলায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একাধিক সংগ্রহশালা। তোফায়েল আহমেদের বাংলা ঘর (ঢাকা)[৩৫] এবং মোহাম্মদ সাইদুরের লোক ঐতিহ্য সংগ্রহশালা (কিশোরগঞ্জ- ১৯৮৮) দুটি ব্যক্তিগতভাবে গড়ে তোলা লোকশিল্প সমৃদ্ধ অন্যতম সংগ্রহশালা।[৩৬]

বাংলাদেশের লোকসংগ্রহশালায় সংরক্ষিত ইসলামী উপাদান হিসেবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে প্রত্নতাত্ত্বিক খননে প্রাপ্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ইসলামী স্থাপনা থেকে উদ্ধারকৃত টেরাকোটা। দ্বিতীয়ত সমকালীন লোক ও কারুশিল্পে (Material Culture) যথা বস্ত্রশিল্প, মৃৎশিল্প, ধাতব শিল্প, আইভরিশিল্প, দারুশিল্প, বাঁশ ও বেতজাতদ্রব্য ইত্যাদিতে ইসলামী ভাবধারায় নির্মিত উপাদান যা বাংলাদেশের বহুমাত্রিক এবং একমাত্রিক লোকসংগ্রহশালায় সংরক্ষিত হয়েছে। বলা বাহুল্য যে, বাংলার এসব প্রতিটি শিল্পকর্মে মূলত সার্বজনীন নকশাকলার প্রাধান্য লক্ষ করা যায়।

L. evsjv‡`‡k †jvKmsMnkvjvi ¸iæZ

বাংলাদেশের লোকসংগ্রহশালা হলো বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্য অন্বেষণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থান। ইতিহাস ও ঐতিহ্যের আলোকে লোকসংগ্রহশালায় সংরক্ষিত উপাদান সুদূর অতীতের গোষ্ঠীভিত্তিক লোকশিল্পীর মর্যাদা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেয়। অর্থ্যাৎ সময়ের পরিবর্তন ও চাহিদা মানুষের সামনে উপস্থাপন করে। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হাজার বছরের পুরনো। এই ঐতিহ্য সুদূর প্রাচীন কাল থেকে বাঙালি জনগোষ্ঠীর মূল্যবোধে, স্বকীয়তায়, ধর্মীয়চেতনায় পরিস্ফুটিত হয়। গুহাবাসীদের লড়াইয়ের সাক্ষী হয়ে আছে তাদের ব্যবহারিক হাতিয়ারের মধ্যে। তেমনি তাদের আঁকা ছবি সভ্য মানুষের দিক নির্দেশনার কাজ করেছে।

যুগে যুগে নানা সময় শাসকশ্রেণির আবির্ভাব ঘটেছে। তাঁরা পৃষ্ঠপোষকতা করেছে শিল্পচর্চায়। বাংলায় ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের পর মুসলমানদের মধ্যে ধর্মকেন্দ্রিক শিল্পচর্চার পরিবর্তে সৃজনশীল শিল্পের

বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। উল্লেখ্য, দুই ধরনের শিল্পধারা লক্ষ করা যায়। ধর্মকেন্দ্রিক শিল্পচর্চা এবং আত্তিক শিল্পচর্চা। ইসলাম ছাড়া প্রতিটি ধর্মই শিল্পকলা কেন্দ্রিক। বাংলার লোকশিল্পে ইসলামী শিল্পকলা ও নকশাকলার প্রভাব ছাড়াও লোক সংগ্রহশালা প্রতিটি ধর্মের বৈশিষ্ট্য সম্মুখে আনে। ফলে লোকশিল্প ধ্রুপদি, দরবারী চিত্র শিল্পের বৈশিষ্ট্য পৃথক করা সহজ হয়। পবিত্র কোরআন শরিফ আরবি ভাষায় লিখিত। আরবি হরফ সৌন্দর্যমণ্ডিত করার জন্যে মুসলমান শিল্পীরা দীর্ঘদিন ধরে চর্চা করে আসছে। বাংলাদেশের অনেক লোকসংগ্রহশালায় পবিত্র কোরআনের বাণী সংরক্ষিত আছে। এছাড়াও তামা, সোনা, রৌপ্য, কাঁসা ওপর আরবি হরফ উপস্থাপন করে তা নান্দনিক রূপ দেওয়া হয়েছে। যে কারণে কোরাআনের আয়াত শুধুমাত্র কাগজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। বরং আরবিলিপিমালা চমৎকার নান্দনিক রূপদান করা হয়েছে। এভাবে লোক সংগ্রহশালা ইসলামী মূল্যবোধ সংরক্ষণের পাশাপশি ধর্মচর্চায় কোরআনের সম্পৃক্তা যথার্থভাবে অনুধাবণ করার দিক নির্দেশনা দেয়।

বাংলাদেশের লোকসংগ্রহশালা লোকশিল্পের হারানো ঐতিহ্যকে পুনরায় আবিষ্কার করার লক্ষ্যে একটি চারু ও কারুশিল্প অনুসন্ধানী প্রতিষ্ঠান। লোক সংগ্রহশালার সংগ্রাহকরা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লোক ও কারুশিল্পে উপাদান সন্ধান করে সংগ্রহশালার জন্য সংগ্রহ করেন। এ কারণে বাংলার লোকশিল্পের চিরন্তন রূপ নকশার সঙ্গে প্রাচীন কারুশিল্পের নিদর্শন একসঙ্গে দেখতে পাওয়া যায়। সময়ের পরিবর্তনে দীর্ঘদিনের বাংলার প্রচলিত অনেক শিল্পই আজ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কারণ মানুষের রুচি কখনই এক রকম থাকেনি। এক সময় মানুষ মাটির তৈরি তৈজসপত্র ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিলো সে স্থান দখল করে নেয় তামা, পিতল, কাঁসা ইত্যাদি ধাতবে তৈরি জিনিসপত্র। পরবর্তীতে সহজলভ্য উপাদান প্লাস্টিক, কাঁচ সমাজ দখল করে নিয়েছে। এ সবটাই ঘটে শুধু মানুষের রুচির কারণে। বিশেষ করে শিল্পকারখানা, বিজ্ঞানের প্রসারতায় মানুষ যান্ত্রিক জীবনে নিজেদের অভ্যস্ত করে ফেলেছে। এখন গ্রামের প্রতিটি ঘরে বৈদ্যুতিক আলো, ফ্যান, এসি, টেলিভিশন, কম্পিউটার, ইন্টারনেট পৌঁছে গেছে। তাই গ্রামীণ সমাজ আর সেই আগের গ্রামীণ সমাজের চেহারায় নেই।

তবে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো, লোকশিল্পের ব্যবহার এখন আর গ্রামীণ পরিসরে সীমাবদ্ধ নেই। বিদেশে রপ্তানী হচ্ছে অনেক নকশি কাঁথা। এক সময় যে কাঁথা শুধু গ্রামীণ সমাজের নানি-দাদিদের আনন্দের খোরাক জোগাতো, এখন সে কাঁথা পৌঁছে গেছে আমেরিকা লন্ডনের বড় বড় শহরে। অর্থাৎ লোকশিল্পের ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। দুঃখজনক হলেও এটা সত্যি যে, বাংলাদেশের কোনো লোকসংগ্রহশালায় দুইশত বছর আগের নকশি কাঁথা টিকিয়ে রাখতে পারছে না। যেগুলো টিকে আছে তার বেশিরভাগই সময়ের কারণে নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে।

Dhaka University Institutional Repository

লোকসংগ্রহশালা দর্শক, শিক্ষার্থী ও গবেষকদের সরাসরি জ্ঞান অর্জনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি স্থান। লোকসংগ্রহশালায় সংরক্ষিত উপাদান বিভিন্ন সময়ে যেমন প্রাচীন, মধ্যযুগ ও সমকালীন সময়ের নির্মিত হওয়ায় উপস্থিত দর্শক অল্প সময়ের মধ্যে একসাথে অনেক কিছু দেখে নিতে পারেন। সেই অর্থে একদিকে দর্শকের সময় যেমন বাঁচে, তেমনি তাদের অর্থ সাশ্রয় হয়। বিভিন্ন ধরনের উপাদান তারা চাক্ষুস ভাবে দেখে। দর্শকদের সামনে যুগ পরিবর্তনের সাথে মানুষের রুচির পরিবর্তনের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।

লোকশিল্প দীর্ঘস্থায়ী নয়। বরং এ শিল্প টিকে থাকে পুনরায় নির্মাণের মধ্যে। এ বিষয়টি লক্ষ রেখে বাংলাদেশের লোকসংগ্রহশালা বাঙালির বিভিন্ন উৎসব ১ বৈশাখ, ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস, ধর্মীয় উৎসব ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহাকে কেন্দ্র করে ঢাকা শহরের মানুষের জন্য গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর নির্মিত লোক ও কারুশিল্পের উপাদান নিয়ে বিভিন্ন লোকসংগ্রহশালার প্রাঙ্গণে এবং শহর ও গ্রামে মেলা বসে যায়। এ ধরনের মেলায় বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের কারুশিল্পীরা তাদের শিল্প নির্মাণের প্রক্রিয়াটি সরাসরি দর্শকদের মাঝে উপস্থাপন করে থাকে। বিশেষ করে নকশি পাখা, নকশি শিকা, কাঠের তৈরি ভাস্কর্য, জামদানি, শতরঞ্জি, শোলার কাজ, বাঁশ ও বেতজাত দ্রব্য উল্লেখ্য। মেলা চলাকালীন সময় প্রচুর দর্শকের সমাগম ঘটে। দেশের মাননীয় অনেক মন্ত্রী, দেশবরেণ্য খ্যাতিমান ব্যক্তিদের পদচারণায় মেলার পরিবেশ মুখর হয়ে ওঠে। এ ছাড়াও কখন কখন অনেক বিদেশি দর্শক, কূটনৈতিক মেলা ও উৎসব পরিদর্শন করেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রের সাংবাদিক, বাংলাদেশ বেতার, বিটিভিসহ বিভিন্ন প্রায় ১৫টি বেসরকারী টিভি চ্যানেল লোকশিল্প মেলা ও উৎসব নিয়ে তাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রামাণ্যচিত্র ও সংবাদ পরিবেশন করে থাকে।

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান এবং সাংস্কৃতিক তাৎপর্যের ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন অঞ্চলে সংগ্রহশালার অবস্থান ও গুরুত্ব নির্ধারিত হয়েছে। বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ লোকসংগ্রহশালা কারুপল্লী ফাউন্ডেশন গড়ে উঠেছে সোনারগাঁওয়ে। চৌদ্দ শতকে ফখরুদ্দিন মোহাম্মদ মোবারক শাহ ছিলেন বিস্তীর্ণ সোনারগাঁও রাজ্যের প্রথম স্বাধীন সুলতান। তাঁর আমলে ব্রক্ষপুত্র পদ্মা মেঘনার মিলন কেন্দ্রে ছিলো এক বিশাল নৌবন্দর । এই নৌবন্দর বিশ্বজুড়ে সোনারগাঁও বন্দর নামে পরিচিত লাভ করে । মরক্কো থেকে বাংলাদেশ পরিভ্রমণে আসা মুসলিম পর্যটক ইবনে বতুতা তাঁর ভ্রমন কাহিনিতে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের জীবন কাহিনি লিপিবদ্ধ করেছিলেন।[৩৭] তাঁর বর্ণনা থেকে জানা যায় এখানকার তাঁতিদের বোনা মসলিন জগৎখাতি অর্জন করেছিলো। সুনিপুণ বুননের মাধ্যমে তারা নানাধরনের নকশা তুলতে পারত।[৩৮]

লোকসংগ্রহশালায় সংরক্ষিত উপাদানের মধ্যে মৃৎশিল্প একটি অংশ। মৃৎশিল্প মানব সমাজ ও সংস্কৃতি বিকাশে দান অপরিসীম। মৃৎ শিল্পের সাথে অন্য কোনো শিল্পের তুলনা চলে না। বাঙালি সমাজে মৃৎ শিল্পের ব্যবহার সকল ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে। পোড়ামাটির শিল্পকর্ম মানুষের সবচেয়ে আদিমতম শিল্প নিদর্শন। হাতে তৈরি পদ্ধতি হলো পৃথিবীর প্রাচীনতম পদ্ধতি যা যুগ যুগ ধরে মৃৎশিল্পীরা ব্যবহার করে আসছে। সিন্ধু সভ্যতা যুগে সমসাময়িক লোকেরা যে পুতুল তৈরি করতেন বাংলার কুমোর ও নারীরা সে পুতুল আজও তৈরি করে আসছে।

গঠন বৈশিষ্ট্যে পুতুল বিমূর্ত। অধিকাংশ পুতুলের মুখ একেবারেই নেই, ক্ষেত্র বিশেষে অস্পষ্ট আভাসমাত্র। হাতে তৈরি পুতুল শুকানো হয় রোদে, অথবা পোড়ানো হয় অতি অল্প আগুনে, কিন্তু ছাঁচে তৈরি পুতুল একান্তই পোড়ামাটির পুতুল।[৩৯] টেরাকোটা মুসলিম স্থাপত্যের অন্যতম নিদর্শন। মসজিদ অলংকরণে পোড়ামাটির তৈরি ফুল-পাতার নকশা একদিকে যেমন ইসলামী নকশার অন্যতম উপাদান তেমনি বাংলার লোকজ ধারার বিশেষত্ব টেরাকোটায় বিশেষরূপে ফুটে ওঠে।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংগৃহীত আইভরি শিল্পের উপাদান যথেষ্ট সমৃদ্ধ। এ উপমহাদেশের আইভরিতে ইসলামী ও মুঘল প্রভাব ছিলো ব্যাপক।[৪০] বিশেষ করে দোলায়িত লতাপাতা এবং ফুলের মটিফের মধ্যে ইসলামী এবং মুঘল ঐতিহ্য প্রতিফলিত হয়েছে। বাংলাদেশে ব্রিটিশ আমলে আইভরি শিল্পের যে টুকু চর্চা হয়েছিলো তা প্রকৃতপক্ষে নবাব, রাম এবং সামন্ত্র জমিদারদের কল্যাণেই। আজ এ শিল্প সম্পূর্ণ রূপে অবলুপ্ত হয়ে গেছে।

নারায়ণগঞ্জের কারুপল্লী ফাউন্ডেশন, জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে বাংলার বিভিন্ন ধরনের কাঠশিল্প। বাংলাদেশের মানুষ পাথরের পরিবর্তে প্রাচীনকাল থেকে কাঠের ওপর নির্ভরশীল ছিলো।[৪১] অভিজাত উচ্চশ্রেণির মানুষের সাথে সাধারণ গৃহস্থের গৃহে, সৌখিন শিল্পায়িত গৃহে, মসজিদের কাঠের খুটি, চালের বাতা, চৌকাঠ, কড়িকাঠ খিলান ইত্যাদিতে অসাধারণ খোদাইকৃত কাজের সন্ধান পাওয়া যায়। এছাড়াও খাট, পালঙ্ক, সিন্দুক ইত্যাদি আসবাবপত্র, পিড়ি, খঞ্চা, বারকোষ, পিলসুজ ইত্যাদি, তৈজসপত্র, হুক্কার নল, ছুরির বাট, কৌটা, পুতুল ইত্যাদির ব্যবহার ছিলো অনেক বেশি।[৪২]

বাংলার প্রতিটি সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত হয়েছে ধাতব শিল্পের নিদর্শন। ধাতব শিল্পে বাংলা লোকশিল্পীদের দক্ষতা ও কৃতিত্ব অসামান্য।[৪৩] লোহা, কাসা ,স্বর্ণকার শিল্প কর্মকার বা কামার সম্প্রদায়ের বৃত্তি। থালা ঘটিবাটি পানপাত্র এবং গৃহস্থালীর অন্যান্য তৈজস তৈরিতে বাংলাদেশে এই কাসাঁর প্রচলন ছিলো সর্বাধিক। এক সময় কাজ হাতের বালা, গলার হার, কানের রিং আতরদান গোলাপ ইত্যাদি নিখুঁত কারুকাজ দেশ বিদেশে সমাদৃত ছিলো। পৌরাণিক যুগ হতে নানা দেব-দেবীর বিভিন্ন অঙ্গে অলংকার পরিধান করার আলামত পাওয়া যায়।[৪৪] ঢাকার স্বর্ণ-রৌপ্য শিল্পে নিয়োজিত কারিগরদের তারজালি কাজে নিয়োজিত রেখেছিলো।

Dhaka University Institutional Repository

ধাতব শিল্পের ওপর মুসলিম কারিগরদের তৈরি ইসলামী নকশা, আরবি লিপিমালা, নানা রকমের ফুল ও লতাপাতা সম্বলিত নকশায় ইসলামী বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে।[৪৫] বাংলাদেশের জাতীয় জাদুঘর, বরেন্দ্র গবেষণা সংগ্রহশালা ,বাংলা একাডেমির লোক ও ঐতিহ্য সংগ্রহশালায় এ ধরনের উপাদান বহু সংরক্ষিত আছে। নকশাকৃত আরবিলিপিমালায় কোরআন শরিফ, প্রস্তর, ধাতব, আইভরি ও পোড়ামাটির তৈরি বিভিন্ন উপাদান, মুদ্রা, শিলালিপি, তুলট কাগজ এবং তাল পাতায় লেখা বাংলা আরবি ও ফার্সি পাণ্ডুলিপি ইত্যাদিতে ইসলামী ভাবধারা ও লোকসংস্কৃতির মিথস্ক্রিয়ার মধ্যে হিন্দু ও মুসলিম রীতিনীতির সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়।[৪৬] ইসলামী শিল্পকলা ও লোকশিল্পে গাছপালা ও লতাপাতা নকশার সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

কেবল ধর্মীয় প্রেরণা ছাড়ায় মুসলিম শিল্পী সৃজনশীলতা এবং শৈল্পিক অভিব্যক্তি শিল্পসত্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে। বাংলাদেশের প্রার্থনার স্থান মসজিদ অলংকরণ করবার প্রবনতা সুলতানী আমল থেকে লক্ষ করা যায়।[৪৭] এসব মসজিদের মেহরাবে ও দেয়ালে পাথরের ফলকে করা হয়েছে নানা কারুকার্য। আরবিলিপিমালা সবদেশেই ইসলামী শিল্পকলার বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছে। তবে বাংলাদেশের মসজিদে আরবি লিপির ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায় না।[৪৮]

মসলিন কাপড় সেই প্রাচীনকাল থেকে সমৃদ্ধ ছিলো। ইতিহাস থেকে জানা যায় খ্রিস্টপূর্বকালে প্রথম বিশ্ব জয় করেছিলো বাংলার মুসলিন। পৃথিবীব্যাপি এদেশের সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিলো সোনারগাঁও-এ তৈরি সূক্ষ্ম বস্ত্র মসলিনের মাধ্যমে।[৪৯] সেকালে ধনী ক্ষমতাধর আমীর ওমরাহ ও বিভিন্ন দেশের রাজকুমার-রাজকুমারীদের শখের বস্ত্র ছিলো মসলিন কাপড়। বাংলাদেশ থেকে নৌ পথে প্রচুর পরিমানে মিহি চালের সাথে মিহি কাপড় মসলিনও ইউরোপের নানা দেশে রপ্তানী হতো। সম্রাজ্ঞী নূরজাহান ও সম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রিয় কাপড় ছিলো মসলিন। প্রাচীন রোমান ও মিসরীয় সম্রাটদের পরিবারে মসলিনের কদর ছিলো অপরিসীম। ফারাওদের পিরামিডের রক্ষিত মমিতেও তখন তাঁরা মূল্যবান মসলিন কাপড় ব্যবহার লক্ষনীয়।[৫০] বাঙালির লোকশিল্পের মধ্যে বিশেষ আকর্ষনীয় শিল্পকর্ম নকশি কাঁথা। বাংলাদেশের অনেক সংগ্রহশালায় এবং কলকাতার আশুতোষ এবং গুরুসদয় সংগ্রহশালায় বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার নকশিকাঁথা সংরক্ষিত আছে। এ ছাড়াও নকশি শিকা নকশি পাখা, কাগজের ঝালট, জামদানি শাড়ি, টাঙ্গাইলের শাড়ি, কাতান ও বেনারসি শাড়ি, শীতল পাটি, পিঠার সাঁচ, শোলাশিল্প ইত্যাদি সবই বাংলার লোকশিল্পের বিরাট একটি অংশ। সুতরাং বাংলাদেশে লোকসংগ্রহশালা বাংলাদেশের সুদূর প্রাচীনকাল থেকে বহমান লোকসংস্কৃতির চলমান সক্রিয় প্রতিষ্ঠান।

Dhaka University Institutional Repository

M. evsjv‡`‡ki †jvK msMnkvjvi Avš—RvwZK ¸iæZ

অজানাকে জানার, অদেখাকে দেখার তীব্র কামনা থেকে মানুষকে এক স্থান থেকে অন্যস্থানে, একদেশ থেকে অন্যদেশে ভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা মানুষের মধ্যে জেগেছে। আর এই আগ্রহ থেকেই বিশ্বে পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটেছে। লোকসংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহে পর্যটনকে বাদ দিয়ে সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। পর্যটন শিল্পকে তরান্বিত করার জন্য গঠিত হয়েছে আন্তর্জাতিক পর্যটন সংস্থা। ভ্রমণের ভেতর দিয়ে একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনার পাশাপাশি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সম্ভব হয়। বাংলাদেশের লোকসংগ্রহশালায় বিশ্বের নানা রাষ্ট্রের বিদেশি পর্যটকদের আগমনে কারণে এ দেশিয় শিল্পের সাথে তাদের পরিচয় ঘটে। তেমনি বাংলার নিজস্ব লোকসংস্কৃতির বিস্তরণ ঘটে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে।

দক্ষিণ এশিয়ার নবীনতম রাষ্ট্র বাংলাদেশের লোক ও কারুশিল্পের সুনাম ও খ্যাতি রয়েছে সেই প্রাচীন কাল থেকে। বাংলাদেশের লোকসংগ্রহশালায় সংগৃহীত অনেক লোকজ উপাদান বর্তমানে আজ আন্তর্জাতিক বিশ্বে গুরুত্বের সাথে বিবেচিত। তাই এই লোকশিল্প সাংস্কৃতিক দূত হিসেবে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্প্রীতি সৌহার্দ্য সৃষ্টি করতে পারে।

বাংলাদেশের লোকশিল্পের সাথে বিশ্বের প্রথম পরিচয় ঘটে মসলিন কাপড়ের মধ্যদিয়ে। বর্তমানে বাংলাদেশের জামদানি শাড়ি, নকশি কাঁথা, কাঠের তৈরি নানা ভাস্কর্য, ব্রোঞ্জ ও পিতলের কারুকার্যমণ্ডিত ভাস্কর্য, লোক সঙ্গীত বিশ্বে যথেষ্ট সমাদৃত। বাংলাদেশের লোক ও কারুশিল্পের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আড়ং প্রাচীন এই শিল্পকে এখনও টিকিয়ে রেখেছে। লোকশিল্পের উপাদান সহজলভ্য ও ভঙ্গুর এ কারণে দীর্ঘদিন ধরে এ শিল্প টিকে থাকে না। এ শিল্পটি টিকে থাকে চলমান নির্মাণের ভেতরে। ফলে বাংলাদেশের দক্ষকারুশিল্পীদের জীবিকা ধরে রাখতে হলে তাদের তৈরি শিল্প বাজারজাতকরণ অত্যন্ত জরুরি। বাংলাদেশে হস্তজাতশিল্পের মধ্যে রয়েছে চামড়ার ব্যাগ, পাটজাত উপকরণ ইত্যাদি। বাংলাদেশের করিকা, নিপুণ, রাজশাহীর সফুরা ইত্যাদি বাণিজ্যিক বিতান সফলতা না পেলেও আড়ং বরাবরই টিকে আছে। বিদেশী পর্যটক বাংলাদেশে এসে আড়ং থেকে অনেক নানারকমের কারুশিল্প কিনে নিয়ে যায়। এ ছাড়াও অনেকে বাংলাদেশের কারুশিল্প বিদেশেও রপ্তানী করে থাকেন। বাংলাদেশের লালনের গান এ দেশের বাউল শিল্পীরা বিশ্বের নানা রাষ্ট্রে পরিবেশন করে সুনাম কুড়িয়েছে।

বাংলা চতুদর্শ শতাব্দীর বিদায় এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর বরণ উপলক্ষ্যে ইউনেসকো-এর সহায়তায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে ১০ এপ্রিল ১৯৯৪ সালে আন্তর্জাতিক লোক ও কারুশিল্প সেমিনার অনুষ্ঠান ও কারুশিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলো। এই সেমিনারে বাংলাদেশ ছাড়াও এশিয়া ও

Dhaka University Institutional Repository

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ১২টি দেশ যথা অস্ট্রেলিয়া, ভুটান, ভারত, চীন, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও থাইল্যান্ড অংশ নেয়। সেমিনারের আলোচ্য বিষয় ছিলো 'এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের লোক ও কারুশিল্পের সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবন'। এই বিষয়ের মধ্যে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছিলো সুচিকর্মে লোকশিল্প, লোকশিল্পে মৃৎ মাধ্যম, লোক চিত্রকর্ম প্রকাশে অলংকরণ মাধ্যম এবং মাদুর ও ঝুড়ি বুনন। কিছু লোক ও কারুশিল্প এক একটি দেশের নিজস্ব অর্জন। যেমন অস্ট্রেলিয়া ও ইরানে কাঁচ ও মৃৎশিল্পভিত্তিক গৃহসজ্জাসামগ্রী, বাংলাদেশের সৌখিন রৌপ্যকর্ম তারজালি কাজ, তিব্বতে ও ভারতে ধাতব নটরাজ। এসব শিল্প উপাসনার পাত্রই হোক বা নিত্যব্যবহার্যই হোক না কেন প্রতিটি শিল্পই মানুষের কাছে চিরপরিচিত।[৫১]

দক্ষিণ কোরিয়ার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পত্নী মিসেস (কিম) ইয়ান সাং ইয়ুম ৯ নভেম্বর ২০০২ সালে ১২ জন সফরসঙ্গি নিয়ে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শনে আসেন। তিনি প্রাকৃতিক, জাতিতাত্ত্বিক ও ইতিহাস বিভাগের গ্যালারিসমূহ পরিদর্শনকালে ঐতিহ্যবাহী লোকায়ত সংস্কৃতি সম্পর্কে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। মিনানমানেরর প্রধানমন্ত্রী থান সুয়ে এর পত্নী কিয়াং কিয়াং ১৭ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করেন। এ সময় তাঁর সাথে সফর সঙ্গী ছিলেন মিনানমারের চারজন মন্ত্রী পত্নীগণ। কমনওয়েল্থ পার্লামেন্টারি এসোসিয়েশন (সিপিএ) ইউকে শাখার সদস্য বিশিষ্ট একটি সংসদীয় প্রতিনিধি দল ৭ অক্টোবর ২০০২ তারিখে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করেন। ১০ আগস্ট ২০০৫ চিলির মাননীয় রাষ্ট্রদূত Mr. Jorge Heineo and Norma Heineo বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করেন। ৩০ আগস্ট ২০০৫ নেদারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত Mr. C.S.M. Beemsterloer জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

বাংলাদেশ সুইজারল্যান্ডে IBF Innovative Bio Fibre Corporation AG And schweizerische botschaft এর উদোগে সুইজারল্যান্ডের Curling Center এ ১৫-২২ সেপ্টেম্বর ২০০৫ Art for Artists শীর্ষক বাংলাদেশ সপ্তাহ উদযাপিত হয়। জাতীয় ঘরের মহাপরিচালকের নেতৃত্বে বাংলাদেশ দলের সদস্যদের মধ্যে ছিলেন খালিদ মাহমুদ মিঠু, কনকচাঁপা চাকমা, গুলশান হোসেন, কাজী সাইদ আহমদ, সুকান্ত বণিক, কুহু, শেখ আফজাল। ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৫ বাংলাদেশ শিল্প-সংস্কৃতি বিষয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৭ সেপ্টেম্বর Drawing with the Master শীর্ষক একটি ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়। এ ওয়ার্কশপে বাংলাদেশের কাঁসা শিল্পের ওপর সুকান্ত বণিক ব্রোঞ্জের কাজ করে দেখান। এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে বাংলাদেশ ও সুইজারল্যান্ডের মধ্যে এক দীর্ঘস্থায়ী সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধন রচিত হয়েছিলো। যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে গর্বের বিষয় হয়ে থাকবে।[৫২]

পৃথিবীর প্রথম সারির ফোকলোর শাস্ত্রীদের অন্যতম ড. অ্যালান ডান্ডেস বাংলা একাডেমিতে শামসুজ্জামান খান আয়োজিত কর্মশালায় শিক্ষক হিসেবে পড়ানোর জন্য এসেছিলেন। তিনি লোক

ঐতিহ্যের সযত্ন দলিল নির্মাণকে বাংলাদেশের প্রধান কাজ হিসেবে সনাক্ত করেন। ১৯৮৭ সালে হেনরি গ্লাসি ফোকলোর গবেষণা পদ্ধতি শেখানোর উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে আসেন এবং বস্তুগত সংস্কৃতি অধ্যয়ণের উপর গুরুত্ব দেন।[৫৩] এদেশের রিক্সা আর্ট এবং রায়ের বাজারের মৃৎশিল্পীদের কারুকলা দেখে মুগ্ধ হন। ১৯৯৫ সালে বাংলা একাডেমির ফোর্ড ফাউন্ডেশনের অর্থ বরাদ্দে হেনরি আবার বাংলাদেশে আসেন লেখার উদ্দেশ্যে। বাংলাদেশ বিষয়ে লেখা (Art and life in Bangladesh) আর্ট এ্যান্ড লাইফ ইন বাংলাদেশ ১৯৯৭ সালে ইন্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়।

প্রত্ননিদর্শন প্রাপ্তির আলোকে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল বাগেরহাট। গুরুত্ব বিবেচনায় প্রত্নঅঞ্চল বাগেরহাট 'বিশ্ব ঐতিহ্যে'র অংশ হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। কুমিল্লা জেলার ময়নামতিতে রয়েছে অষ্টম শতকে নির্মিত শালবন বৌদ্ধ বিহার। ময়নামতি জাদুঘরে রক্ষিত আছে তামা নির্মিত থালাবাসন, সোনা-রুপার মুদ্রা, ব্রোঞ্জের তৈরি মূর্তি, কারুকার্যখচিত বাক্স, গয়না, বুদ্ধমূর্তি খচিত তৈজসপত্র ও মাটির পাত্র।

বগুড়া জেলা থেকে ১৮ কি.মি. উত্তরে বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরাতন প্রত্নতাত্ত্বিক এলাকা মহাস্থানগড়। করতোয়া নদীর ধারে খ্রিস্ট তৃতীয় শতকে নির্মিত প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার নিদর্শন এ মহাস্থানগড়। এছাড়া রাজশাহীর অষ্টম শতকে নির্মিত বৌদ্ধ সন্ন্যাসী মঠ পাহাড়পুর, বরেন্দ্র গবেষণা সংগ্রহশালা, দিনাজপুরের কান্তজীর মন্দির, লালবাগ দূর্গ, আহসান মঞ্জিল, পর্যটক আকর্ষনীয় স্থান। প্রাচীন বাংলার ঐতিহ্যের প্রতিনিধিত্ব করছে পাহাড়পুর ও ময়নামতি প্রত্নঅঞ্চল। এই দিক থেকে বাগেরহাট প্রত্নস্থলের গুরুত্ব কিছুটা ভিন্ন। কারণ এই প্রত্নস্থল প্রধানত বাংলার মধ্যযুগের সুলতানী পর্বের প্রতিনিধিত্ব করছে। মহাস্থান, শালবন বিহার, পাহাড়পুর বিহার এই ঐতিহাসিক স্থানেও সারা বছর পর্যটকদের ভিড় থাকে। ইতিহাস সন্ধানীদের কাছে এসব স্থান খুবই লোভনীয়।

ইউরোপ, এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া- এই তিন মহাদেশের আন্তঃযোগাযোগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে। পর্যটনের জন্য সম্ভাবনাময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, বিশ্বের সর্ববৃহৎ সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার, একই স্থানে দাঁড়িয়ে সুর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখার বিরল সুযোগ সৃষ্টিকারী কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত,সিলেটের চা বাগান, মাধবকুণ্ডের ঝরণাধারা, টেকনাফের পাহাড়ি অঞ্চল, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহ বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে থাকা প্রাচীন স্থাপত্যকর্ম এবং নানা স্থানে ছড়িয়ে থাকা জমিদার বাড়ি ইত্যাদি। মেঘালয়ের পাদদেশে অবস্থিত নেত্রকোনা জেলার পাহাড় নদীঘেরা জনপদ দুর্গাপুর।

নোয়াখালী হাতিয়া উপজেলার পশ্চিম দক্ষিণে সাগর মোহনায় অবস্থিত সেন্টমার্টিন দ্বীপ। এটি একমাত্র প্রবাল দ্বীপ সমুদ্রসীমায় সর্ব দক্ষিণের স্থলভাগ, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কারণে এখানে সারা বছরই পর্যটকদের আনাগোনা থাকে। রাঙামাটি বাংলাদেশের পার্বত্য শহর। ট্রাইবাল সংগ্রহশালা রাঙামাটি শহরের আর্কষণীয় পর্যটন স্থান।[৫৪]

N. cwiwa: cvPxbKvj †_‡K eZgvb chšÍ

আলোচ্য বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ গবেষণা নেই। কিছু গ্রন্থ ও অন্যান্য প্রকাশনায় সংগ্রহশালা জাদুঘর, ইসলামী শিল্পকলা ও লোকশিল্প নিয়ে প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে গবেষণামূলক রচনার অনুপস্থিতি লক্ষণীয়। বিক্ষিপ্ত কিছু রচনায় বিশেষ কোনো বিষয় নির্দেশ করে লেখা হয়েছে। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ রচনার অভাব রয়ে গেছে। এ ক্ষেত্রে গবেষণার লক্ষ্য হবে প্রথমত (ক) লোকসংগ্রহশালার উৎপত্তি ও বৈশিষ্ট্য, ফোকলোর ও লোকসংগ্রহশালা, লোকসংস্কৃতি, লোকশিল্প, বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিতে সংগ্রহশালার বৈশিষ্ট্য, প্রাচীনযুগ থেকে মধ্যযুগে লোকসংগ্রহশালার ঐতিহাসিক বিবর্তন, পশ্চিম বাংলার লোকসংগ্রহশালার বৈশিষ্ট্য কাঠামো তুলে ধরা (খ) বাংলাদেশে লোকসংগ্রহশালার ইতিহাস ও ঐতিহ্যের পাশাপশি বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক অপ্রাতিষ্ঠানিক সংগ্রহশালার সনাক্ত করা (গ) লোকসংগ্রহশালার কার্যক্রম সম্পর্কে পর্যালোচনা করা (ঘ) লোকসংগ্রহশালায় সংরক্ষিত ইসলামী উপাদান নির্ণয় করা (ঙ) বাংলাদেশের লোকসংগ্রহশালায়: ইসলামী নকশাকলার প্রভাব ইত্যাদি। এ ছাড়াও বর্তমান গবেষণায় বাংলাদেশ ও প্রতিবেশী ভারতের প্রতিষ্ঠিত সংগ্রহশালার ভূমিকা গুরুত্ব সহকারে বিশ্লেষণের প্রয়াস নেয়া হবে। ইতিহাস ও ঐতিহ্যের দিক থেকে দুটি দেশের বেশ কিছু সাদৃশ্য রয়েছে। এ আলোকে আমাদের গবেষণার বিষয় হিসাবে বিবেচিত হবে।

ইউরোপীয় ইতিহাস নিষ্ঠায় অনুপ্রাণিত হয়ে বিশ শতকে এ-ভূখণ্ডে ঈর্ষণীয় ইতিহাসচর্চা হয়েছে, ইতিহাসের আধার মিউজিয়াম বা সংগ্রহশালা নিয়ে গবেষণা ও গ্রন্থগার পরিমাণও নিতান্ত অপ্রতুল নয়। কিন্তু ফোক মিউজিয়াম অর্থাৎ লোকসংগ্রহশালার দিকে গবেষকের দৃষ্টি তেমনভাবে আকৃষ্ট হয়নি। ফলে লোকসাহিত্য ও লোকসংগীত বিষয়ে গবেষণার অভাব না-থাকলেও লোকসংগ্রহশালা পূর্বাপর উপেক্ষিত থেকে গেছে। জটিল আর্থ-সামাজিক ও ঐতিহাসিক কারণে গবেষণাকর্মে পিছিয়ে-থাকা দক্ষিণ এশিয়ারই অবিচ্ছেদ্য অংশ নবজাত বাংলাদেশ এর ব্যতিক্রম হবে এমনটি ভাবা নিশ্চয়ই সংগত নয়। এই অপ্রীতিকর শূণ্যস্থান পূরণ করাই বর্তমান গবেষণাপত্রের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য।

P. cKvkbv chv‡jvPbv

মিউজিয়াম, জাদুঘর, সংগ্রহশালালয়, লোকশিল্প, ইসলামী শিল্পকলা সম্পর্ক নিয়ে যে সকল বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধ/ নিবন্ধ রয়েছে সে সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা হলো।

(ক) বাংলাদেশের সমকালীন ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্প প্রদর্শনী ও মেলা ২১ মে-২১ জুলাই ২০০ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।

এই গ্রন্থটিতে ‘বাংলাদেশের সমকালীন ঐতিহ্যনির্ভর শিল্প’ এই শিরোনামে মূল হেনরি গ্লাসি অনুবাদ সালাউদ্দীন আইয়ূবের (পৃ. ৩) একটি প্রবন্ধ, ‘বাঙালির লোকশিল্পঃ ঐতিহ্য ও আধুনিকতা’ এই শিরোনামে শামসুজ্জামান খানের (পৃ. ৫) এবং ‘কীর্তিমান মানুষ ও তাদের শিল্পকর্ম’ (পৃ. ৮) এই শিরোনামে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রবন্ধে বাংলাদেশের লোক ও কারুশিল্পীদের জীবন ও কর্মের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে।

(খ) সৈয়দ মাহবুব আলম (সম্পা) †jvKwkí †jvKKvi‚wkí †gjv I †jvKR Drme নারায়ণগঞ্জঃ বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, ২০০১

এই গ্রন্থটিতে ‘ঢাকাই জামদানী শাড়ির নক্সা বৈচিত্র্য’ এই শিরোনামে মালেকা খান (পৃ. ১৭), ‘টাংগাইল শাড়ির ঐতিহ্য ও রূপ বৈচিত্র্য’ শিরোনামে সুকুমার বসাক, এবং ‘রংপুরের শতরঞ্জি বাংলার নিজস্ব এক কারুশিল্প এবং এর ভবিষ্যৎ’ (পৃ. ৫২) শিরোনামে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

(গ) সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, (সম্পা) †jvKwkí, ঢাকাঃ বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন, ১৯৮৩

এই গ্রন্থটিতে ‘বাংলার মুসলিম স্থাপত্যে লোক-উপাদান’ এই শিরোনামে (পৃ. ৪২) এবনে গোলাম সামাদের প্রবন্ধটিতে বাংলার মুসলিম স্থাপত্যে লোক উপাদানের কিভাবে সংমিশ্রন ঘটেছে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও এই গ্রন্থটিতে ‘লোক-সংস্কৃতি ও তার সমস্যা’ এই শিরোনামে (পৃ. ৩৫) শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্যের, ‘লোকশিল্প, সংজ্ঞা ও পরিধি’ এই শিরোনামে (পৃ. ১) তোফায়েল আহমদের, এবং ‘লোকশিল্পের জাতিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নঃ প্রসঙ্গ নকশি কাঁথা’ (পৃ. ১৫০) শিরোনামে সৈয়দ মাহবুব আলমের প্রবন্ধ রয়েছে।

(ঘ) Rv‘Ni mgvPvi, A‡±vei-wW‡m¤i, 2005, wbDR †jUvi, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ২০০৬, এই পত্রিকায় ‘নগর জাদুঘর’ এই শিরোনামে নজরুল ইসলামের একটি প্রবন্ধ, ‘জাদুঘরে শিক্ষা কার্যক্রম’ এই শিরোনামে ড. মো. ছাবের আলীর, ‘নিদর্শন ডকুমেন্টেশন: স্থির ও ভিডিও চিত্রের ভূমিকা’ এই শিরানোমে প্রবন্ধ রয়েছে।

(ঙ) Rv‘Ni mgvPvi, A‡±vei-wW‡m¤i, 2002 wbDR †jUvi, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এই পত্রিকায় ‘বাংলাদেশের অলংকৃত দারুশিল্প’ এই শিরোনামে এ.কে. এম দেলোয়ার হোসনের প্রবন্ধ (পৃ. ১৩), ‘পোড়ামাটির ফলক নির্মাণ-রীতি ও ভবন গাত্রে এর ব্যবহার’ শিরোনামে ড. নীরু শামসুন্নাহারের এবং ‘আহসান মঞ্জিল ও প্রদর্শনী উপস্থাপনা’ শিরোনামে মুহম্মদ হাবিবুর রহমানের (পৃ. ১৮) প্রবন্ধ রয়েছে।

(চ) সম্পা. কানিজ ফাতেমা, mwPÎ evsjv‡‘k chUb msL¨v 1-30 Rb, 2005, ঢাকা: চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর ২০০৫

এই গ্রন্থটিতে ‘বাংলাদেশের আকর্ষণীয় স্পট ও প্রত্নসম্পদ’ এই শিরোনামে লিয়াকত হোসেন খোকনের একটি প্রবন্ধ (পৃ.৭১) ‘বাংলাদেশ ও পর্যটন শিল্প’ এই শিরোনামে কবির আহমেদ (পৃ. ২১) ও ‘সোনারগাঁও ও বিশ্ববিশ্রুত মসলিনের কথা’ এই শিরোনামে (পৃ. ৬৪) গাজী রফিকের প্রবন্ধ রয়েছে।

(ছ) ড. আবদুল ওয়াহাব (সম্পা.) evsjv GKv‡Wwg cwÎKv, ৫০ বর্ষ: ৩য়- ৪র্থ সংখ্যা জুলাই-ডিসেম্বর

এই পত্রিকাটিতে ‘আমাদের আবহমান লোকসংস্কৃতি সংরক্ষণ’ এই শিরোনামে (পৃ. ৫) আশরাফ সিদ্দিকীর প্রবন্ধ, ‘বাংলা একাডেমির ফোকলোর কার্যক্রম’ এই শিরোনামে (পৃ. ১৪৭) শাহিদা খাতুনের ‘প্রত্নতত্ত্ব চর্চা এবং সাম্প্রতিক গবেষণা বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পুনর্গঠনের সম্ভাবনা’ এই শিরোনামে (পৃ. ৪৯) এ কে এম শাহনাওয়াজ, এবং ‘আদিবাসী অধ্যয়ন’ এই শিরোনামে (পৃ. ১৮২) সাহেদ মন্তাজের প্রবন্ধ রয়েছে।

(জ) অধ্যক্ষ তোফায়েল আহমদের প্রথম মৃত্যু বার্ষিকী ২৮ মার্চ ২০০৩, স্মiwYKv প্রযত্ন পরিষদ বাংলাঘর লোক ও কারুশিল্প সংগ্রহ।

(ঝ) মোবারক হোসেন, খান সম্পাদক, wkíKjv Ivb¥wlK cwÎKv, বাংলাদেশের শিল্পকলা একাডেমি, ষষ্ঠদশ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৯৯২।

এই পত্রিকায় ÔAvgv‡‘i †jvK-wPÎKjvÕ শিরোনামে ড. রফিকুল আলমের (পৃ. ১৫) একটি, ‘লোকশিল্পের ভুবনে’ এই শিরোনামে তোফায়েল আহমেদের (পৃ. ৬৯), ‘বাংলাদেশের লোক-সংস্কৃতি’

ড. আশরাফ সিদ্দিকী (পৃ.৭৭) এবং Ôevsjv‡`‡ki †jvK-ev`¨hš¿' এই শিরোনামে ড. খালেদ মাসুকে রসুলের (পৃ. ৯৫) প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

(ঞ) evsjv‡`k RvZxq hv`Ni, ৮৫ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন ০৭ আগস্ট

এই পত্রিকায় 'A Short History of the Bangladesh National Museum' এই শিরোনামে ফিরোজ মাহমুদের (পৃ. ৩) প্রবন্ধ রয়েছে। এই প্রবন্ধটির মধ্যে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ইতিহাস সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

Q. M‡elYv c×wZ I Dcv`vb

লোক সংগ্রহশালার ইতিহাস, লোকসংস্কৃতি, ইসলামী উপাদান ও লোকশিল্প নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে উপাদানের স্বল্পতা হয়ে দাঁড়ায়। এই সীমাবদ্ধতা কিছুটা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব মৌখিক ও লিখিত উপাদানের ভিত্তিতে। যে কোনো গবেষণার ক্ষেত্রে দুই ধরনের প্রধান উৎস থেকে আমরা তথ্য সংগ্রহ করতে পারি। উপাদান দুটি হলো প্রাথমিক (Primary) এবং দ্বৈতীয়িক (Secondary) উপাদান।

'বাংলাদেশের লোকসংগ্রহশালা: ইসলামী উপাদান' গবেষণার ক্ষেত্রে মুখ্য উপাদান জরিপ, সরকারি পরিসংখ্যান, তথ্যবিবরণী, সাক্ষাৎকার ইত্যাদি। দ্বিতীয় প্রকার উপাদানের অন্তর্ভুক্ত বইপত্র, সাময়িকী, সংবাদপত্র, গণমাধ্যম ও প্রবন্ধ। দ্বিতীয় প্রকার বা মাধ্যমিক উপাত্ত উপাদান থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত মূখ্য উপাদানের আলোকে যাচাই বিশ্লেষণ করেই গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হয়।

1. gL¨ Dcv`vb

১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর পাকিস্তান আমলে পূর্ব বাংলায় এবং ১৯৭১ সালের পরবর্তী বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের সংগ্রহশালার মধ্যে নির্দিষ্টভাবে লোকশিল্প ও ইসলামী উপাদান সম্পর্কিত গ্যালারি এবং লোকসংগ্রহশালা থেকে বেশিরভাগ উপাদানের তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। সব চাইতে বড় সমস্যা হলো বাংলাদেশে নিয়মিতভাবে কোনো জাদুঘর বা সংগ্রহশালার তথ্যভিত্তিক বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় না। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, কারুপল্লী ফাউন্ডেশন থেকে যা প্রকাশিত হয় তা খুবই অনিয়মিত, কয়েক বছরের ব্যবধানে, এবং সামান্য পরিসরে। যে সমস্ত প্রাচীন শিল্পকর্ম আবিস্কৃত হয় সে সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করা হয় না। জাদুঘর সম্পর্কে বই, পুস্তক, নির্দেশিকায় যা প্রকাশিত হয় তা একেবারেই অল্পবিস্তর, সংক্ষিপ্ত। আবিস্কৃত প্রাচীন নিদর্শনসমূহ খনন কার্য করে যা উত্তোলন করা হয় তার অধিকাংশই থাকে অপ্রকাশিত। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর থেকে জাদুঘর সমাচার, বিশেষ প্রদর্শনী নিদর্শন সংগ্রহ ও কর্মকাণ্ড, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর পরিচিতি,

বাংলাদেশের সমকালীন ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্প প্রদর্শনী ও মেলা, ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন সোনারগাঁও নারায়ণগঞ্জ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছে কারুশিল্পীদের তালিকা, বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী লোক ও কারুশিল্পের জরিপ ও নথিভুক্তকরণ প্রথম পর্যায়ঃ ঢাকা অঞ্চল (Survey and documentation of traditional folk art and crafts of Bangladesh phase 1 Dhaka Region) বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার ওপর লোক ও কারুশিল্পের জরিপ ও নথিভুক্ত করা হলে এ শিল্পের বর্তমান অবস্থা সঠিকভাবে নিরূপণ করা সম্ভব হবে।

mv¶vrKvi: সাক্ষাৎকার অনেক ক্ষেত্রে গবেষণার দলিলপত্রের শূন্যতা পূরণ করে। বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক ব্যক্তিগতভাবে গড়ে ওঠা সংগ্রহশালায় যেসব দক্ষ জাদুঘরকর্মীবৃন্দ দীর্ঘদিন ধরে কর্মরত রয়েছেন, অবসরে চলে গেছেন তাঁদের সাথে সাক্ষাৎকার গ্রহণের ফলে নতুন তথ্য সরবরাহে সাহায্য হয়ে থাকে।

বাংলাদেশের লোকসংগ্রহশালাঃ ইসলামী উপাদান সম্পর্কে জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক, ড. জিনাত মাহরুখ বানু, ড. শামসুন্নাহার নিরু, শিক্ষা অফিসার ড. মোহাম্মদ শরিফুল ইসলাম ড. মোহাম্মদ শিহাব উদ্দিন, ড.স্বপন কুমার বিশ্বাস (সহকারী কিপার ইতিহাস ও ধ্রুপদি শিল্পকলা বিভাগ) ড. মুহাম্মদ রেজাউল করিম উপ কিপার ইতিহাস ও ধ্রুপদি শিল্পকলা বিভাগ, ফারজানা আক্তার মিউজিয়াম কিপার বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, কারুপল্লী ফাউন্ডেশনের প্রাক্তন পরিচালক শেখ আলাউদ্দিন, মাহাবুব আলম, বিশ্বজিৎ সরকার বরেন্দ্র গবেষণার পরিচালক, বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক, উপ-পরিচালক, উপপরিচালক, বিভিন্ন সংগ্রহশালায় সংরক্ষণের জন্য উপহারদাতা, জাদুঘরের ট্রাস্টিবোর্ডের সদস্যবৃন্দ, জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কারপ্রাপ্ত লোক ও কারুশিল্পীদের মাঠ পর্যায়ে গিয়ে সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে। আমেরিকার ইন্ডিয়ানা ইউনির্ভাসিটির প্রফেসর খ্যাতিমান ফোকলোরবিদ ও গবেষক হেনরি গ্লাসি, ইন্ডিয়ান ফোকলোর কনগ্রেসের সম্মানিত সদস্য ফোকলোরবিদ প্রফেসর জহরলাল হানডু, ফোকলোরবিদ শৌমেন সেন, জাদুঘর বিশেষজ্ঞ ড. ফিরোজ মাহমুদ, স্থপতি রবিউল হুসাইন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. মো. আবুল হাসান চৌধুরী ও প্রফেসর ড. মো. শহীদুর রহমান, চারুকলা বিভাগের অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান বাদশা, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. আবুল আহসান চৌধুরী, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামে ইতিহাস ও সংস্কৃতি সহকারী অধ্যাপক ড. হাদীউজ্জামান, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. আমীরুল ইসলাম, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. আতিয়ার রহমান, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব

বিভাগের অধ্যাপক ড. এ কে এম শাহনাওয়াজ, সহযোগী অধ্যাপক ড. বুলবুল আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. জাকারিয়া, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের অধ্যাপক ড. ফয়েজুল আজিমসহ কয়েকজন সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। এসব সাক্ষাৎকার থেকে যথেষ্ট মূল্যবান তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মেরোনা মারমো, কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির এ্যাসিট্যান্ট লাইব্রেরিয়ান সুজাতা মিশ্র, ভারতের উড়িষ্যা প্রদেশ (পুরী) প্লাস্টিক ইঞ্জিনিয়ার সন্তোষ কুমার মল্লিক এবং ভারতীয় সংগ্রহশালা কর্মরত অশোক পালের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

2. ˆØZxwqK Dcv‘vb

সাধারণত বইপত্র, সাময়িকী, আত্মজীবনী, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, পত্রিকা ও গণমাধ্যমকে দ্বৈতীয়িক উৎস বলা হয়ে থাকে। বাংলাদেশের লোকসংগ্রহশালা: ইসলামী উপাদানের ওপর কোনো গ্রন্থ রচিত না হওয়ায় বিভিন্ন সাময়িকী, প্রবন্ধ, প্রতিবেদন প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত পিএইচডি অভিসন্দর্ভ থেকে সাহায্য নেয়া হয়েছে। ভারতের এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, কলকাতার গণগ্রন্থাগার, বাংলাদেশের এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগার, বাংলাদেশের জাতীয় জাদুঘরের গ্রন্থাগার, ঢাকা আগারগাঁওয়ে অবস্থিত প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের গ্রন্থাগার, নারায়ণগঞ্জের কারুপল্লী ফাউন্ডেশনের গ্রন্থাগার, রাজশাহী বরেন্দ্র গবেষণা সংগ্রহশালার গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমির গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, ঢাকা পাবলিক লাইব্রেরি, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার গ্রন্থাগার, আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ বেতারের গ্রন্থাগার থেকে বহু তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। বর্তমান ইলেকট্রনিক মাধ্যমকেও গবেষণার উৎস হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। ইন্টারনেটের বিভিন্ন ওয়েব সাইড, বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশের বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের খবর থেকে তথ্য ও ছবি নেয়া হয়েছে।

মূখ্য ও দ্বিতীয় প্রকার উপাদানের সমম্বয়ে গবেষণা সম্পাদনের চেষ্টা করা হয়েছে। গবেষকদের বরাবরই কিছু সীমাবদ্ধতা থেকে যায়। গবেষণায় বাংলা এবং ইংরেজিতে অনুদিত প্রাসঙ্গিক তথ্য ব্যবহৃত হয়েছে। সংগ্রহশালা, লোকশিল্প ও ইসলাম সম্পর্ক গবেষণার ক্ষেত্রে সাধারণত ৫টি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে। (১) ঐতিহাসিক পদ্ধতি, (২) বর্ণনামূলক পদ্ধতি, (৩) আদর্শভিত্তিক পদ্ধতি, (৪) সমন্বিত পদ্ধতি।

‘বাংলাদেশের লোকসংগ্রহশালা: ইসলামী উপাদান’ গবেষণার ক্ষেত্রে পদ্ধতিগুলোর সীমাবদ্ধতা মেনে নিয়ে সকল পদ্ধতি থেকে প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিয়ে গবেষণা কর্ম সম্পন্ন করার একটি সর্বাত্মক উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তবে এ গবেষণায় বর্ণিত ফলাফলই যে চূড়ান্ত বা শেষ কথা নয়। পরবর্তী গবেষকদের এ রচনা পথপদর্শক হিসেবে কাজ করবে বলে আমি মনে করি।

তথ্য সুত্র

১. বিনয় ঘোষ, evsjvi ms¯wZ mgvRZË (কলকাতাঃ তরুণ প্রকাশনী, ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ) পৃ. ৮
২. মাযহারুল ইসলাম, †dvK‡jvi cwiwPwZ Ges †jvK mwn‡Z¨i cVb-cVb (বাংলা একাডেমি, ১৯৬৭) পৃ. ১৭
৩. প্রভাতাংশু মাইতি, BD‡iv‡ci BwZnv‡mi i/c‡iLv (কলিকাতাঃ শ্রী ধর প্রকাশনী, ১৯৯৫) পৃ. ২১০
৪. বিনয় ঘোষ, পৃ. ৮
৫. ফিওদর করোভকিন, cw_exi BwZnvm: cvPxb hM (g‡¯‹v: প্রগতি প্রকাশন, 1983) c. 29
৬. নীহার রঞ্জন রায়, evOvjxi BwZnvm, Aw`ce (কলিকাতাঃ দেজ পাবলিশিং, ১৪০০ বঙ্গাব্দ) পৃ. ৬৭৬
৭. মোঃ মোশারফ হোসেন, cZZË D™¢e I weKvk cwi‡cwµZ evsjv‡`k (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি, ১৯৯৮) পৃ. ১৩৬
৮. এম এ রহিম, evsjvi mvgvwRK I mvs¯wZK BwZnvm c_g LÐ (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি, ১৯৯৬) পৃ. ৩১
৯. এবনে গোলাম সামাদ, Bmjvgx wkíKjv (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি, ১৯৮৯) পৃ. ১৪৮
১০. Firoz Mahmund, Habibur & Rahman, ***The Museums in Bangladesh*** (Dhaka: Bangla Academy, 1987) p. 1
১১. বিজন কুমার মন্ডল, msMnkvjv I †jvKwkí (কলকাতা, ব-দ্বীপ প্রকাশনা, ১৯১৯) পৃ. ৩০
১২. Mahmund & Rahman, p. 80
১৩. বিজন কুমার মন্ডল, পৃ. ৩৬
১৪. ঐ পৃ.৩২
১৫. ঐ. পৃ.১১৭
১৬. Mahmund, & HabiburRahman, p. 72
১৭. মোহাম্মদ আবদুল ওদুদ ভূইয়া, evsjv‡`‡ki ivR‰bwZK Dbqb (ঢাকাঃ রয়েল লাইব্রেরি, ১৯৮৯) পৃ. ২০৩
১৮. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, evsjv‡`‡ki ivRbxwZ (ঢাকাঃ দিব্য প্রকাশ ২০০৩) পৃ. ৪২
১৯. যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, †jvKwkí ebvg D”P gvMxq wkí (কলকাতাঃ লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র ১৯৯৯) পৃ. ১৩
২০. Firoz Mahmund, Habibur Rahman. p.128
২১. ঐ p. 80
২২. নাজিমুদ্দিন আহমেদ, gnv¯’vb, gqbvgZx, cvnvoci (ঢাকাঃ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রালয়, ১৯৬৬) পৃ. ১৮
২৩. Mahmund & Rahman, p. 66
২৪. সৈয়দ আমীরুল ইসলাম সম্পাঃ evsjv‡`‡ki Rv`Ni (ঢাকাঃ সময় প্রকাশনী, ২০০২) পৃ. ৯-১০
২৫. ইসলাম, পৃ. ১১০-১১৩
২৬. ঐ পৃ.
২৭. আবদুল ওয়াহাব (সম্পা) বাংলা একাডেমি পত্রিকা, ৫০ বর্ষ, ৩য়-৪র্থ সংখ্যা, পৃ. ৪৯
২৮. Mahmund & Rahman, p. 112
২৯. বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর ৮৫ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন, ০৭ আগস্ট ১৯৯৮, পৃ. ১৭
৩০. ঘোষ, পৃ. ৩২
৩১. আবদুল ওয়াহাব (সম্পা) পৃ. ১৪৭
৩২. ঐ পৃ. ১৪৯
৩৩. তোফায়েল আহমদ, †jvK HwZ‡n¨i `k w`MšÍ (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি, ১৯৯৯) পৃ. ৬৭
৩৪. Mahmund, & Rahman, p. 72,
৩৫. অধ্যক্ষ তোফায়েল আহমদের প্রথম মৃত্যু বার্ষিকী ২৮মার্চ ২০০৩, স্মরণিকা প্রযত্ন পরিষদ বাংলাঘর লোক ও কারুশিল্প সংগ্রহ। মনসুর মুসা (সম্পা.) †jvK wkí G¨vjevg, Avng‡`i †Zvdv‡qj evsjv Ni †_‡K wbevwPZ msMn (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি, ২০০৪) পৃ. ১
৩৬. প্রথম আলো, ৫ মার্চ ২০১২, পৃ. ৯
৩৭. আব্দুল করিম, XvKvB gmwjb (ঢাকাঃ নগর জাদুঘর, ১৯৯০) পৃ. ১৫
৩৮. শেখ আলাউদ্দিন (সম্পা.) gvme¨vcx †jvKKvi“wkí †gjv I †jvKR Drme (নারায়নগঞ্জ: বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, ২০০৮) পৃ. ১২

৩৯. মোঃ মোকাম্মেল হোসেন ভূঁইয়া, cvPxb evsjvi †cvovgvwUi wkí (ঢাকা: দিব্য প্রকাশক, ২০০৩) পৃ. ৩৬

৪০. আব্দুল হাফিজ, evOvjv‡`‡ki †jŠwKK HwZn¨ (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৭৫) পৃ.২৬

৪১. খগেশ কিরণ তালুকদার, evsjv‡`‡ki †jvKvqZ wkíKjv (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৭) পৃ. ১৬

৪২. জিনাত মাহরুখ বানু, evsjv‡`‡ki `vi“wkí (XvKv: বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ২০০৩) পৃ. ১৪৭

৪৩. Ajit Mookerjee, ***Folk Art of India*** (India: Clarion Books. Delhi –1986) p. 15

৪৪. ঐ p. 15

৪৫. কামাল আহমদ, wkíKjvi BwZnvm (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪) পৃ. ১১৩

৪৬. Enamul Haque, ***Islamic Art Heritage of Bangladesh*** *(Dhaka: Bangladesh National Museum,1983)p 1*

৪৭. এবনে গোলাম সামাদ, Bmjvgx wkíKjv (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯) পৃ. ১৩

৪৮. Haque, p.12

৪৯. আব্দুল করিম, XvKvB gmwjb পৃ. ৬১

৫০. ঐ পৃ. ৬১

৫১. International Seminar on Folk Arts and Crafts of Asia And the Pacific Region Bangladesh1994, Bangladesh Shilpakala Academy.

৫২. বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর, ৮৫ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন, পৃ. ১৭

৫৩. বাংলাদেশের সমকালীন ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্প প্রদর্শনী ও মেলা ২১ মে, ২১ জুলাই ২০০০, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, পৃ. ৪

৫৪. সচিত্র বাংলাদেশ পর্যটন সংখ্যা ১, ৩০ জুন ২০০৫, পৃ. ৩৮

c_g Aa¨vq

†jvKmsMnkvjvi HwZnvwmK weeZb

কোনো দেশের লোকসংগ্রহশালা সেই রাষ্ট্রের জনগোষ্ঠী, ভৌগোলিক অবস্থা এবং লোকসংস্কৃতির ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে। বাংলা একটি নদীমাতৃক অঞ্চল। গংগা ও ব্রহ্মপুত্রের অসংখ্য শাখা- প্রশাখা ছড়িয়ে রয়েছে বাংলার উর্বর মাটির বুকে। আবহমানকাল থেকে এ সব নদী-উপনদীর প্রবাহ অব্যাহত রয়েছে, তবে গতিপথের পরিবর্তন হয়েছে বারংবার। ফলে, নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে বাংলার অগনিত শহর, বন্দর ও জনপদ। নতুন পলি জমে সৃষ্টি হয়েছে নতুন জনপদ। বাঙালির সাহিত্য-সংস্কৃতি, শিল্পস্থাপত্য, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ সংগঠন, আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদির ওপর নদীর রয়েছে ব্যাপক প্রভাব। প্রায় পাঁচ ছয় হাজার বছর আগে ইন্দোচীন থেকে আসাম হয়ে বাংলায় প্রবেশ করেছিলো অস্ট্রিক জাতি। অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় গোষ্ঠীর জনসমষ্টির সাথে আর্যজাতি সংযুক্ত হয়ে গড়ে তুলে বাঙালি জাতি।[১] দ্রাবিড়, অস্ট্রোমঙ্গোলীয়, আর্য, নিগ্রো,ও সেমীয় শাখার জনসমষ্টির আকৃতি, প্রকৃতি, রক্ত ও ঐতিহ্যের বিস্ময়কর সমন্বয় ঘটেছে এই বাংলাদেশে। স্বভাবত কারণে এ অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অনুসন্ধানে উল্লেখিত জনসমষ্টির ব্যাপক অবদান লক্ষ করা যায়।[২] এ ছাড়াও বর্তমানে বাংলাদেশে ৪৭টি উপজাতি রয়েছে। Oxford Advanceed Learner's Dictionary তে বলা হয়েছে উপজাতি হলো নরগোষ্ঠীর এমন একদল মানুষ যারা অভিন্ন প্রথা রীতিনীতি, ভাষা ও ধর্ম প্রভৃতির অনুসারী হয়েও একটি নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাস করে এবং এক গোষ্ঠীপতির নেতৃত্বে পরিচালিত হয়।[৩] সুতরাং বাংলাদেশের লোকসংগ্রহশালা জাতিতাত্ত্বিক (Ethnography) ও নৃতাত্ত্বিক অর্থাৎ কোনো জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার ক্ষেত্রানুসন্ধানের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সমাজের ইতিহাস থেকে তথ্য প্রাপ্ত সম্পর্কে সঠিক ধারণা দেয়।[৪]

আলোচ্য অধ্যায়ে প্রথমত, লোকসংগ্রহশালার উৎপত্তি বৈশিষ্ট্য; দ্বিতীয়ত, বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিতের আলোকে প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলায় সংগ্রহশালার ঐতিহাসিক বিবর্তন তৃতীয়ত, ইংরেজ শাসনামলে ভারতের পশ্চিম বাংলায় গড়ে ওঠা সংগ্রহশালা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

১(ক) লোকসংগ্রহশালার উৎপত্তি ও বৈশিষ্ট্য

'লোক' এবং 'সংগ্রহশালা' এ দুটি শব্দেরই আলাদা আভিধানিক অর্থ ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। Museo এবং logy শব্দের অর্থ যথাক্রমে 'সংগ্রহ' এবং 'বিদ্যা' অর্থাৎ সংগ্রহবিদ্যা। 'Museum' বিষয়ক আলোচনা যে বিদ্যাকে অবলম্বন করে করা হয় তাই হলো Museology। অতএব লোকসংগ্রহশালা লোকবিদ্যা (Folklorology) এবং সংগ্রহবিদ্যা এই দুটি শাখার মিলনে সৃষ্টি হয়েছে লোকসংগ্রহশালা। ইংরেজি Folk শব্দের বাংলা অর্থ লোক অথবা সাধারণ গণসমাজ (People in general, People of specified class) জার্মান ভাষায় Folk শব্দটি Volk যার অর্থ একাধিক ব্যক্তি নিয়ে যে দল তৈরি হয়। এই লোক বড় আকারে জাতি, ছোট আকারে একটি পরিবার। আবার পরিবার তখনই লোক, যখন তারা তাদের পূর্বপুরুষের পরিচয় দেয়, কিভাবে এবং কোথা থেকে এসে বসতি গড়ে তোলে ইত্যাদি।[৫] অর্থ্যাৎ পুরাতন ঐতিহ্যের মৌলিক ভাণ্ডারের সাধারণ মানুষ, নৃত্ত্বতের পরিভাষায়, 'লোক'।[৬] সুতরাং লোকসংগ্রহশালার উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে সংগ্রহশালা সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন।

ইংরেজি Museum-এর বাংলা আভিধানিক অর্থ সংগ্রহশালা, প্রদর্শনশালা। এছাড়াও সংগ্রহশালা শব্দটি জাদুঘর, আলেখ্যগৃহ, দেবকুল, বিশ্বকর্মাগৃহ, খট্টকাঘর, জুওলজিক্যাল গার্ডেন, মন্দির, বীথি, চিত্রশালা ও চিড়িয়াখানা ইত্যাদি নামে পরিচিত। বাংলা অভিধান অনুযায়ী সংরক্ষণ শব্দটির মধ্যে সংগ্রহশালার বিষয়টি যুক্ত। সংরক্ষণ করা বলতে 'বিশেষ প্রকারের সংরক্ষণ' বা অবিকৃত রাখা। এ ক্ষেত্রে প্রাচীন নিদর্শনমূলক উপাদান, প্রাকৃতিক ঐতিহাসিক উপাদান, শিল্পগত উপাদান, স্মৃতিবিজরিত কোনো উপাদান, ইত্যাদি বিষয় প্রদর্শনের জন্য এবং বস্তু সংরক্ষনের জন্যে ব্যবহৃত ভবন, বাড়ি অথবা স্থান সংগ্রহশালার পর্যায়ভূক্ত করা যায়।[৭] যেখানে দৃষ্টিনন্দণ ও কৌতুহললোদ্দীপক বিষয়বস্তু সংগ্রহ ও সমাবেশের স্বতঃস্ফুর্ত আগ্রহ থেকে গবেষণা, বিনোদন ও শিক্ষা অর্জন করাই এর প্রধান ও মূল উদ্দেশ্য।[৮]

Museum গ্রিক শব্দ Movoetov থেকে এসেছে। আবার Movoetov শব্দ থেকে mouseion শব্দের উৎপত্তি। (In Greece the claim of a place to the name Movoetov- the Muses' realm- seems to have depended on its general atmosphere rather than on its concrete features. It was a place where man's mind could attain a mood of aloofness above everyday affairs. Elements of a sacred temple and of an educational institution seem to have mingled in Greek schools of philosophy, in Pythagoras school in Southern Italy and in Plato's Academy, where the study of philosophy was regarded as a service to the

Muses) গ্রিস শব্দ মটেভো (Movoetov) এর অর্থ গ্রিক দেবদেবীদের বাসগৃহ এবং এটি পার্থিব জগতের উর্ধ্বে।[৯] 'মিউজেস' (Muses) বলতে মনে মনে আলোচনা করা, গভীরভাবে চিন্তা করা, ধ্যান করা, ব্যক্তির পড়ার নিজস্ব ঘর,আনমনা হওয়া ইত্যাদি অর্থে বোঝায়। বিশেষ করে মন্দির এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন উপাদান, গ্রিক দার্শনিক দক্ষিণ ইতালির পিথাগোরাসের শিক্ষাদর্শন এবং প্লেটোর দার্শনিক মতবাদ যুক্ত করে দেবদেবীদের সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিলো সংগ্রহশালা।[১০] Nathan Baily (1737) তাঁর English Dictionary-তে Museum সম্পর্কে পড়াশোনা (Study) ও গ্রন্থাগার (Library) বলে উল্লেখ করেছেন।[১১]

আধুনিক যুগে সংগ্রহশালাকে নানাভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। 'সংগ্রহশালা বলতে কোনো বিশেষ নিদর্শন শিক্ষা ও গবেষণার চর্চা কেন্দ্র যেখানে গিয়ে দর্শনার্থী শিক্ষার সাথে আনন্দ ও বিনোদন উপভোগ করতে পারে প্রদর্শনীবস্তুর মাধ্যমে। " In its present meaning the term Museum refers to a collection of specimens of almost any character and is in theory connected with the education or enjoyment of anybody who may wish to avail himself of its facilities." অর্থাৎ সংগ্রহশালা শিক্ষার সাথে বিনোদনের যোগসূত্র তৈরি করে এবং ব্যক্তি তার নিজস্ব ক্ষমতা দিয়ে জ্ঞান অর্জন করে।[১২] এখানে সংগ্রহশালা উল্লেখযোগ্য দুটি বিষয় নির্দেশ করে, প্রথমত নিদর্শন ও উপকরণ যা মানুষের জীবন ও সমাজের সাথে সম্পৃক্ত বস্তু, যার মধ্যদিয়ে অতীত থেকে বর্তমানের প্রাসঙ্গিক উপকরণ স্বচক্ষে দেখে চেতনার আলোকে উপলব্ধি ও অনুধাবন করা যেতে পারে।[১৩] দ্বিতীয়ত, দর্শক যে কোনো উপাদান দেখে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে পারে। তাই সংগ্রহশালা গড়ে ওঠার পেছনে ব্যক্তি এবং উপকরণই হলো মূখ্য।

প্রাচীন গ্রিকদের কাছে লাইব্রেরি এবং সংগ্রহশালা এ দুটি অভিন্ন প্রতিষ্ঠান ছিলো। প্রকৃত শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে বই পড়া ছাড়া কোনো মানুষই পরিপূর্ণ শিক্ষা অর্জন করতে পারে না। লিখন পদ্ধতি আবিষ্কারের পর প্রথমে গাছের ছাল ও পোড়ামাটির ফলকের মধ্যে লিখে রাখা হতো। আবার কাগজ আবিষ্কারের পর মানুষ জ্যোতিষশাস্ত্র, অংক, চিকিৎসাবিদ্যা, অতীতের ঘটনা লিখনির মাধ্যমে পুস্তকের মাধ্যমে প্রকাশ করেছে। প্রাচীন মিসর ও গ্রিক সভ্যতায় দেখা গেছে যে, বই পুস্তক লাইব্রেরিতেই সংরক্ষণ করা হতো। একইভাবে আর্কাইভ দুস্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য দলিল দস্তাবেজ এবং ফিল্ম সংরক্ষণ করে।[১৪] এ ক্ষেত্রে বলা যায় যে, সংগ্রহশালা উপাদান সংরক্ষণের ঘর, ব্যক্তি, পুস্তক ইত্যাদি। যা ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির আলোকে সকল শ্রেণির মধ্যে ব্যাখ্যা ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাঁড়িয়ে থাকে।[১৫] সমাজে সাধারণভাবে দুই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত । বিধিবদ্ধ ও অবিধিবদ্ধ। কোনো ব্যক্তি নিজের বাড়ি, সাংস্কৃতিক সংঘ, সামাজিক সংগঠন, পাঠাগার, সংবাদপত্র,

বেতার, টেলিভিশন ইত্যাদির মাধ্যমে যখন শিক্ষা লাভ করে এ ধরনের শিক্ষা হলো অবিধিবদ্ধ। অতএব শিক্ষা শুধু পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে সীমাবদ্ধ বিষয় নয়। " Education is the manifestation of the perfection already in man" অর্থাৎ শিক্ষা মানুষের ভেতরে প্রথম থেকেই বিদ্যমান যে পূর্ণতা তার প্রকাশ।'[১৬] মানুষ জাগতিক বিষয় স্বচক্ষে দেখে যে শিক্ষা লাভ করে, সে শিক্ষা হয়ত পাঠ্যপুস্তক পড়ে সে জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়। অবশ্য আদিম কাল থেকে মানুষ প্রকৃতির কাছ থেকে প্রথমে শিক্ষা গ্রহণ করেছে। প্রসঙ্গক্রমে বলা দরকার যে, তৃতীয় বিশ্বের দেশে শতকরা ৭০-৮০ জন লোকের নিকট লিখন পদ্ধতি অনায়ত্তই রয়ে গেছে। এ ক্ষেত্রে সংগ্রহশালা সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যেখানে অক্ষরজ্ঞানহীন মানুষের মধ্যে উপাদানের ভিত্তিতে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে।

সাংস্কৃতিক সম্পদ

সংগ্রহশালার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞরা সংজ্ঞা নির্ধারণে বিভিন্ন মাপকাঠির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। বেশিরভাগ জাদুঘরবিদ মনে করে থাকেন যে, সংগ্রহশালা হলো প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সাথে সম্পৃক্ত কোনো বিশেষ দর্শনীয় স্থান, গুহা, মন্দির, মঠ, গির্জা, মসজিদ, একুরিয়াম, ঐতিহাসিক স্তম্ভ অথবা মিনার, সংরক্ষিত উদ্যান, ঐতিহাসিক স্থাপত্য, ভাস্কর্য, ঐতিহাসিক রাজপ্রাসাদ,ও ঐতিহ্যমণ্ডিতগৃহ, প্রাণিবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, সংরক্ষিত মাছগৃহ, নথিপত্রের সংরক্ষিত প্রতিষ্ঠান- যা স্থায়ী প্রদর্শিত ঘরকে পরিচর্চা করে স্মৃতিতে ধরে রাখে। প্রাচীন সমাজ থেকে দেখা গেছে যে মানুষ ধর্মীয় উপসনালয়কে নির্দিষ্টভাবে বৃহৎ অট্টালিকায় রূপ প্রদান করেছে। শত শত বছর ধরে টিকে থাকা ধর্মীয় এসব ইমারত রাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক সম্পদ হিসেবে বিবেচিত। বস্তুত এসব নিদর্শন অতীতের বহমান সংস্কৃতির আলোকে, সমাজের বিভিন্ন সময়ের ঘটে যাওয়া সকল কর্মকাণ্ড প্রমাণাদিসহ সকলের সামনে প্রকাশ করে। এভাবে সময়ের পরিবর্তনের সাথে যুগের সাক্ষি হয়ে থাকা ইমারত সংগ্রহশালায় রূপান্তরিত হয়েছে। যার মধ্যদিয়ে ঐতিহাসিক বিবর্তন ঘটেছে।

(The term 'Cultural property' means property which, on religious or secular grounds, is specifically designated by each state as being of importance for archaeology, prehistory, history, literature, art or science and which belongs to the following categories)[১৭] সাংস্কৃতিক সম্পদ বলতে সুনির্দিষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, প্রাগৈতিহাসিক, ঐতিহাসিক, সাহিত্য, শিল্পকলা, বিজ্ঞান, কোনো দুর্লভ সংগ্রহ, উদ্ভিদ লতাপাতা, খনিজ ও জীবাশ্মের কৌতুহলোদ্দীপক দ্রব্যাদি, লিপিমুদ্রা বা খোদিত সিল, জাতিতাত্ত্বিক নিদর্শন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিহাস, সামরিক ও সামাজিক ইতিহাস, যে কোনো অঞ্চলে খননের মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তু

Dhaka University Institutional Repository

এবং প্রত্নসম্পদ, ঐতিহাসিক নিদর্শন, বিধ্বস্ত পুরাকীর্তির স্থান, চমৎকৃত হওয়ার মতো যে কোনো ছবি, চিত্র ড্রয়িং (কারিগরি নকশা এবং হস্তাঙ্কিত শিল্পজাতদ্রব্য ছাড়া) ভাস্কর্য শিল্প, লিথোগ্রাফ, দুস্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি, পুরনো বই, দলিলপত্র, ডাকটিকিট, রাজস্ব টিকেট, আলোকচিত্র, ছায়াছবি, মহাফেজখানা, ১০০ বছরের পুরনো আসবাবপত্র, বাদ্যযন্ত্রাদি, দেশবরেণ্য কবি, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ, ইতিহাসবিদদের লেখা, বিভিন্ন ধরনের ব্যবহার সামগ্রী ইত্যাদি। এগুলো রাষ্ট্রীয় সম্পদ এবং এ সব সম্পদ রাষ্ট্র সংরক্ষণ করে।[১৮] তবে বাংলাদেশে এখনও পর্যন্ত সংগৃহীত উপাদানগুলোকে বৈজ্ঞানিক রীতিতে বিশ্লেষণের নিষ্ঠা কম দেখা যায়। সাংস্কৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ আইন 'ট্রেজার ট্রোভ এ্যাক্ট ১৮৭৮' (The Treasure Trove Act 1878) আইনে বলা হয়েছে যে, ১০০ বছর আগের দশ টাকা মূল্যমানের মাটির নিচে প্রোথিত অথবা লুকানো যে কোনো বস্তুসামগ্রী সরকারি মালিকানা বলে গণ্য হবে। কোনো ব্যক্তির কাছে এ ধরনের বস্তু হস্তগত হলে অবশ্যই বস্তুটি তিনি সরকারি রাজকোষে জমা দিতে বাধ্য থাকবেন। The Ancient Monuments Preservation Act, 1904 আইনের মাধ্যমে স্মৃতিসৌধ, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ, পুরাকীর্তি পাচার রোধ এবং বিভিন্ন বিখ্যাত অট্টালিকা অথবা প্রত্নতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক বা শৈল্পিক বস্তুসমূহ সংরক্ষণ ও সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করা হয়।[১৯] প্রত্নসম্পদের ওপর একটি আইন The Antiquities (Export Control) Act 1947 পুরাকীর্তি সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা প্রণীত হলেও সরকারি অনুমোদন ছাড়া যে কোনো পুরাকীর্তি বিদেশে রপ্তানি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ১৮৭৮ সালের এই আইনটি সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ১৯৬৮ সালের আইনের কার্যকারিতা লক্ষ রাখার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলো। ১৮৫৭ সালের আগের ছাড়া কোনো বস্তু এন্টিকুইটি বা পুরাকীর্তি বলে ধরা হতো না। [২০]

লক্ষ্যণীয় হলো, প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে সমাজের মানুষের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাপন প্রণালিই স্থাপত্যশিল্পকে বিভিন্ন রূপকাঠামোতে মূর্ত করে আসছে ।[২১] প্রাচীন গুহাবাসীদের মধ্যে উপলব্ধি হয়েছিলো যে, বাসস্থানের জন্যে এমন কিছু নির্মাণ করা প্রয়োজন যেখানে প্রাকৃতিক দূর্যোগ এবং পশুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। কেননা প্রাচীন গুহা থেকে আবিষ্কৃত ছবি, ভাস্কর্য এবং আদিম মানুষের কাজের জন্যে তৈরি নানা ধরনের হাতিয়ার এটাই প্রমাণ করে তারা সংরক্ষণের কলাকৌশল সম্পর্কে জানতো। যদিও এই সংরক্ষণের প্রক্রিয়াটি প্রথমে ব্যক্তির নিজের পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় কৃষিকাজে ব্যবহারের জন্য লাঙ্গল, কাস্তে, কুঠার ইত্যাদি। ধীরে ধীরে মানুষ খাদ্য সংরক্ষণের জন্য তৈরি করা শিখেছে মাটির তৈরি বড় বড় মৃৎ পাত্র। এভাবে সুতা থেকে তৈরি করা শিখেছিলো কাপড় বোনানো। ধাতব দিয়ে তৈরি করেছে নানা ধরনের সামগ্রী। যা হোক, উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের উৎপাদিকা শক্তি যাতে বৃদ্ধি পায় সেই উদ্দেশ্যে নানাবিধ আচার-অনুষ্ঠান পালন তারা

করতো। পৃথিবীর বহু দেশে আদিম মানুষের তৈরি 'মাতৃকা' মূর্তি পাওয়া গেছে; যেগুলো উৎপাদিকা শক্তির প্রতীকরূপে ভাবা হয়েছে।[২২] এভাবে দিনের পর দিন মানুষ আচার আচরণের মধ্যদিয়ে সংস্কৃতি ও সমাজবদ্ধ মানুষের প্রয়োজনীয় জিনিস বা বস্তু টিকিয়ে রেখেছে।[২৩]

বাস্তব ক্ষেত্রে এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে, স্থাপত্যশিল্পের মাধ্যম ছাড়া কোনো ইমারত, অট্টালিকা, ভবন যাই বলা হোক না কেন, স্থায়ীভাবে ধরে রাখা সম্ভব নয়। স্থাপত্যের সাথে নগরায়নের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। সামগ্রিকভাবে মানুষের রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য নগরায়নের উদ্ভব হয়। মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং রাষ্ট্রিক বিভিন্ন চাহিদা পুরণের একটি কেন্দ্রীয় জনপদের দরকার, যেখানে সুপরিকল্পিতভাবে সবকিছু স্থাপনা করা হয় সকলের সুবিধার্থে, এরকম জনপদের নামই নগর। এই নগরকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য অন্যান্য সবকিছুর মতো স্থায়ী কার্যালয়ের দরকার। সুতরাং এজন্যে নগরায়নের সঙ্গে স্থাপত্যশিল্পের কথা এসে যায়। প্রাচীনকালে রাজা এবং সামন্ত প্রভুরা যেখানে বাস করতেন, সেটিকে ঘিরেই নগরায়ন শুরু হতো। কিন্তু বাংলাদেশের আবহাওয়ার কারণে স্থাপত্যিক কীর্তি বেশিদিন টিকে থাকতে পারেনি। যে কারণে বাংলাদেশে অনেক কীর্তি থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে দেখা যায় না। এজন্য বাংলাদেশকে একটি বৃহৎ গ্রাম বলা হয় সভ্যতা এবং গ্রামীণ সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে।[২৪]

প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান

সাংস্কৃতিক উপাদানের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশন। ইংরেজি Archaeology শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ প্রত্নতত্ত্ব। সংস্কৃত প্র+ ত্ন (ত্নপ)= প্রত্ন= পুরাতন এবং তৎ+ত্ব (তত্ত্ব)-জ্ঞান বা বিজ্ঞান থেকে আধুনিক কালে প্রত্নতত্ত্ব শব্দটি জন্ম লাভ করেছে। অপর দিকে গ্রিক শব্দ archaia এবং logos শব্দ দুটি থেকে Archaeology শব্দের উৎপত্তি। এর অর্থ প্রাচীন দ্রব্যাদি জ্ঞান বা বিজ্ঞান। এই বিশ্লেষণ থেকে প্রত্নতত্ত্বের অর্থ দাঁড়ায় ' পুরাতন দ্রবাদি সম্পর্কিত জ্ঞান। সুদূর অতীতে গড়ে ওঠা সংস্কৃতি ও সভ্যতা কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। মানুষের জীবনধারা সম্পর্কিত যাবতীয় প্রমাণাদি নির্ধারিত পদ্ধতির মাধ্যমে চিহ্নিতকরণ, সংরক্ষণ ও উপস্থাপনার কাজে নিয়োজিত জ্ঞানবিজ্ঞানের এই শাখাটিই হলো প্রত্নতত্ত্ব।[২৫] প্রত্নতাত্ত্বিকদের খননের মাধ্যমে শত শত বছর আগের মানুষের ব্যবহৃত তৈজসপত্রাদি, মুদ্রা, পুঁতির সন্ধান মিলেছে। এ সব উপাদান অতীতের ইতিহাস এবং মানুষের জীবনযাপন সম্পর্কে তথ্য উদ্ঘাটন করে ইতিহাস রচনায় সহায়ক হয়েছে।[২৬] সুতরাং খননে প্রাপ্ত উপাদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং স্থায়ীভাবে তা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে গড়ে তোলা হয় সংগ্রহশালা ভবন। এভাবেই বিশ্বব্যাপী পুরাকীর্তির নির্দশন নিয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিভিন্ন সমাজে গড়ে উঠেছে সংগ্রহশালা।

বিশ্বে প্রত্নখননের প্রথম ইতিহাসের সূচনা হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব ছয়'শতকের দিকে। ব্যাবিলনের সর্বপ্রথম রাজা নেবুনিডাস (খ্রিস্টপূর্ব ৫৫৫-৪৩৮) ব্যাবিলনের সাতাস ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিটির নির্মাতার নাম ও এর অতীত ইতিহাস জানার আগ্রহে প্রাচীন ভবন ও মন্দিরের ধ্বংস স্তূপের মধ্যে খননকাজ চালিয়ে নজির সৃষ্টি করেন। রাজকন্যা এন্নিগালডি-নান্না খ্রিস্টপূর্ব ৫৫৬-৫৩৯ অব্দে খননে উন্মোচিত এবং পাশ্ববর্তী এলাকা থেকে সংগৃহীত বিভিন্ন নিদর্শনাদি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছিলো।[২৭]

প্রাচীন বাংলায় এক অঞ্চলের সাথে অন্য অঞ্চলের রেষারেষি ও যুদ্ধবিগ্রহ সব সময় লেগেই থাকত। পরাজিত অঞ্চলে লুট করা, জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেয়া, ধ্বংস করে দেয়া স্বাভাবিক ব্যাপার ছিলো। ফলে কোনো কোনো অঞ্চল মানবশূন্য হয়ে দীর্ঘকাল বিরাণ থেকে একসময় মাটি চাপা পড়ে যেতো। আবার ঝড়ঝঞ্ঝা ভূমিকম্পের কারণেও এরকম মাটিচাপা পড়ে যায়। বাংলাদেশে মাটির স্তূপ খনন করে এ ধরনের তিনটি জনপদের ধবংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এর মধ্যে পাহাড়পুর, কুমিল্লার ময়নামতি এবং বগুড়ার মহাস্থানগড়। সাম্প্রতিককালে উয়ারি বটেশ্বর ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রত্নতাত্ত্বিক খননে উন্মোচিত হয়েছে বাংলার প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিদর্শন। এ ছাড়াও বাংলায় সুলতানী যুগে নির্মিত আদিনা মসজিদ, বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদ, আটিয়া মসজিদ, সোনা মসজিদ, এবং মোগল আমলে নির্মিত লালবাগদুর্গসহ বাংলার আনাছে কানাচে বহু ইমারত টিকে আছে। এ জাতীয় ঐতিহাসিক ইমারত স্বাধীন বাংলাদেশের প্রত্নতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদ। এই সব নিদর্শন সমাজে টিকে থেকে অতীতের সাথে বর্তমান সময়ের যোগসূত্র তৈরি করে। দেশ বিদেশের পর্যটকদের চিত্তবিনোদনের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে মনের খোরাক মেটায়।[২৮] অতএব সংগ্রহশালা শুধু জাতীয় সংস্কৃতির রক্ষণাগার ও বস্তু রক্ষণের জন্যে স্বীকৃত ভবনই নয়, এটি এমন ধরনের জ্ঞানগৃহ যেখানে সংগৃহীত উপাদানসমূহ প্রদর্শনীর মাধ্যমে অজানা তথ্য উদ্ঘাটনের মাধ্যমে মানুষকে সমৃদ্ধ করে তোলে।

আইকম (ICOM)

১৯৪৬ সালে সালে পৃথিবীর জাদুঘরগুলো উন্নয়নের উদ্দেশ্যে আইকম ICOM (International Council of Museums) নামে একটি পেশাদারি প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। ICOM এর কার্যনির্বাহী কমিটি সংগ্রহশালা সংজ্ঞায়িত করেছে এভাবে, "সংগ্রহশালা একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান যা সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের জন্য একটি স্থায়িত্ব, শিক্ষা, আনন্দ ও বিনোদনের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে সাংস্কৃতিক ও বিজ্ঞাননির্ভর উপাদানসমূহ সংগ্রহের মাধ্যমে দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ, ইতিহাসতত্ত্ব, সমাজতাত্ত্বিক, পুরাতাত্ত্বিক প্রভৃতি বিষয় বিশ্লেষণের মাধ্যমে দিকনির্দেশনা দেয়।" এ ছাড়াও মানুষের আত্মিক মূল্যবোধকে জাগ্রত করতে, সমাজের সেবা এবং উন্নয়নের লক্ষ্যে সংগ্রহশালা একটি অলাভজনক স্থায়ী প্রতিষ্ঠান।

পঞ্চাশ দশকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সংরক্ষণের ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করে আসছে ইউনেসকো। UNESCO থেকে প্রকাশিত Regional Seminar on the Educational Role of Museum

পত্রিকায় সংগ্রহশালা সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে “A museum is a permanent establishment, administered in the general interest, for the purpose of proving, studying, enhancing by various means and particular, of exhibiting to the public for its delectation and instructive groups of objects and specimens of cultural value; artistic, historical and zoological gardens and aquarium etc."[২৯] সংগ্রশালা হলো এমন একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান যা সাধারণ মানুষের স্বার্থসম্পর্কিত সেবা, শিক্ষা, বিভিন্ন কৌশলে জনগণকে সেই জাতির বিভিন্ন শৈল্পিক, ঐতিহাসিক, প্রাণিবিদ্যামূলক, বাগান এবং একুরিয়াম ইত্যাদি বিষয়ের নমুনা আনন্দদানের জন্য প্রদর্শন করা হয়।

ফোকলোর ও লোকসংগ্রহশালা

১৮৪৬ সালে উইলিয়াম থম্‌স নামক একজন পণ্ডিত ‘দি এ্যাথেনিয়াম’ পত্রিকায় লিখিত একটি পত্রে প্রথম Folklore শব্দটি ব্যবহার করে বিশ্ববাসীর কাছে ফোকলোর শব্দটিকে পরিচিত করে তোলেন।[৩০] Folklore শব্দটির ব্যাপক অর্থ রয়েছে। ফোকলোরের সাথে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনযাপন, কুসংস্কার, আচার, ব্যবহার, অতীত সময়, বিশ্বাস, ঐতিহ্য, সমাজ, ধর্ম সংস্কৃতি সব কিছুর সম্পর্ক। Lore মূলত ঐতিহ্যগতভাবে শেখা (Traditional learning) প্রচলিত জ্ঞান ও তার সামগ্রিক অভিব্যক্তিকে বোঝায় যা লোক সমাজের কর্মপ্রয়াস ও মানব প্রয়াসের বৃত্তে স্বতোৎসারিত। lore শব্দের আভিধানিক অর্থ Body of traditions; Knowledge relation to some subject. শব্দের বিচারে লোর শব্দটি বিদ্যা, জ্ঞান, ঐতিহ্য, কৃষ্টি ইত্যাদি উপযুক্ত প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে।[৩১] ফোকলোর দুই ভাগে বিভক্ত- অবস্তুগত ফোকলোর (Formalised Folklore) অপরটি Material Culture. চারু ও কারুশিল্পের যাবতীয় নিদর্শন বস্তুগত লোককলার অন্তর্ভুক্ত। এই সংস্কৃতিকে এখন Artifact হিসেবে একে চিহ্নিত করা হয়। লোকশিল্প (Folkart) এই Artifact-এর অন্তর্গত। পৃথিবীর প্রথম সারির ফোকলোরবিদ হেনরি গ্লাসি (Henry Glassie) মনে করেন যে, ‘ফোকলোর গবেষণার ক্ষেত্র হিসাবে Material Culture অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বস্তুগত সংস্কৃতির ভেতর দিয়ে মানুষ প্রকৃতি ও সংস্কৃতির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য কল্পণা করে। বস্তুগত সংস্কৃতিকে স্বতঃসিদ্ধভাবে গ্রহণ করে মানুষ। কেননা এর ভেতর দিয়ে চরিতার্থ হয় তাদের উদ্যম ও প্রেরণা।’[৩২] তবে নৃতাত্ত্বিক অভিধানে Folk শব্দটিকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে ‘Folk in ethnology is the common people who share a basic tradition.’ অর্থাৎ পুরাতন ঐতিহ্যের মৌলিক ভাণ্ডারের অংশীদার সাধারণ মানুষ।[৩৩]

Shyam Chand Mukherjee তার ***Folklore Museum*** **(1969 c. xxiii)** গ্রন্থে বলেছেন যে, " Folklore museum holds special potentialities for the fulfillment of educational

requirements offering vocational instruction, and providing information about the socio-traditional behavioral- cultural as well as economic and religious aspects." অর্থ্যাৎ লোক সংগ্রহশালা কোনো একটি জনগোষ্ঠীর আচার, আচরণ, বিশ্বাস, অনুষ্ঠানাদি, ঐতিহ্য, উৎসব, যানবহন, গৃহাদি, অস্ত্রশস্ত্র, খেলাধুলা ব্যবহারিক জিনিসপত্র এবং বস্ত্র-অলংকার-শিল্প-চারুকলা-চিত্রকলা ইত্যাদি বিষয়ক উপাদান সংরক্ষিত ও এতদাসংক্রান্ত গবেষণায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান। উপরন্তু, লোকসংগ্রহশালায় প্রদর্শিত বিভিন্ন উপাদান সেই আদিম যুগ থেকে আরম্ভ করে ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ের লোকজীবনের ইতিহাস ব্যক্ত করে।[৩৪] বিশেষ করে গ্রামীণ অর্থনীতি, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যের ধারা লোকসংগ্রহশালায় স্পষ্টরূপে ফুটে ওঠে।[৩৫]

অতএব লোকসংগ্রহশালা যে কোনো রাষ্ট্রের লোকসমাজের নির্দেশিত বস্তুর আশ্রয়স্থল, চিহ্নশালা অথবা নির্দিষ্ট একটি ঠিকানা। যেখানে লোক শ্রেণির কার্যকলাপের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।[৩৬] তাই বাংলাদেশে লোকসমাজ বলতে শুধুমাত্র গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকেই নির্দিষ্টভাবে বোঝায়না, বরং সমগ্র ভূখণ্ডে বসবাসরত মানুষ শ্রেণিকে নির্দেশ করে। যেখানে বাঙালি জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় রীতিনীতি, কাজের বৈশিষ্ট্য, আচার, আচরণ, বিশ্বাস ও ভৌগোলিক ও আঞ্চলিক মানস সংগঠনের পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায়। বিশেষ করে বাংলার লোকসমাজে প্রচলিত বংশপরম্বরায় নিয়োজিত কারু ও লোকশিল্পীদের তৈরি বিভিন্ন বস্তুগত উপাদান সম্পর্কে বিশেষ ধারণা দেয়।[৩৭] এই শিল্প কৃষিনির্ভর গ্রামীণ পরিবেশের সাধারণ মানুষের মনন, মেধা ও শ্রমের বিনিময়ে সৃষ্টি হয়। পাশাপাশি এ শিল্প অভিজাত ও মার্জিত রুচি উভয়ের পটভূমিকে আলাদা করে দেখাতে শেখায়। লোকশিল্পকে সুশীল সমাজে আরো নান্দনিক ও বিনোদক করে তোলে।[৩৮] সেই অর্থে সমষ্টিগতভাবে কোনো জনগোষ্ঠী বা জাতি এবং তাদের সংগৃহীত উপকরণ জ্ঞান ও বিদ্যাচর্চায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে লোকসংগ্রহশালার সমাজে উৎপত্তি ঘটে। লোকসংগ্রহশালা থেকে দর্শকরা দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ থেকে ঐতিহ্য, নিজেশ্য স্বকীয়তা ও শিকড়ের অনুসন্ধানের ক্ষেত্র তৈরি করে শিক্ষা, জ্ঞানচর্চা এবং অবসর মূহুর্ত কাটানোর অন্যতম স্থান হিসেবে বেছে নিতে পারে।

আঠার শতকের শেষের দিকে শিল্প বিপ্লব, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, কলকারখানা ও শিক্ষার প্রসারতার কারণে বিশ্বের অনেক রাষ্ট্র ধনী হয়ে যায়। ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে আধুনিক শিল্প কলকারখানার ব্যাপক প্রসারতায় দেশিয় লোকসংস্কৃতি, লোকসঙ্গীত এবং প্রচলিত লোকশিল্প ও লোকসাহিত্যের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। বিশ্বব্যাপী দ্রুত শিল্পায়ন, নগরায়ণ এবং প্রযুক্তি কলা-কৌশল ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের কারণে পৃথিবী ব্যাপী মানব সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ব্যাপক প্রভাব এসে পড়ে। এই অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে গ্রামীণ সমাজ ক্রমশ নগরায়ণের দিকে ধাবিত হয়।

হস্তচালিত কারুশিল্পের ওপর মানুষের নির্ভরতা কমে যায়। মানুষ কায়িক শ্রমের পরিবর্তে যন্ত্রশিল্পের উপর ক্রমশ নির্ভরশীল হয়ে উঠতে থাকে। যে কারণে মানুষ গ্রাম্য জীবনের পরিবর্তে নগর সভ্যতায় নিজেদের অভ্যস্ত করে ফেলতে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, নৌকার পরিবর্তে স্ট্রিমার, গরুর গাড়ির পরিবর্তে যন্ত্রচালিত গাড়ির ব্যবহার, বড় বড় দালান কোঠায় বসবাস, আধুনিক খাবার দাবারের সাথে মানুষের পরিচিত বেড়ে যায়। বস্তুত জীবনযাপনে ভিন্ন ধারণা ও রুচির পরিবর্তন আসে। অর্থ্যাৎ মানুষ প্রযুক্তির ব্যবহার এবং আধুনিক সভ্যতার দিকেই প্রতিনিয়ত এগিয়ে গেছে। তাহলে বোঝায় যাচ্ছে যে, এই পরিবর্তনের কারণে পৃথিবীর লোক ও কারুশিল্পের সংরক্ষণাগারগুলো ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছিল।

উনিশ শতকের চতুর্থ পর্বে লোকসংস্কৃতি চর্চার এ ধারা ইউরোপ থেকে ইংল্যান্ডে পৌঁছায় এবং সেখানে ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে ফোক-লোর সোসাইটি স্থাপিত হয়।[৩৯] উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত গ্রামীণ সাস্কৃতিক ঐতিহ্য লোক ও কারুশিল্প সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে উপকরণ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে (স্ক্যানডনাভিয়া (Scandinavia)) ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, আইসল্যান্ড ও ফিনল্যান্ড ইত্যাদি রাষ্ট্রসমূহ তাদের প্রাচীন ঐতিহ্য এবং অতীতের অবস্তুগত ও বস্তুগত উপাদান সংগ্রহ করে ফোকলোর মিউজিয়াম গড়ে তোলায় উদ্যোগী হয়ে ওঠে। প্রাথমিক পরিকল্পনায় এ ধরনের সংগ্রহশালায় বস্তুগত লোকজ উপাদান সংগ্রহ করে উপাদানসমূহ প্রদর্শনের জন্য নির্বাচন করা হয় গ্রামীণ উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের খোলা পরিবেশ। বৈশিষ্ট্যগত কারণে এ ধরনের সংগ্রহশালা ওপেন এয়ার মিউজিয়াম (open air museum) নামে পরিচিত হয়। আরেকটি বিষয় ছিলো, সংগ্রহশালার উন্মুক্ত প্রাঙ্গনের মধ্যে প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী কোনো রাজকীয় পরিত্যক্ত বাড়ি সংস্কার করে সেখানে কৃষি জীবনের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন ধরনের হাতিয়ার, আসবাবপত্র ইত্যাদি উপাদান প্রর্দশন করা হতো। চালর্স ডি বোস্টন সুইডিস পণ্ডিত আঠারো শতকে বসবাসরত একটি ভবন সংস্কার করে সেখানে ফোকলোর মিউজিয়াম গড়ে তুলে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন । এছাড়াও সুইডিশ স্কুল শিক্ষক এবং ফিয়োলোজিষ্ট Artur Hazelius (1833-1901) অথর হেজেলিয়াস স্কটহোম এবং স্ক্যানসেনে **(Sknansen)** বিখ্যাত নরডিসকা মিউসেট (Nordiska Museet) লোকসংগ্রহশালাটির ভিত্তি স্থাপন করেন। এ সংগ্রহশালাটি (চিত্র ১) গড়ে ওঠে একটি খামার বাড়িতে (Folk park)। এটি ছিলো লোকসংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা করার মতো প্রথম (open air museum) লোকসংগ্রহশালা।[৪০] স্ক্যানসেনের অনুকরণে স্ক্যানডেনেভিয়ায় এবং সুইডেনে ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় ৮০০টি লোকসংগ্রহশালা গড়ে ওঠে। এভাবে নিজেদের ঐতিহ্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে লোকসংগ্রহশালা উত্তর

ইউরোপের অনেক দেশ ছাড়াও আমেরিকা, ইন্দোনেশিয়া, ইসরাইল, কোরিয়া, ভারত এবং বাংলাদেশে পর্যন্ত ছড়িয়ে যায়।

wPÎ-1: **Nordiske Museum** biWwmKv wgDwRqvg

বিশ্বে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সংগ্রহশালা গড়ে ওঠার ইতিহাসের নজির সৃষ্টি হয় মধ্যযুগের শেষের দিকে। বিশেষ করে অতীত ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে ইউরোপের ইতালীতে (রেনেসাঁ) প্রাচীন ক্ল্যাসিক্যাল সাহিত্য, জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং শিল্পকলার নবজাগরণ ঘটে। সতের শতকের প্রথমার্ধের মধ্যে বিশ্বের নানা রাষ্ট্রে বিখ্যাত প্রাতিষ্ঠানিক জাদুঘরগুলো প্রতিষ্ঠা পায়। এর মধ্যে গড়ে ওঠে অ্যাসমোলিয়ার (Ashmolean) জাদুঘর অক্সফোর্ড ১৬৩৮, ব্রিটিশ (British) জাদুঘর লন্ডন ১৭৫৯ বেলভেডিয়ারি Belvdere ভিয়েনা ১৭৮১, লুভ্যর Louver প্যারিস ১৭৮৩, প্যাডো (prado) মাদ্রিদ ১৮১৯, অ্যালটেস (Altes) জাদুঘর, বার্লিন ১৮৩০। আমেরিকার সর্বপ্রথম চারলসটন (Charlesleston) জাদুঘর দক্ষিণ ক্যারোলিনা ১৭৭৩ এবং পিয়েবডি জাদুঘর স্যালেসে ম্যাসাতুসেট। পেনসিলভানিয়া একাদেমী অব ফাইন আর্টস আমেরিকার প্রথম আর্ট জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮০৫ সালে। ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় ভিক্টোরিয়া আলবার্ট মিউজিয়াম। ১৮৫০ সালের আগে ব্রিটেনে ৫৯টি এবং ১৮৫০ থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত মোট ২৯৫ টি জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়। জার্মানিতে ১৮০০ থেকে ১৮২০ সালের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৫ টি জাদুঘর।[৪১] উল্লেখ্য যে, জাদুঘরের কাজের মূল্যায়ন করে প্রথম জাদুঘর আইন পাস হয় ১৮৪৫ সালে।[৪২]

wPÎ-2: j‡f¨i wgDwRqvg c¨vwim (B›Uvi‡bU †_‡K cvß Qwe)

ইংরেজ শাসকদের সহযোগিতায় দক্ষিণ এশিয়ায় সংগ্রহশালা ধরনের প্রতিষ্ঠানের সাথে অবিভক্ত ভারতবাসীর পরিচতি ঘটে। তবে লোকশিল্পভিত্তিক সংগ্রহশালা ১৯১৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর আশুতোষ সংগ্রহশালাটি ঘিরে দেখা যায়।[৪৩] দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার জোকোর ব্রতচারি গ্রামে লোকশিল্প নিয়ে গড়ে ওঠে 'গুরুসদয়' লোকসংগ্রহশালা।[৪৪] বাংলাদেশে লোকশিল্পভিত্তিক সংগ্রহশালার সূচনা হয় বাংলা একাডেমিকে ঘিরে। অবশ্য পূর্ববাংলার এর আগে লোকশিল্প নিয়ে সংগ্রহশালা গড়ে তোলার ধারণা মানুষের মধ্যে লক্ষ করা যায়নি। কারণ পূর্ববাংলা বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের তুলনায় অর্থনৈতিকভাবে তখনও অনেক পিছিয়ে ছিলো। বাংলাদেশের শতকরা ৯০ লোক গ্রামে বাস করতো এবং কৃষি কাজে বাংলার বেশির ভাগ মানুষ নিয়োজিত ছিলো। বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার পর ১৯৭৫ সালে লোকসংগ্রহশালা নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁওয়ে লোক ও কারুপল্লী ফাউন্ডেশনকে ঘিরে গড়ে তোলা হয়। বিশেষ করে এই ফাউন্ডেশনের লক্ষ ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ইউরোপের উন্মুক্ত সংগ্রহশালার open air museum- এর সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে এ ধরনের সংগ্রহশালা সোনারগাঁওয়ে ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না। বাংলায় সোনারগাঁও প্রাচীনকাল থেকেই ছিলো সমৃদ্ধ। সোনারগাঁওয়ে রাজধানী থাকাকালীন সময় এখানে একটি মনোরম শহর গড়ে উঠেছিলো যা পানাম নগর হিসেবে পরিচিত। ঐতিহাসিকদের তথ্য সূত্রমতে, চিরকালই এই সোনারগাঁও লোক ও কারুশিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ স্থান। ইবনে বতুতার সোনারগাঁও সম্পর্কে বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, বাংলার তাঁতিদের বোনা মসলিন একসময় জগৎখাতি অর্জন করেছিলো। চৌদ্দ শতকের শুরু থেকে সোনারগাঁও একটি বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে। ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ ছিলের বিস্তীর্ণ সোনারগাঁও রাজ্যের প্রথম স্বাধীন সুলতান। এছাড়াও মধ্যযুগ থেকে ইসলামিক শিল্প ও জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র হিসেবে সোনারগাঁওয়ের যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলো।[৪৫] তাছাড়া সোনারগাঁও তের শতক ও চৌদ্দ শতক পর্যন্ত ছিলো স্বাধীন বাংলার রাজধানী।

প্রাথমিকভাবে সোনারগাঁওয়ের পানাম নগরীতে ক্ষুদ্র পরিসরে বাংলাদেশের লোক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মূল্যবান নিদর্শন প্রদর্শনের মাধ্যমে বিশেষায়িত লোক ও কারুশিল্প জাদুঘরের অগ্রযাত্রা শুরু হয়। সোনারগাঁওয়ের পরিত্যাক্ত সর্দার বাড়ি সংস্কার করে সেখানে গ্রামীণ জনজীবনের সাথে সম্পৃক্ত ব্যবহারিক, নান্দনিক, এবং ধর্মীয় উপাদান সংরক্ষণ করা হয়েছে। কারুপল্লী ফাউন্ডেশন সম্পূর্ন গ্রামীণ পরিবেশে সংগ্রহশালার চারপাশ প্রাচীরবেষ্টিত করে এর মধ্যে গ্রামীণ স্থাপত্যের মধ্যে চৌচালা ঘর, পুকুর, কৃত্রিম হৃদ তৈরি করা হয়েছে। একটি বিষয় করা প্রয়োজন তাহলো লোকসংগ্রহশালা (open air museum) গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ গ্রামীণ পরিবেশকে প্রাধান্য দেয়া হয়। [৪৬]এর মধ্যে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আচার, আচরণ, বিশ্বাস, জীবনযাপন, পেশা কৃষিকাজ, কুমারের মাটির বাসন কোসন তৈরি, কামারের পিতলের সামগ্রী নির্মাণ, তাঁতির কাপড় বোনা, পাখা তৈরি, গ্রামীণ হাট-বাজার, নৌকা নিয়ে জেলের মাছ ধরা, গ্রামীণ বিয়ে, গৃহপালিত পশু- পাখি, রাস্তা, গ্রামীণ যানবহন, মেশিন, ইত্যাদি বিষয়কে পুন্যাঙ্গ গ্রামীণ চিত্রটিকে সংগ্রহশালার মধ্যে উপস্থাপন করা হয়। সংগ্রহশালার দর্শনার্থীদের সুবিধার্থে পিকনিকস্পট, পর্যটনকেন্দ্র, গ্রামীণ হোটেল, মাছ ধরা, নৌকা ভ্রমন, গ্রামীণ খেলাধূলা, মণ্ডামিঠায়ের দোকান ইত্যাদি ছাড়াও এখানে আনন্দ ও বিনোদনের জন্য লোকসঙ্গীত, যাত্রা-পালা, পুতুল নাচ ইত্যাদির ব্যবস্থা রয়েছে।[৪৭] লোকসংগ্রহশালার ১৭০ বিঘার আয়তনের কমপ্লেক্সের মধ্যে বনজ, ফলজ, ঔষধি ও শোভাবর্ধন কারী প্রজাতির বাহারি বৃক্ষ পাখির কলতানে মনোমুগ্ধকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। সোনারগাঁওয়ে রাস্তার দুধারে মাঠের পর মাঠ সবুজ আর সবুজ। ধান, পাট, নানা ধরনের ফসলে সারা বছর মাঠ সবুজ হয়ে থাকে। অগ্রহায়ণ মাসে কৃষকের ঘরে ফসল ওঠে। শুরু হয় নবান্ন। বাড়িতে বাড়িতে পিঠা খাওয়ার ধুম লেগে যায়। অসুখ বিসুখ হলে কবিরাজি ঔষধ খাওয়ানো হয়। গ্রাম্য ডাক্তারের কখন চিকিৎসা চলে।

প্রাচীনকাল থেকে বাংলার গ্রামীণ সমাজে শুকনো ঘাস ছন ও বাঁশ দিয়ে তৈরি করা হতো কুঁড়েঘর এবং ইট দিয়ে দালান কোঠা নির্মাণের প্রচলন সোনারগাঁওয়ে। কুঁড়েঘরের ছাদ দুইরকমের চৌচালা ও দোচালা। গৃহ ছাদের চারটি চাল এবং পরবর্তীতে দেয়ালের ওপর তিনকোণা অংশবিশিষ্ট একটি কেন্দ্রিয় বাঁকানো মটকাসহ দুটো ডালা থাকে। বাঙালিরা এদেশে বাঁশের প্রাচুর্যের ফলে সর্বজনীনভাবে বক্রাকার ছাদ-বিশিষ্ট বাসগৃহ নির্মাণের কাজে ব্যবহার করে। সুতরাং গ্রামীণ সমাজে প্রচলিত কুঁড়েঘর লোকসংগ্রহশালার অন্যতম উপাদান। প্রকৃতির অফুরন্ত রূপ, অবারিত ভূপ্রকৃতি, বৃক্ষ, মাটি- এইসব মৌলিক নির্মাণ-উপকরণ বাংলাদেশের গ্রামীণ স্থাপত্যে সাধারণত মূল গঠনসামগ্রীরূপে দেখা যায় কারুপল্লীতে।[৪৮]এর সঙ্গে আবহাওয়া, বৃষ্টি পড়ার কৌণিক পরিমাপ, সূর্যরশ্মির আলোছায়ার রূপ অনুযায়ী আবাসগৃহের নকশা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই খনার বচনে বলা হয়েছে দখিন দুয়ারি ঘরের রাজা,

পূর্ব দুয়ারি তারই প্রজা, পশ্চিম দুয়ারি মুখে ছাই, উত্তর দুয়ারির খাজনা নাই। আবার পুবে হাঁস, দক্ষিণে বাঁশ। অর্থ্যাৎ বাড়ির পূর্বদিকে থাকবে পুকুর যেখানে হাঁস সাঁতার কাটবে। এ দেশে দক্ষিণ অথবা পূর্ব থেকে যে বাতাস আসে তা পূর্ব দিকের জলভরা পুকুরের উপর দিয়ে বয়ে বাড়ির উপরে সুশীতল বইয়ে দেয় এবং পশ্চিম দিক থেকে যে তীব্র রোদ আসে তা পশ্চিমে ঘন বাঁশঝাড় থাকলে বাড়িটিকে রৌদ্রতাপ থেকে বাঁচিয়ে রাখবে। বাংলার লোকজ উপকরণ খুবই সামান্য ও সাধারণ। যেগুলো কখনো খুঁজে পেতে কষ্ট করতে হয় না আবার সুলভেও পাওয়া যায়। মাটি, খড়, কাঠ, বাঁশ নারকেল বা পাটের দড়ি, বেত, পাটকাঠি এসব নিয়েই গ্রামীণ স্থাপত্যের অগ্রযাত্রা। গ্রামের ঘরবাড়ি ভিটেভিত্তিক, একটি পরিবারের কয়েকটি ভিটে একটি উঠোন ঘিরে, তার উপর বাড়ি-ঘরদোর। ঘরের ভেতর কাঠের চৌকি অনেক সময় বাঁশের খুঁটি দিয়ে উঁচু করে লাগানো জানালা বরাবর, যাতে বাতাস গায়ে লাগে শোবার সময় এবং তলায় পেঁয়াজ, আলু, মরিচ, সব সময় ব্যবহারের জন্যে সংসারের যাবতীয় বাক্স-প্যাঁটরা, টুকিটাকি জিনিসপত্র রাখা একটি ভাঁড়ার ঘরের মতো। দেয়ালে ঝোলানো আয়না, কাঁকই, কুপি রাখার কুপিদানি, তার ওপর বাঁশের তাক। একটি আলমারি, কাঠাল গাছের হলুদ টেবিল, চেয়ার। বাঁশের আড়কাঠি থেকে বেতের দোলনা ঝোলে পাটের দড়িতে, মাঝে একটা ঝুলন্ত রঙিন কাগজের ফুল, ঝুমঝুমি- গঞ্জের মেলা থেকে বাচ্চার জন্য নিয়ে আসা। ঘরের আরেক পাশে উঁচু মাচা বাঁধা, তার ওপর এই বছরে লাগানোর জন্যে আগের বছরের ধান, পাট, শস্য ইত্যাদির বীজ অথবা বড় বড় সারি সারি গুড়ের মাটির কোলা। গ্রামের বাড়ির ঘরগুলো গ্রামের মানুষের বহুমূখী ব্যবহারের জন্যে সাধারণত এমনি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ঘরের বাইরের দেয়ালে গোঁজা থাকে কাঁচি, হুকো কিংবা একটি রঙিন ছবি।[৪৯] দাওয়ার গায়ে হেলান দিয়ে দুতিনটে বাবলা কাঠের লাঙ্গল। বাইরের উঠোনে হলুদ এক খড়ের গম্বুজ, তার আশপাশে মোরগ আর একপাল বাচ্চা নিয়ে মুরগি মাটি খুঁচে বেড়াচ্ছে, তার পাশেই গোয়ালঘর, বাঁশের কাঠামোতে এক মাটির চাড়ি, তাতে দু চারটে গরু একসঙ্গে মুখ ডুবিয়ে খেতে পারে। ভোর বেলা কৃষক লাঙল কাঁধে নিয়ে ফসল মাঠে চলে যায় আবাদ করতে। কৃষক গরু মহিষের সাহায্যে ফসল উৎপাদনের জন্য জমি চাষ করে। ধান কাটা শেষ হলে মাথায় করে কৃষকেরা বাড়ির উঠোনে বোঝাই করে রাখে। গরুর গাড়িতে করেও ধান বোঝাই করে ধান ঘরে আনা হয়। বাড়ির উঠোনেই ধান শুকানো চলে। এ কাজটি মেয়ে বউরা করে। গ্রামীণ সমাজে পল্লী বধূ কলসি কাঁখে করে নদী থেকে পানি আনে। গ্রামের মেয়েরা সকালে রান্নাবান্না সেরে বাঁশঝারের নীচে মাচানে বসে তিনচার জন মিলে নকশি কাঁথা সেলাই করছে। পানের বাটা থেকে পান নিয়ে গালে দিচ্ছে কেউ কেউ। বাপের বাড়ির গল্প, ঘর সংসারের গল্প চলছে তাদের মধ্যে। বসন্ত কালে বাজারে যাত্রাপালার আয়োজন করা হয়। হিন্দু মুসলমান সবাই যাত্রাপালা দেখতে বাজারে

যায়। ফেরিওয়ালা বাড়ির দুয়ারে এসে কাঁচের চুড়ি, কানের দুল বিক্রি করে। পুকুরে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সাঁতার কাটে। মেয়ে বউরা গোছল করে পুকুরে নদীতে। বাড়ির উঠোনের এক কোনে থাকে চাপ কল। মাঝে মধ্যে গ্রামীণ শিল্পীর কণ্ঠে শোনা যায় ভাটিয়ালী, পল্লী গীতি। অতিথি এলে বাড়ির মুরগি জবেহ করে, পুকুর থেকে জাল ফেলে মাছ ধরে আপ্যায়ন করা হয়। সকাল সকাল গ্রামের মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে আবার ভোর হলে সকাল সকাল ঘুম থেকে জাগে। ঘরের অনেক দূরে পায়খানা। চৌদ্দ পনের বছরের কিশোরীকে বিয়ে দিয়ে দেয়া যায়। বিয়ের অনুষ্ঠানে কনের বাড়িতে কলাগাছের গেটের মধ্যে নকশি করে কাগজ কেটে গেট সাজানো হয়। বরকে খাওয়ানো হয় চিনির ও লবনের শরবত। বিয়ের অনুষ্ঠানে হাসি ঠাট্টা চলে। বিয়ের শেষে আট বেহারার পালকিতে চড়ে পল্লী বধূ শ্বশুর বাড়িতে যায়। বিয়ের বছরের মাথায় কোনো কোনো মেয়ে অল্প বয়সে বাচ্চা হতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে। মৃত বাড়িতে কান্নার সুর ওঠে। মৃত ব্যক্তির নাম ধরে বর্ণনা করে আত্নীয় স্বজন চিৎকার করে কান্নাকাটি করে। সম্পূর্ণ গ্রামীণ পরিবেশ এ ধরনের সংগ্রহশালায় দেখা যাবে। অর্থ্যাৎ এই গ্রামীণ সমাজের চিত্রটি শহুরে জীবন চিত্র থেকে একেবারেই পৃথকভাবে উপস্থাপিত হবে। কিন্তু গ্রামীণ সমাজ চিত্র হলো একটি রাষ্ট্রের নিজস্ব লোকসংস্কৃতি এবং তা অকৃত্রিম ও বিশুদ্ধ।

১(খ) লোকশিল্পভিত্তিক সংগ্রহশালা

বাংলাদেশে ঢাকা মহানগরীর প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত বাংলা একাডেমির ফোকলোর বিভাগের অর্ন্তভুক্ত লোকসংস্কৃতি বিষয়ক লোক ঐতিহ্য সংগ্রহশালটি বাংলাদেশে প্রথম (Folklore museum) বাংলার লোকশিল্প ভিত্তিক সংগ্রহশালা। এখানে উল্লেখ করার মতো বিষয় হলো এই যে, বাংলা একাডেমি শুধুমাত্র বাঙালির ঐতিহ্য সংরক্ষণে নিয়োজিত একটি প্রতিষ্ঠানই নয়; বাংলাদেশের গ্রামগঞ্জের নানা অঞ্চলের লোকসাহিত্য, লোকসঙ্গীত অর্থাৎ অবস্তুগত লিখিত নানা উপাদান দীর্ঘদিন ধরে সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে ফোকলোর বিষয়ক অসংখ্য বই এই প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং এ প্রতিষ্ঠানটি ফোকলোর গবেষণার ক্ষেত্রে হিসেবে বাংলাদেশে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বাংলা একাডেমির স্বপ্নদ্রষ্টা ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ১৯৪৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণে বলেন,"ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারের অবশ্য কর্তব্য পূর্ব বাংলার সকল থেকে পুঁথি, পল্লীগীতি, পল্লীকাব্য ও উপকথা সংগ্রহ করে রক্ষা করা।" ১৯৫৫ সালে বাংলা একাডেমির প্রতিষ্ঠার পর বাংলা একাডেমি ফোকলোর গবেষণার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। প্রথমত বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পুরাতন পুঁথির পাণ্ডুলিপি, প্রাচীন কীর্তি-কাহিনী, লোক-গাঁথা , লোক-সঙ্গীত, পল্লীগান-গীতিকা, রূপকথা, প্রবাদ-বাক্য, কিংবদন্তী প্রভৃতি প্রভৃতি অঞ্চল থেকে সংগ্রহ ও সংকলন করে প্রকাশ করে। যা ছিলো বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে

ফোকলোরের বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহের প্রথম ধাপ। দেশী-বিদেশি গবেষকরা একাডেমির ফোকলোর আরকাইভসে সংরক্ষিত উপাদান গবেষণার কাজে ব্যবহার করে আসছেন। ১৯৬৩ সাল থেকে বাংলা একাডেমি বস্তুগত উপাদানের মধ্যে প্রাচীন, মুদ্রা, হস্তলিখিত প্রাচীন পাণ্ডুলিপি, লোক-অলংকার, লোক-বাদ্যযন্ত্র, নকশি কাঁথা, নকশি শিকা, নকশি পাখা প্রভৃতিসহ লোকশিল্পের নিদর্শনাদি সংগ্রহের কাজ শুরু করে।[৫০] ফোকলোর গবেষণার জন্য অবস্তুগত ও বস্তুগত উপাদান সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করার স্বপ্ন ড. মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ প্রথম যে দেখেছিলেন এবং বাংলা একাডেমি সে স্বপ্ন রূপায়নের চেষ্টা করেছে।[৫১] তবে বাংলা একাডেমির লোক ঐতিহ্য সংগ্রহশালাটি সাময়িকভাবে বন্ধ আছে ২০১১ সাল থেকে।

চিত্র-৩: বাংলা একাডেমির বর্ধমান ভবন

বাংলার লোকশিল্পের প্রতি কবি গুরু রবীন্দ্রনাথের অসম্ভব অনুরাগ ছিলো এ বিষয়টি সম্পর্কে হয়ত অনেকেই অবগত নন। বিদেশী সংস্কৃতির আগ্রাসনে বাংলাদেশের অনেক লোকজ উপাদান হারিয়ে যাওয়া আশঙ্কা তার ছিলো। কবি মোহিতলালকে এই আশঙ্কার কথা নিয়ে একটি চিঠিতে ব্যক্ত করেছিলেন। কবি গুরু স্বয়ং বস্তুগত লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন নিদর্শন শিলাইদহ এবং শান্তিনিকেতন থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। বিশেষ করে তাঁর সংগ্রহের মধ্যে বাঙালির চৌচালা ঘরের মডেল, নকশি কাঁথা, শিকা ইত্যাদি ছিলো। বাংলার গ্রামীণ আলপনার অলংকরণ নষ্ট হয়ে যাবার ভয়ে মোটা ব্রাউন পেপারের উপর আঁকিয়ে নিতেন। এছাড়াও তাঁর পরিচিতজন কাছ থেকে লোকসংস্কৃতির নিদর্শন সংগ্রহ ছাড়াও বিদ্যোৎসায়ীদের এ কাজে যোগ দেবার জন্যে তাগিদ দিতে অনুরোধ করতেন। একবার তিনি দার্শনিক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে চিঠিতে চাটগাঁ অঞ্চল থেকে প্রচলিত মেয়েলি শিল্প সংগ্রহ করে দিতে অনুরোধ করেছিলেন। চিঠিতে তিনি শিল্পীপটু মেয়েকে দিয়ে কাগজের উপর আলতার রঙে বিবাহ ও লক্ষ্মী পূজার জন্য আঁকা আলপনা নকশা এবং শিকা, কাঁথা চেয়েছিলেন।[৫২]

সুতরাং লোকশিল্পের প্রতি কবি গুরুর অসম্ভব মনোযোগের এই বিষয়টি এটাই প্রমাণ করে যে, বাংলায় লোকশিল্পভিত্তিক সংগ্রহশালা গড়ে তোলার স্বপ্ন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরও ছিলো। একান্তভাবে পূর্ব বাংলায় ১৯৫৫ সাল থেকে লোকশিল্পভিত্তিক সংগ্রহশালার গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিলেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন। ঢাকার শহর ছেড়ে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁওয়ে কারুপল্লী ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন শিল্পাচার্যেরই ছিলো। তাঁর এ স্বপ্ন পাকিস্তান আমলে সফল হয়নি। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশে সম্পূর্ণ লোক ও কারুশিল্পভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক সংগ্রহশালা গড়ে ওঠে। ১৯৭৫ সালের ১২ মার্চ এক প্রজ্ঞাপন বলে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। লোক ও কারুশিল্প সংগ্রহ ও তার পঠন-পাঠন এবং কারুপল্লী স্থাপন এ ফাউন্ডেশনের মূল উদ্দেশ্য এ সম্পর্কিত Regolution No. ৭-২-৭২ এ উল্লেখ করা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন গঠনের নথিতে স্বাক্ষর করেন (চিত্র ৪)। ১৯৭৫ সালে শুরুতে সোনারগাঁয়ের পানাম নগরীতে একটি সরকারি রিকুইজিশনকৃত পুরানো ভবন সংস্কার করে সেখানে অস্থায়ীভাবে লোক ও কারুশিল্প জাদুঘরের কার্যক্রম শুরু হয়। [৫৩]

১৯৮১ সালে পুরাতন সর্দার বাড়িতে লোক ও কারুশিল্প সংগ্রহশালাটি স্থানান্তর করা হয়। ১৫০ বিঘা জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত সংগ্রহশালার জন্য ১৫০০ বর্গফুটের গৃহ নির্মাণ করা হয়। সংগ্রহশালার গ্যালারিগুলো বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোক ও কারুশিল্পের বিভিন্ন নিদর্শন প্রর্দশনের জন্য সাজানো হয়েছে।

চিত্র- ৪: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লোক ও কারুপল্লী ফাউন্ডেশনের নথিতে স্বাক্ষর করেন।

১৯৯৬ সালের অক্টোবরে লোক ও কারুপল্লী ফাউন্ডেশনের মধ্যে শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প সংগ্রহশালাটি স্থাপিত হয়। ১৯৯৭ সালে শেখ হাসিনা ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার পর প্রথম পরিচালনা

বোর্ডের সভাপতি নিযুক্ত হন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন। এছাড়া ফাউন্ডেশনের সদস্যপদে যারা ছিলেন সচিব, শ্রম ও সমাজকল্যাণ ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়, অর্থমন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, চেয়ারম্যান, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা, পরিচালক জাতীয় জাদুঘর, অধ্যক্ষ, চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়, জনাব, এ কে নাজমূল করিম, চেয়ারম্যান, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জনাব সফিকুল আমীন নির্বাহী পরিচালক বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ।[৫৪]

১৯৯৮ সালে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের অধীনে ফোকলোর বিভাগের যাত্রা শুরু হয়। এই বিভাগের স্বপ্ন দেখেছিলেন ড. মাজহারুল ইসলাম। এ বিভাগে ছাত্রছাত্রীদের লোক ও কারুশিল্প সম্পর্কে বাস্তবিক শিক্ষা প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ফোকলোর জাদুঘর।[৫৫] এখানে বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের লোকশিল্প সংরক্ষণ করা হয়েছে। এই সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত আছে নকশিকাঁথা, শখের হাঁড়ি, জায়নামাজ, মৃৎশিল্পের উপাদান।[৫৬] শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রামীণ জীবনের সাথে সম্পৃক্ত কৃষিকাজে ব্যবহৃত উপাদান সংগ্রহ সংরক্ষণ এবং প্রদর্শনের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে 'শেরে বাংলা কৃষি জাদুঘর'।

পুরান ঢাকায় অবস্থিত লালবাগ প্রাসাদ-দূর্গ মোগল আমলের অনিন্দ্য স্থাপত্যিক নিদর্শন। শাহজাদা আযম কর্তৃক নির্মিত লালবাগ প্রাসাদ-দুর্গটির দোতলায় দরবার হলে লালবাগদুর্গ সংগ্রহশালাটি স্থাপন করা হয়েছে। দরবার হল কক্ষটির অন্তপ্রবিষ্ট প্যানেল ও কুলুঙ্গিতে মোগল আমলের নানা ধরনের ইসলামী শিল্পকলার নিদর্শন প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে । ইংরেজ আমল থেকে শুরু করে স্বাধীনতা উত্তরকাল পর্যন্ত যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে এখানকার বহু মূল্যবান প্রত্নদ্রব্য হারিয়ে গেছে এবং দেশের বাইরে পাচার হয়ে গেছে। ফলে মুঘল আমলের অনেক উপাদানই এদেশে অত্যন্ত দুস্প্রাপ্য। তা সত্বেও বাংলাদেশের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রচেষ্টায় কিছুসংক্ষক প্রত্নবস্তু সংগ্রহীত হয়েছে এবং প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও প্রদর্শিত দ্রব্যাদির মধ্যে দুইটি জিনিস লালবাগ দুর্গের ইতিহাসের সাথে একান্তভাবে জড়িত। একটি হলো পরিবিবির মাজারে আলগা অবস্থায় প্রাপ্ত কালো পাথরে উৎকীর্ণ লিপি ও আযম শাহের একটি প্রতিকৃতি। বাকি অন্যান্য জিনিসগুলো লালবাগ দূর্গের সাথে সরাসরিভাবে সম্পর্কিত না হলেও মুঘল আমলের ইতিহাস সম্পর্কিত। কেল্লার সংগ্রহশালায় প্রদর্শিত উপাদানগুলির বেশির ভাগ উপাদানই মুঘল আমলের শেষ যুগের [৫৭]

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের জাতিতাত্ত্বিক ও অলংকার শিল্পকলা গ্যালারিতে, রাজশাহী বরেন্দ্র গবেষণা সংগ্রহশালার আবহমান বাংলা ও মুসলিম ঐতিহ্য কক্ষটিতে, লালবাগকেল্লার সংগ্রহশালা,

গুলিস্তানে অবস্থিত সিটি কর্পোরেশনের ঢাকা মহানগর সংগ্রহশালায় বিশেষভাবে লোকশিল্প এবং মুসলিম শিল্পকলার অনেক উপাদান সংরক্ষিত করা হয়েছে যা বাঙালি জাতিসত্ত্বার পরিচয়বহন করে।

এছাড়াও বাংলাদেশে ব্যক্তিগত উদ্যোগে তোফায়েল আহমেদ ও মুহাম্মদ সাইদুর লোকসংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠা করেন। প্রখ্যাত লোকসংস্কৃতিবিদ জনাব তোফায়েল আহমেদ তাঁর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ঢাকার লালমাটিয়াতে (বাংলাঘর, ৩/৭ ব্লক-বি) নিজবাড়িতে 'বাংলাঘর' নামে একটি লোকসংগ্রহশালা গড়ে তুলেছিলেন। এই সংগ্রহশালাটির মালিক ছিলো 'বাংলাঘর লোক ও কারুশিল্প প্রযত্ন পরিষদ' নামের একটি ট্রাস্ট। অধ্যাপক ড. ওয়াকিল আহমদ এ ট্রাস্টের চেয়ারম্যান ছিলেন। তোফায়েল আহমেদ মৃত্যুর আগে 'অসিহ' করেন বাংলাঘর সম্প্রসারণ করে একটি পূর্ণাঙ্গ সংগ্রহশালায় যেন পরিণত করা হয়।[৫৮] পারিবারিক সিদ্ধান অনুযায়ী উপাদান সমূহ বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটিকে দান করে দেয়া হয়। লোকসংগ্রহশালা গড়ে তোলার জন্যে বর্তমানে এই সংগ্রহশালাটি আর টিকে নেই।[৫৯]

মোহাম্মদ সাইদুর কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার বিন্নগাঁও গ্রামে ১৯৪০ সালের ১৮ জানুয়ারি জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন বাংলাদেশের অন্যতম সংগ্রাহক ও বিশিষ্ট লোকতত্ত্ববিদ।[৬০] ১৯৮৮ সালে নিজ বাড়ি বিন্নগাঁওয়ের বাগদিয়ায় নিজ বাসভবনে প্রতিষ্ঠা করেন লোকঐতিহ্য সংগ্রহশালা ও একটি গবেষণাকেন্দ্র। তাঁর সংগ্রহশালাটি উদ্বোধন করেন আমেরিকার ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকশিল্পের অধ্যাপক হেনরি গ্লাসি। এখানে রয়েছে তিনশ বছরের পুরাতন নকশি কাঁথাসহ ৩০৩টি নকশি কাঁথা, ৫০ রকমের শিকা, ২০০ ধরনের পাখা, ২৫টি মুখোশ, ২৫০টি পুতুল, শখের হাঁড়ি, লক্ষীসরা, গাজীর পট, মনসাঘটসহ লোকশিল্পের এক বিশাল ভাণ্ডার। বাংলাদেশে ব্যক্তিগত উদ্যোগে গড়ে ওঠা এটি সবচেয়ে বড় লোকসংগ্রহশালা।[৬১]

ঢাকা এক ঐতিহাসিক নগর। এই নগর নিয়েই একটি জাদুঘর প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছিলেন এদেশের কয়েকজন বিশিষ্ট গবেষক ও সংস্কৃতি ব্যক্তিত্ব। ঢাকার ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখার উদ্যোগে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের নগর ভবনের ষষ্ঠতলায় ১৯৯৬ সালের ২০ জুলাই ঢাকা নগর জাদুঘরটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই সংগ্রহশালাটির উদ্বোধন করেছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ঢাকা নগর সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠার আগে জাদুঘর স্থাপন এবং তা বাস্তবায়নের দাবীতে একটি জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছিল ঢাকা নগর বাস্তবায়ন কমিটি। ১৯৮৭ সালে প্রফেসর মুনতাসির মামুনের আহবানে বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির একটি ভবনে সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত অনেক সুধীবৃন্দ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। এখানে উল্লেখযোগ্য সদস্যদের

মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, নাট্যব্যক্তিত্ব আসাদুজ্জামান নূর, ড. সিরাজুল ইসলাম প্রমুখ ব্যক্তিত্ব।[৬২]

চিত্র-৫: ঢাকা মহানগর সংগ্রহশালা

ফোকলোর ও লোকসংস্কৃতির দ্বিধাদ্বন্দ্ব

শংকর সেনগুপ্ত তার ***Folklore and Folklife in India An Objective Study in Indian Perspective*** গ্রন্থে সংস্কৃতি এবং ফোকলোর সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে " In addition to the function of entertainment, folklore also serves to sanction the established belief, attitude and institutions, both sacred and secular in extensive discussion of the social context of folklore. Culture context of folklore and functions of folklore may clarify the idea." উপরন্তু বিনোদনের কথা চিন্তা করলে সমাজের স্থায়ী বিশ্বাস, সামাজিক মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ এবং সমাজের বিভিন্ন ধর্মীয় এবং পার্থিব প্রতিষ্ঠানগুলোর কলেবর বৃদ্ধির মধ্যদিয়ে আনন্দ প্রদান করে। ফোকলোরের সামাজিক অবস্থান এবং সামাজিক কর্মকাণ্ড এই মতবাদকে আরো স্পষ্ট করতে পারে।[৬৩] অতএব দলবদ্ধ মানুষের ঐতিহ্যবাহী যাবতীয় নান্দনিক জ্ঞান ও কর্মকাণ্ডের সম্মিলিত হলো ফোকলোর। বিশেষ করে লোকসংগ্রহশালায় যে সব উপাদান সংগ্রহ করা হয়ে থাকে এর বেশিরভাগই হলো ফোকলোর সংক্রান্ত উপাদান। জনাব ইসলাম ফোকলোর এর প্রতিশব্দ লোকসংস্কৃতি অবাস্তব এবং সম্পূর্ণ অনুপযোগী মনে করলেও পাশ্চাত্যের ফোকলোরবিদগণ ফোকলোরের প্রতিশব্দ লোকসংস্কৃতি বলে মনে করেন। ড. তুষার চট্টোপাধ্যায় এবং আশরাফ সিদ্দিকী ফোকলোর শব্দটির প্রতিশব্দ ব্যবহার করেছেন লোকসংস্কৃতি।[৬৪] তাছাড়া লোক সংগ্রহশালার সাথে লোর শব্দটির সম্পর্ক রয়েছে। আবার সংগ্রহশালা শব্দটির সাথে 'লোক' শব্দটিকে সংযুক্ত করে

নির্দিষ্টভাবে গ্রামীণ লোকসমাজ, অঞ্চল, জনগোষ্ঠী ইত্যাদি চিহ্নিত করা হয়েছে যাদের আচার, আচরণ, শিক্ষা সমাজের উচ্চ ও অভিজাত শ্রেণি থেকে পৃথক। সুতরাং, লোক কথাটির মধ্যে তথাকথিত শিষ্ট বা অভিজাত শিল্প থেকে লোকশিল্পকে আলাদা করা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।[৬৫] লোকসংগ্রহশালায় সংরক্ষিত প্রতিটি লোকজ উপাদান পৃথক বৈশিষ্ট্যেমণ্ডিত এবং বিদ্যা, জ্ঞান, ঐতিহ্য, কৃষ্টি প্রত্যেকটি বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত। তেমনি ফোকলোরের প্রত্যেকটি উপাদানের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, শিল্পরূপ আছে, আকৃতি আছে এবং সবকিছু মিলিয়ে একটি উপাদানকে বিশেষ উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করে থাকে। ইংরেজিতে একে বলা হয় Text। বাককেন্দ্রিক ফোকলোর ভাষার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। অনুরূপভাবে বস্তুগত, ভাষাগত, ভঙ্গিগত, বিজ্ঞানগত আচারানুষ্ঠানগত, কারিগরিগত, চিত্রশিল্প-স্থাপত্য শিল্পগত প্রত্যেকটি উপাদান Text।[৬৬] সুতরাং লোকসংস্কৃতি ও ফোকলোর শব্দটির মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব রয়েছে। সঙ্গীত ও নৃত্য, শিল্প সাহিত্য, অধ্যাত্ম সাধনা পর্যন্ত ব্যক্তি বা গোষ্ঠী মানুষ নিজেদের জীবনের উন্নতি ও সংস্কারের জন্য যাবতীয় কর্মের ফলশ্রুতিই হলো সংস্কৃতি।[৬৭] Shyam Chand Mukherjee তার ***Folklore Museum*** গ্রন্থে বলেছেন Ô Folklore deals with everything that concerns folk people their life and living culture, society, religion, suspension, magic, rites rituals, beliefs, behaviors, pastimes, traditional characteristics." ফোকলোর মানুষের জীবন ও জীবিকা, গ্রামীণ সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম, জাদু, আচার-আচরণ, রীতিনীতি, ঐতিহ্য, কুসংস্কার, বিভিন্ন মূল্যবোধ, অবসর বিনোদন এবং ঐতিহ্যগত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত।[৬৮]

জাতি ও পরিবার ছাড়াও অন্য ধরনের ফোক আছে। আঞ্চলিক ভিন্নতা লোকসংস্কৃতিগত পার্থক্য ভিন্ন গ্রুপের এবং ফোকলোরের জন্ম দেয়। খুলনার ফোকলোর, রাজশাহীর ফোকলোর, সিলেটের ফোকলোর ভিন্ন মেজাজ ও স্টাইলে ফোকলোর বিদ্যমান।[৬৯] তাই লোক বলতে যারা সুদূর অতীতকাল থেকে ফোকলোরের সৃষ্টি করে এসেছে এবং এখনো সৃষ্টি করে চলেছে। তারা গ্রামের এবং শহরের। অশিক্ষিত এবং শিক্ষিত। ধনী এবং দরিদ্র, তারা সুরুচিসম্পন্ন, পরিশীলিত চিন্তার অধিকারী। [৭০]তবে গ্রাম্যতা বলতে যা বোঝায় তা থেকে মুক্ত নয়। শহরের অশিক্ষিত শ্রমজীবী মানুষ যাদের শেকড় গ্রামে কিন্তু শহরে ভিড় জমিয়েছে, এই শ্রেণি পূর্বের ও নতুন অভিজ্ঞতার আলোকে লোককলার জন্ম দেয় ও চর্চা করে।

লোকসংস্কৃতি ফোকলোর চেয়ে আরো ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[৭১] আমেরিকার লোককলাবিদদের মতে, আধুনিক শহর ও শিল্পনগরে শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে নতুনভাবে লোককলার উপাদান বিকাশ লাভ করে। শিক্ষা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি সেখানে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। এই

Dhaka University Institutional Repository

লোককলাবিদগন একে লোককলার নগর সংস্করণ (Urban folklore) বলে থাকেন। বর্তমানে বাংলাদেশের রিকশা, ট্রাক, বেবিটেক্সি, সিনেমা, ইত্যাদি পেইন্টিং এর সাহায্যে চিত্রশোভিত করার প্রথা চালু হয়েছে। এই শিল্পীদের পূর্বপুরুষ গ্রামের পটুয়া তবে এই চিত্রকর্ম গ্রামের পটচিত্র নয় আবার শহরের আধুনিক শিল্পকর্মও নয়। এটি মূলত গ্রামীণ শিল্পের নগর সংস্করণ।[৭২] বর্তমানে শহর ও গ্রামে নতুন অনেক কারুশিল্পের চাহিদা বেড়েছে। এর মধ্যে মাটির, কাঠ, কাঁচ, প্লাস্টিক পুঁতি ইত্যাদি নির্মিত এক ধরনের গহনা। এ ধরনের গহনা মূলত সোনা রুপার গহনার নতুন এক সংস্করণ। এই সব গহনা ঢাকা শহরের রাস্তার মোড়ে বসে এক শ্রেণির মহিলারা জীবিকার তাগিদে তৈরি করে। পাশাপাশি শহুরে পুরুষেরাও এ ধরনের গহনা নির্মাণ পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছে। সোনার আকাশচুম্বী দাম এবং দামি গহনা পরে বের হলে নিরাপত্তার অভাব এ দুটি কারণে মধ্যবিত্ত পরিবারে সোনার গহনার প্রচলন প্রায় উঠেই গেছে। সে স্থান দখল করে নিয়েছে মাটির, প্লাস্টিকের, কাঠ, পুঁতি দিয়ে তৈরি গহনা। এ ধরনের গহনা দেখতে যেমন আকর্ষণীয় দামেও সাশ্রয়। বলাবাহুল্য, শহুরে ফ্যাশানের সাথে তাল মিলিয়ে এ ধরনের গয়না, শাড়ি এবং পোশাকের সাথে ম্যাচিং করে অনেক মেয়েরা সাজগোজ করে। বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও কলকাতার অনেক সিনেমা ও টিভি অভিনেত্রী, মডেল, বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের উপস্থাপিকা, সংগীতশিল্পী, নৃত্যশিল্পীদের মধ্যে এই ধরনের গয়না এখন খুবই জনপ্রিয়। সুতরাং গহনা সমাজে টিকে আছে ভিন্ন আঙ্গিকে। উল্লেখ্য যে, আশির দশক থেকে এ ধরনের গহনার প্রচলন দেখা যাচ্ছে ।

বাংলাদেশের শহরবাসী জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যেসব ধর্মীয় ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক আচার-অনুষ্ঠান পালন করে থাকে এর মধ্যে প্রায় নব্বই শতাংশই লৌকিক উপাদানের সন্ধান খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন বিয়ের আচারভিত্তিক অনুষ্ঠানে পানচিনি, গায়ে হলুদ, ডালা প্রদান, বধূবরণ ইত্যাদি লৌকিক ঐতিহ্যের অংশ। সুতরাং ফোকলোরের যে কোনো ধারার কথায় বলা হোক না কেন এর পেছনে থাকে লোক মনের সৃজনশীলতা। প্রবাদ লোকসাহিত্যের ধারা। যেমন চলতে না জানলে উঠোন বাঁকা। একটি গান একটি ছড়া একটি ধাঁধা এগুলোতে লোকমনে সৃজনশীলতার স্পর্শ অনুভব করা যায়। তাই লোকসংস্কৃতির ভিত্তি ভূমির ওপরই গড়ে ওঠে পরিশীলিত বা ধ্রুপদীর সৌধ। লোকপুরাণ, লোককথা, কিংবদন্তি, গান, গীতিকা, চারু ও কারুশিল্প, নৃত্য, নাট্য, ক্রীড়া, ভঙ্গিমা ইত্যাদি যেমন একদিকে, অন্যদিকে সংস্কার, বিশ্বাস, আচার, নিয়ম, প্রথা, বিধিনিষেধ, ধর্ম, দেবতা, খাদ্য, পোশাক, উৎসব ইত্যাদি বিষয় সভ্যতার আদিকাল থেকে বিবর্তন হয়ে আসছে লোকায়ত সংস্কৃতির মধ্যে।[৭৩] অতএব লোক বলতে কোনো নির্দিষ্ট স্তরের মানুষকে ইঙ্গিত করে না– সমাজের যে কোনো স্তরে এ লোকের বসবাস। লোক বিশেষ কোনো স্থানের অধিবাসী নয়, শহরে, নগরে বা গ্রামে সে থাকতে পারে। তবে

সে যে স্তরেই থাকুক, বাস করুক, লোক ঐতিহ্যের সুত্র ধরেই সে তার সৃষ্টিকর্ম সম্পাদন করে থাকে। সেই ঐতিহ্যের আলোকে নতুন ঐতিহ্য সে সৃজন করে এবং তার সৃষ্টি সমাজের সামগ্রিতে পরিণত হয়। এ অর্থে লোক কথাটি বুঝতে হবে লোকের চারিত্র্যে, কার্যকলাপে, তার সামাজিক অবস্থান অথবা বাসস্থানের ভিত্তিতে নয়।[৭৪]

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নাগরিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রধানত ঢাকা শহরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। অন্যদিকে ঢাকার বাইরে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর ৮০ ভাগ মানুষ গ্রামে বাস করে এবং এরা নাগরিক সভ্যতা থেকে বঞ্চিত। সুতরাং এদেশের বেশিরভাগ মানুষই লোকসংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী। বাংলাদেশের প্রশাসনিক কার্যক্রম ঢাকা শহর থেকে পরিচালিত হয়। বিমানবন্দর, রেলওয়ে, দালানকোঠা, বড় বড় শপিংমল, স্কুল, কলেজ, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, সচিবালয়, ব্যাংক বীমা সবকিছু এই ঢাকা শহরকে ঘিরে। লক্ষণীয়, বর্তমানে ঢাকা অনেক উন্নত শহরে পরিণত হলেও গ্রামীণ সংস্কৃতি থেকে এখনও মুক্ত নয়।[৭৫] বর্তমানে ঢাকায় বসবাসরত মধ্যবিত্ত ও ধনী শ্রেণিটি ব্যবসা, বাণিজ্য ও চাকুরির কারণে এ শহরে এসে বসতি স্থাপন করেছে। কিন্তু এদের বেশিরভাগই কিছুদিন আগেও গ্রামে বসবাস করতো। তাদের পূর্বপুরুষ এখন গ্রামেই বাস করে। সুতরাং এই শ্রেনিটি বর্তমানে নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত হলেও গ্রামীণ সংস্কৃতি তাদের মধ্যে এখনো সক্রিয়। প্রতিনিয়ত বাংলার গ্রামীণ দরিদ্র মানুষ গ্রাম থেকে শহরে ভিড় করছে জীবিকার তাগিদে। এরা কৃষি ও পূর্বপুরুষের দীর্ঘদিনের পেশা ছেড়ে দিয়ে শহরে এসে রিকশা, ভ্যান, ঠেলাগাড়ি চালায়। কেউ কেউ গার্মেন্স কারখানায় পোশাক শ্রমিকের কাজ করে। এই গার্মেন্সকর্মীর বেশিরভাগ হলো গ্রামের মেয়েরা। সামাজিক বাঁধা উপেক্ষা করে এই মেয়েরা শহরে এসে ভিড় করে। কেউ কেউ বড় বড় দালানকোঠা নির্মাণের দিনমজুরির কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। উপরন্তু, গ্রাম ছেড়ে আসা এই বৃহৎ শ্রেণিটি দীর্ঘদিন ধরে শহরে বসবাস করেও গ্রামীণ সংস্কৃতি থেকে কখনই বেড়িয়ে আসতে পারেনি। তাই ঢাকায় বসবাসরত ধনী, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র শ্রেণির বেশিরভাগ মানুষ গ্রামীণ সংস্কৃতি বহন করে চলেছে।

১(গ) বাগাশ্রিত লোককলা (Formalised Folklore)

বাককেন্দ্রিক ফোকলোর মূলত লোকসাহিত্যের সামগ্রিক উপকরণ। লোকসাহিত্যের অংশ হলো লোককাহিনী, কিংবদন্তি, পরীকাহিনী, কৌতুক, লোকসঙ্গীত, ছড়া, প্রবাদ, হেঁয়ালি, লোকবিশ্বাস, শব্দালংকার লোকগীতিকা ইত্যাদি। এই উপাদানসমূহের অধিকাংশই মুখে মুখে রচিত, লালিত এবং প্রচারিত। ফলে লোকসাহিত্যের উপকরণসমূহ মুখে মুখে সৃষ্টি লাভ করে মুখে মুখেই জীবিত থাকে

Dhaka University Institutional Repository

এবং মানুষের মনের গভীরে সংরক্ষিত হয়। যে কারণে বাগাশ্রিত লোককলা কিছু কিছু লিখিতভাবে সৃজিত, তাদের জন্যই ঐতিহ্যজাত লিখন পদ্ধতির মাধ্যমে। লোকাচার, বিশ্বাস এবং অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক ফোকলোর মৌখিক ঐতিহ্যজাত। লোকবিজ্ঞান বলতে লোক চিকিৎসা, লোক ঔষধ, লোক -অংক, দুধ থেকে মাখন, ঘি, ছানা, দই তৈরি করা খাদ্য প্রস্তুতের বিশেষ নিয়ম বোঝায়। এই সব উপাদানের মধ্যে মন্ত্রতন্ত্রের দ্বারা চিকিৎসা, লোক অংক ইত্যাদি মৌখিক ঐতিহ্যে টিকে থাকে। অন্যগুলো দেখে দেখে শিখতে হয় এবং পুরুষাক্রমিকভাবে চলে এসেছে।[৭৬] বিভিন্ন অঞ্চলের লোক সাহিত্য, পুঁথির পাণ্ডুলিপি, প্রাচীন কীর্তি- কাহিনী, লোকগাঁথা, লোকসঙ্গীত, পল্লীগান, পালাগীতিকা, রূপকথা, প্রবাদবাক্য, কিংবদন্তি সংগ্রাহকের অক্লান্ত পরিশ্রমের বিনিময়ে লিখিতভাবে বিভিন্ন অঞ্চল হতে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয় গবেষণার উদ্দেশ্যে। লোকসঙ্গীতে ব্যবহারিক সংগীত এই বিভাগটি প্রায় সকল দেশেই সুপরিচিত। এই সংগীতগুলো সাধারণতঃ পরিবারস্থ স্ত্রীলোক কিংবা তাদের প্রতিবেশিনীদের দ্বারা কোনো আচারানুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে গীত হয়। তার নির্দিষ্ট ব্যবহারিক ক্ষেত্র জন্ম বিবাহ ও মৃত্যু। বাংলাদেশের সর্বত্র মুসলমান পরিবারের মহিলারা বিবাহ উপলক্ষে বিয়ের গান গেয়ে থাকে। বিবাহ সংগীতের উৎকৃষ্ট এবং মধুরতম অংশ হলো কন্যা বিদায়ের গান। বিয়ের অনুষ্ঠানের পর কন্যা বিদায়ের সময় এই সংগীত গীত হয়।

বাউল সম্রাট লালন শাহের গান

বাউল বাংলার এক বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়। বাউল গান বাঙালির আধ্যাত্মিক সাধনার গান। বাংলা ফোকলোরের জগতে লোকসঙ্গীতের ভাণ্ডারটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ। বিশেষ করে বাউল গান লোকসঙ্গীত সম্পদের মধ্যমণি। রূপকের মাধ্যমে এই গানে স্রষ্টার সাথে মানুষের এক লীলা- সম্পর্ক স্থাপক করা হয়। বাউল গানে মনের মানুষ, সাঁই আধরা ইত্যাদি স্রষ্টার প্রতি ইঙ্গিত করে- প্রেম ও ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপন করে মানুষের মিলনের পথ সন্ধান করে। মান আরাফা নাফ্সাহু, ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু- যে নিজেকে জানে সে স্রষ্টাকে জানে- আরবি এই বাণীই বাউল গানের মর্মধ্বনি।[৭৭] সুতরাং লোকধর্ম বাউল একটি ধর্ম নয়, একপ্রকার সাধনা। সেই সাধনার সাধকরা ইহজগতে হিন্দু মুসলমান দুইই হতে পারেন। সাধনা করলে এই দেহেই তার দেখা মেলে।[৭৮] বাংলাদেশের বাউল সম্রাট লালন সাঁইয়ের মাজার কুষ্টিয়া শহরে ছেউড়িয়ায় অবস্থিত। সিরাজ শাহ ফকির বলে এক সাঁই দরবেশ ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর বাউল সাধক। তাঁর কাছে তরুন বয়সে লালন দীক্ষা লাভ করেছিলেন। লালন ফকির জীবিতাবস্থায় প্রতি বছর ছেঁউড়িয়ায় শীতকালে মহোৎসব করতেন। এ উৎসবে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ফকিরেরা তাঁর সাথে মিলিত হতেন। এ সময় লালনের আখড়ায় বাউল গানের আসর বসত। লালন ফকির নিজে এবং তাঁর স্ত্রী গানের জলশায় অংশ নিতেন এই মাজারকে ঘিরে গড়ে উঠেছে লালন সংগ্রহশালা। ১৮৯০ সালের ১৭ অক্টোবর বাউল সম্রাট ইহলোক ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে লালনের

বয়স হয়েছিল ১২৬ বৎসর। কুষ্টিয়ার ছেউড়িয়াতে তাঁর সমাধির পাশে মলম শাহের স্ত্রী মতিজান বিবির কবর রয়েছে। লালন ফকিরের নির্দেশই লালন আখড়ার একটি ঘরে সমাহিত করা হয় এই সংগ্রহশালায় রয়েছে একতারাসহ বাংলার বিভিন্ন ধরনের লোকবাদ্য এবং লালনের ব্যবহৃত কিছু সামগ্রী। লালনের গান শুধু দেশেই নয় বিশ্বব্যাপী আজ সমাদৃত হয়েছে।[৭৯] লালনের জীবন ও কর্মের সারা আমেরিকা, জাপান ছাড়াও অনেক দেশের বিশ্ববিদ্যালগুলোতে গবেষণা হয়েছে।

চিত্র-৬: বাউল সম্রাট লালন শাহের মাজার প্রাঙ্গন

গাজীর গান

গাজী আরবি শব্দ যার অর্থ ধর্মযোদ্ধা। ধর্মযুদ্ধে জয়ী হয়ে যারা ফিরে আসেন তাঁরাই গাজী। সেই অর্থে সবাই গাজী। অঞ্চলভেদে গাজীর গানের ভিন্ন ভিন্ন নাম রয়েছে। গাজীর গান যারা গেয়ে থাকেন তাদের নাম গাইন, গায়েন, বয়াতি। যারা নিঃসন্তান অপুত্রক তাঁরা সন্তান কামনায় এবং যাদের সন্তান আছে তারা সন্তানের মঙ্গল কামনায় গাজীর গান মানত করে থাকে। বাঘের পিঠে উপবিষ্ট গাজী সাহেবের পরিচয় নিয়ে দ্বিমত আছে। তিনি কোনো ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব না কল্পিত লৌকিক পির, এই প্রশ্নের উত্তর ঠিকমত পাওয়া যায় না। প্রচলিত বিশ্বাস মনে গাজী বৈরাটনগরের শাহ সেকান্দরের পুত্র। 'গাজী কালু চম্পাবতী' পুঁথিতে তাকে এই পরিচয়ে পাওয়া যায়। বড়খাঁ গাজীকে সুন্দরবন এলাকার বাঘের পির বলে মনে করা হয়। আসলে বাংলায় যে সব পির ও দরবেশ ইসলাম প্রচার করতে এসেছিলেন, তাঁরা তাঁদের ব্যবহারে সাধারণ মানুষের মন জয় সহজেই জয় করে নিতে পেরেছিলেন। পির গাজীকে ভাবা হয় বাঘের দেবতা। লোকায়ত সমাজে তিনি অতিলৌকিক

শক্তিসম্পন্ন পির যিনি নিঃসন্তানকে সন্তান দান করেন। গাজী সাহেব বাঘ- পির হিসেবে প্রথমে আবির্ভূত হন সুন্দরবনে। বাউয়ালী, মাউয়ালী, জেলে, কাঠুরিয়া, নৌজীবী, কৃষক গাজীর পূজা- করে শিরণি দেয় বাঘের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে। সত্যপির ও সাতপিরদের ভেতরে তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি সবচেয়ে বেশি।[৮০] নারায়ণগঞ্জের কারুপল্লী ফাউন্ডেশনের সর্দার বাড়িতে গাজীকে উপস্থাপন করা হয়েছে গাজীর পটচিত্রে। এই পটচিত্র শিল্পীরা দর্শকদের গাজীর গান পরিবেশনের মধ্যদিয়ে গাজীর সম্পূর্ণ জীবনের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে।

মরমিবাদ

ইসলামী বিশ্বে সংগীত দুটি ভাগে বিভক্ত। মরমিবাদ সূফি সাধকরা সংগীতকে অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে থাকেন। বিশ্ববিখ্যাত সূফি সাধক জালালউদ্দিন রুমী থেকে আরম্ভ করে আজকের পির ফকিররা সংগীত সাধনার মাধ্যমে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করতে চান। বৈদিক যুগ থেকে বাংলায় মুসলমানদের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত সংগীতের ধারা ছিলো মূলত মন্দিরকেন্দ্রিক। মুসলমানদের সময় সংগীতের একটি পার্থিব রূপরেখা তৈরি হতে দেখা যায়। তখনই তৈরি হয় আরব পারস্য সংস্কৃতির মিশ্রণে এক অপূর্ব গায়ন পদ্ধতি। দেব-দেবীর স্তুতিগাঁথা বন্দনার সাথে সংযোজিত হয় বাদশার প্রশাস্তি, মানবিক প্রেম, ভালোবাসা, আনন্দ, বেদনা। পারস্য সংস্কৃতি থেকে ভারতীয় আবহাওয়ায় তৈরি হয় গজল। গীত, নৃত্য ও বাদ্য মিলে হয় সংগীত। সংগীত ও নৃত্যে মানুষ বাদ্য ধ্বনির প্রয়োজন অনুভব করে। এই প্রয়োজনের বাইরেও তান ও তাল সৃষ্টির জন্য বাদ্য ধ্বনির অত্যাবশ্যাকীয় হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে ধর্মকর্ম, উৎসব, শোভাযাত্রা, রণাঙ্গন, বিয়েসাদীতে বাদ্যযন্ত্র বেশি ব্যবহৃত হয়। বাংলার শাসক গিয়াস উদ্দিন আজম শাহের রাজত্বকালে বাংলার রাজধানী গৌড়ে একদল গায়ক সানাই ও ঢোল বাজিয়ে গান গেয়ে অর্থ উপার্জন করতেন। সানাই এবং ঢোল বাদ্য দুটি বাংলাদেশে মুসলমানরা প্রবর্তন করেছিলো।[৮১] বাংলাদেশের লোকসংগ্রহশালার অন্যতম উপাদান লোকবাদ্য। এই লোকবাদ্য মরমিগান পরিবেশনের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বাংলাদেশের মাজারগুলোতে পিরের ভক্তরা সংগীত পরিবেশনের মধ্যদিয়ে পিরের মাজার জাগ্রত করে রাখে।

মুহররম পর্ব

মুহররম শিয়াদের একটি ধর্মীয় পর্ব। মুসলমানরা দুই ভাগে বিভক্ত। শিয়া ও সুন্নী। সুন্নীরা কুরআন ও সুন্নাহ অনুসরণ করে চলে। কিন্তু শিয়াদের মত আলাদা। আরবিতে শিয়া অর্থ দল বা পৃথক সেনাবাহিনী। ইসলামের ইতিহাসে হজরত আলীর সমর্থকরা শিয়া নামে পরিচিত। শিয়াদের বিশ্বাস হজরত আলী প্রথম ইমাম, তাঁর জৈষ্ঠ পুত্র হাসান দ্বিতীয় ইমাম এবং কনিষ্ঠ পুত্র হুসেন হলেন তৃতীয়

ইমাম। মুহররম মাসের প্রথম দশ তারিখে ইমাম হোসেনের কারবালা প্রান্তরে শাহাদাতবরণকে উপলক্ষ করে মুহররম পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় লৌকিক ধর্ম ও আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে মুহররম পর্বটি এদেশিয় চরিত্র পেয়েছে। সুতরাং মুহররম অনুষ্ঠান চলাকালে মর্সিয়া ও জারিগানে কারবালার পরিণতির বর্ণনা লোকসমাজকে আলোড়িত করে। কারবালা প্রান্তরে শিশু আলী আজগরের তীরবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু কাসেমের সাথে সখিনার পরিণয় সুত্রে আবদ্ধ হওয়ার পর যুদ্ধক্ষেত্রে কাসেমের শাহাদত বরণ, ইমাম হোসেনের তাবুতে জলতৃষ্ণায় কাতর নারী ও শিশুদের হৃদয়বিদারক কান্না ও হাহাকার এবং সীমার কর্তৃক ইমাম হোসেনকে নৃশংসভাবে হত্যা-কারাবালার এই টুকরো টুকরো ঘটনা লোক গায়েন বা বয়াতিদের কণ্ঠে মর্মস্পর্শী হয়ে ওঠে। লক্ষণীয়, তাজিয়া তাবু নির্মাণ-পদ্ধতি ঘোড়া ও মানুষের প্রতিকৃতি, ফুল ও পুষ্পমাল্য অর্পণ, ঘোড়ার পা দুধ দিয়ে ধোয়ানো, কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় তাজিয়া বিসর্জন দেয়া, ঘোড়ার প্রতিকৃতিকে সালাম করা ইত্যাদি আচরণ কোনোটাই ইসলামের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ অনুষ্ঠান নয়। তাজিয়াসহ পথযাত্রা হিন্দু ধর্মাল্বমীদের রথযাত্রার এবং তাজিয়া বিসর্জন দুর্গাপূজার সাথে সাজুষ্যপূর্ণ। তাসত্ত্বেও বাঙালি সংস্কৃতিতে মুহররম সম্পর্কিত অনুষ্ঠান বিশেষভাবে মিশে আছে।[৮২] বাঙালি মুসলমান শিয়া সম্প্রদায়ের এ ধরনের আচরণের মধ্যদিয়ে কুসংস্কার ও লোক সংস্কৃতি চর্চার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। মুহররম পর্বের অনেক উপাদান লোকসংগ্রশালার অন্যতম নিদর্শন।

পিরবাদ

ঐতিহ্যাশ্রায়ী ভাষা বলতে বোঝায় আঞ্চলিক উপভাষা । তেমনি লোক ধর্ম হলো সাধারণ ধর্ম বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠান । সাধারণ মানুষের জীবন যাপনে লোক ধর্মের প্রভাব অপরিসীম। প্রত্যেকটি ধর্মেরই সাধারণত দুটো দিক থাকে। পরিশীলিত (pure) ও লোক-ইসলাম (Folk Islam)। লোক ধর্মের অনেক ধারনায় পরিশীলিত ধর্মের সাথে খাপ খায় না। ইসলাম ধর্মেরও দুটো রূপ আছে পরিশীলিত ও লোক। খাঁটি ইসলামে আল্লাহ ও মানুষের মধ্যে কোন প্রকার মধ্যস্থতার সমর্থন পাওয়া যায় না। আল্লাহর কাছে সব মানুষই সমান-পবিত্র মানুষ (Saint) বলে কিছু নেই। কিন্তু পবিত্র মানুষের ধারণা লোক ইসলামে প্রবল। মনে করা হয়ে থাকে কোনো কোনো ব্যক্তি তাদের ধ্যান ও আন্তরিকতার সাধনার ফলে আল্লাহর কাছ থেকে অলৌকিক শক্তি ও জ্ঞান লাভ করে থাকেন। এ ধরনের ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে ফারসিতে বলা হয় পির (শব্দগত অর্থে বয়োবৃদ্ধ, সুতরাং সম্মানীয়) আরবিতে সাধারণত বলে ওয়ালি।

Dhaka University Institutional Repository

কিছুসংখ্যক আরবিয় ও ইরানীয় মুসলমান সাধু- দরবেশ বাংলায় বসতি স্থাপন করেছিলেন এ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করার জন্য। তাঁদের মধ্যে ছিলেন বাবা আদম শহীদ (ঢাকা জেলার বিক্রমপুর,) শাহ সুলতান রুমী (ময়মনসিংহের নেত্রকোনা জেলা) শাহ সুলতান মাহীসওয়ার (বগুড়া জেলা) শাহ মখদুম শাহদৌলা শহীদ (পাবনা জেলা) মখদুম শাহ গজনবী (বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোর্ট) আরও প্রমুখ।[৮৩] পিরের স্মৃতিসৌধ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মসজিদের অনুকরণে তৈরি হয়ে থাকে। মসজিদ সাধারণত তিনটি গম্বুজ বিশিষ্ট হয়। কিন্তু পিরের মাজার এক গম্বুজ বিশিষ্ট করে নির্মিত হয়েছে। এ সব মাজারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য খান জাহান আলীর মাজার।[৮৪] লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, বাংলাদেশে এক সময় পিরবাদ খুবই প্রবল ছিলো। ধারণা করা হয় যে, যাঁরা বড় পির, তাঁদের মৃত্যুর পরেও অলৌকিক ক্ষমতা নষ্ট হয় না। পিরের আত্মা পিরের কবরের সাথে যুক্ত থাকে। পিরের মাজারে শিরনি দিলে পিরের আত্মা সন্তুষ্ট হয়। পিরের আত্মার সহায়তায় ভক্তের মনোবাসনা পূর্ন হয়ে থাকে। সুতরাং পিরের কবরকে মনে করা হয় পবিত্র স্থান। বাংলাদেশের অনেক মসজিদের পাশে পিরের কবর সংরক্ষিত আছে। সোনারগাঁওয়ে গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের মাজার থেকে সামান্য দূরে পশ্চিমদিকে অবস্থিত পাঁচপিরের সমাধি।[৮৫] কখনো কখনো পিরের কবর মসজিদ ছবি সংবলিত অথবা কোরআনের আয়াত লেখা মখমলের কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। নিয়মিত আগরবাতি, গোলাপ পানি, তাজা ফুল দিয়ে সজ্জিত করা হয়। পিরের ভক্তরা সেখানে দিয়ে তাঁর কবর জিয়ারত করেন। মানত থাকলে পিরের দরগার পাশে মুরগি, খাসি জবাই করে ফকির এতিমদের খানার ব্যবস্থা করেন। প্রত্যেক দরগায় পিরদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে বাৎসরিক উৎসব ও মেলা হয়। এ সব দরগায় হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক যাতায়াত করে।

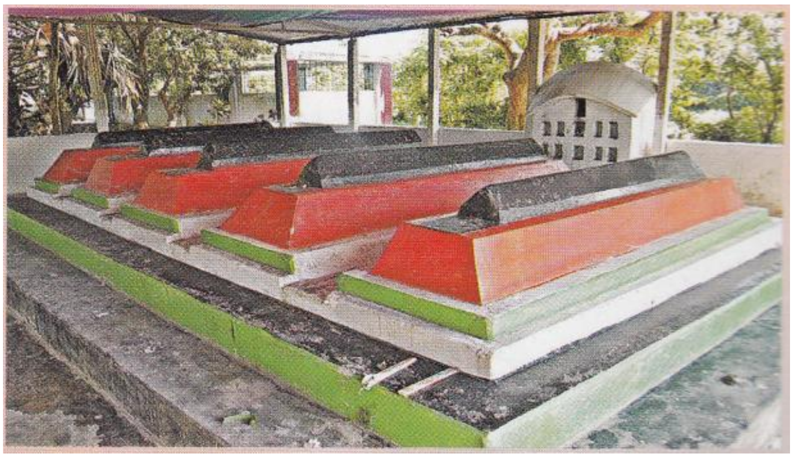

wPÎ-7: †সানারগাঁওয়ের পাঁচ পিরের সমাধি

সত্যপির বাংলার মুসলমানদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। এ সংস্কৃতিতে হিন্দু মুসলমান ধ্যানধারনার সমন্বয় দেখা যায়। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সত্যপির ভক্তি লক্ষ করা যায়। ষোড়শ শতক থেকে বাঙালি

সমাজে সত্যপির মতবাদ খুবই প্রচলিত ছিলো। আজও উত্তর ও পশ্চিম বাংলার বহু হিন্দু ও মুসলমান আনুষ্ঠানিকভাবে সত্যপিরের উপাসনা করে থাকে। লোকেরা কাঠের তকতা দিয়ে সত্যপিরের আসন তৈরি করে এবং ফুল দিয়ে এটা সজ্জিত করে। পূর্ণিমার দিনে সত্যপিরের পূজায় তারা নানা রকমের শিরণি দেয়া হয়। রাজশাহীতে সত্যপিরের ভিটা রূপে অভিহিত একটা জায়গা আছে।[৮৬] বাংলাদেশের অনেক জায়গায় পিরের কবরের উপর স্মৃতিসৌধ রয়েছে। যাকে বলা হয় দরগা। এখানে দর্শনার্থীদের ভিড়ে সব সময় পরিপূর্ন থাকে। বাঙালি মুসলমানদের জীবনে দরগা উল্লেখযোগ্য স্থান হিসেবে রয়েছে। সুতরাং বস্তুগত লোকসংস্কৃতি চর্চায় অবস্তুগত লোকসংস্কৃতি অতোপ্রতোভাবে জড়িত থাকে। এক ধরনের লোকসংস্কৃতিচর্চা মানুষের বস্তুনির্মাণের মধ্যে প্রকাশ পায়। অপরদিকে মনের আনন্দ, পাপমোচন,বিশ্বাস, কুসংস্কার, মানসিক প্রশান্তির আশায় আচার আচরণের মধ্যদিয়ে প্রকাশ করে।

১(ঘ) বস্তুগত লোকসংস্কৃতি (Material culture)

লোকশিল্প

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হাজার বছরের পুরনো। ঐতিহ্য হলো যে কোনো জাতির বড় সম্পদ যার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে শিল্প, সংস্কৃতি ও সভ্যতা। লোকশিল্পের ভেতর দিয়ে বাঙালি জাতির জাতীয়তাবোধ, দৈনন্দিন কাজকর্ম, উৎসব, পার্বণ এবং আচার অনুষ্ঠানের প্রতিচ্ছবি স্পষ্টরুপে ফুটে ওঠে। সুতরাং এ শিল্প কোনো বিশেষ ধর্মের মানুষের তৈরি শিল্প নয় বরং এই শিল্পের ভেতর দিয়ে সকল ধর্মের মানুষের শিল্পচর্চার সম্মিলিত রূপ খুঁজে পাওয়া যায়।[৮৭] গুরুসদয় দত্ত ও অজিত মুখার্জি লোকশিল্পের উদ্ভব খুব প্রাচীন বলে মনে করেন।

বাংলাদেশের লোকায়ত সমাজ কৃষিভিত্তিক। প্রাত্যহিক জীবনযাপন প্রণালি থেকে শুরু করে লোকশিল্প, লোকসাহিত্য, লোকনৃত্য, লোকক্রীড়া প্রভৃতির পরিমণ্ডলে কৃষিভিত্তিক জনজীবনকে প্রতিফলিত করেছে। লোকসংস্কৃতির এই বিষয়গুলো আদিতে ছিলো জাদুবিশ্বাসভিত্তিক অথবা জাদুভিত্তিক।[৮৮] লোকশিল্প পুরাতন বিষয় রূপান্তর ও বিবর্তনের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত হয়ে স্থান-কাল-পাত্রের সাথে খাপ খেয়ে বেঁচে থাকে। এই সংস্কৃতি একটি বনবৃক্ষের মতো, যার শেকড় অতীতের গভীরে প্রোথিত কিন্তু তা ক্রমাগত নতুন পাতা ও ফল উৎপন্ন করে চলেছে।

লোকশিল্পের পর্যায়ভুক্ত আলপনা, পুতুল ও খেলনা, কাঠের পুতুল,শোলার পুতুল, লোকচিত্র, দেয়ালচিত্র, পুঁথিচিত্র, ধাতব ও বেতের কাজ, ঘরকন্নার হাঁড়ি পাতিল, ক্ষুদ্র প্রতিমূর্তি, বাঁশ ও বেতের কাজ, সুচি ও বয়নশিল্প, মুখোশ, শিকা, আমসত্ত ও সন্দেশের ছাঁচ, সরা ও ঘট ইত্যাদি। [৮৯]নকশি

বইটে, বালিশের গেলাপ, কলাপাতাচিত্র, লেপ তোষক বাঁধার দড়ি, পিড়িচিত্র, পুতুল, শঙ্খচিত্র, কাঠশিল্প, কাঠের চিত্রিত বাড়ি, ঘর ও রথ, পাথর কাঠ ও মাটির ফলকচিত্র, পুঁথির পাটা, ধাতব তৈজসপত্র, কাগজ ও কাপড়ের ওপর পাশা খেলার চিত্রিত ছক, কেশ বিন্যাস, বর কনের কপালের চন্দনচিত্র, কারু খচিত শিকা, পটচিত্র, কাঠচিত্র, হাতির দাঁতের কাজ, মাটির চিত্রিত পীড়ি, রোদে শুকানো মাটির তৈরি সন্দেশ ও আমসত্তের ছাঁচ, সজ্জিত বাংলা ঘর ও কাঠের গৃহ, বিয়ের বাসরের প্রায় সমস্ত চিত্রিত আসবাব পিড়ি ও কাগজের আসন, রেশমের ওপর ফুল লতার বুটি, ধাতব সামগ্রী, ঘরের দেয়ালে গোবর মাটির ছবি, রন্ধনশিল্প, বাংলার মেয়েদের তৈরি নারকেলের মিঠাই ও কনের চুল বাঁধার নুতন নতুন কায়দা ইত্যাদি। [৯০]

বাংলাদেশের লোকশিল্প ইতিহাসের পটে স্থাপিত (diachronic)। সমাজ এমনকি ঐতিহ্যগত সমাজেরও পরিবর্তন ঘটে।[৯১] এই প্রক্রিয়ায় লোকশিল্পকলাও পরিবর্তিত হয়েছে। মহেঞ্জোদারো বা মেসোপটেমিয়ার শিল্পকলার সাথে এর সম্পর্কের কথা বলা হয়ে থাকে। তেমনি লোকশিল্পের উদ্ভব পাহাড়পুর-মহাস্থান সভ্যতার সাথে সম্পর্কিত। কারণ ওই সভ্যতার ধ্বংসস্তূপের মধ্যে পোড়ামাটির লোকজীবনের সাথে সম্পৃক্ত বেশকিছু কাজ পাওয়া গেছে।[৯২] এ ধরনের কাজের চরমোৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায় দিনাজপুরের কান্তজি মন্দিরের অপূর্ব নান্দনিকতায় ভাস্কর টেরাকোটার কাজে।[৯৩] টেরাকোটা কাজ বাংলাদেশে অনেক ব্যবহৃত হয়েছে এবং এই শিল্পকলাটি এখনো ভিন্ন তাৎপর্য ও ব্যঞ্জনায় টিকে আছে। প্রাসাদ অলংকরণের ওই লোকজ চিত্রকলা ব্যবহৃত হয়েছে বাংলা একাডেমির বটতলার বেদির তিন দিকের দেয়ালে। বাংলাদেশ টেলিভিশন ভবন, আজিমপুরে অবস্থিত নিপোর্ট ভবনের দেয়ালসহ কিছু কিছু ভবন ও বাড়িতে পোড়ামাটির কাজের নতুন ব্যবহার দেখা যাচ্ছে।[৯৪]

শিল্প সম্পর্কে হেনরি গ্লাসি তাঁর '*Traditional Art*' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন 'Art is the most human things. Based in the genetic, in the creative intelligence and the nimble body, art is a potential in every individual. Nurtured in social experience, taught, learned, and bent against circumstance, art is a reality in every culture.'[৯৫] শিল্প সর্বাপেক্ষা বৃহৎ মানবীয় বস্তু। উদ্ভাবনী বুদ্ধিমত্তা এবং অতি সুক্ষ্ম অস্তিত্বের বংশানুক্রমিক ভিত্তিতে, শিল্প প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে, শিক্ষা প্রদানের মধ্যদিয়ে, শিক্ষা গ্রহণের মধ্যদিয়ে এবং বিভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যদিয়ে লালিত পালিত হওয়া শিল্পই প্রতিটি সংস্কৃতির বাস্তবতা।

বাঙালি জীবনে মৃৎশিল্প খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কৃষিজীবী বাঙালির গার্হস্থ্য জীবনে মাটির বাসন-কোসন, হাঁড়ি-পাতিল কলসি-মালসা কত বিচিত্র উপাদান দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত হয়। জাতিতাত্ত্বিক জীবনে মৃৎশিল্পের সম্পর্ক খুবই গুরুত্বপূর্ণ।[৯৬] আবহমানকাল ধরে মৃৎশিল্প বাংলার জীবনযাত্রার সহায়ক বস্তু

হিসেবে গৃহীত হয়ে আসছে। বাঙালি তার শখ পূরণের ক্ষেত্রে মৃৎশিল্পের কোনো না কোনো উপাদানে হৃদয়ের রঙ ও হাতের শিল্পিত্ব কারুকাজ মিশিয়ে নিয়েছে। এর কোনোটার মধ্যে পড়েছে ধর্মীয় ছোপ আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে পড়েছে নিতান্তই মনের মাধুরী মাখানো রেখা ও রঙ। শখের হাঁড়ি তৈরি হতো প্রধানত রাজশাহী অঞ্চলে।[৯৭] মৃৎশিল্পের কাজ মানিকগঞ্জ ও মুন্সিগঞ্জ হলেও বৈচিত্র্যময়, চাকচিক্যবহুল ও উৎকর্ষ সম্পন্ন মাটির সামগ্রী ঢাকা জেলার ধামরাই ও সাভারে দেখতে পাওয়া যায়। মৃৎশিল্পের সাথে পুতুলের সম্পর্ক রয়েছে। সমাজবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানীদের মতে, পুতুল আর্য যুগের আদি মানুষের হাতে তৈরি। পুতুল তৈরির পেছনে জাদু বিশ্বাস, ইচ্ছাপুরণ ও শত্রু নিধনের সম্পর্ক রয়েছে। বর্তমান সময়ে ভিন্ন প্রতীকী মর্যাদায় চালু রয়েছে রাজনীতির মতো একটি আধুনিক ক্ষেত্রে। ১৯৭১ সালে যেভাবে ইয়াহহিয়ার কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়েছিলো। আদিম সমাজের সেই চিরায়ত বিশ্বাস নতুন অর্থ বা ব্যঞ্জনায় যুক্ত হয়েছে। এটি লোকশিল্পের একটি অভিনব অবদান।[৯৮]

সাধারণভাবে চারটি প্রকরণ বিশ্বের সমস্ত সংস্কৃতিতেই লোকায়ত শিল্পকলার পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে। চিত্র, অলংকরণ, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য।[৯৯].লৌকিক ভাস্কর্যের মধ্যে মৃৎভাস্কর্য ও দারুভাস্কর্য দুই-ই এর অন্তর্ভুক্ত। মাটির পুতুল, কাঠের পুতুল, শোলার পুতুল, কাগজের পুতুল তো বটেই, এই সবকটি উপকরণ দিয়ে করা দেবদেবীর প্রতিমা, নানা ধরনের মুখোশ ও খেলনা লৌকিক ভাস্কর্যের এলাকাভুক্ত। কিন্তু এই সবের মধ্যে পুতুল হলো বহুলতমভাবে প্রচলিত শিল্পবস্ত। বাংলার লোকশিল্পীরা তৈরি করে থাকে সাধারণত তিনটি উপলক্ষে ধর্মীয় আচার আচরণ, গৃহসজ্জা এবং শিশুর খেলনার উপকরণ হিসেবে। সন্দীপ বন্দোপাধ্যায় তাঁর 'পট পুতুলের বাঙালা' বইয়ে বলেছেন, 'বাঙালার মাটির পুতুলকে লক্ষণ, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি দিক দিয়ে বিচার করে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রতীকধর্মী বা সিম্বলিক, আর বাস্তবধর্মী বা ন্যাচারালিস্টিক। প্রত্নবস্তুর মধ্যে যে পুতুলগুলো পাওয়া গেছে এগুলো প্রায় সবই প্রতীকীধর্মী। এই পুতুল তৈরিতে কোনো ছাঁচ লাগে না। এগুলো হাতে টেপা পুতুল নামে পরিচিত।[১০০] বাংলাদেশের ফরিদপুর, বরিশাল, কুমিল্লা, মাদারীপুর, জামালপুর, রামদিয়া ও ময়মনসিংহে পুতুল তৈরি হয়। মাটির পুতুল ছাড়াও কাঠের চিত্রিত পুতুল তৈরি হতো সোনারগাঁওয়ে। এ পুতুল ছিলো অতি বিখ্যাত। বিসিক কাপড়ের পুতুল ব্যাপক প্রচলনকে নান্দনিক শোভায় নতুন রূপ দিয়েছে। পিতল-কাঁসার তৈজসপত্র এক সময়ে গ্রামবাংলার প্রতি ঘরে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতো। কিন্তু মানুষের পরিবর্তনে চাহিদা পূরণে এলুমিনিয়াম, মেলামাইন, কাচ ও প্লাস্টিকসামগ্রী বর্তমানে এই সবের স্থান দখল করেছে।[১০১]

লোকসংগ্রহশালার সংরক্ষিত উপাদানের মধ্যে পট চিত্র অন্যতম।[১০২] পটচিত্র অনার্যদের উদ্ভাবন। হর্ষবর্ধণ, চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে পটচিত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। কার্পাস বস্ত্রে ছবি এঁকে গল্পের

আকারে তা পড়ে শোনানো হতো। পটচিত্র লোকের ধর্মের পিপাসা যেমন মেটাতো তেমনি লোকশিক্ষার উপায়ও হয়ে উঠেছিলো। বাংলার মুসলমানরাও এই চিত্রকলার বাইরে থাকতে পারেনি।[১০৩] বাংলার প্রাচীন শৈল্পিক ঐতিহ্যের ধারাবাহিক বিবর্তন যদি পাওয়া যায় তবে তা গ্রামীণ জীবনের লোকায়ত শিল্পী যারা পটুয়া নামে পরিচিত তাদের মধ্যেই লক্ষ করা যায়। চিত্রকর অথবা পটিদার এইসব পট লম্বা কাপড় নিয়ে তার ওপর পৌরাণিক উপাখ্যান অংকন করতেন। এইসব গোটানো পট বগলদাবা করে ঘুরতেন এবং সহজ সরল গ্রামবাসীদের কাছে গোটানো ছবি ধীরে ধীরে খুলে গানের মাধ্যমে বিভিন্ন অংকিত দৃশ্যাবলীর বর্ণনা দিতেন।

তবে বাংলার প্রাচীন চিত্রশিল্পের নিদর্শন খুব একটা পাওয়া যায় না। বাংলার আবহাওয়া ও জলবায়ু এই শিল্প মাধ্যমটির ক্ষয়িষ্ণুতাই ছিলো মূল কারণ।[১০৪] দশম শতকের আগে তালপাতা কাপড় বা কাঠের ওপরে করা চিত্রকলার নিদর্শন পাওয়া যায় না প্রধানত এই সব মাধ্যমের ভঙ্গুর চরিত্রের কারণে। স্ক্রলচিত্র নির্মাণের ধারা পটচিত্রের প্রভাবজাত। জয়নুলের মনপুরা শীর্ষক বিশাল স্ক্রলচিত্রটি পটচিত্রের আঙ্গিকে করা। সম্প্রতি বাংলাদেশের শিল্পী রুহুল আমিন কাজল ডেনমার্কে দীর্ঘতম পথচিত্র এঁকে গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে নাম তুলতে সক্ষম হয়েছেন। এই চিত্রের ধরণও পটচিত্রের মতো দীর্ঘ। তবে তার মৌলিক পার্থক্য হলো পটচিত্র গোটানো আর ওই চিত্র প্রসারিত। এই চিত্রের আবির্ভাব ঘটিয়েছে ঢাকা আর্ট ইনস্টিটিউটের ছাত্ররা তাদের শিক্ষাঙ্গনের বাইরের দেয়ালে।[১০৫]

আলপনা এবং পটচিত্র এই দুটি বিষয়ই বাংলার লোকশিল্পের মধ্যে প্রধান। আলপনা বা আচারমূলক চিত্র স্ত্রী-সমাজেই তা সীমাবদ্ধ। পর্বানুষ্ঠান নানা উপলক্ষে লোকসমাজে বছরের বিভিন্ন সময়ে মহাসমারোহে উদযাপিত হয়ে থাকে। নিছক ধর্মীয় পর্বগুলোকে উপলক্ষে বা কেন্দ্র করে কিছু অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে, যা একান্তভাবে লৌকিক। বাংলার লোকচিত্রকলার মধ্যে আলপনা কাঁথা, পট ইত্যাদি প্রকরণ খুবই সমৃদ্ধ; সরা ঘট, তাস প্রভৃতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য নমুনা মেলে।[১০৬]

আলপনা এবং কাঁথার মধ্যে বিভিন্ন অলংকরণের আভিপ্রায়িক প্রকাশটা বেশি হলেও অনেক সময়ই সেখানে চিত্রবিন্যাস দেখা যায়। কাঁথার নকশার মধ্যে ধর্মীয় তাৎপর্য বা যাদুকেন্দ্রিক কোনো বিশ্বাস ঘটে না।[১০৭] গ্রাম বাংলার মানুষের ব্যবহারিক জীবনে নকশিকাঁথা সবচেয়ে বেশি রেখাপাত করে।[১০৮] আসলে গ্রাম বাংলার এটা সচিত্র প্রতিবেদন। গ্রামের মেয়েরা অবসরে বসে প্রতিদিনের সুখ দুঃখের প্রতিচ্ছবির প্রতিফলন নকশি কাঁথার মধ্যে ফুটিয়ে তোলে। তবে বর্তমানে নকশি কাঁথার ফোঁড় শুধুমাত্র কাঁথার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। কাঁথার এই ফোঁড় গ্রামীণ সমাজ থেকে নগরের বড় বড় বিপনি গুলোতে

চলে এসেছে। বিশেষ করে বাংলাদেশে আড়ং নকশি কাঁথার একটি বিশাল বাজার সৃষ্টি করেছে। ছাঁচ লোকায়ত শিল্পকলার বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেক ছাঁচের প্রতিটি নকশা অথবা নকশা প্রতিটি অংশ থাকে সুস্পষ্ট এবং সুসমঞ্জস্য।

কাতান বেনারসি জামদানি শিল্পের সর্বাধিক সমাবেশ ঘটেছে নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ থানার অন্তর্গত কাজীপাড়া ও নওয়াপাড়া এবং ঢাকা জেলার ডেমরায়। শীতলক্ষ্যা নদীর উভয় পাশে কারিগরদের বাড়িগুলো সারিবদ্ধভাবে অবস্থিত। মধ্যযুগের সাহিত্যে বহুমূল্য কারুকার্যখচিত পাটাম্বর বা রেশমের শাড়ি ও বেলন পাটের নেতেল শাড়ির উল্লেখ আছে। মুসলমান শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় এ শিল্প বিকশিত হয়েছিলো। গঙ্গা-পদ্মা উপত্যকায় গৌড়ের সুলতান সম্রাট নবাব-সুবাদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠে উত্তরবঙ্গের রেশমশিল্প। বাংলার আদিম বস্ত্র শিল্পের প্রকৃত উত্তরাধিকারী বাংলার প্রত্যন্ত নিবাসী আদিবাসীগণ। মগ, টিপরা, চাকমা, মণিপুরীদের সুতিবস্ত্র তৈরির বৈশিষ্ট্য বিশেষত শক্ত মোটা কাপড়ে বুননেন কারুকার্য প্রশংসনীয়।[১০৯] ধাতবশিল্পে বাংলার লোকশিল্পীদের দক্ষতা অসামান্য। লোকশ্রুতি অনুসারে বল্লাল সেনের সময়ে পূর্ববঙ্গে বিক্রমপুরে সর্বপ্রথম ধাতু সংমিশ্রণ শিল্পের সূচনা হয়।[১১০] কাষ্ঠশিল্প সুতার বা সুত্রধর সম্প্রদায়ের বৃত্তি। কিছুদিন আগেও শুধু অভিজাত শ্রেণি নয় সাধারণ গৃহস্থের গৃহে খোদাইকৃত কাঠের কারুকার্যের সন্ধান মিলতো। খাট, পালঙ্ক, সিন্দুক ইত্যাদি আসবাবপত্র উচ্চবিত্তের তামাকাঁসা পিতলের তৈজসপত্রের মত প্রকৃত বাঙালির গৃহে ব্যবহৃত হতো।

লোকায়ত শিল্পকলার অন্যতম গৌরবময় ঐতিহ্য নৌশিল্প। ১০০ বছর আগে বাংলার দূরপাল্লার প্রধান এবং একমাত্র যানই ছিলো নৌকা। বাংলার নৌশিল্পের যথেষ্ঠ বিকাশের সাক্ষ্য শুধু চট্টগ্রাম আর মধ্যযুগের সাহিত্যেই নয়; প্রাচীন লিপিমালা এবং সংস্কৃত সাহিত্যেও তার বহুতর সাক্ষ্য বিদ্যমান। বিকল্প পণ্যের প্রতিযোগিতায় কাঠশিল্প অনেকখানি ক্ষতিগ্রস্ত।[১১১] প্রাচীনকাল থেকে বাংলার গ্রামীণ সমাজে শুকনো ঘাস ছন ও বাঁশ দিয়ে তৈরি করা হতো কুঁড়েঘর এবং ইট দিয়ে দালান কোঠা নির্মাণের প্রচলন ছিলো। এর ছাদগুলো ছিলো দুইরকমের চৌচালা ও দোচালা। গৃহ ছাদের চারটি চাল এবং পরবর্তীতে দেয়ালের ওপর তিনকোণা অংশবিশিষ্ট একটি কেন্দ্রিয় বাঁকানো মটকাসহ দুটো ডালা থাকে। বাঙালিরা বাঁশের প্রাচুর্যের ফলে এটা সর্বজনীনভাবে বক্রাকার ছাদ-বিশিষ্ট বাসগৃহ নির্মাণের কাজে ব্যবহার করে। গ্রামীণ সমাজে প্রচলিত কুঁড়েঘর লোকসংগ্রহশালার অন্যতম উপাদান।[১১২]

চামড়াজাত শিল্পদ্রব্যের ব্যবহার বর্তমানে বৃদ্ধি পেয়েছে। সুটকেস, জুতা, স্যান্ডেল, টুপি, ব্যাগ, ভ্যানিটি ব্যাগ প্রভৃতি চামড়াজাত দ্রব্য। তেমনি বাংলাদেশের লোকসংগ্রহশালায় বাংলার

লোকসংস্কৃতির বিবিধ উপকরণ সংরক্ষিত হওয়ায় সেখানে ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর ও বাঙালি জাতিসত্তার সাথে লোকসংস্কৃতির সম্পৃক্ততার অনুসন্ধানে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে।

চারম্ন ও কারম্নশিল্প

শিল্প কথাটি বাংলায় এসেছে সংস্কৃত থেকে। তবে সংস্কৃত ভাষায় এর সঠিক অর্থ নিরূপিত হয়নি। জীবনধারণের মূল লক্ষ্যে নিয়োজিত মানবিক শ্রম বা অভ্যাস, নৈপুণ্য ও দক্ষতায় সুন্দর, গভীর নিগূঢ় এবং ব্যাপক করে কৃতিত্বের পর্যায়ে উন্নিত করার নামই শিল্পকলা।[১১৩] তেমনি বলা যেতে পারে যে, মানব তার সৌন্দর্যবোধের ভেতর দিয়ে ও মননশীলতার বিকাশ ঘটিয়ে যা কিছু সৃষ্টি করে তাই হলো শিল্পকলা। পাশ্চাত্যের পণ্ডিতেরা লোকশিল্পকে চারু ও কারু এই দুই ভাগে বিভক্ত করে থাকেন।

চারুকলা হলো নৃত্য অভিনয়, ভাস্কর্য স্থাপত্য। চারু হলো মার্গীয় স্তরে উন্নীত শিল্প। Hand and craft শব্দের সমন্বনে (Handicraft) শব্দের উৎপত্তি। বাংলায় তার পরিভাষা হস্তশিল্প বা কারুকলা। ছোট খাট যন্ত্রের সাহায্যে ব্যবহারিক বস্তুকে সুষমা বা সৌন্দর্যমণ্ডিত করে কায়িক কৌশলে যে অলংকরণ সৃষ্টি হয় তার নাম কারুকলা। খালি হাতে বা কোনো জটিলতা বর্জিত সহজ উপকরণ বা হাতিয়ারে এই শিল্পকর্ম সৃষ্টি হয়। স্থাপত্য ও ভাস্কর্য ললিতকলার মধ্যে পড়ে, তা কারুকলা ভুক্ত নয়।[১১৪] কারুকলা সাবেকী রীতি বা পুরোনো রীতি Traditional. কারুকলা শহরের পরিবেশেও তৈরি হতে পারে। কারুকলা ও লোকশিল্পের পার্থক্য অনুধাবন করা যেমন কঠিন তার চেয়ে কঠিন বাস্তবক্ষেত্রে এর তফাৎ বের করা।

আধুনিক চিত্রকলার সাথে লোকশিল্পের পার্থক্য বলতে চারুশিল্পী উপযুক্ত শিক্ষাগ্রহণ করে শিল্প সৃষ্টি করেন। তার সৃষ্টি নিজশ্য ‘কপিরাইট’ স্বীকৃত। কেউ অনুকরণ করলে চৌর্যবৃত্তির দায়ে অভিযুক্ত হতে পারেন। তিনি পরিশীলিত এবং সৃষ্টিও করেন পরিশীলিতজনের উদ্দেশ্যে। কিন্তু লোকশিল্পের মালিকানা পুরো গ্রামীণ সমাজের। অনুকরণেও কোনো দায়বদ্ধতা নেই। এই শিল্পের কদর ও সহজ সরল গ্রামীণ সমাজে। তবে পরিশীলিত সমাজেও কখনো কখনো আবেদনের সৃষ্টি করে থাকে। লোকশিল্পী বিভিন্ন মাধ্যমের শিল্পী। যেমন যিনি খেলনা পুতুল তৈরি করেন, অন্য সময় ঘরবাড়ি, প্রতিমা তৈরি করেন। যুগ যুগ ধরে লোকশিল্পের নিজস্ব কতকগুলো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আছে। এই শিল্প রক্ষণশীল এবং গতানুগতিক।[১১৫] কারুশিল্প আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি মুহুর্তের সাথে জড়িত। এক অর্থে এই শিল্পকে ব্যবহারিক শিল্পকলা বলা হয়ে থাকে। এই শিল্পের আওতাভুক্ত শিল্পগুলো হলো মৃৎশিল্প, বয়নশিল্প, বাঁশ ও বেতশিল্প, গহনাশিল্প, চামড়াশিল্প, দারুশিল্প, ঝিনুকশিল্প, শঙ্খশিল্প ইত্যাদি। কারুকলার ব্যবহারিক দিকটা থাকে প্রধান তেমনি চারুকলার লক্ষ থাকে সৌন্দর্য

সৃষ্টি করা। রঙ তুলির সাহায্যে আঁকা চিত্রকলা ও সুই সুতা দিয়ে তৈরি নকশি কাঁথার অলংকরণ চারুকলার মধ্যে পড়ে।[১১৬] কতকগুলো লোকশিল্পকে ভাগ করা যায় না। যেমন সখের হাঁড়ি, মনসাঘট, লক্ষ্মীর সরা। এই শিল্প নিদর্শনগুলো চারু এবং কারু দুটি শিল্পের পর্যায়ভুক্ত করা হয়। বর্তমান কালের শিল্পকলা বিশেষজ্ঞগন চারু ও কারু এই দুই শিল্পে বিভক্তি করতে চান না। এগুলোকে লোকশিল্প বলে আখ্যায়িত করেন। নানারকম ডিজাইন ও অলংকরণ শোভিত আসবাবপত্র ও যন্ত্রাদি গৃহস্থের ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটায়। বাংলাদেশে আরো একটি বহুল প্রচলিত নাম কুটিরশিল্প। কারিগরদের নিজ গৃহে সাধারণত হাতিয়ারের সাহায্যে উৎপাদিত শিল্প কুটিরশিল্প নামে পরিচিত। কারখানার বাইরের শিল্পসমূহ চিহ্নিত করতে কটেজ ইন্ডাষ্ট্রি বা কুটিরশিল্প নামের উৎপত্তি। কারু ও কুটির শিল্প এক নয়। কারু ও কুটির শিল্পে বাজারের দিকে লক্ষ রেখে তাতে চটক থাকে। লোকশিল্পে থাকে শান্ত ও নমনীয়তা।[১১৭]

১(ঙ) বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিতে সংগ্রহশালা

পরিবার গড়ে ওঠার পাশাপাশি বেঁচে থাকার এবং আইনশৃঙ্খলার প্রয়োজনে মানুষ প্রাচীনকাল থেকেই সামাজিক সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজন বোধ করেছিলো। মানবগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা যখন একটি বিশিষ্ট রূপ ধারণ করে এবং এই উৎকর্ষতার স্তরটিই হলো সভ্যতা।[১১৮] স্থায়ী বসবাসের কারণে কোনো মানবগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা নির্দিষ্টমানে ও বিশিষ্ট রূপে যখন গড়ে উঠে সেটাই আসলে সভ্যতা। মানুষের ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরে নানা অঞ্চলে কৃষ্টির উদ্ভাবনীর সাথে সভ্যতার সূচনা হয়েছে, সেই সভ্যতা আবার ধ্বংস প্রাপ্তও হয়েছে। কিন্তু টিকে আছে শিল্পকর্ম। প্রাচীনকালে শিল্পকলা সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে নিয়ে যেতে অনেকখানি সহায়তা করেছে। বিশেষ করে প্রাচীন সভ্যতায় লিখন পদ্ধতি আবিষ্কারের পর সমাজে শিল্প ও বিজ্ঞানের যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হয়। সভ্যতা বিবর্তনশীল এবং চক্রাকারে তা আবর্তিত হয়। যে কোনো সভ্যতার উন্মেষের পেছনে থাকে কৃষিকাজ, সেচব্যবস্থা, যানবাহনের উন্নতি, রাষ্ট্রিয় বিধান ও ধর্মীয় অনুশাসনের প্রবর্তন, শিল্প, স্থাপত্য, শিক্ষা ও বিজ্ঞানের উৎকর্ষতা ইত্যাদি। সুতরাং দেশ-বিদেশে বিভিন্ন গণগোষ্ঠী, সমাজ ও দল আদি থেকে পরবর্তী সামাজিক স্তরে উন্নিত হয়েছে বিবর্তনের মাধ্যমে। সভ্যতার সময় হতে সমাজ পাথর দিয়ে তৈরি মূর্তি, স্মারক প্রভৃতি তৈরি আরম্ভ হয়। ‘ডলম্যানস’ (কবর) প্রাচীন স্মৃতিস্তম্ভের উদাহরণ। সমাধির চারপাশে কতকগুলো পাথর রাখা হতো। পূজার জন্য দেবতার মন্দির নির্মাণ করা হয়। কবর সংরক্ষণ থেকে সংগ্রহশালার ধারণাটি প্রাচীন মানুষের মধ্যে জাগ্রত হয়ে থাকতে পারে।[১১৯]

Dhaka University Institutional Repository

wPÎ-8: ডলম্যানস

গুহা

পৃথিবীতে মানুষের ক্রমবিকাশের ধারায় ভারত উপমহাদেশে আদি মানবের অস্তিত্বের প্রমাণ মেলে পুরাপলীয় বা পুরনো পাথর যুগের বেশকিছু খুঁজে পাওয়া হাতিয়ারের মধ্যে। এগুলোর মধ্যে শিকারের অস্ত্র, হাতুড়ি, কাটা-ছিলার উপযোগী হাতিয়ার অন্যতম। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে যে প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষের বিচরণ ছিলো আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার তার প্রমাণ বহন করছে। বাংলাদেশের ভূখণ্ডে প্রথম প্রাগৈতিহাসিক মানুষের ব্যবহার করা অস্ত্র পাওয়া যায় চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে।[১২০] এছাড়াও আদিম যুগের মানুষ বসবাস করে গেছে এ ধরনের কিছু গুহার সন্ধান পৃথিবীর অনেক স্থানে পাওয়া গেছে। প্রত্ন অনুসন্ধানে পাওয়া এ গুহা গুলো একদিকে যেমন ঐতিহাসিকদের আদিম সমাজ ও সংস্কৃতি জানতে সহায়ক হয়েছে, তেমনি এটাও প্রশ্নবিদ্ধ করেছে যে, এত বছর পরেও এ গুলো অক্ষত অবস্থায় থেকে গেল কিভাবে? সাধারণত মানুষের প্রধান পাঁচটি মৌলিক চাহিদার ভেতর বাসস্থান হলো তিন নম্বরে। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা। বাসস্থানের পরিক্রমায় আদিমকালে পাহাড়ের গুহা, গাছের কোটর সবচেয়ে প্রাচীন। বাসস্থান বলতে শুধু বসবাসের অবস্থা মনে করা হলেও এর ভেতর কাজকর্ম, বিনোদন, মানুষের জীবনের স্বপক্ষে সব কর্মকাণ্ডকে বোঝানো হয়। লক্ষণীয় বিষয় হলো যে, সভ্যতার আদিতে স্থাপত্যের প্রথম স্ফূরণ শুধু বাসস্থানের মধ্যেই ঘটেনি, এ সঙ্গে চারু, কারু,ও ভাস্কর্য শিল্পের বিকাশ ঘটেছিলো এই গুহার ভেতর দিয়েই।[১২১] সুতরাং এই আদিম মানুষের আশ্রয়স্থলের ভেতর দিয়ে স্থাপত্যিক অবকাঠামো পরিকল্পনা একটি বৈশিষ্ট্যে ক্রমশ রূপ নিয়েছে। প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে মিসরীয় সভ্যতায় প্রথম স্থাপত্যকলার পরিপূর্ণ বিকাশ দেখা যায়। ফারাও সম্রাটদের আগে জোসের সম্রাটদের প্রধান উপদেষ্টা ইমটোটেপ পৃথিবীর প্রথম স্থপতি ছিলেন। মিসরীয় সভ্যতার

পিরামিডগুলোতে স্থাপত্য, চারুকলা, দেয়ালচিত্র ও ভাস্কর্য সব শিল্পকলা একই দালানে যেমন গ্রোথিত থাকত, তেমনি স্বাভাবিকভাবেই পরিকল্পকদের মধ্যে এই সব গুণের সমাহার থাকতে হতো। সুতরাং স্থাপত্যশিল্প মানব সভ্যতায় স্থায়ী দলিল হিসেবে মানুষের অদম্য ইচ্ছা ও স্বপ্নের সাধ বাস্তবায়নে দৃঢ়তা শক্তির প্রমাণ করে।[১২২]

যা হোক, অনুসন্ধানে পাওয়া গেছে এ ধরনের প্রাচীন গুহার মধ্যে স্পেনের আলতামিরা, ফ্রান্সের হোৎগারোন, লাগ্রে, ফনত্ দে গোম নাম উল্লেখযোগ্য।[১২৩] এ ছাড়াও সমগ্র ভারতবর্ষে প্রস্তরযুগে আনুমানিক ৭০০ জায়গার ত্রিশের অধিক গুহার সন্ধান খুঁজে পাওয়া গেছে, যেখানে মানুষের বসবাস করতো। ভারতের সমৃদ্ধ ও উল্লেখযোগ্য গুহার মধ্যে মধ্যপ্রদেশের সুরগুজায় রামগড় পাহাড়ের যোগীমায়া গুহা। এছাড়াও হায়দ্রাবাদের খান্দেশ জেলায় অবস্থিত অজন্তা গুহা, ভারতের ইলোরা, কাহ্নেরী কারলী, ভাজা, বাঘ প্রভৃতি গুহার নাম উল্লেখ করা যায়। এ সব বিচিত্র ও ঐশ্বর্যপূর্ণ গুহাগুলো ছিলো একাধারে বিশ্রামাগার, ধর্মশিক্ষা ও সাধনার স্থান।[১২৪]

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, বিভিন্ন গুহার ছাদে আঁকা জীবজন্তুর রঙিন ভারতীয় ছবির সাথে স্পেনের আলতামিরা বা অরিগনেসন গুহার ছবির মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।[১২৫] ধারণা করা হয় যে, প্রাচীন পৃথিবীর এ শিল্পকলার আবির্ভাব ঘটেছে ৩০ হাজার বছরেরও আগে। আদিম মানুষেরা শিকারে বের হওয়ার আগে প্রথমে শক্তিশালী কোনো পশুর ছবি এঁকে সেই ছবির জন্তুকে কল্পনায় হত্যা করতো। দ্বিতীয়ত তাদের বিশ্বাস ছিলো সুনির্দিষ্ট নিয়মে কিছু আচার পালন করলে সে কাজে সফলতা আসে (চিত্র ৯)।[১২৬] আর এভাবেই আদিম সমাজের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিলো যাদুর প্রভাব। এই যাদু বিশ্বাসকে বলা হতো 'ইমিটেটিভ ম্যাজিক'। আরেক ধরনের যাদু তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিলো যাকে বলা হতো 'সিম্প্যাথেটিক ম্যাজিক'। অর্থাৎ নিদর্শন ছিলো কবচ ও মন্ত্রপূত মূর্তি। বিশেষ করে কোনো সৎ অথবা অসৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে এ যাদু ব্যবহার করা হতো।[১২৭] মুখোশ তৈরি মানুষের সবচেয়ে প্রাচীনতম শিল্পবস্তুগুলির অন্যতম। প্রাচীনকালে মুখোশের উপকরণের মধ্যে ছিলো বিভিন্ন প্রাণীর মাথা, ছাল, শিং ইত্যাদি। অর্থাৎ বিশেষ কোনো প্রাণীর ছদ্মবেশ ধারণ করে এবং শিকারী জন্তুদের আকর্ষণ করার চেষ্টা করা হতো। এখানেও উদ্দেশ্য ছিলো ভালো শিকারের। ছবি আঁকা ছাড়াও পশুর হাড়, শিং দিয়ে তারা বিভিন্ন জীবজন্তুর মূর্তি তৈরি করা শিখেছিলো। এই শ্রেণির মূর্তিকে বলা হতো 'ফেটিশ'। যাদুবিদ্যায় পারদর্শী অথবা পুরোহিতরা এই ফেটিশের মধ্যে আধিভৌতিক শক্তি দিতে পারতেন।

Dhaka University Institutional Repository

wPÎ-9: গুহা চিত্র

প্রাচীন মানুষ ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখে অনুভব করেছিলো দেহের মধ্যে আত্মা আছে। এখানে সর্বপ্রাণবাদ বা Animatism এর কথা এসে যায়। মানুষ যখন সমস্ত চেতনাকে জড় বিশ্বের উপর আরোপ করে, এই চেতনা পরে সুবিস্তৃত হয়ে Animism নামে পরিচিত হয়। সর্বপ্রাণবাদের ধারণা থেকে ধর্মবিশ্বাসের উদ্ভব। উপরন্তু পূজা পার্বন মন্দিরকে ঘিরে প্রচলিত হয়। কৃষিভিত্তিক গোষ্ঠীজীবনে ধর্মবিশ্বাস মানুষের জীবনযাত্রার পদ্ধতি পাল্টে দিল। পরিবর্তিত হলো ধর্মবিশ্বাসেরও। প্রকৃতির যে সব জিনিসের ওপর তাদের জীবন নির্ভরশীল ছিলো সেগুলোর আত্মা তাদের কাছে অত্যন্ত প্রধান হয়ে দেখা দিল যেমন সুর্য, মেঘ আত্মা। তারা ভাবতে লাগল এই সব আত্মা নিশ্চয় বিভিন্ন শক্তিশালী দেবতার দান। দেবতার ইচ্ছায় পৃথিবীতে বসন্ত আসে, বৃষ্টি পড়ে, ফসল ফলে। এই দেবতারাই মানুষ বা পশুর রূপ ধারণ করে। শুরু হলো কাঠ বা পাথর দিয়ে দেবমূর্তি তৈরি। তাদের মধ্যে এই বিশ্বাস জন্মালো যে আত্মা এবং অন্যান্য অলৌকিক শক্তি প্রকৃতি ও মানুষের জীবনের পরিচালক। এভাবে ধীরে ধীরে আদিম মানুষের মধ্যে আচার বা অনুষ্ঠানের জন্ম হতে লাগল। হয়তো একজন মানুষের শুরু করা আচার বহুজনের ভালো লেগে গেল। নিজেদের অজান্তেই সেই ভালো লাগা আচার ব্যবহার মানুষকে সামাজিকতার পথের নির্দেশ দিলো, এক সময় তা সুনির্দিষ্ট রীতি বা আচারে পরিণত হয়। কৃষিকাজ ও পশুপালনের সাথে সাথে তখনকার মানুষদের মধ্যে আরো একটি জিনিস আবিভার্ব হয় হস্তশিল্প অর্থ্যাৎ কারিগরি। পাথর ছিদ্র করা বা তাকে ঘঁষে মেজে মসৃণ করা তারা শিখেছিলো। কাঁচা মাটি পুড়লে শক্ত কঠিন হয়ে যায় দেখে তারা হাঁড়ি, থালা-বাটি ইত্যাদি মাটি দিয়ে তৈরি করে পোড়াতে লাগল। গাছের ডাল ও ছাল দিয়ে তারা ঝুড়ি বুনতে শিখলো। এতে অভ্যস্ত হওয়ার ফলে জাল বোনা, সুতো কাটা এবং পশুর লোম ও শন দিয়ে কাপড় বানানো শিখলো। এক সময় তারা

অনুভব করতে লাগল যে এক স্থানে বসবাস করা শুরু করতে হবে। এই বসবাসের জন্য তৈরি হলো ঘরবাড়ি, গ্রাম, শহর, জনপদ। এভাবে মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করা শুরু করে। বসবাসের উপযোগিতা পেলো স্থাপত্যশিল্পে। তবে পলিমাটির বাংলাদেশে কঠিন ও স্থায়ী উপকরণসামগ্রী যেমন পাথর মর্মর ইত্যাদি ছিলোনা বলে প্রাচীন স্থাপত্যকীর্তি স্থায়িত্ব লাভ করেনি। যে কারণে অন্যান্য দেশের তুলনায় স্থাপত্যশিল্পের প্রভূত উৎকর্ষ সাধন হয়নি। সুতরাং এ দেশে চিরকাল স্থাপত্যশিল্প লোকজশিল্পের আওতায় থেকে গেছে। আমাদের দেশের লোকজশিল্প সবসময়ই আমাদের অহংকার। তাই প্রাচীন মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর, ময়নামতির দুর্লভ স্থাপত্য নিদর্শন এদেশে সৃষ্টি হয়েছিলো এবং কালের গর্ভে সে কীর্তি তলিয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত তার ছিটেফোঁটার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

অতএব গুহায় ছিলো আদিম সমাজের বাসস্থান, শিল্পচর্চা ও জাদুগৃহ। তারা তাদের যাবতীয় উপকরণ নিজের অজান্তেই গুহায় সংগ্রহ করতো। এক সময় আদিম মানুষের বসবাসযোগ্য গুহা বিবর্তনের ভেতর দিয়ে সংগ্রহশালার রূপ ধারণ করেছে। গুহায় বসবাস করা মানুষের মধ্যে যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিলো সে সংস্কৃতি এক সময় লোকসংস্কৃতিতে পরিণত হয়। উপরন্তু গুহাচিত্র এবং আদিম সংস্কৃতি ছিলো লোকসংস্কৃতির আদি রূপ। আদিম মানুষের সেই চিন্তা-ভাবনা ও কার্যকলাপ পরবর্তীতে সভ্য সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। নিজেদের প্রয়োজনীয় বস্তুসামগ্রী সংরক্ষণের ভাবনা থেকে সমাজের মধ্যে টিকে থাকা নানা সংস্কৃতির উপকরণ সংরক্ষণের চিন্তা এক সময় সংগ্রহশালার মধ্যে ব্যাপ্তি ঘটেছে।

মিসর

যিশু খ্রিষ্টের জন্মেরও প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে মিসরে গড়ে উঠেছিলো এক অসাধারণ সভ্যতা। নীল নদের তীরে গড়ে উঠেছিলো সপ্তাশ্চর্যের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন রহস্যমণ্ডিত খুফুর পিরামিড। অবিশ্বাস্য হলেও এত প্রাচীন পিরামিড এখনো পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। খ্রিস্ট পূর্ব ২৫৬০ সালে ফারাও রাজা খুফু নিজে এ পিরামিডটি নির্মাণ করেন। প্রাচীন মিসরে সম্রাটদের বলা হতো ফারাওন। তাঁরা ছিলেন অসীম ক্ষমতার অধিকারী। ফারাওনরা পিরামিড নির্মাণের আদেশ দিয়েছিলেন। পিরামিড হলো পাথরের তৈরি বিশালাকার সমাধিসৌধ। এখানে ফারাওনদের মৃতদেহ কবরস্থ করে রাখা হতো। মিসরীয়দের বাস্তবধর্মী ও সমৃদ্ধ শিল্পকলার নিদর্শনের দেখতে পাওয়া যায় তাদের নির্মিত পিরামিড, মন্দির, দেওয়াল চিত্র, তৈজসপত্র, কাঠ ও পাথরে খোদাই করা দ্রব্যে। কায়রোর অদূরে অবস্থিত গিজোর পিরামিড এখনও প্রাচীন মিসরীয় স্থাপত্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এভাবে প্রাচীন সভ্যতার প্রতিটি স্তরে মন্দির নির্মিত হয়েছে বিশাল আকৃতির, জাঁকজমকপূর্ণভাবে, এবং প্রচুর অর্থ ব্যয় করে।[১২৮]

Dhaka University Institutional Repository

WPÎ-10: খুফুর পিরামিড

সুতরাং বিশ্বের প্রাচীন সভ্যতা ও শিল্পকলার ইতিহাসে মিসরীয়দের অবদান অবিস্মরণীয়। মিসরেই প্রথম উন্নতর সভ্যতার গোড়াপত্তন ঘটে। এ জন্যে মিসরকে বলা হয়ে থাকে মানব সভ্যতার জন্মস্থান। খ্রিস্টপূর্ব ৪র্থ সহস্রাব্দে মিসর জ্ঞানচর্চায় নতুন দিক নির্দেশনা দেয়। মিসরীয়রা বুঝেছিলো বংশ পরম্পরায় শুধুমাত্র শ্রুতির মাধ্যমে স্মৃতিতে ধরে রাখা সম্ভব নয়। এ কারণে তারা লিপির মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান সংরক্ষণের উপায় বের করেছিলো লিপির উদ্ভবের মধ্যদিয়ে। মিসরীয় লেখার পদ্ধতি ছিলো হায়ারোগ্লিফ (hieroglyph)। এই লিপি লেখা হতো পেপিরাসের ওপর। বাংলায় চিত্রলিপি নামে পরিচিত। মেসোপটেমিয়রা লিখত মৃত্তিকাফলককে। মাটি কেটে লেখা মৃত্তিকা ফলক রৌদ্রে ফেলে ভালোভাবে শুকিয়ে নেয়া হতো। এই ধরনের লিপিকে বলা হতো কীলকলিপি বা কিউনিফম (cuneiform)।[১২৯] নিঃসন্দেহে সভ্যতা যুগে এক সময় অতীতের ইতিহাস লিখনির মাধ্যমে এবং বস্তুগত উপাদান সংরক্ষণ প্রক্রিয়াজাত করণের ভেতরেই সংগ্রহশালার রূপ নিহিত ছিলো। এ কারণে সংগ্রহশালা হয়ে উঠেছিলো লোকসমাজের শিক্ষাকেন্দ্র।

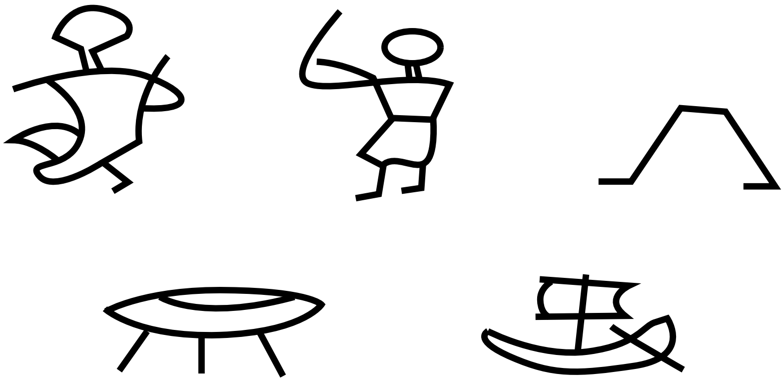

WPÎ-11: মিসরীয় চিত্র লিপি হায়ারোগ্লিফিকস

মিসরীয়দের ধর্মের মূলবাণী ছিলো, মৃত্যুর পর মানুষের দেহ সংরক্ষণ করা হলে বহু বছর পরে পুনরায় সে জীবন ফিরে পাবে। মৃত্যু হলো মানুষের সাময়িক সুপ্তিকাল এবং আত্মা অবিনশ্বর।এ ছাড়াও মিসরীয়রা সমাধিস্থ করার সময় মৃত দেহের সাথে খাদ্যবস্তু, শ্রম-হাতিয়ার গহনা রেখে দেয়া হতো। তারা মনে করতো, দেহ ছেড়ে চলে যাবার পর আত্মা আবার ফিরে আসবে এবং জীবিত মানুষের যা

যা প্রয়োজন তা সেই আত্মার প্রয়োজন পড়বে। সুতরাং মৃতদেহকে সংরক্ষণ করা হলে আত্মা পুণরায় দেহে ফিরে আসবে। বস্তুত এই বিশ্বাস থেকেই মিসরীয়রা মৃতদেহ থেকে নাড়িভুড়ি বের করে সেটা লবণাক্ত সলিউশনে ভেজাতো, তারপর রজন মিশ্রিত সাদা কাপড়ে দেহটি জড়িয়ে রাখা হতো, এভাবে সংরক্ষিত দেহটি কখনো পচে বিকৃত হতে পারত না। এই বিশুষ্ক মৃতদেহটির নাম মমি। তবে মিসরের ধনী লোকেরাই এই মমি সংরক্ষণ করতে পারতো।[১৩০] গরীরদের পক্ষে সম্ভব ছিলো না।

বর্তমানে মিসরের জাদুঘর আরবি আল মাতহাফুল মাসরিতে সংরক্ষিত আছে মমি করে রাখা ফেরাউনের লাশ। মানুষের মৃত দেহ যেখানে সংরক্ষণ করা হয়েছে সেটাই সংগ্রহশালা। কলকাতার ভারতীয় সংগ্রহশালায়ও রয়েছে এ ধরনের মমি করা মৃতদেহ।

‖PÎ 12-13: আরবি আল মাতহাফুল মাসরী জাদুঘর

নীল নদের অববাহিকায় আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট স্থাপিত আলেকজান্দ্রিয়া শহর খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে হেলেনিস্টিক যুগে পৃথিবীর অন্যতম এক বৃহৎ নগরী ও মিসর সাম্রাজ্যের রাজধানী রূপে খ্যাতি লাভ করে। আলেকজান্দ্রিয়ায় ছায়াঘন উদ্যান, রঙ্গমঞ্চ, জাকজমকপূর্ণ রাজপ্রাসাদ, গিমনাসিওন ও বিখ্যাত মুসেইওনের মধ্যে একটি বৃহৎদাকারের পাঠাগারে সাড়ে সাত লাখ পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত ছিলো। এ পাণ্ডুলিপি আসলে ছিলো পোড়ামাটির খোদিত ফলক।[১৩১] এই পাঠাগারের বিভিন্ন কক্ষে এই পাণ্ডুলিপি নিয়ে পণ্ডিত ও বিজ্ঞানীরা গবেষণা করতে পারতেন। জ্যোতিষমণ্ডল নিরীক্ষণের জন্য এখানে একটি মানমন্দির ছিলো। উপরন্ত অংক, ভূগোল চিকিৎসাবিদ্যা, শরীরবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, জ্যোর্তিবিদ্যা, গবেষণার যন্ত্রপাতি এখানে সংরক্ষণ করা হয়েছিলো। এ সব উপাদান ছাত্ররা দেখে বাস্তবভাবে শিক্ষা লাভ করতে পারত। একপর্যায়ে এই প্রতিষ্ঠানটির নাম হয়ে যায় আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরি।[১৩২] এই লাইব্রেরিটি আসলে একটি সংগ্রহশালা।

ব্যাবিলন

সংগ্রহশালার ক্রমবিবর্তনের আরেকটি অধ্যায় সূচিত হয় উরের রাজশক্তি পতনের পর ব্যাবিলনে নতুন এক রাজবংশের সূচনার মধ্যদিয়ে। সেই রাজবংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতি ছিলেন হাম্মুরাবী (১৭৯২-১৭৫০ খ্রি.পূর্ব) তাঁর ডায়োরাইট পাথরে তৈরি একটি মুখ (লুভ্যর মিউজিয়াম) সুসা থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। এটি হাম্মুরাবীর প্রতিকৃতি নামে পরিচিত। মূর্তিটির মাথায় কাপের মতো টুপি ও মুখে দাড়ি। এই হাম্মুরাবীর প্রস্তর ফলক (লুভ্যের মিউজিয়ামে সংরক্ষিত) ব্যাবিলনের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ। এটি উচ্চতায় প্রায় সাড়ে সাত ফুট। মূর্তিটির ওপরের অংশে সূর্য দেবতা কর্তৃক হাম্মরাবীকে দেশের আইন বর্ণনা করার দৃশ্য খোদিত আইন প্রদর্শন □□□ হতো। ব্যাবিলনের রাজ নেবোনিডাসকে (৫৫৫-৪৩৮ খ্রিস্টপূর্ব) সংগ্রহশালার উদ্ভাবক বলা হয়ে থাকে।[১৩৩] কারণ তিনিই সর্ব প্রথম ব্যবিলনের অতীতের ইতিহাস জানার আগ্রহে খননে প্রাপ্ত নিদর্শনসমূহ প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এ জন্যে তাঁকে পৃথিবীর প্রথম প্রত্নতত্ত্ববিদ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

প্রাচীন চীন

খ্রিস্ট পূর্ব ২য় সহস্রাব্দে হোয়াং-হো অববাহিকা অঞ্চলে চীনে দাসমালিকভিত্তিক রাষ্টের উদ্ভব ঘটে। হোয়াং-হো তীরবর্তী অঞ্চলে প্রত্নতত্ত্ববিদগণ খ্রি পূর্ব ২য় সহস্রাব্দে নির্মিত বহু কবরের সন্ধান পাওয়া যায়। কয়েকটি কবরের মধ্যে ক্ষৌম্যবস্ত্রে জড়িত মৃতদেহ এবং খাদ্যসহ রক্ষিত হাঁড়ি পাওয়া গেছে। আন্যান্য কবরের জন্য ভূতলগর্ভে বিশাল ভবন নির্মাণ করা হয়েছিলো, শবাধারের চতুষ্পার্শ্বে স্বর্ণনির্মিত জিনিসপত্রাদি, অস্ত্রশস্ত্র, পাথর ও ব্রোঞ্জের তৈরি বাসনপত্র থাকতো। মৃত ব্যক্তির সঙ্গে কখনো বা দশবিশ জন কখনো বা শতাধিক মানুষকে সমাধিস্থ করা হতো, উদ্দেশ্য মৃত ব্যক্তির আত্মাকে তারা সেবা ও রক্ষা করবে। চীনের এ ধরনের কবর দেওয়া পদ্ধতির সাথে মিসরিয় সভ্যতার সাথে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। হয়

চীনের জনগন খ্রিস্ট পূর্ব প্রায় ২য় সহস্রাব্দে তাদের লিপিমালা উদ্বাবন করে। অক্ষর হিসেবে তারা ব্যবহার করতো চিত্রলিপি-বর্ণমালা। চিত্রলিপির প্রতিটি অক্ষরে সমগ্র একটি শব্দ বোঝানো হতো। যেমন চিত্রলিটিতে গাছের মতো একটি রৈখিক আচরে অক্ষর রূপায়ন করে বোঝাতো গাছ। এভাবে পাশাপাশি দুটি অক্ষর থাকলে বোঝাবে বন। তিনটি থাকলে তার অর্থ দাড়াবে ঝোপ জঙ্গল। চীনা লিপিতে কয়েক হাজার চিত্রলিপি-বর্ণমালা ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[১৩৪]

প্রাচীন চীনে প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী লিখন পদ্ধতি স্বর্গ-প্রদত্ত। চীনে হাড় ও রেশমি কাপড়ের ওপর লেখা হতো। রেশম খুব দামি ছিলো বলে তা শুধুমমাত্র বেশ গুরুত্বপূর্ণ কিছু লেখার জন্য ব্যবহৃত হতো। বাঁশের চটা একসাথে গোছ বেঁধে ব্যবহার করা হতো বই হিসেবে। খ্রিস্টিয় ১ম শতাব্দীতে চীন কাগজ আবিষ্কার করে। ছেঁড়া কাপড়, বাঁশ আর গাছের বাকল দিয়ে তারা কাগজ বানাতো।[১৩৫] কাগজ সস্তা ছিলো এবং বাঁশের চটার চেয়ে অনেক সুবিধাজনক ছিলো। কাগজ আবিষ্কার চীনে জ্ঞানপ্রসারের ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করেছিলো। শুধু তাই নয় কাগজ আবিষ্কারের ফলে বিশ্ববাসী জ্ঞানচর্চায় অনেক এগিয়ে যায়।

বৈদিক সভ্যতা

আর্যদের আদি বাসস্থান সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অনেকের ধারণা, সপ্তসিন্ধুর অববাহিকা অঞ্চলে আর্যদের আদি বাসভূমি। পণ্ডিত লক্ষ্মীধর শাস্ত্রীর মতে আর্যদের প্রথম বসতি ছিলো হিমালয়ের পাদদেশে। ভারতীয়রা আর্য বলতে সাধারণভাবে একটি জাতিকে নির্দিষ্ট করে। অতি প্রাচীনকালে পারস্য সম্রাট দারায়ুস নিজেকে পারসিকের পুত্র, একজন আর্য বলে অভিহিত করেছিলেন। অনেকে অনুমান করে থাকেন যে, আর্যরা উত্তর সীমান্ত হতে ভারতের অর্ন্তদেশে প্রবেশ করেছিলো। আর্যরা দেবদেবী জ্ঞানে প্রাকৃতিক বিভিন্ন শক্তির প্রকাশকে উপাসনা করতো। যে সকল প্রাকৃতিক দৃশ্য বা শক্তি মনে ভীতি, বিস্ময় ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করতো সেটাই আর্যদের উপাসনার বস্তু ছিলো। যেমন পৃথিবী, মরুৎ, রুদ্র, অগ্নি, ইন্দ্র ইত্যাদি। এ ছাড়া বিশ্বকর্মা, প্রজাপতি প্রভৃতি দেবতার পূজার প্রচলন ছিলো। বৈদিক সাহিত্যে দেবদেবীর সংখ্যা অগণিত। দেবতাদের বাসস্থান হিসাবে তাঁদেরকে তিন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। যেমন আকাশের দেবতা (মিত্রবরুণ) বায়ুর দেবতা (ইন্দ্র ও মরুৎ) এবং পৃথিবীর দেবতা (অগ্নি ও সোম) কালক্রমে ইন্দ্র আর্যদের প্রধান দেবতা রূপে বরুণের স্থান দখল করে নেয়। গ্রিকদের মতো আর্যদের প্রাথমিক দেবতারা ছিলেন পুরুষ ও আকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট। সেই সাথে নারী দেবতারও উল্লেখ আছে। যথা পৃথিবী, অদিতি, উর্বা, অরণ্যাণী, সরস্বতী ইত্যাদি। আর্য ধর্মের মূল বৈশিষ্ট্য হলো বহু দেব-দেবীর উপাসনা করলেও তারা পৌত্তলিক ছিলো না। তবে তারা লিঙ্গ পূজা করতো। কিন্তু তাদের কোনো মন্দির ছিলো না।[১৩৬]

সিন্ধু সভ্যতা

হিমালয় থেকে আরব সাগর পর্যন্ত প্রায় এক হাজার বিস্তৃত অঞ্চলে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দে একটি বিরাট সভ্যতার বিকাশ ঘটে যা সিন্ধু সভ্যতা নামে পরিচিত। সিন্ধু ও মহেঞ্জোদারো সভ্যতা থেকে প্রাপ্ত উপাদান বিশ্বের বিভিন্ন সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত আছে। যেমন মৃৎপাত্র, নারীমূর্তি, সিলমোহর

উল্লেখযোগ্য।[১৩৭] চুনাপাথরে তৈরি পুরুষমূর্তির দেহক হরপ্পা থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে এবং তা দিল্লির সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। মহেঞ্জোদারোর আবক্ষ পুরুষ মূতির্টি Central Asian Antiquities Museum-এ আছে।[১৩৮] ১৯২৬-২৭ সালে উত্তর বালুস্থানে এবং ১৯২৭-২৮ সালে দক্ষিণ বালুচিস্তানে খনন করে যে সমস্ত আবিষ্কৃত উপাদান পাওয়া গেছে তাতে প্রমাণিত হয় যে, ইরান ও মেসোপটেমিয়ার প্রাচীন সভ্যতার সাথে সাদৃশ্য ছিলো। এই মিল খুঁজে পাওয়া যায় মাটির পাত্রের টুকরার রঙ করা ছবিতে। কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত সিন্ধু সভ্যতা সম্পর্কে মানুষের ধারণা ছিলো না। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধিকর্তা ক্যানিংহাম পাঞ্জাবে রাভী নদীর তীরে হরপ্পা নামক স্থানে কিছু অজ্ঞাত লিপি, মূর্তি ও কিছু সীলমোহর দেখতে পান। এরপর ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সিন্ধু নদের পশ্চিম তীরে মহেঞ্জোদাড়ো নামক স্থানে ধ্বংসস্তূপ খননকাজ চালানোর পর প্রাচীন সভ্যতার এই নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। সিন্ধুবাসীদের মধ্যে ধর্মীয় বিশ্বাস কেমন ছিলো তা সঠিকভাবে জানা যায় না। এখানে অসংখ্য পোড়ামাটির নারীমূর্তি পাওয়া গেছে। ধারণা করা হয়ে থাকে সিন্ধুবাসীদের মধ্যে মাতৃ পূজার খুব জনপ্রিয় ছিলো। সুতরাং এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে, সিন্ধু সভ্যতা ভারতের আদি সভ্যতা।[১৩৯] ঐতিহাসিকরা ধারণা বালুস্থানে খ্রিস্টপূর্ব ২৯০০-২৮০০ বছর আগে থেকে খ্রিস্টপূর্ব ২২০০ বছর পর্যন্ত জোব নদীর ধারে একটি সংস্কৃতি ছিলো।[১৪০] এছাড়াও এই সময় আমরি, নান্দারা, নাল, শাহী টুম্প সংস্কৃতি ছিলো।[১৪১] এ সব সংস্কৃতি থেকে প্রাপ্ত মাটির খেলনা, মাটির পাত্র, খোলামকুচি দেখে পণ্ডিতদের ধারণা হয়েছে যে ইতিহাসের আগের যুগে পারস্য দেশের দক্ষিণ দিকে তৈরি হতো বাফ বা হলদেটে রঙের মাটির পাত্র। উত্তর দিকে তৈরি হতো লাল রঙের পাত্র। হলুদ রঙের পাত্র বালুস্থান এবং সিন্ধুর নানা স্থানে পাওয়া যেতো। শাহীটুম্প সংস্কৃতি ও দক্ষিণ বালুস্তান থেকে পাওয়া যে সব মাটির পাত্রের ওপর নকশার মটিফ পাওয়া যায় তা অত্যন্ত প্রাচীন হলেও শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এ ধরনের নকশাই যেমন নকশি কাঁথা, ছাপাকাপড়, বোনা শাল, সূঁচের কাজ, চীনা মাটির বাসনে এখন চলে আসছে।[১৪২]

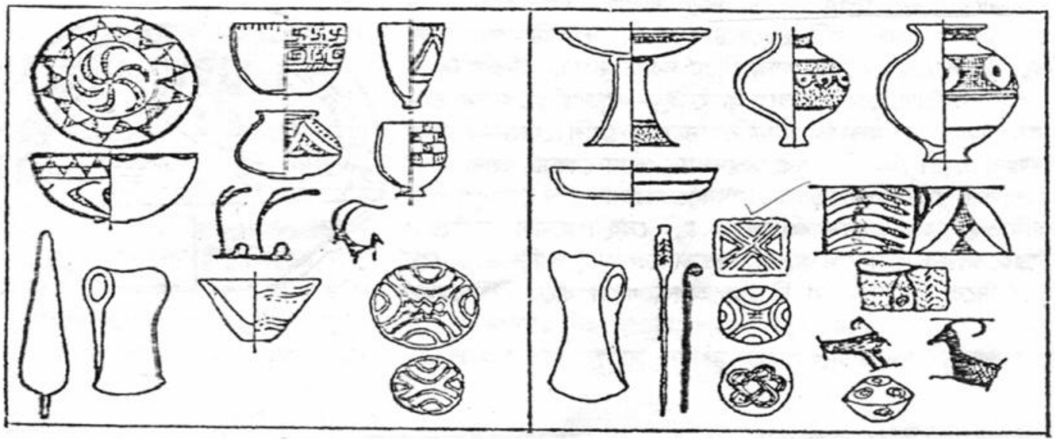

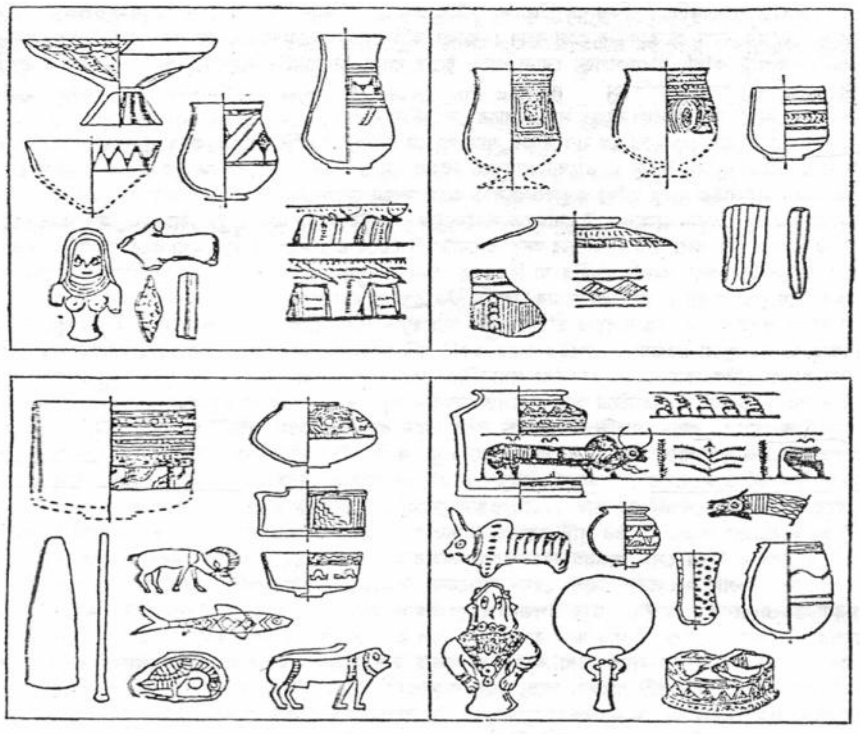

wPÎ-14: wmÜ mf¨Zv †_‡K cvß grcv‡Îi bgbv

প্রাচীন গ্রিস

প্রাচীন গ্রিক সমাজে গ্রিকদেবীদের কলাবিদ্যার এক একটি শাখায় বিশেষজ্ঞ ভাবা হতো। 'ক্যালিওপি' মহাকাব্য ও বাগ্মিতার দেবী এবং 'ইউটারপি' ছিলেন সংগীতের দেবী। 'পলিহিমনিয়া' বাগ্মিতা ও ধর্মীয় কবিতার দেবী, 'ক্লিও' ইতিহাসের দেবী, 'এরাটো' ছিলেন প্রেমকাব্যের দেবী। মেলপমিনি ট্র্যাজেডির, থ্যালাইয়া কমেডির, টারপসিকারি বৃন্দগীতি ও নৃত্যের, এবং ইউরেনিয়া ছিলেন জ্যোর্তিবিজ্ঞানের দেবী। এ ছাড়াও জিউস ছিলেন দেশের অর্থনীতি ও সংস্কৃতির রক্ষাকর্তা।[১৪৩] সৌন্দর্য দেবতা এ্যাপেলো যিনি ছিলেন সকল দেবীদের নেতা। জিউস, অ্যাপোলো ও অন্যান্য প্রধান প্রধান দেব-দেবী গ্রিসের সবচেয়ে উচু অলিম্পীয় পর্বতে বাস করতেন এবং তারা ছিলেন অলিম্পীয়দেবকুল। এ ছাড়াও গ্রিক সমাজে দেবদেবীদের নিয়ে লোক কাহিনী প্রচলিত ছিলো।

স্বভাববাদের জন্ম হয় গ্রীসে। গ্রিকরা মানুষের মূর্তি গড়তে ভালোবাসত। এসব মানুষের মূর্তির মধ্যে গ্রিকরা দিতে চেয়েছে সুঠাম সুন্দর মানুষের স্বাভাবিক রূপ। এসব মূর্তির অনেক নিদর্শন আজো টিকে আছে। জিউসের দেবমন্দিরটি নির্মিত হয়েছিলো খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে। এই মন্দিরের জিউসের মূর্তিটি ভাস্কর ফিদিয়াস প্রথমে কাঠ দিয়ে তৈরি করে পরে হাতির দাঁতের পাতলা আবরণে মোড়াই করে দেয়। জিউসের এই বিখ্যাত মূর্তিটি ছিলো পৃথিবীর সপ্তমাশ্চার্যের একটি বস্তু।

Dhaka University Institutional Repository

wPÎ-15: জিউসের মূর্তি সপ্তম আশ্চার্যের একটি নির্দশন

তেমনি জিউস মন্দিরকে ঘিরে এর চারপাশে আরো অন্যান্য মন্দিরে দেবদেবী, বীর ও ক্রীড়াবিজয়ীদের প্রস্তমূর্তি ছিলো। গ্রিক মন্দিরের ভেতর ও বাইরে প্রস্তরমূর্তি ও রিলিফ দ্বারা সুসজ্জিত করা ছাড়াও শহরের বিভিন্ন স্থানে স্থাপন করা হতো প্রস্তরমূর্তি। মর্মর প্রস্তর কেটে, ব্রোঞ্জ ঢালাই করে, এবং কাঠ খোদাই করে ভাস্কর্য শিল্পীরা মূর্তি গড়ে তুলতে পারত।[১৪৪] গ্রিকে নগরলক্ষ্মী দেবী এ্যাথেনার সম্মানে স্থাপন করা হয়েছিলো স্বর্ণাভ শ্বেত মর্মর পাথর দিয়ে সুবিশাল মন্দির পার্থেনন।[১৪৫]

সুমেরীয়রা বিশ্বাস করতো যে, প্রধানতঃ স্বর্গ ও পৃথিবী নিয়ে নিখিল বিশ্ব গঠিত হয়। বিশ্বজগতের নাম 'আন-কি' যার অর্থ 'স্বর্গ-মর্ত'। পৃথিবীর আকার গোল চাকতির মতো। পৃথিবীর ওপরে আছে মহাশূন্য যা গম্বুজের মতো জিনিস দিয়ে ঢাকা; এটি স্বর্গ। স্বর্গ ও পৃথিবীর মাঝে আছে বায়ু। বায়ুমণ্ডলের মতো একই উপাদানে সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহ নক্ষত্রের সৃষ্টি হয়। গোল চাকতির মতো পৃথিবীর নিচে বিশ্বের পরিসর হলো নরক। জলভাগ পার হয়ে সেখানে যেতে হয়। নিখিল বিশ্বকে ঘিরে আছে আদি অন্তহীন সমুদ্র। যে সব দেব-দেবী মহাবিশ্বকে পরিচালিত করেন তাঁদের আকার মানুষের মতো হলেও তাঁরা অমর।[১৪৬] প্রাচীন সমাজ থেকে ছোট ছোট রাজ্যের সৃষ্টি হয়েছিলো এবং রাজ্যগুলো পৃথক পৃথক রাজা শাসন করতো। এ সব রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রাচীন মন্দিরগুলো নির্মিত হয়। যেখানে গ্রিক সমাজের মানুষের অবাধ বিচরণ ছিলো শিক্ষা, বিনোদন ও দর্শনের উদ্দেশ্যে।

রোম

গ্রিকদের পরে রোমান সভ্যতার অভ্যুদয় ঘটে। বাস্তববাদী মানুষ হিসেবে রোমানরা চমৎকার মন্দির, বিজয় স্তম্ভ ও নতুন প্রাসাদ নির্মাণ করতে পারতো। রোম নগরীর দুটি ইমারতের মধ্যে একটি ছিলো প্যানথিওন মন্দির। অপরটি ৬৫ হাজার দর্শকের স্থানসংবলিত 'কলোসিয়াম' নামক রঙ্গমঞ্চ বা এ্যাম্ফিথিয়েটার। গ্রিক ও রোমান সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় ছোট ছোট রিলিফ ভাস্কর্যের সাহায্যে দেবদেবীর বর্ণনা মন্দিরে করা হয়েছে। প্রথমদিকে খ্রিস্টানদের উপাসনার জন্য যে ধরনের ভবন

নির্মাণ করা হয় তা ব্যাসিলিকা নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। খ্রিষ্টান সনের প্রথম শতাব্দীতে ভাস্কর্য এবং স্থাপত্যের মতো চিত্রকলাও গীর্জার সেবায় নিয়োজিত হয়। এই সব ঐতিহাসিক ইমারত রোমান সমাজে সুরক্ষিত ছিলো যেখানে গণমানুষের বিচরণ ছিলো। এটাই প্রতীয়মান হয় যে, প্রাচীন সভ্যতা থেকে মানুষের নির্মিত ধর্মীয় ও ইহলৌকিক স্থাপত্যিক ভবনে ঈশ্বররূপী দেবদেবীর ভাস্কর্য সংরক্ষিত হয়েছে এবং অসংখ্য মানুষের উপস্থিতিতে সে ভবনটি স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠত। এভাবে যা পূর্বপুরুষ থেকে পরবর্তী পুরুষে তা চলে এসেছে।

ইসলামী সভ্যতা

কাবাগৃহ

প্রাক ইসলামী যুগে আরবে বহু দেবদেবীর পূজা প্রচলিত ছিলো। বহু দেবদেবীর পূজা করাকে বলা হতো পলিথেইজম (Polytheism) অথবা বহু দেবতাবাদ। অনেক দেবদেবীর মধ্যে একজন দেবী ছিলেন সর্বশক্তিমান। ধর্ম বিশ্বাসের এই অবস্থাকে আরব সমাজে বলা হতো হেনোথিইজম (Henotheism) অথবা এক ঈশ্বর ও বহুদেবতাবাদে বিশ্বাসী। মনোথিইজম বলতে (Monotheism) একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী করা। সে যুগে প্রাচীন আরবেরা ছিলো (Henotheist) এক ঈশ্বর এবং বহুদেবতাবাদে বিশ্বাসী। মক্কাবাসীদের ধারণা ছিলো যে, আল্লাহর তিন কন্যা আছেন আল-লাত, আল উজা ও আল -মানত। আল মানত ছিলেন আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় কন্যা এবং তিনি অনেক ক্ষমতার অধিকারী। আরববাসীদের তাঁকে ভাগ্যদেবী বলে মানতেন এবং এই দেবীর নামে সমাজে মানত প্রচলিত ছিলো। মক্কার কাবা মন্দির ছিলো আরববাসীর কাছে সবচেয়ে সম্মানিত স্থান।[১৪৭] লক্ষণীয় হলো, প্রাক ইসলামী যুগের মানুষের মধ্যে এ ধরনের ধর্মীয় ও সামাজিক আচরণে মধ্যে হিন্দু ধর্মের সাথে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। প্রাক ইসলামী যুগ থেকে কাবা মন্দির ছিলো আরববাসীর কাছে সবচেয়ে সম্মানিত স্থান। বিশেষ করে ইসলাম প্রচারের অনেক আগে থেকেই প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ হজের সময় কাবায় এসে হজ পালন করতে আসতেন। এই কাবা মন্দিরের রক্ষিত কালো পাথরটিকে (হাজারুল আসওয়াদ) সবাই ভক্তি করতো। ইসলামের আবির্ভাবের আগে হেজাজ এবং ওকাজ এই দুটি স্থানে প্রতি বছর মেলা, খেলাধুলা, আমোদফুর্তি এবং কবিতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হতো। শ্রেষ্ঠ কবিকে পুরস্কৃত করে তাঁর লেখা কবিতাটি কাবার প্রাচীরে স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখা হতো।[১৪৮] আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য যে, কাবার ছাদের দেয়ালে ও স্তম্ভে নবি, ফেরেশতা, গাছগাছড়া ও হযরত ঈসার সাথে তাঁর মা মরিয়মের অংকিত ছবি সংরক্ষিত ছিলো। ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে মহানবি (স) মক্কা বিজয়ের সময় কাবাগৃহে বিবি মরিয়মের কোলে শিশুপুত্র যীশুর প্রতিকৃতি দেখতে

Dhaka University Institutional Repository

পান। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই প্রতিকৃতিটি তিনি নষ্ট করতে বারণ করেছিলেন। অবশ্য ৬৮৩ খ্রিস্টাব্দে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে এই চিত্রটি নষ্ট হয়ে যায়। ৬৮৫ খ্রিস্টাব্দে কাবা পুণনির্মাণের সময় একে রেশমি আচ্ছাদনে আবৃত করে দেয়া হয়।[১৪৯] ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের পর কাবার দিকে মুখ করে বিশ্বের সকল মুসলমানদের নামাজ আদায় করা ফরজ হয়েছে। সুতরাং নানা বৈশিষ্ট্যের কারণে কাবাগৃহ আরব সমাজের সংরক্ষিত স্থান ছিলো।

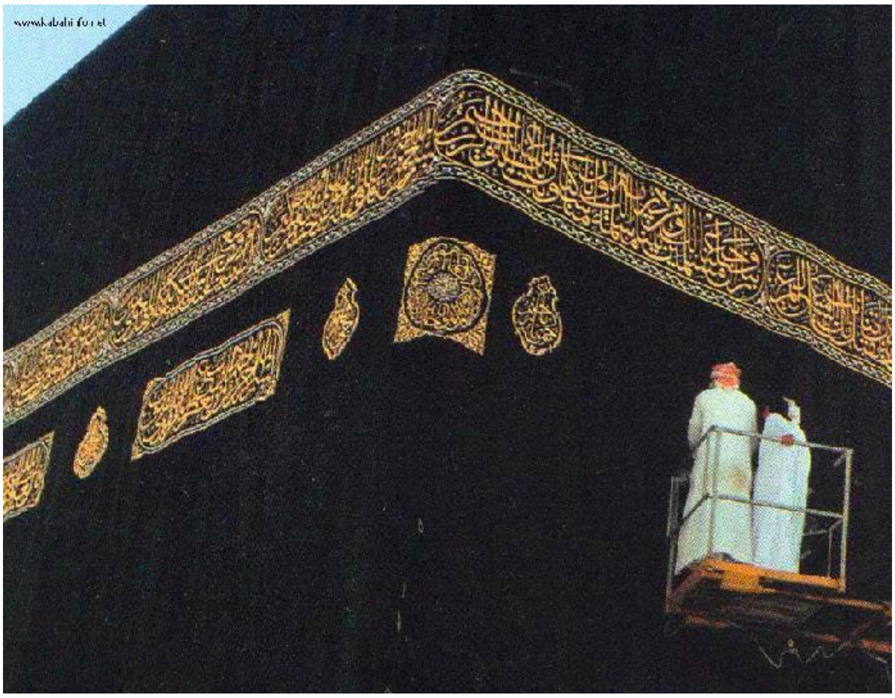

wPÎ-16: কাবা শরিফ

কুব্বাত আস সাখরা

৬৮৪ খ্রি. উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিকের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় জেরুজালেমে কাবার প্রতিভূ হিসাবে নির্মিত হয় ধর্মীয় ইমারত কুব্বাত আস সাখরা (Dome of the Rock) পাষাণ গম্বুজ। অবশ্য এটি হজের উদ্দেশ্যে নির্মিত করা হলেও এখানে মুসলমানরা কখনও হজ পালন করেনি। ইসলামের ইতিহাসে এটি একটি অনন্য ইমারত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, খলিফা আবদ আল মালিকের কুব্বাত আস সাকরা র্নিমাণের উদ্দেশ্য ছিলো হারাম শরিফস্থিত মোরিয়া পাহাড়ের শীর্ষ হতে মহানবি (স) মিরাজে গমন করেছিলেন। এখানকার একটি পাথর যাকে মনে করা হতো পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল (নাভিমূল)। এই পাথরটিকে ঘিরে এই পাষাণ গম্বুজ নির্মাণ করা হয়। খ্রিস্টানরা ভাবতো পাষান -গম্বুজ নবি সুলেমানের -মন্দির। নান্দনিক সৌন্দর্য এবং অবকাঠামোর কারণে কুব্বাত আস সাকরা এবং দামেশক জামি মসজিদ আরব ঐতিহাসিকদের মতে পৃথিবীর অত্যাশ্চর্য বিষয়সমূহের অন্যতম। কুব্বাত আস সাখরার মূল বৈশিষ্ট্য হলো এর অলংকরণ অত্যন্ত জাকজমকপূর্ণ।

ছবি-17: কুব্বাত আস সাকরা জেরুজালেম

কুব্বাত আস-সাখরা প্রাচীন মুসলিম ইতিহাসের ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক বিজয়ের প্রতীক। বলাবাহুল্য যে কুব্বাত আস সাখরার গম্বুজ মুসলিম স্থাপত্যশিল্পের প্রথম বহুল পরিচিত গম্বুজ। কুব্বাত আস সাখরার ভূমি নকশা ইরান তুরস্ক ও ভারতে অনুরূপে অষ্টভূজাকৃতি বহু সমাধিসৌধ নির্মিত হয়েছে। কুব্বাত আস সাখরা মতো পবিত্র ইমারতকে অনুকরণ করে নির্মাতা পূণ্যবান হবেন এবং মৃতো ব্যক্তি পরলোকে সুখী হবেন এই অন্তর্নিহিত ইচ্ছাকে রূপদান করাই হয়তো এ জাতীয় সমাধিসৌধ নির্মাণের উদ্দেশ্য ছিলো। বিশ্বজুড়ে ইসলামী সংস্কৃতি সম্প্রসারিত হওয়ার পর এ ধরনের ইমারত বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রে নির্মিত হয়েছে।

দামেশক মসজিদ

৬২২ সনে মহানবি হজরত মুহাম্মদ (স) নির্মিত মদিনায় মদিনা মসজিদ গড়ে ওঠার ভেতর দিয়ে ইসলামে মসজিদ স্থাপত্যের ইতিহাসের সূচনা হয়। প্রাথমিকভাবে এ মসজিদটি ছিলো ইট ও পাথরের দেয়াল দিয়ে ঘেরা একটা স্থান। মসজিদের এক পাশে ছিলো খেজুর গাছের খুঁটির ওপর কাদামাটি ও খেজুরপাতায় ছাওয়া একটি একচালা ঘর।[১৫০] বিশ্বজুড়ে ইসলাম সম্প্রসারিত হলে মুসলমানদের কাছে মসজিদ হয়ে ওঠে একাধারে শিক্ষাকেন্দ্র, উপাসনালয়ও শিল্পকলাচর্চার অন্যতম স্থান।[১৫১] অতএব মহানবীর মৃত্যুর পর আরব স্থাপত্যের যে ক্রমোন্নতি ঘটেছিলো তা সাধারণভাবে মসজিদকে কেন্দ্র করেই। এই ক্রমোন্নতি দুইভাবে সংঘটিত হয়েছিলো প্রথমতঃ যেখানে আরব বিজেতারা নিজেরা শহর গড়ে তুলেছিলেন সেখানে মদিনা মসজিদের অনুকরণে মসজিদ নির্মাণ করে। দ্বিতীয়তঃ গির্জা ভেঙে অনেকটা গির্জার মতো করে মসজিদ গড়ে তুলে। যেমন প্রথম আকসা মসজিদ, হোমস মসজিদ,

দামেশক মসজিদ ইত্যাদি।[১৫২] এই দুটি নিয়মে আরবগণ একদিকে মহানবির মসজিদের নকশাকে আদর্শরূপে গ্রহণ করে, অন্যদিকে তেমনি খ্রিস্টান গির্জার বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে তারা মসজিদের অঙ্গ হিসাবে সংযোজিত করেছিলো। মসজিদ স্থাপত্যের সাথে সাথে আরব স্থাপত্যে আর একটি ইমারত গড়ে উঠেছিলো তা হলো দার আল-ইমারা।[১৫৩] ইসলাম ধর্ম শুরুতে খুব সাদামাটা সহজ ছিলো। কিন্তু সিরিয়াতে ছিলো প্রাচীন ঐশ্বর্যময় সভ্যতা। ছিলো সুন্দর স্থাপত্যের নিদর্শন। খ্রিস্টানরা গির্জা বানাতো খুব জাকজমকপূর্ন করে। খ্রিস্টানদের গির্জার সাথে পাল্লা দেবার প্রেরণায় ইসলামী স্থাপত্যের উদ্ভব হয়েছিলো বলে ঐতিহাসিকরা ধারণা করে থাকেন।

তেমনি দামেশক মসজিদের অলংকরণের মোজাইক চিত্রে বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর ফুলে-ফলে সুশোভিত গাছ এবং বিখ্যাত শহরের স্থাপত্য নিদর্শন, পানি প্রবহমান নদীর দৃশ্য আঁকা হয়েছিলো দামেশক মসজিদের অলংকরণে। কুব্বাত আস সাখরা এবং দামেশক মসজিদের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ও প্রাণবন্ত নকশা বিশ্বের সকল ধর্মের মানুষের মধ্যে আনন্দের খোরাক জুগিয়েছে।[১৫৪] এভাবেই এক সময় মসজিদের অনুপম সৌন্দর্য ইসলামী শিল্পকলার অনন্য দৃষ্টান্তে মুসলিম বিশ্বে পরিণত হয়। বাংলায় মুসলমানদের আধিপত্য বিস্তার লাভের পর মুসলমানরা মদিনা ও দামেশক মসজিদের অনুকরণে মসজিদ নির্মাণ করে ইসলাম ধর্মকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। যে কারণে ইসলামের ইতিহাসে এই স্থাপত্যিক নিদর্শন দুটির গুরুত্ব অনেক বেশি।

॥Pî-18: **দামেশক মসজিদের অভ্যন্তরভাগ**

বায়তুল হিকমা

উমাইয়া খিলাফতকে বলা হয় আরব যুগ কিন্তু প্রকৃত অর্থে ইসলামী সভ্যতার উন্মেষ ও ক্রমবিকাশ ঘটে আব্বাসীয় খিলাফতে। বিশেষ করে বৈদেশিক প্রভাবে মুসলিম জ্ঞান -বিজ্ঞানের চর্চা ও অনুশীলনের উন্মেষ আব্বাসীয় খিলাফতে শুরু হয়। আব্বাসীয় খলিফাদের পৃষ্ঠপোষকতায় জ্ঞান-

বিজ্ঞান শিক্ষা দীক্ষা, কৃষ্টি, সভ্যতার চরম উৎকর্ষতায় পৌছে। আব্বাসীয় খলিফা আল মামুনের সময় ৮৩০ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদে বায়তুল হিকমা নামে গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে সংস্কৃত, পারস্য, সিরীয় গ্রিক ভাষায় লিখিত পাণ্ডুলিপি ও পুস্তকাদি সংগ্রহ করে তা অনুবাদ করবার ব্যবস্থা নেয়া হয়। এই জগৎ-বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানটিতে তিনটি বিভাগ ছিলো। গ্রন্থাগার, শিক্ষায়তন এবং অনুবাদ ব্যুরো। এখানে পারসিক, হিন্দু, গ্রিক, খ্রিস্টান, আরবিয় প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মনীষী ও পণ্ডিতগণ শিক্ষামূলক গবেষণা, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা অনুশীলন ও অনুবাদ কার্যে নিয়োজিত থাকতেন। পাঠাগার এবং গবেষণামূলক এ প্রতিষ্ঠানটি আব্বাসীয় যুগের একটি সংগ্রহশালার বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছিলো।[১৫৫] ইসলামী সভ্যতা, শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে বায়তুল হিকমার গুরুত্ব যথেষ্ট ছিলো।

রেনেসাঁ

রেনেসাঁ বলতে বোঝায় মধ্যযুগের শেষের দিকে প্রাচীন ক্লাসিক্যাল সাহিত্য, জ্ঞান- বিজ্ঞান এবং শিল্পকলার নবজাগরণ। অতীত ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে ইউরোপের ইতালীতে এ যুগে প্রাচীন ক্লাসিক্যাল সাহিত্য, জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং শিল্পকলার নবজাগরণ ঘটে। শিক্ষাকে জ্ঞানের আলোয় নতুন চেতনায় গ্রহণ করা হয়েছিলো।[১৫৬] ক্লাসিক্যাল শিল্পকলার ক্ষেত্রে জিয়াত্তো, মেসাসিও, ডোনাটেলো, সিমাবিও, জ্যান-ভ্যান আইক, ব্রুনেলেশী, মাইকেল -এঞ্জেলো, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, রাফায়েল, গির্বাটি প্রমুখ বিশ্বের খ্যাতিমান শিল্পীরা অসামান্য অবদান রাখেন। এই কালজয়ী শিল্পীদের অংকিত ছবি, ভাস্কর্য বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত আছে। উপরন্তু, রেঁনেসা যুগে জাগতিক শিক্ষার পরিবেশ পরিপূর্ণভাবে সৃষ্টি হয়। এ কারণে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে অসংখ্য সংগ্রহশালা গড়ে ওঠে সৃজনশীল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে। তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এদেশে কিভাবে পরিকল্পিত হয়েছিলো জানতে হলে , পাশ্চাত্যের শিল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি কিভাবে গড়ে উঠেছে তা জানা দরকার। **১৫৬৬** সালে শিল্পী মাইকেল এঞ্জেলো আর ইতালির ফ্রোরেন্স নগরীর ক্ষমতাধর পুঁজিপতি মেডিসি পরিবারের যৌথ উদ্যোগে চিত্র, ভাস্কর্য, ও স্থাপত্যকলার উন্নতির লক্ষ্যে ফ্লোরেন্সে সর্বপ্রথম' আকাদেমিয়া দেল দিয়েগনো' অর্থ্যাৎ নকশাকলা একাডেমি স্থাপিত হয়। এই তিন শিল্পকে প্রচলিত কারিগরি হস্তশিল্প থেকে পৃথক করে ললিত কলায় উন্নিত করাই ছিলো এর মূল উদ্দেশ্য। কারণ পাশ্চাত্যে রেঁনেসা পর্যন্ত দেখা গেছে যায়- সংগীত, ছন্দোশাস্ত্র, যুক্তিবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, জ্যামিতি প্রভৃতিকে অভিজাতদের চর্চাযোগ্য বিদ্যা এবং চিত্রাঙ্কন, মূর্তিগড়া প্রভৃতির চর্চাকে সাধারণ হস্তশিল্প হিসেবে বিবেচনা করা হতো। চারুকলাকে একাডেমিক চর্চাযোগ্য মর্যাদা দেয়ার পরবর্তী পর্যায়ে **১৬৩৮** সালে ফরাসিদের চতুর্দশ লুইয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় ললিত একাডেমি গড়ে ওঠে। ফরাসি দেশের অনুকরণে ‌উনিশ শতকের মধ্যেই পাশ্চাত্যের নানা দেশে ললিতকলা একাডেমি ও স্কুল অব ফাইন আর্টস গড়ে ওঠে।[১৫৭]

১(ছ) প্রাচীন যুগে বাংলার সংগ্রহশালা

প্রাচীন বাংলা তথা ভারতে সংগ্রহশালা বলতে বিহার, স্তূপ, ও মন্দিরকে বোঝায়। লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, ভারতের বিভিন্ন গুহা চিত্রে বুদ্ধের জীবনী এবং বৌদ্ধ ধর্মের মূলবাণী চিত্রিত করা হয়েছে সাধারণ মানুষ যাতে সহজে ধর্মের মর্মবাণী বুঝতে পারে। অশিক্ষিত মানুষকে ধর্ম শিক্ষা দেয়ার এটি সহজ উপায় বলে ধারণা করা হয়। সুতরাং হিন্দু, বৌদ্ধ, ও খ্রিস্টান ধর্মে চিত্র ও ভাস্কর্যের সাহায্যে ধর্মীয় ভাবধারা বহিঃপ্রকাশের ক্ষেত্রে কোনো ধর্মীয় বিধিনিষেধ না থাকায় ধর্মীয় অনুভূতি থেকে শিল্পকলা জাগ্রত হওয়াটাই স্বাভাবিক ব্যাপার ছিলো। আবার প্রত্নতাত্ত্বিক খননের মাধ্যমে বাংলায় যে সব প্রাচীন ইমারত আবিষ্কৃত হয়েছে এর সিংহভাগই ধর্মীয় ইমারত। মুসলমানপূর্ব যুগের বহু প্রত্ননিদর্শন রয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে ওই সমস্ত প্রত্ননিদর্শনের সাথে পৌরাণিক কাহিনী বা লোকগাঁথার নায়ক-নায়িকার নাম যুক্ত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বেহুলা-লক্ষ্মীন্দরের বাসর, ধনন্তরীর বাড়ি, বিরাট রাজার ঘোড়াশাল, ভীমের পান্ঠি, নেতাই ধোপীনীর পাট, ময়নামতির রাজবাড়ি, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।[১৫৮]

স্তূপ

স্তূপ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ গাদা ঢিবি। ভারত উপমহাদেশে পাওয়া ধর্মীয় ইমারতের মধ্যে স্তূপ সবচেয়ে প্রাচীন। ধারণা করা হয়ে থাকে যে, বৌদ্ধস্তূপ ছিলো এ উপমহাদেশের তথা প্রাচীন বাংলার প্রথম সংরক্ষিত স্থান। প্রথমদিকে জৈনধর্মালম্বীরা স্তূপ নির্মাণ করতো। পরবর্তীতে বৌদ্ধদের মধ্যেও স্তূপ নির্মাণ করতে দেখা যায়। এখানে বৌদ্ধ ধর্মানুসারীরা বৌদ্ধের সান্নিধ্য লাভের আশায় গমন করতো। সাঁচি, অমরাবতী, এবং ভারহুত এর পাথরের বাঁকা প্যানেলগুলোতে বৌদ্ধ স্তূপ সম্পর্কে প্রশস্তি করে ছোট ছোট বর্ণনায় পাওয়া যায় যে বুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ ও বৌদ্ধধর্মের মর্মবাণী ভক্তদের বোঝানোর জন্য খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় অথবা প্রথম শতকে স্তূপ তৈরি হয়েছিলো। ভগবান বুদ্ধের প্রতীক হিসাবে স্তূপের পূজা করা হতো। স্তূপের অভ্যন্তরে সাধারণত বুদ্ধদেব তার শিষ্য বা অন্য কোনো ধর্মগুরুর দেহাবশেষ রাখা হতো। সে যুগের স্তূপের মধ্যে মধ্যপ্রদেশের ভারহুত ও সাঁচির স্তূপ ছিলো সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।[১৫৯]

চিত্র-১৯: সাঁচির স্তূপ

বাংলায় কিছু বৌদ্ধ ও জৈন স্তূপ নির্মিত হয়। বাংলায় আবিষ্কৃত এই স্তূপগুলি সাধারণত ক্ষুদ্রাকৃতি। ঢাকা জেলার অষ্টধাতুনির্মিত একটি স্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে সম্ভবত এটি বাংলার সর্বপ্রাচীন স্তূপের নদর্শন। সম্রাট অশোক বৌদ্ধ ধর্মের একজন প্রচারক ছিলেন। [১৬০]ধর্ম প্রচারের সাথে সাথে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসে প্রস্তর খোদাই কার্যের এক নতুন অধ্যায়ের সূচিত হয়। এ সময় দরবারিশিল্পের পূর্ণ বিকাশ ঘটে। প্রাচীন লেখকদের রচনা থেকে জানা যায় যে, পাটলীপুত্রে সম্রাটের বিশাল রাজপ্রাসাদে ছিলো অপাডানার মতো বহু স্তম্ভ বিশিষ্ট হলঘর। এক পাথরে তৈরি স্বাধীন স্তম্ভের গায়ে সম্রাট অশোকের অনুশাসন লিপিবদ্ধ ছিলো। শীর্ষবেষ্টনীর গায়ে হাতি, বৃষ, অশ্ব ও সিংহের মূর্তিগুলির ফাঁকে ফাঁকে একটি করে ধর্মচক্র খোদিত আবার কোনো কোনো স্তম্ভের শীর্ষবেষ্টনীতে ছিলো ফুলপাতার নকশা ।[১৬১]

বিহার

বৌদ্ধ ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত স্থাপত্যিক নিদর্শনের স্তূপ পর বিহারের স্থান। সংরক্ষিত স্থান হিসেবে বিহারের স্তূপের পরবর্তী পর্যায়। পালি ও প্রাকৃত ভাষায় রচিত সংকলনগুলোতে বিহারের অপর একটি নাম হলো 'সংঘারাম'। সংঘ অর্থ 'একত্রিত হওয়ার স্থান' আর 'রাম' শব্দের অর্থ বিশ্রামাস্থল। রাজা এবং ধনীদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিহার নির্মিত হতো। এ বিহারগুলো শিলোৎখাত শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত ছিলো এবং নির্মিত হতো একটি হলঘরকে কেন্দ্র করে। হলঘরের একটি প্রান্তকে অর্ধ গোলাকার রূপ দিয়ে এর মধ্যে নিবেদন স্তূপ বা বৌদ্ধমূর্তি সংরক্ষণ করা হতো। পরবর্তীতে মহাযানী বৌদ্ধদের দ্বারা বিহারের 'চৈতন্যগৃহ' নৈবেদ্য স্তূপ গৌতম বুদ্ধের মূর্তি অথবা পবিত্র ধাতু সংরক্ষণ করা হয়েছে।

বৌদ্ধ আচার্য ও তাদের জ্ঞান সাধনার কেন্দ্র ছিলো এই বৌদ্ধবিহার। বৈন্যগুপ্তের গুনাইঘর পট্টে তিনটি বিহারের উল্লেখ আছে- রুদ্রদত্তের আশ্রম বিহার, রাজবিহার ও জিনসেন বিহার। অষ্টম শতকে তৈরি

প্রসিদ্ধ বৌদ্ধবিহারের মধ্যে ছিলো সোমপুরী মহাবিহার। এই বিহারের ধ্বংসাবশেষ রাজশাহী বিভাগের নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরে রয়েছে। ধর্মপাল ছিলেন এই বিহার মন্দিরটির পৃষ্ঠপোষক। এগারো শতকের শেষ পর্যন্ত অথবা বার শতকের গোড়া পর্যন্ত বৌদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আধ্যাত্ম সাধনার এটি অন্যতম ছিলো।[১৬২] ১৮৭৯ সালে স্যার কার্নিংহাম এই বিশাল কীর্তি আবিস্কার করেন। ১৯১৩ সালে ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ এটি সংরক্ষিত পুরাকীর্তি হিসেবে ঘোষণা করে। ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ, বরেন্দ্র গবেষণা সংগ্রহশালা এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথভাবে ব্যাপক খনন কাজ শুরু করে ১৯২৩ সালে। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর ১৯৫৭ সালে প্রথম প্রত্নস্থানিক পাহাড়পুর সাইট সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠা করে। এই সংগ্রহশালাটি চার গ্যালারিতে বিভক্ত। এখানে উল্লে-খযোগ্য নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে বৌদ্ধের অবক্ষ অংশ, পোড়ামাটি ফলক, অলংকৃত ইট, তৈজসপত্র ইত্যাদি। এই বিহারের অনেক নিদর্শন কলকাতার আশুতোশ সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত আছে। ১৯৮৫ সালে ইউনেসকো এটি 'বিশ্ব ঐতিহ্য' স্থানের মর্যাদা দেয়।[১৬৩]

১৯৬৭ সালে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর নগর খননকালে এখানকার প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সংগ্রহের জন্য মহাস্থানগড় সংগ্রহশালাটি নির্মাণ করে। প্রতিষ্ঠাকালে এই সংগ্রহশালায় মাত্র ১২টি প্রদর্শনী ছিলো। বর্তমানে এখানে ৪৪টি শোকেস রয়েছে। এর মধ্যে একটি প্রদর্শনীতে পাহাড়পুরের প্রত্নসামগ্রী এবং বাকি দুটি প্রদর্শনীতে কুমিল্লার ময়নামতি থেকে প্রাপ্ত প্রত্নসামগ্রী দিয়ে সাজানো হয়েছে । অন্যান্য প্রর্দশনীতে মহাস্থানগড় থেকে প্রাপ্ত প্রত্নসামগ্রী দিয়ে সাজানো রয়েছে।

চিত্র-২০: পাহাড়পুর, সোমপুর বিহার

wPÎ-21: gnv¯vbMo, e¸ov

চিত্র -২২: খননকৃত স্থান বিনোদন স্পট

কুমিল্লার ময়নামতি সংগ্রহশালাটি বাংলার প্রাচীন সভ্যতার ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। সুতরাং ময়নামতি সংগ্রহশালার গুরুত্ব অনেক বেশি। কুমিল্লা জেলার প্রায় ১১ মাইল উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত ছোট ছোট পাহাড় শ্রেণি লালমাই ময়নামতি প্রত্ন খনন এবং অনুসন্ধান চালিয়ে বিভিন্ন স্থান থেকে প্রায় অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর বৌদ্ধ বিহার, মন্দির ও স্তূপের ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন পাওয়া গেছে। [১৬৪]স্থানীয়ভাবে এগুলো শালবন বিহার, কোটিলা মুড়া, রূপবান মুড়া, ইটাখোলা মুড়া ইত্যাদি নামে পরিচিতি। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার রচনায় সময় এই বিস্তৃত এলাকার বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়। এতে বলা হয়েছে যে, ময়নামতি পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়ায় ঘন

জঙ্গলাচ্ছাদিত অবস্থায় চতুষ্কোণ একটি ইট নির্মিত দুর্গ আছে। তার মধ্যে হিন্দুদেবীর বহু ভাস্কর্য দেখা যায়। এই দূর্গটি কোনো বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ এবং ভাস্কর্যগুলি মন্দির অলঙ্করণের পোড়ামাটির ফলকচিত্র। ১৯৪৩-৪৪ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এ সব প্রাচীন নিদর্শন অত্যন্ত আকষ্মিকভাবে আবিস্কৃত হয়। এ সময় অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে ঐ সমস্ত ইট খুলে নিয়ে নতুনভাবে নির্মাণকার্য ব্যবহার করতে শুরু করে। এই স্তূপের ধ্বংসাবশেষের নিদর্শনসমূহ প্রমাণ করে যে, বাংলার লালমাই ময়নামতি অঞ্চল ছিলো বৌদ্ধ ধর্মের কেন্দ্রবিন্দু। ১৯৫৫-৫৬ সাল থেকে এখানে খননকার্য চালিয়ে বহু প্রত্নসম্পদের সন্ধান লাভ করা সম্ভব হয়েছে। লালমাই-ময়নামতি পাহাড় শ্রেণিতে মোট ৫৪টি বৌদ্ধ বিহার আবিষ্কৃত হয়েছে। সুতরাং এসব নানা উপকরণ সংরক্ষণের লক্ষ্যে নির্মাণ করা হয় (সাইট মিউজিয়াম) ময়নামতি সংগ্রহশালা । এই সংগ্রহশালায় অধিকাংশ প্রত্ন সম্পদই শালবনবিহার, আনন্দ বিহার, ভোজ বিহার, ইটাখোলা মুড়া, ইটাখোলা বিহার, রূপবান কন্যার মুড়া, কোটিলা মুড়া, চারপত্র মুড়া, রানী ময়নামতির প্রাসাদ ও মন্দির থেকে উদ্ধারকৃত প্রত্নবস্ত সংরক্ষণ করা হয়েছে। [১৬৫]

মন্দির

মন্দির হচ্ছে দেহ এবং দেবতা হচ্ছে তার প্রাণ। অর্থাৎ দেব-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মন্দির নির্মিত হয়। বাস্তশাস্ত্রে দেবালয় বোঝাতে মন্দির শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। প্রাচীনকালে বাংলায় জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার এবং এই দুই ধর্মকে আশ্রয় করে আর্যভাষা ও সংস্কৃতির বিস্তার ঘটে। গুপ্ত সম্রাটরা এই দুই ধর্মের, বিশেষ করে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি অনুরক্ত ও শ্রদ্ধাবান ছিলেন। সারনাথ বিহারের ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সাধনার পিছনেও তাদের পৃষ্ঠপোষকতা ছিলো। পাশাপাশি গুপ্ত রাজবংশ ছিলো ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী এবং তাদের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে পৌরাণিক হিন্দু ধর্মের উত্থান ও প্রসার ঘটে। মৎস্য, বায়ু, বিষ্ণু প্রভৃতি পুরাণগুলি এই যুগেই রচিত হয় এবং পৌরাণিক দেবদেবীদের এই সময়ই পূজা ও প্রতিষ্ঠা পায়। ঢাকেশ্বরী মন্দির বাংলাদেশের ঢাকাই ঈশ্বরী মন্দির নামে পরিচিত। অর্থ্যাৎ ঢাকা শহরের রক্ষাকর্তা দেবী ভাবা হতো। ধারণা করা হয় যে, সেন রাজা বল্লাল সেন বার দশকে এটি প্রতিষ্ঠা করেন।[১৬৬]

সুতরাং প্রাচীন বাংলা তথা সমগ্র ভারতে নির্দিষ্টভাবে সংগ্রহশালা বলতে যা বোঝায় সে ধরনের কোনো প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার বিষয়টি শাসকদের মাঝে দেখা না গেলেও তারা ধর্মীয় ইমারত এবং বিদ্যাপীঠ নির্মাণে বিশেষ নজর দিয়েছিলেন। পোড়ামাটি, পাথর ও মিশ্রধাতুর, কাঠের তৈরি ভাস্কর বা তক্ষণশিল্পের শিল্পনিদর্শন মন্দির বা বিহারের অংশ-গর্ভগৃহের দেবদেবী, প্রাচীর-গাত্র কুলুঙ্গি বা দরজার অলংকরণ, ধাতব নিদর্শন, ধর্মীয় ইমারত ও বিদ্যাপীঠে শোভা পেয়েছে। সুতরাং শিক্ষা গ্রহণের সাথে সাথে ধর্মীয় ইমারত গাত্রের অলংকরণ মানুষকে স্বাভাবিকভাবেই আকৃষ্ট করতো।

Dhaka University Institutional Repository

wPÎ-23: ঢাকেশ্বরী মন্দির

১(ছ) মুসলিম শাসনামলে বাংলার সংগ্রহশালা

সুলতানী আমল

সুপ্রাচীনকাল থেকে ভারত উপমহাদেশ অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ ছিলো। দ্রাবিড়, আর্য, মঙ্গোল, পার্সি, তুর্কি, আফগান, পর্তুগিজ এবং সব শেষে ইংরেজরা ছুটে আসে ভারতবর্ষে। ব্যবসা-বাণিজ্য, আক্রমণকারী হিসেবে অথবা ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বিদেশিরা এদেশে এসেছে। মক্কা থেকে মদিনায় মহানবি (স) এর হিজরতের ১০০ বছরের (৬১০-৭১০) মধ্যে পশ্চিম আফ্রিকা হতে পূর্বে পারস্য পর্যন্ত ইসলাম বিস্তৃতি লাভ করে। দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমরের (রা.) রাজত্বকালে পারস্য বিজয়ের পর আরবদের দৃষ্টি পড়ে ভারতবর্ষের দিকে। কিন্তু উমাইয়া যুগে ৭১২ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধু অভিযানের পর মুহাম্মদ বিন কাশিম সিন্ধু ও মুলতান অঞ্চলে মুসলিম প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে আধিপত্য বিস্তার করেন। সুতরাং আরবদের সিন্ধু বিজয়ের মধ্যদিয়েই সমগ্র ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনের ব্যাপ্তি ঘটে। তবে মুহাম্মদ ঘুরি কর্তৃক স্থায়ীভাবে মুসলিম শাসন ১১৭৩ খ্রিস্টাব্দে ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়। সুলতান মুহম্মদ ঘুরির প্রতিনিধি হিসেবে কুতুব উদ্দিন আইবক যখন উত্তর ভারতের অধিকৃত অঞ্চলগুলি সংঘবদ্ধ করে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত ছিলেন, তখন তাঁর সেনাপতি ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজি বিহার ও বাংলা জয় করেন।[১৬৭] এই বিজয়ের মধ্যদিয়ে বিভিন্ন দেশের মুসলমানরা বাংলায় শাসনকর্তা, সৈনিক, সেনাপতি, ধর্মপ্রচারক, শিক্ষক, ব্যবসায়ী ও ভাগ্যান্বেষণকারী রূপে আগমন করে। বাংলার সমাজে ক্রমশ মুসলমানদের বৃদ্ধির সাথে সাথে ধর্মান্তরিত মুসলমানদের পূর্বের অভ্যাস রীতি, নীতি এবং আদর্শের পরিবর্তন ঘটে যায়। [১৬৮]

যা হোক, প্রধানত স্থাপত্যকে নির্ভর করেই গড়ে উঠেছে বাংলায় ইসলামী শিল্পকলা। ইমারতগুলিকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। ধর্মীয় ইমারত এবং লোকায়ত ইমারত। মসজিদ, মিনার, ঈদগাহ, সমাধি সৌধ, মাদ্রাসা ইত্যাদি ধর্মীয় ইমারত। অন্যদিকে তোরণ, রাজপ্রাসাদ, দুর্গ, নগরী ইত্যাদি লোকায়ত ইমারত হিসেবে গণ্য করা হয়। পবিত্র হাদিসে বর্ণিত আছে, 'এই পৃথিবীতে যে একটি মসজিদ নির্মাণ করবে,আল্লাহ তায়ালা তার জন্য বেহেস্তে একটি গৃহ নির্মাণ করবেন।' তবে মসজিদ শুধু নামাজের স্থানই নয়- ইসলামের আর্থ -সামাজিক, ধর্মীয়,ও রাজনৈতিক সমস্যা সমাধান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রধান কার্যালয় হিসেবে মহানবির (স) সময় থেকে গণ্য করা হয়।[১৬৯] পবিত্র কুরআনে একা একা প্রার্থনা করার চেয়ে সমবেতভাবে প্রার্থনা করার ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে (সুরা ২, আয়াত ৪০)। সুতরাং বাংলায় ইসলাম সম্প্রসারিত হওয়ার পর বাংলার মুসলিম শাসকরা বৃহৎ আকারে এবং নকশা ও কারুকার্যময় করে মসজিদ নির্মাণে উৎসাহিত বোধ করেছিলেন।[১৭০] অবিভক্ত বাংলার স্বাধীন বাংলার রাজধানী পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদটি ছিলো সবচেয়ে বৃহৎতম মসজিদ। ইলিয়াস শাহী সুলতান সেকেন্দার শাহ ১৩৬৩ সালে নির্মাণ করেন এ মসজিদটি। মসজিদটির ৫২৪ ফুট লম্বা এবং ৩২২ ফুট প্রসস্থ । সম্ভবত মসজিদ বৌদ্ধ স্তূপের ধ্বংসাবশেষের ওপর নির্মাণ সিরিয়ার দামেশক মসজিদের আদলে আদিনা মসজিদটি নির্মিত হয়।

wPÎ-: 24 আাদিনা মসজিদ

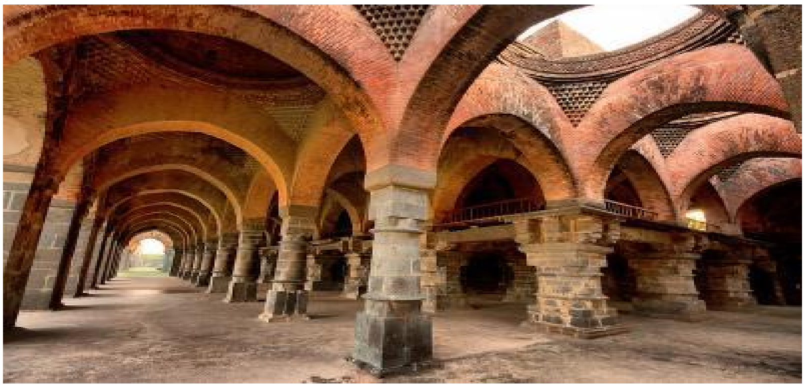

চিত্র-২৫: আদিনা মসজিদের অভ্যন্তরভাগ

সুলতানী যুগে মসজিদ নির্মাণে স্বতন্ত্র স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। মুসলিম শাসকরা মসজিদ নির্মাণে কোথাও কোথাও দেবমন্দির থেকে মূর্তির পাথর সরিয়ে মসজিদ স্থাপত্যে সরাসরি পাথর ব্যবহার করেছে। তবে শ্রী রমেশ চন্দ্র মজুমদার বহিরাগত আধিপত্য প্রতিষ্ঠাকারী মুসলমানদের অনেকে ধর্মান্ধ গোড়া ছিলেন বলে আখ্যায়িত করেছেন। তার মতে, বাংলার মুসলিম শাসক হিন্দুধর্মে বিদ্বেষী ও হিন্দু সংস্কৃতি ধ্বংসকারী ছিলেন। তারা হিন্দু মন্দির ও দেবমূর্তি ধ্বংস করা পুণ্যের কাজ বলে দাবি করতেন। এ কারণে মন্দিরের পাথর নদী, পুকুরে নিক্ষেপ অথবা মূর্তি পূজার প্রতি অসহিষ্ণু মনোভাব প্রকাশ করতে দ্বিধাবোধ করতেন না।[১৭১] অবশ্য এ বিষয়টি নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ লক্ষ করা যায়। তৎকালীন সব মুসলিম শাসকের মন মানসিকতা এক রকম ছিলো এটা হয়ত বলা অযৌক্তিক হবে। বাংলা তথা ভারতে অন্য ধর্মের প্রতি বিরূপ ধারণা প্রদর্শনের জন্যে মুসলমানরা কখনো কখনো স্বৈরাচারী শাসক রূপে নিজেদের অধিষ্ঠিত করতে পারে এটা সত্য বলে দাবি করা যায়। তবে বেশিরভাগ শাসক অন্য ধর্মের প্রতি উদার মানসিকতা দেখিয়েছিলেন। গির্জা ভেঙে মসজিদ তৈরির বিষয়টি মুসলমানদের জন্যে নতুন কোনো ঘটনা ছিলো না। উমাইয়া শাসকদের তৈরি জেরুজালেমের দামেশক মসজিদটি পূর্বে একটি গির্জা ছিলো।[১৭২] যেহেতু বহিরাগত মুসলমানগণ হয়ত এ বিষয়টি সম্পর্কে অবগত ছিলেন। মসজিদ নির্মাণে শাসকদের অনেকে মন্দির ভেঙ্গে সেই জায়গায় হিন্দু মন্দিরের ব্যবহৃত পাথর ব্যবহার করে মসজিদ বানিয়েছিলেন। এ ধরনের কাজের পিছনে কয়েকটি যৌক্তিক কারন থাকতে পারে। প্রথমত মুসলমানরা যখন হিন্দু রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলো এ সময় যুদ্ধে নিশ্চিত পরাজয়ের পরিণাম হিসাবে কিছু হিন্দু মন্দির ধ্বংস করতে পারে। দ্বিতীয়ত, মুসলিম অধিকারের পর হিন্দুরা এলাকা ছেড়ে চলে গেলে পরিত্যাক্ত মন্দির ভেঙ্গে ফেলা হতে পারে। তৃতীয়ত গুপ্তধন পাবার আশায় পুরাতন হিন্দু মন্দির ভাঙতে পারে। এখন বিচার্য বিষয় হলো কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে মুসলমানগন মসজিদে এ ধরনের উপকরণ ব্যবহার করেছেন? এর পক্ষে সবচেয়ে বস্তনিষ্ঠ যে যুক্তি হতে পারে তা হচ্ছে সাংস্কৃতিক চেতনার দিক থেকে মুসলমান শাসকদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ধর্মীয় ছুৎমার্গের উর্ধ্বে ছিলেন। হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি বৈরী দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো না বলে তাঁরা অবলীলায় দেবমূর্তি সংবলিত পাথর এবং হিন্দু রীতির অলংকরণ তাঁদের বিচারে মসজিদের মতো ধর্মীয় স্থানে প্রতিস্থাপন করতে পেরেছিলো।[১৭৩] সুতরাং বাংলায় মুসলমান সুলতানদের ধর্মীয় আচরণে কখনই গোড়ামীভাব লক্ষ করা যায়নি এর যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

বাংলায় পাথর না থাকায় বাংলার স্থাপত্যে নির্মাণ উপকরণ হিসেবে ইটের ব্যবহার বেশি হয়েছে।[১৭৪] সুলতানী বাংলার উল্লেখযোগ্য মসজিদের মধ্যে রয়েছে হোসেন শাহের আমলে (১৪৯৩-১৫১৯) তৈরি গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদ এবং হুসেন শাহের পুত্র নসরত শাহ ১৫২৬ সালে বড় সোনা

মসজিদটি। মসজিদটির ইটের দেয়াল বাইরের দিকে আংশিকভাবে প্রস্তরমণ্ডিত। এই মসজিদ দুটির গম্বুজের ভিতরাংশেও সোনালি পাত দিয়ে মোড়ানো ছিলো। এ মসজিদের চারকোণায় আছে খুঁটির মতো চারটি আটকোনা মিনার। এর কার্নিস নুয়েপড়ার চালার মতো বাঁকানো। কিন্তু এর সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের ঐতিহ্যের সমন্বয় ঘটানো হয়েছে গম্বুজ এবং অলংকরণে। [১৭৫] ছোট সোনা মসজিদে শুধু ইসলামী জ্যামিতিক নকশায় নয় এর সাথে গোলাপ ও পদ্ম জায়গা করে নিয়েছে। বিশেষ করে ছোট সোনা মসজিদে পদ্মের পাপড়ির ওপর খোদিত আছে আল্লাহ কথাটি।

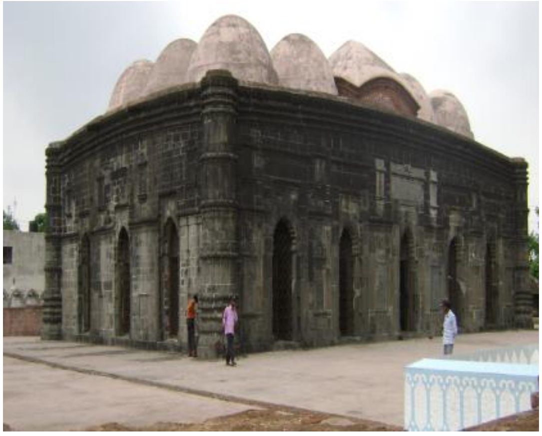

॥Pî-২৬: ছোট সোনা মসজিদ

চিত্র-২৭: অভ্যন্তরভাগ

অপর আরেকটি নিদর্শন নুসরত শাহের আমলে নির্মিত হয় বাঘা মসজিদ। মসজিদটি রাজশাহী শহর থেকে ২৫ মাইল দূরে অবস্থিত।এই মসজিদের পোড়ামাটির নকশা খুবই বিখ্যাত। এই মসজিদটির নকশা থেকে সুলতানী আমলের পোড়া মাটির নকশার বিশেষ ধারণা পাওয়া যায়। আকৃতির দিক থেকেও বাঘা মসজিদ চারচালা ঘর বিশিষ্ট।

॥Pî-28: বাঘা মসজিদ রাজশাহী

খুলনা বিভাগের বাগেরহাট জেলায় খান-ই-জাহানের মাজার থেকে দেড় মাইল পশ্চিম, পশ্চিম উত্তরে ঘোড়া দীঘির পূর্বতীরে সুন্দরঘোনা মৌজায় অবস্থিত ষাটগম্বুজ মসজিদ। সুলতানী আমলে প্রতিষ্ঠিত মসজিদগুলোর মধ্যে এটি বৃহত্তম। অবিভক্ত বাংলায় আদিনা মসজিদ ও বড় সোনা মসজিদের পরেই ছিলো এর স্থান। ষাটগম্বুজ মসজিদটি বাংলার চৌচালা আকারে নির্মিত। মসজিদটির উপরে ৭৭টি এবং চারকোনে ৪টি মোট ৮১টি গম্বুজ রয়েছে।[১৭৬] এ সব স্থাপত্যিক নির্মাণ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বাংলার স্থানীয় রীতি ও লোকজ সংস্কৃতি সন্নিবেশ ঘটেছিলো। ঝিনাইদহের বারবাজারে রয়েছে সুলতানী আমলে প্রায় ১৬টি মসজিদ। বাংলাদেশের কোথাও এতগুলো মসজিদ এক সাথে দেখা যায় না। ধারণা করা হয় এগুলো নির্মিত হয় ১৪১০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। এর মধ্যে গোরার মসজিদ, গলাকাটা মসজিদ, সাতগাছিয়া মসজিদ, জোড়বাংলা মসজিদ, পীরপুকুর মসজিদ, নুনগোলা মসজিদ, পাঠাগার মসজিদ, শুকুর আলী মসজিদ উল্লেখ করার মতো। তবে সাতগাছিয়া মসজিদ স্থাপত্যশিল্প বাগের হাটের খানজাহান আলী মসজিদের সাথে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

wPÎ-29: ev‡Mi nv‡Ui lvU MšR gmwR‘

লক্ষণীয় বিষয় হলো, হিন্দুরা নিজ ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিলেও অনেকেই তাদের পূর্বের হিন্দু ধ্যান-ধারণা পরিত্যাগ করতে পারেননি। বাংলার সুলতানগণ ইসলামের বিধি নিষেধ নব দিক্ষিত মুসলমানদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলো এ ধরনের কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। যে কারণে হিন্দু দর্শন ও মুসলিম ধর্মীয় চিন্তার মিশ্রণে ক্রমে বাংলায় লৌকিক ইসলামের অভ্যুদয় ঘটে। ফলে ধর্মান্তরিত মুসলমানগন স্বাভাবিকভাবেই সাংস্কৃতিক ও মানসিক দিক থেকে হিন্দু- বৌদ্ধ ধারা বজায় ছিলো। বাংলার স্থানীয় হিন্দু ও বৌদ্ধদের মন্দির এবং বিহারকেন্দ্রিক উপাসনালয়ে আগের মতোই ধর্ম পালন করতে পারতো। বলাবাহুল্য যে, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কোনো সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠার আগ পর্যন্ত মন্দির ও মসজিদ সংগ্রহশালার বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছিলো।

কদম রসুল

১৫৩১ খ্রিস্টাব্দে নসরৎ শাহ ইট দিয়ে গৌড়ের কদম রসুল (আরবি ভাষায় 'কদম' মানে পা) নির্মাণ করেন। এর প্রধান কক্ষটি সমচতুস্কোন এবং ভেতরের দিকে ১৯ ফুট বর্গক্ষেত্র। বাংলার মুসলিম স্থাপত্যের একটি অনন্য উদাহরণ। এটি কোনো মসজিদ নয় কিন্ত দেখতে মসজিদের মতো। কদম রসুলের প্রধান কক্ষে একটি কালো মার্বেল পাথরের পুরু চ্যাপটা খণ্ড বিশেষভাবে সংরক্ষিত আছে। এর উপর আঁকা আছে পদচিহ্ন। বলা হয়ে থাকে এই পদচিহ্ন রসুলের এবং যিনি পদচিহ্ন চুম্বন করবে সে পূণ্যবান হবেন। তবে এই ব্যাপারটি ইসলাম সম্মত একেবারেই নয়।[১৭৭] বিশ্বাস করা হয় এই পাথরটি আরব দেশ থেকে পির জালাল তাবরেজী এনেছিলেন পাণ্ডুয়ার দরগায়। সেখান থেকে সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহ এটি নিয়ে আসেন গৌড় দূর্গে। তার পুত্র নসরত শাহ ১৫৩০ সালে একটি কষ্ঠি পাথরের বেদির ওপর পদচিহ্নটি স্থাপন করে কদমরসূল সৌধ নির্মাণ করেন। এ ধরনের আচরণ মূলত বাংলার লৌকিক সংস্কৃতিরই অংশ। কারণ হাদিসের কোথাও নবির পায়ের চিহ্নের কথা কোথাও বলা হয়নি।

wPÎ-30: K'g imj

তাসত্ত্বেও বাংলার মুসলমানরা এখানে রসুলের পদচিহ্ন দেখার উদ্দেশ্যে ছুটে আসে। অতএব এ স্থাপত্যটি মুসলিম লোক সমাজের বিশ্বাসের স্থান দখল করতে সক্ষম হয়েছে। কেবল গৌড় নয় বাংলাদেশের চট্টগ্রাম শহরেও পাথরের ওপর অংকিত একটি পদচিহ্ন বলে দাবি করা হয়। নারায়ণগঞ্জের কাছাকাছি নবিগঞ্জ নামক স্থানেও এরকম পদচিহ্ন আছে। পদচিহ্নকে নবির পায়ের ছাপ মনে করা সম্ভব প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব থেকে বাংলায় আসতে পারে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো

৬৮৪ সালে উমাইয়া খলিফা কাবার প্রতিভূ হিসেবে কুব্বাত আস সাখরা নির্মাণ করেছিলেন হারাম শরিফস্থিত মোরিয়া পাহাড়ের শীর্ষ হতে মহানবি মিরাজে গমন করেছিলেন বলে সেই স্থানটি উপযুক্ত বলে মনে করেছিলেন। কুসংস্কার অন্ধবিশ্বাস আচারণের ভেতর দিয়ে কদমরসূলের মধ্যে লোকসংগ্রহশালার বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায়। প্রত্নতত্ত্ববিদ ড. এ কে এম শাহনেওয়াজ মনে করেন সমগ্র বাংলাদেশে প্রায় ২১টি স্থানে কদম রসুল আছে।[১৭৮]

মাজার

মুসলমান সমাজে দরবেশ সূফি সাধকরা ছিলেন সম্মানিত ব্যক্তি। সূফিদের মৃত্যর পর এদেশে অনেক সমাধি ও মাজার গড়ে উঠেছে। ইসলামে মাজার কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি নিয়ে বিরোধ থাকলেও মাজার সংরক্ষিত হয়েছে পিরের ভক্তদের মাধ্যমে। সুতরাং মধ্যযুগের এই মাজারগুলো অপ্রাতিষ্ঠানিক লোকসংগ্রহশালার বৈশিষ্ট্য এনে দেয়। মাজার অর্থ দর্শনীয় স্থান। যা দেখলে মন ভালো হয়ে যায়। সহি হাদিসে আছে কবর করা নিষেধ। কবরকে উৎসবের স্থান বানানো নিষেধ। কবরে গিলাফ লাগানো নিষেধ। কিন্তু বিশ্ব জুড়ে দেখা গেছে মুসলমানরা এই নিষেধ মানেনি। বাংলাদেশে বর্তমানে মাজারের সংখ্যা কত এ সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া কঠিন। বিশেষ করে ঢাকা শহরের অলিতে গলিতে মাজার দেখা যায়। পির -ফকির ও দরবেশের মৃত্যু উপলক্ষে তাদের দরগাজ ও আস্তানাগুলিতে ভক্ত মুসলমান ও শিষ্যরা ওরশ নিয়মিতভাবে পালনেরর ব্যবস্থা করে। ভারতের পশ্চিম পরগনা জেলার বারাসত মুহকুমার কাজীপুর গ্রামে রয়েছে প্রখ্যাত পির হজরত একদিল শাহের মাজার। বাংলাদেশের নেত্রকোনা জেলার অন্তর্গত মদনপুর নামক স্থানে আছে প্রখ্যাত দরবেশ শাহ মুহম্মদ সুলতান রুমীর মাজার, দরগাহ, পাকা মসজিদ, মুসাফিরখানা এবং দাতব্য চিকিৎসালয়।[১৭৯]

বাংলাদেশে মাখদুম শাহের মাজার রাজশাহী জেলার দরগাপাড়ায় অবস্থিত। সাধারণভাবে এটি মখদুম শাহর দরগা বলে পরিচিত। এই সমাধিসৌধের ভেতরে মূল্যবান গেলাফে ঢাকা পাকা কবর। এই দরবেশের স্মরণে প্রতি বছর ওরশ অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর ভক্তরা ওরশের দিন রোজা রাখেন, গোসল অজু করে দোয়া দারুদ পাঠ করেন। তারপর বাবা শাহ মখদুমের কবেরে গেলাফ তুলে কবরটি পবিত্র পানির সাহায্যে ধোয়া হয়। এরপর কাপড় দিয়ে মুছে ফেলে গোলাপ পানি, আতর, লোবানের সাহায্যে কবর সুগন্ধিযুক্ত করা হয়। তারপর গেলাফ কবরের গায়ে পরিয়ে দেয়া হয়। অসংখ্য ভক্তের সমাগম ঘটে এখানে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, এখানে শিয়া ধর্মের যে অনুষ্ঠান হয় সে ধরনের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। বাগেরহাটের ষাট গম্বুজের পাশে রয়েছে খান জাহান আলীর মাজার।

wPÎ-31: নবির সাহাবাদের কবর (ছবি ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহ)

wPÎ-32: সূফির মাজার

wPÎ 33-34: kvn Rvjv‡ji gvRv‡ii ‘kbv_x‡‘i wPÎ

১(জ) মুঘল আমল

১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে প্রথম পানিপথের যুদ্ধে জহিরুদ্দীন মুহম্মদ বাবরের সামরিক বিজয়ের মধ্যদিয়ে ভারতবর্ষে মুঘল শাসনের ইতিহাস সূত্রপাত ঘটে। মুঘল শাসকরা নিজেদের সুলতান না বলে সম্রাট বলে ঘোষণা করতেন। এ ছাড়াও ভারতে মুঘল সম্রাটরা পারস্য রীতি-পদ্ধতির অনুকরণে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান প্রবর্তন করেন। স্থাপত্য, সংগীত, সাহিত্য, সুন্দর হস্তলিপি, শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে মুঘল যুগে উৎকর্ষ সাধিত হয়। মুঘল স্থাপত্যের স্বর্ণযুগ সম্রাট শাহজাহানের সময় (১৬২৮-১৬৬৮) সূচিত হয়। তাঁর সময় থেকে মসজিদ ও স্মৃতিসৌধে কন্দাকৃতি গম্বুজের ব্যবহার এবং গম্বুজের গোড়ার দিকে পদ্ম পাপড়ি বৈশিষ্ট্যময় নকশা মুঘল স্থাপত্যের একটি বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। এই গম্বুজের গোড়া-চিকন। মধ্যভাগ মোটা ও অগ্রভাগ সঙ্কীর্ণ, কতকটা পেয়াজের মতো। এ সময় লাল বেলে পাথর বাদ দিয়ে সাদা মর্মর পাথর দিয়ে হর্ম তৈরি আরম্ভ হয়। সম্রাট শাহাজাহান নির্মিত আগ্রার তাজমহল সপ্তম আশ্চার্য্যের একটি অন্যতম নিদর্শন।[১৮০] ভারতের আগ্রায় তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী আরজুমান্দ বানু বেগম যিনি মুমতাজ মহল নামে পরিচিত, তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই অপূর্ব সৌধটি নির্মাণ করেন।

॥Pî-35: তাজমহল আগ্রা

মোগল শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন অঞ্চলে মসজিদ দুর্গ, প্রাসাদ, মাজার গড়ে ওঠে। এর মধ্যে পুরান ঢাকায় লালবাগের দুর্গটি অনন্য স্থাপত্যিক নিদর্শন হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। আয়তকার এই দূর্গ প্রাকারের দৈর্ঘ ১০৮২ ফুট ও প্রস্থ ৮০০ ফুট। কেল্লার দরবার হলের দ্বিতলের ছাদের গঠন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কেন্দ্রিয় কক্ষের ছাদ বাংলার দোচালা ঘরের মতো। যা বাংলার নিজস্ব স্থাপত্য ও মোগল স্থাপত্যের সংমিশ্রণে তৈরি।

wPÎ-36: †gvMj ¯vcZ¨K wb‘kb jvjevM ‘M

প্রাচীনতম ইমামবাড়া হোসেনী দালান

মুসলিম শিয়া সম্প্রদায় কারবালার নিষ্ঠুর ঘটনাকে স্মৃতিতে জাগরিত করে রাখতে ইমামবাড়া তৈরি করে থাকে। বাংলাদেশে এ ধরনের ইমারতের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ পুরানো ঢাকার বখশীবাজারের কাছাকাছি অবস্থিত হোসনী দালান। [১৮১]এটি এই উপমহাদেশের প্রাচীনতম ইমামবাড়া। মুঘল আমলে সুবেদার শাহ সুজার প্রধান সেনাপতি মীর মুরাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ইমাম হোসেন (রা) কারবালার শোকাবহ ঘটনার স্মরণে এই অনুপম স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেন। কথিত আছে যে মীর মুরাদ কোনো এক রাতে স্বপ্নে দেখেন যে, হজরত ইমাম হোসেন (রা) কারবালার ঘটনাকে কেন্দ্র করে একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেন।

wPÎ-37: †হাসনী দালান

সেই স্বপ্ন সার্থক রূপ পায় ১০৫২ হিজরি ১৬৪২ খ্রিস্টাব্দে। এখানকার কক্ষগুলোতে কারবালার নিষ্ঠুর ঘটনার স্মৃতিবিজড়িত বিভিন্ন দ্রব্যাদি সংরক্ষিত আছে। সে সময় থেকে শোক অনুষ্ঠান নিয়মিতভাবে পালিত হয়ে আসছে। ১ মুহররম হতে ১০ মহররম পর্যন্ত সারারাত ধরে মজলিস ও নওহা ও মাতম অনুষ্ঠিত হয়।[১৮২] শিয়াদের এ ধরনের আচার আচরণ ইসলামী বিরোধী। তা সত্ত্বেও এ আচরণের মধ্যে লৌকিকতা খুঁজে পাওয়া যায়।

মুঘলরা ভারতবর্ষে মিনিয়েচার চিত্র (ক্ষুদ্রাকৃতি চিত্র) অংকনের সূত্রপাত্র করে বিশেষ অবদান রাখে। সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় চিত্রাঙ্কনের জন্য ভারতে স্টুডিও নির্মিত হয়েছিলো। এ ধরনের স্টুডিওতে পুঁথি-পুস্তক চিত্রায়ন, মিনিয়েচার চিত্র দ্বারা অ্যালবাম প্রস্তুতকরণ, প্রতিকৃতি অংকন, উৎসবের দৃশ্য রূপায়িত হতো। সুতরাং মুঘল স্টুডিওগুলো ছিলো চিত্র অনুশীলনের স্থান ও চিত্রশালা। বিশেষ করে সম্রাট এবং শাসকদের সহায়তায় মুঘল মিনিয়েচার ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ে।

মুঘল শাসকদের প্রায় সকলেই বিদ্যোৎসাহী এবং সংস্কৃতিবান ছিলেন। তাদের রাজদরবারে বিদ্বান, কবি, সঙ্গীতজ্ঞ, গায়ক, রসজ্ঞ ব্যক্তিদের আবাসস্থল ছিলো। তবে আদিম সমাজ থেকে নির্দিষ্ট করে মুঘল যুগ পর্যন্ত সংগ্রহশালা ধরনের ভবনের কথা কোথাও উল্লেখ পাওয়া যায়না। ইউরোপে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে সতেরশ শতকের দিকে। সেখানে পিছিয়ে পড়া বাঙালি সমাজে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান না থাকারই কথা। প্রাচীন সভ্যতার প্রাচীন পর্বে সংগ্রহশালার সাথে তুলনা করা হয়েছে লাইব্রেরি, শিক্ষাকেন্দ্র, উপাসনালয়। এ কারণে বাংলায় মুসলমানদের মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাকে সংগ্রহশালার তুলনা যৌক্তিকভাবেই তুলনা করা যেতে পারে। আরেকটি লক্ষনীয় বিষয় হলো প্রতিটি রাজ্যে টাকশাল, মহাফেজখানায় অর্থ এবং দলিল সংরক্ষিত হয়। তবে টাকশাল এবং দলিল সংরক্ষণাগার সংরক্ষিত হলেও সংগ্রহশালা নয়।

চিত্র-38: কান্দজির মন্দির দিনাজপুর

মুসলিম শাসনামলের শিক্ষা ব্যবস্থা

পূবেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রাচীন গ্রিকরা সংগ্রহশালা বলতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বোঝাতো। সুতরাং সে ধারণার আলোকে বলা যায় যে, মুসলমান শাসকরা শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলায় গড়ে তুলেছিলো মসজিদ, মক্তব, মাদ্রাসা ও খানকা। ইসলামে বিদ্যাশিক্ষা অর্জনের প্রতি বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। শিক্ষাকে মানব জীবনের অলংকার, তার গলার হার ও মাথার পাগড়ি স্বরূপ গণ্য করা হয়ে থাকে। মুসলমান সমাজে শাসনকর্তা রাজকর্মচারী ও অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে কোরআন শিক্ষার প্রতি যথেষ্ট আগ্রহ দেখা যায়। মুসলমান ছেলেমেয়েদের শিক্ষা গ্রহণের প্রাথমিক স্তর ছিলো মক্তব। বাংলায় মক্তবকে পাঠশালা বলা হতো। মাদ্রাসাসমূহে মাধ্যমিক শিক্ষা দান করা হতো। এছাড়াও ইমামবাড়া ও মসজিদ মাধ্যমিক শিক্ষার কেন্দ্রস্বরূপ ছিলো। কোরআন, হাদিস, ধর্মতত্ত্ব, আইনশাস্ত্র ও অন্যান্য ইসলামী বিষয়াদি মাধ্যমিক পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বাংলার লক্ষ্মণাবতী, গৌড়, পাণ্ডুয়া, মহিসুন, সোনারগাঁও, সাতগাঁও, নাগর, মান্দারন, বাঘা, রংপুর ও চট্টগ্রাম ছিলো উচ্চশিক্ষার কয়েকটি স্থান। সরকার ও অবস্থাশালী ব্যক্তিরা মাদ্রাসা ও মসজিদগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উদারভাবে লাখেরাজ জমি দান করতেন। বখতিয়ার খলজি এবং তার সভাসদবর্গ লক্ষ্মণাবতী অঞ্চলে কয়েকটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন। বাংলা প্রসিদ্ধ আলেম-সূফি শেখ আলাউল হক ও তাঁর পুত্র শেখ নূর কুতবুল আলমের খানকা ছিলো বিদ্যাশিক্ষা ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বিখ্যাত কেন্দ্র। হজরত কুতবুল আলম পাণ্ডুয়ায় একটি সুবৃহৎ মাদ্রাসা ও শিক্ষালয় গড়ে তোলেন। এখানে এই উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে জ্ঞানান্বেষণকারীরা শিক্ষাগ্রহণের জন্য আসতেন।[১৮৩] ভারত উপমহাদেশের প্রত্যেকটি অঞ্চল সূফি দরবেশদের আবাসস্থল ও তাদের কার্যাবলীর দৃশ্যস্থান ছিলো। খুলনা-যশোহরে দরবেশ খান জাহান আলীর প্রচেষ্টায় ইসলাম বিস্তারলাভ করে। সিলেটের অধিবাসীরা শেখ জালালের ধর্মীয় কাজে আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। মোগল সম্রাটগণ শিক্ষা বিস্তারের জন্য স্কুল কলেজ নির্মাণ করেছিলেন। হুমায়ূন একটি গ্রন্থাগার নির্মাণ করেছিলেন বলে তথ্য পাওয়া যায়।[১৮৪]

পলাশীর যুদ্ধে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় স্বাধীন মুসলমান শাসনের পতন হয় এবং এই প্রদেশে রাজনৈতিক প্রাধান্য লাভ করে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি। বাংলাদেশ তথা দক্ষিণ এশিয়ায় স্থাপিত হয় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন। গোটা আঠারো শতক ছিলো বাংলার তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে রাজনৈতিক পালাবদল ও অস্থিরতার যুগ। দীর্ঘদিনের পুরাতন রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক কাঠামো ভেঙে পড়ার ফলে ভারতীয় সমাজ জীবনে ব্যাপক অবক্ষয় দেখা দিলে তাতে বুদ্ধিবৃত্তিক শিক্ষাদীক্ষা ও মননশীলতার চর্চার অনেকাংশে ব্যাহত হয়। কারণ অতীতকাল থেকে বাংলা তথা ভারতবর্ষে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় সমাজের প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিবর্গের পৃষ্ঠপোষকতার ওপর নির্ভরশীল ছিলো। হিন্দু-

মুসলিম উভয় সম্প্রদায় আবদ্ধ ছিলো নিজ নিজ সনাতন শিক্ষা ব্যবস্থার বাঁধাধরা গণ্ডিতে। মক্তব মাদ্রাসা ও টোলসমূহে শিক্ষা দেয়া হতো প্রাচীন ও ধর্মশাস্ত্রভিত্তিক। সেখানে শিল্প সাহিত্য ও শাস্ত্রচর্চার ক্ষেত্রে মৌলিক সৃজনশীলতার কোনো অনুকূল পরিবেশ ছিলো না। সুতরাং মুসলমানদের বাংলায় শাসনের অবসানের পর সমগ্র ভারতবর্ষে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা ও সৃজনশীল শিক্ষব্যবস্থা গড়ে ওঠে যা ছিলো ইউরোপীয় ভাবধারার শিক্ষা ব্যবস্থা।

১(ঝ) ভারতের পশ্চিম বাংলায় গড়ে ওঠা লোকসংগ্রহশালা

কোম্পানী শাসিত বাংলায় কিছুটা স্থিতিশীলতা ফিরে আসার পর স্থানীয় শিক্ষিত শ্রেণির একাংশ পাশ্চাত্যের নতুন- জ্ঞান আহরণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। ১৮৩৫ সালের লর্ড বেন্টিঙ্ক মেকলের বিখ্যাত প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী বাংলা তথা ভারতবর্ষে ইংরেজির মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রসারকে ভারত সরকারের শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করা হয়। ফলে বাংলায় বেশকিছু ইংরেজি স্কুল ও কলেজ গড়ে ওঠে। ঢাকা শহরের প্রাণকেন্দ্রে ১৯২১ সালে তদানীন্তন ব্রিটিশ ভারতে ক্যামব্রিজ শিক্ষাব্যবস্থা অনুসরণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়।[১৮৫] বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ও গবেষকদের পাশাপাশি সকল শ্রেণির মানুষের মাঝে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে এ উপমহাদেশে গড়ে ওঠে সংগ্রহশালা। অবিভক্ত ভারতে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সাথে বস্তু সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ও গবেষণামূলক শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ইংরেজরাই প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ১৮৫৭ সালে ২৪ জানুয়ারি কলকাতার কলেজস্ট্রিট প্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠিত হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষা প্রাঙ্গণে ভারতের প্রথম কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সরকারি সংগ্রহশালা গড়ে ওঠে। শ্রীরামপুর কলেজে স্থাপিত হয় কেরি সংগ্রহশালা এবং পাঠাগার। এটি দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের প্রথম কলেজে গড়ে ওঠা সংগ্রহশালা। ১৭৯৪ সালে ইংল্যান্ডে সর্বপ্রথম স্টোনিহাস্ট কলেজ সংগ্রহশালা গড়ে ওঠে। ১৮০১ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ইংল্যান্ডে একটি সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠিত করে যেখানে ভারতবর্ষে কর্মরত ব্যক্তিদের যুদ্ধলব্ধ বিভিন্ন নিদর্শনে ভরে ওঠে। এভাবে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত উপমহাদেশে ১৩টি সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। ভাইসরয় লর্ড কার্জন পুরাকীর্তি সংরক্ষণ এনসিয়েন্ট মনুমেন্টস প্রিজারভেশন অ্যাক্ট ১৯০৪ আইন জারি করেন। এর ফলে প্রাচীন ভবনাদি সংরক্ষণের ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করে। লর্ড কার্জনের তত্ত্বাবধানে কলকাতায় মহারাণী ভেক্টোরিয়ার স্মরণে ১৯০৪ সালে তৈরি হয় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল। এক পর্যায়ে এটি ভারতের বিখ্যাত সংগ্রহশালায় পরিণত হয়।

এশিয়াটিক সোসাইটি

ভারতের এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্যোগেই প্রথম সংগ্রহশালা গড়ে ওঠে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিং এবং উইলিয়াম জোনস্ ১৭৮৪ সালে পশ্চিম বাংলার কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি শিক্ষা ও গবেষণাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। মূলত এই গবেষণা প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য ছিলো ভারতবর্ষের নানা জাতি ও জনগোষ্ঠীর ইতিহাস, সাহিত্য, শিল্প, পাণ্ডুলিপি ও ঐতিহ্য সর্ম্পকিত বস্তুসামগ্রী সংগ্রহ করা। সেই লক্ষ অর্জনে ১৭৮৪ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির একটি কক্ষে এই উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের নানা ধরনের পুরাবস্তু সংগৃহীত হতে থাকে। এক সময় এ উপাদান সংরক্ষণ করার বিষয়টি সোসাইটির কাছে তখন গুরুত্বপূর্ন হয়ে ওঠে।[১৮৬] কলকাতার পার্ক স্ট্রিটে ১৮১৪ সালের ২ ফেব্রুয়ারি 'ওরিয়েন্টাল মিউজিয়াম অব দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি' নামে গড়ে ওঠে দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথম সংগ্রহশালা । এশিয়াটিক সোসাইটির সংগৃহীত পুঁথি, পাণ্ডুলিপি ও চিত্রিত পাণ্ডুলিপি লাইব্রেরির জন্য এবং ঐতিহাসিক নিদর্শনাদি ও প্রাকৃতিক বিষয়বস্তু সংগ্রহশালার জন্য নির্বাচন করা হয়।[১৮৭] ডেনিশ উদ্ভিদ বিজ্ঞানী নাথানিয়েল ওয়ালিচ এখানকার প্রথম অবৈতনিক সুপারিন্টেনডেন্ট পদে নিযুক্ত হন।[১৮৮] পাথর পিতলের লেখামালা, হিন্দু, মুসলিম, ভাস্কর্যের প্রাচীন স্মৃতিনিদর্শন, প্রাচীন মুদ্রা, পুরনো পাণ্ডুলিপি, প্রাচ্যের বিচিত্র যুদ্ধাস্ত্র, বাদ্যযন্ত্র, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত পাত্রাদি, দেশীয় শিল্পে ও দ্রব্যে ব্যবহৃত যন্ত্রাদি, বিচিত্র প্রাণীদের কঙ্কাল বা হাড়গোড়, পাখি, শুকানো গাছ-গাছড়া প্রাচ্য ধারায় চিকিৎসার খনিজ বা উদ্ভিদ দ্রব্যাদি, আকরিক ধাতু, স্থানীয় খাদমিশ্রিত ধাতু, সব ধরনের খনিজ ফল ইত্যাদি উপাদান সংগৃহীত হবে তার একটি সুনির্দিষ্ট তালিকা প্রস্তত করা হয়।

িচÎ-39: এশিয়াটিক সোসাইটি ভবন

ভারতীয় সংগ্রহশালা

ভারতীয় সংগ্রহশালাটি এশিয়াটিক সোসাইটির ওরিয়েন্টাল মিউজিয়াম অব দ্য এশিয়াটির রূপান্তর ছিলো মাত্র। ১৮১৪ সালে 'ওরিয়েন্টাল মিউজিয়াম অব দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি'কে নতুন করে উদ্বোধন করে এর নামকরণ করা হয় ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম (ভারতীয় সংগ্রহশালা)। [১৮৯]এ প্রতিষ্ঠানটিকে আলাদা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি দিয়ে ইন্ডিয়ান অ্যাক্ট পাস করানো হয়। এরপর 'বোর্ড অব ট্রাস্টির হাতে ভারতীয় সংগ্রহশালার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে অর্পণ করা হয়। এর আগে এশিয়াটিক সোসাইটি ভারতীয় সংগ্রহশালার সম্পূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছে।[১৯০]

১৮৬৭ সালে নতুনভাবে ভারতীয় সংগ্রহশালার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। [১৯১] ১৮৯২ সালে ভারতীয় সংগ্রহশালায় খোলা হয় আর্ট গ্যালারি। ১৮৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় নৃতত্ত্ববিষয়ক গ্যালারি। ১৮৮৭ সালে প্রাচীন মিসরীয় মমি সংরক্ষণ করে নৃতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, স্থাপত্য, চিত্রাঙ্কন, উদ্ভিদবিষয়ক বিভাগে বিভক্ত করে নিদর্শনসমূহ দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়।[১৯২] পুরাতত্ত্ব বিভাগটি পুরোপলীয় এবং নবোপলীয় যুগের হাতিয়ার, মহেঞ্জোদারো-হরপ্পার সিলমোহর, পোড়ামাটির ভাস্কর্য, নকশাকৃত মাটির পাত্র, মৌর্য যুগের অশোক স্তম্ভের সিংহ মাথা, গান্ধার শিল্পনিদর্শন, কুষান যুগের বুদ্ধমূর্তি, সাতকাহন রাজাদের আমলের অমরাবতীর স্থাপত্যাদি, গৌড়, বঙ্গ, পাল ও সেন আমলের ভাস্কর্য, শিলালিপি, তাম্রশাসন, চিত্রসংবলিত পুঁথি ও পুরনো পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত করা হয়।[১৯৩] তবে বিভিন্ন কারণে প্রায় চার বছর আগে প্রাগ ঐতিহাসিক গ্যালারি, বাদ্যযন্ত্র গ্যালারি, এবং আর্ট গ্যালারিটি সংগ্রহশালার কর্তৃপক্ষ বন্ধ করে দিয়েছে। [১৯৪]

চিত্র-40: ভারতীয় সংগ্রহশালা

e½xq mwnZ¨ cwil‘

পশ্চিম বাংলার অনেক পণ্ডিত বিদেশে থেকে উচ্চশিক্ষা লাভ করার পর দেশে ফিরে এদেশে জ্ঞানচর্চায় নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন। তাদের প্রচেষ্টায় ১৮৭৫ সালে গঠিত হয় ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন। এই অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ১৮৯৩ সালের ২৩ জুলাই বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচার ও একটি সাহিত্য সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য পরবর্তীতে এ নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। এই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের যাত্রা শুরু হয়েছিলো কলকাতার শোভাবাজারে বিনয়কৃষ্ণ দেব এর বাসভবনে।[১৯৫] বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নত চর্চা করায় ছিলো এ পরিষদের মূল উদ্দেশ্য। তা সত্ত্বেও শুরুতে পরিষদের প্রায় সব কাজ ইংরেজিতে করা হতো। এমনকি বঙ্গীয় সাহিত্য সংঘ থেকে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা দ্য বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচার-এর অধিকাংশ লেখায় ইংরেজিতে বের হতো। এই অসঙ্গতি দূর করতে উমেশচন্দ্র বটব্যালের প্রস্তাবানুযায়ী ১৮৯৪ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি দি বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচার ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ নামে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৮৯৪ সালের ২৯ এপ্রিল এক বৈঠকে এই পরিষদটি 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' নামে গৃহীত হয়। ১৮৯৪ সালে এই পরিষদের সভাপতি ছিলেন রমেশচন্দ্র দত্ত, সহ-সভাপতি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নবীনচন্দ্র সেন এবং সম্পাদক ছিলেন এল লিওটার্ড দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। পরিষদের নিজস্ব একটি কার্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ১৮৯৯ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে একটি বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।[১৯৬] ১৯০৬ সালে পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশন কলকাতার বাইরে পরিষদের শাখা স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে বাংলার বিভিন্ন জেলা শহর ও বাংলার বাইরেও ৩০টি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৯৭] ১৯০৭ সালে বঙ্গ সাহিত্য পরিষদের একটি কক্ষে একটি সংগ্রহশালার উদ্বোধন করা হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের দেশিয় সমাজ ও সংস্কৃতির চর্চা করাই ছিলো মূল এর লক্ষ। এখানে বাংলা ভাষা চর্চার সাথে লৌকিক নানা উপাদান, লৌকিক রীতিনীতি নিয়ে বহু প্রকাশনাও এই পরিষদে প্রকাশিত হয়েছে। তবে এই সংগ্রহশালাটি বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেনি। গবেষণা ছাড়াও বঙ্গ সাহিত্য পরিষদ আরো কিছু বিষয়ে আগ্রহ দেখিয়েছিলো। প্রাচীন মুদ্রা, প্রস্তরমূর্তি, ধাতবমূর্তি, তাম্রশাসন, প্রাচীন চিত্র, সাহিত্যিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, হস্তলিপি, পত্র ও দানপত্রাদি, প্রাচীন অশ্রশস্ত্র পাণ্ডুলিপি (বিখ্যাত লেখকের রচনা) ও প্রাচীন দলিল প্রভৃতি বিভাগসমূহে একটি চিত্রশালাও গঠন করা হয়। অনেক প্রচেষ্টার ফলে এ পরিষদে একটি লাইব্রেরি গড়ে উঠেছে যেখানে অসংখ্য দুর্লভ বইয়ের সংগৃহীত হয়েছে। [১৯৮]

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল সংগ্রহশালা

পশ্চিম বাংলার কলকাতায় অবস্থিত ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল সংগ্রহশালাটি ইংরেজ শাসনের কথা স্মরণ দর্শকদের করিয়ে দেয়। ইংরেজদের তৈরি অনিন্দ্য সুন্দর স্থাপত্য দেশ বিদেশের পর্যটকদের ভীষণ আকৃষ্ট করে। ১৯০১ সালে ইংল্যান্ডের রাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর পর তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড কার্জন রাণীর স্মৃতির রক্ষার্থে একটি স্মারক প্রাসাদ ও উদ্যান প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯০৬ সালে এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় এবং ১৯২১ সালে প্রাসাদ এবং উদ্যানটির উদ্বোধন করা হয়।[১৯৯]

এই স্থাপনাটি ব্রিটিশ এবং মুঘল স্থাপত্যরীতির সংমিশ্রণে নির্মিত। ফলে এর গঠনশৈলিতে তাজমহলের সুস্পষ্ট ছাপ রয়েছে। প্রাসাদ নির্মাণে ব্যবহার করা হয়েছে রাজস্থানের মাকরানা মার্বেল পাথর। মূল ভবনটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে ৩৩৮ ফুট এবং উচ্চতায় ১৮৪ ফুট। ৬৪ এক নিয়ে গড়ে উঠেছে বাগান। এখানে ভিক্টোরিয়া এবং প্রিন্স এ্যালাবার্টের স্মৃতিবিজড়িত প্রচুর ঐতিহাসিক সামগ্রী রয়েছে।[২০০] রয়্যাল গ্যালারিতে রয়েছে ভিক্টোরিয়া ও প্রিন্স আলবার্টের জীবনের বিভিন্ন ঘটনার উপর আঁকা ছবি। ভারতের ব্রিটিশ শাসন এবং ভারতে অবস্থানকারী ব্রিটিশ কর্মচারী, ব্যবসায়ী, চিকিৎসক, শিক্ষকসহ বিভিন্ন পেশার ইংরেজদের সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ভারতের জাতীয় নেতাদের ছবি এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে জড়িত স্মারক প্রদর্শনীর জন্য আলাদা একটি গ্যালারি রয়েছে। এ ছাড়া রাণীর তরুণী বয়সের একটি ভাস্কর্য লর্ড কর্নওয়ালিস, ক্লাইভ, ওয়েলেসলি এবং ডালহৌসির মূর্তি রয়েছে। গরুর গাড়ি, পাল তোলা নৌকাসহ ভারতীয় উপমহাদেশের চিরন্তন প্রাকৃতিক দৃশ্য ফুটে উঠেছে। এখানে রয়েছে নকশি কাঁথা মসলিন কাপড়, ভারতীয়দের ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, নবাব সিরাজ উদ দৌলার সাথে ইংরেজদের পলাশীর প্রান্তরে যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র। বলা যেতে পারে, এ সংগ্রহশালাটি শুধু পশ্চিম বাংলার জন্যে নয়, বর্তমান বাংলাদেশের ইতিহাসের সাথে এর সম্পর্ক রয়েছে।

॥Pî-41: ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল সংগ্রহশালা

আশুতোষ সংগ্রহশালা

১৯৩৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ স্ট্রিট আশুতোষ শিক্ষা প্রাঙ্গণের আশুতোষ ভবনে গড়ে ওঠা আশুতোষ সংগ্রহশালাটিকে বাংলার লোকসংগ্রহশালা অগ্রদূত বলা যেতে পারে। এটি প্রতিষ্ঠা করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তাঁর নামানুসারে সংগ্রহশালাটির নামকরণ করা হয় 'আশুতোষ সংগ্রহশালা' (আশুতোষ মিউজিয়াম)। এখানকার প্রথম কিউরেটর ছিলেন দেবপ্রসাদ ঘোষ।[২০১] এটি ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লোকসংগ্রহশালা হিসেবে সর্বজনস্বীকৃত।

চিত্র-42: আশুতোষ সংগ্রহশালা গ্যালারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

বর্তমানে আশুতোষ সংগ্রহশালায় এ উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থান সংগৃহীত ৩০,০০০-এর অধিক প্রত্নতাত্ত্বিক হাতিয়ার, টেরাকোটা, ভাস্কর্য, চিত্রকলা, ব্রোঞ্জ শিল্পকর্ম, মুদ্রা, কাঠখোদাই কাজ, বস্ত্রশিল্প ও লোকশিল্পসমূহের নিদর্শনাদি সংরক্ষিত রয়েছে। বিশেষ করে এর মধ্যে লোক ও গ্রামীণ শিল্প, বালুচুড়ি শাড়ি,পটচিত্র, বাংলার পোড়ামাটি শিল্প, ভাস্কর্য ও ব্রোঞ্জশিল্প। উল্লেখযোগ্য উপাদানের মধ্যে আরো রয়েছে পোড়ামাটি, কাঠ, বাঁশ শোলার তৈরি খেলনা ও পুতুল, জড়ানো পট, চৌকো পট, সরাচিত্র, পাটাচিত্র।[২০২] পূর্বভারতীয় রীতির শিল্পকর্মের অসাধারণ সংগ্রহের জন্য আশুতোষ সংগ্রহশালা বিশেষভাবে গর্ব করতে পারে।

গুরুসদয় সংগ্রহশালা

১৯৬১ সালে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার ঠাকুর পুকুরের কাছে জোকোর ব্রতচারী গ্রামে গুরুসদয় সংগ্রহশালাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। গুরুসদয় দত্ত (১৮৮২-১৯৪১) অবিভক্ত বাংলায় জেলা প্রশাসক হিসেবে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তাঁর লোকশিল্পের প্রতি অসীম অনুরাগ ছিলো। সরকারি চাকুরির

কারণে বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রাম থেকে নানা ধরনের লোকজ উপাদান সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। বর্তমানে গুরুসদয় সংগ্রহশালায় লোকশিল্পের উল্লেখযোগ্য উপাদানের মধ্যে রয়েছে নকশি কাঁথা, চিত্রকলা, পোড়ামাটির নানারকম ফলক নিদর্শন, মৃৎশিল্প, তক্ষণশিল্প, বাঁশজাতশিল্প, লোকবাদ্য, দারুশিল্প ও ঢোকরাশিল্প ইত্যাদি। লোকচিত্রের মধ্যে আছে সরাচিত্র, পাটাচিত্র, দশবতার তাস চিত্রিত পাত্র, চিত্রিত পুতুল, কাঠের পুতুল, পুরুলিয়ার ছৌ নাচের মুখোশ, ফরিদপুর ও রাজশাহী জেলার পোড়ামাটি ও কাঠের মুখোশ, আমসত্ত্ব ও মিষ্টির ছাঁচ উল্লেখযোগ্য। গুরুসদয় সংগ্রহশালায় সবচেয়ে বেশি নকশি কাঁথা সংরক্ষিত আছে। এর মধ্যে বাংলাদেশের যশোর জেলার নকশি কাঁথা বেশি সংগ্রহে আছে। টেরাকোটা রয়েছে প্রায় ২১০টি। এ ছাড়াও এখানে রয়েছে পাল, সেন যুগের স্থাপত্য, কাঠের ওপর খোদাই করা মূর্তি। [২০৩]

চিত্র-৪৩: গুরুসদয় সংগ্রহশালার প্রদর্শনী গ্যালারির অভ্যন্তরভাগ

উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয়েছে লোকসংগ্রহশালা বলতে এমন একটি নির্দিষ্ট স্থান, প্রতিষ্ঠান, বাড়ি ইত্যাদি বোঝানো যেতে পারে যেখানে সুদুর অতীত কাল থেকে লোকসমাজের সাধারণ মানুষের নানাব্যবহার্য, অব্যবহার্য সামগ্রী, লোকশিল্প ,কারুশিল্প ধর্মচর্চাকেন্দ্র, জ্ঞানচর্চাকেন্দ্র, গবেষণা, আনন্দ, বিনোদন ইত্যাদি পার্থিব ও আর্থিব বিষয়ক বিষয়াদি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনে সহায়তা পাওয়া যায় বস্তু প্রদর্শনের মাধ্যমে। সংস্কৃতি প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। প্রাচীন যুগের সাথে মধ্যযুগের আবার মধ্যযুগের সাথে আধুনিক যুগের সংস্কৃতির পার্থক্য রয়েছে। সুতরাং সংগ্রহশালা প্রতিটি পৃথক জাতির সংস্কৃতি, সমাজ, জনগোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের মধ্যে আলাদা স্বকীয়তা স্বাধীনতা ও পার্থক্য নির্ণয় করে একটি বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন করে যেখানে মানুষ তার সংস্কৃতিবোধ অনুভব করতে পারে। শুধু তাই নয় নিজেদের সংস্কৃতির সীমানা পেরিয়ে বহিঃদেশের ভিন্ন সংস্কৃতি সম্পর্কে অবগত হতে পারে। সংগ্রহশালায় যে সব উপাদান সংরক্ষিত হয়, সে উপাদান একটি প্রেক্ষাপট তৈরি করে নিজস্ব পরিচয় বহন করে। সময়ের সাক্ষী দেয়, এবং সময়ের ব্যবধান সকলের সামনে তুলে ধরে। লোকসংগ্রহশালার

ধারণা সুদূর ইউরোপে থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে প্রথমে অবিভক্ত ভারতের পশ্চিম বাংলার এশিয়াটিক সোসাইটিকে ঘিরে এর প্রায় এক শতাব্দীর পর দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষুদ্রতম রাষ্ট্র বাংলাদেশে সংগ্রহশালা গড়ে ওঠে। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশে সংগ্রহশালা আত্মমর্যাদাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশের নানা জায়গায় লোকসংগ্রহশালা ছাড়াও নানা ধরনের সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য সূত্র

১. নীহার রঞ্জন রায়, evOvjxi BwZnvm, Awv'ce (কলিকাতা: দেজ পাবলিশিং, ১৪০০) পৃ. ৩৩

২. মাযহারুল ইসলাম, †dvK‡jvi cwiwPwZ Ges †jvK mwwn‡Z¨i cVb-cvVb, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

৩. আবদুল ওয়াহাব (সম্পা), বাংলা একাডেমি পত্রিকা, ৫০ বর্ষ, ৩য়-৪র্থ সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২

৪. জে. ম্যানচিপ হোয়াইট (মাহমুদা ইসলাম অনূদিত) bZ‡Ëi mnR cvV, (ঢাকা: জে.কে. প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮১ পৃ.৮৯

৫. মাযহারুল ইসলাম, পৃ. ৪৬৩

৬. International Dictionary of Regional European Ethnology and folklore, vo.1. Copehagen,1960.p.126

৭. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত) evsjwcwWqv (ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩)পৃ.১৪

৮. J.W.Y Higgs, ***Folk Life Collection and Classification,*** (London: Museum Association, 1963) p.14.

৯. Wittlin, S Alma ***The Museum*** **(**London: Routledge & Kegan paul limited First publised 1949) p. 1

১০. ঐ p.2

১১. বিজন কুমার মন্ডল, msMnkvjv I †jvKwkí (কলকাতা: ব-দ্বীপ প্রকাশনা, ১৯১৯) পৃ. ১১

১২. Wittlin, S Alma. p.1

১৩. Shobita Punja ***Museums Of India*** (Hong Kong: The Guidebook Company Limited1990) p. 3

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

১৫. H Sarkar. ***Museums & Protection of monuments & Antiquates in India*** (Delhi Sundeep Prakashan 1981.) p. 13

১৬. যোগেশরঞ্জন পাঠক, †jvKwkÿv I †jvKms¯'wZ (কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৯৭) পৃ. ১

১৭. Firoz Mahmund, Habibur & Rahman, ***The Museums in Bangladesh*** (Dhaka: Bangla Academy, 1987) p. 468

১৮. H Sarkar., p. 16

১৯. Mahmund, & Rahman,, p. 479

২০. সৈয়দ আমীরুল ইসলাম evsjv‡`‡k wgDwRqvg, (ঢাকা: জ্যোতিপ্রকাশ ২০০৬), পৃ. ৮৫

২১. রবিউল হুসাইন, evsjv‡`‡ki ¯'vcZ¨ ms¯'wZ (ঢাকা: সন্দেশ আজিজ সুপার মার্কেট) ১৯৯৬, পৃ. ৪

২২. অলোক মুখোপাধ্যায় wekwk‡íi i|c‡iLv (কলকাতা :এ মুখার্জী এ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ ১৩৯৫) পৃ. ৩

২৩. সিরাজুল ইসলাম, (সম্পাদিত), evsjv‡`‡ki BwZnvm (mvgwRK I mvs®'wZK BwZnvm) 1704-1971 তৃতীয় খণ্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩ পৃ. ৭৪

২৪. রবিউল হুসাইন, ১৯৯৬ পৃ. ২৫

২৫. সুধীর রঞ্জন দাস, DrLbb weÁvb (কলকাতা : নব ভারত পাবলিশার্স, ১৯৭৫)পৃ.৫

২৬. ঐ পৃ. ৬

২৭. মোঃ মোশারফ হোসেন, পৃ. ১

২৮. ঐ পৃ. ১৩৩

২৯. vinod p., Dwivedi, Smita J Baxi, ***Modern Museum***, (Delhi: Abhinav Publications) p. 7

৩০. বিনয় ঘোষ, evsjvi ms¯'wZ mgvRZË প্রাগুক্ত পৃ. ৮

৩১. মাযহারুল ইসলাম, †dvK‡jvi cwiwPwZ Ges †jvK mwwn‡Z¨i cVb-cvVb , পৃ. ১

৩২. evsjv‡`‡ki mgKvjxb HwZn¨evnx †jvKwkí c`kbx I †gjv ২১ মে-২১ জুলাই ২০০ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, পৃ. ৪

৩৩. ওয়াকিল আহমদ, †jvKKjv ZË I gZev` (ঢাকা :বাংলা একাডেমি, ১৯৯৯) পৃ. ১

৩৪. মুহম্মদ আবদুল জলিল, †jvK ms¯'wZi bvbv cm½ (বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৫) পৃ. ২২

৩৫. Shyam Chand. Mukherjee, ***Folklore Museum,(Calcutta*** Indian Publication. 1969, p. xxiii

৩৬. J.W.Y Higgs, ***Folk Life Collection and Classification,*** p. 8

৩৭. Higgs, p. 7

৩৮. ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য wkí fvebv (কলকাতা: ইন্ডিয়ান পাবলিকেশন্স) পৃ. ১১১

৩৯. প্রভাতাংশু মাইতি প্রাগুক্ত পৃ. ২১০

৪০. Shyam Chand Mukherjee. ***Folklore Museum,*** p 4

Dhaka University Institutional Repository

৪১. Ibid, pxxi
৪২. Mahmund, & Habibur, Rahman ***The Museums in Bangladesh.*** p. 55
৪৩. ঐ পৃ. ৩২
৪৪. ঐ, পৃ. ১১৭
৪৫. Mahud Shsfique, ***Intangible Cultural Heritage and Sonargaon Folk Museum*** (Narayangonj: Bangladesh Folk Art & Crafts Foundation Sonargaon Ministre of Cultural Affairs, 2004) p, 11
৪৬. রবীন্দ্র, গোপ,†jvKwk‡íi wbewPZ ceÜ, (নারায়ণগঞ্জ:বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ২০১০) পৃ.২১৭
৪৭. ঐ p, 12
৪৮. gvme¨vcx †jvKKvi…wkí †gjv I †jvKR Drme 2008, (বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়) পৃ.১৪
৪৯. রবিউল হুসাইন, evsjv‡`‡ki ¯vcZ¨ ms¯‥wZ পৃ. ১৭
৫০. সাক্ষাৎকার: সাইদা খাতুন, উপপরিচালক, বাংলা একাডেমি
৫১. আবদুল ওয়াহাব (সম্পা), বাংলা একাডেমি পত্রিকা, ৫০ বর্ষ, ৩য়-৪র্থ সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২
৫২. বিনয় ঘোষ, evsjvi ms¯‥wZ mgvRZË ,প্রাগুক্ত পৃ. 23
৫৩. gvme¨vcx †jvKKvi…wkí †gjv I †jvKR Drme 2008, c,11
৫৪. লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব আয়োজিত সেমিনারে উপস্থাপিত প্রবন্ধ সংকলন HwZn¨ (নারায়ণগঞ্জ বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, সোনারগাঁও) পৃ.১২
৫৫. সাক্ষাৎকার, ড. আবুল হাসান চৌধুরী, সভাপতি, ফোকলোর বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ২০১৩
৫৬. স্মরণিকা, যুগপূর্তি উৎসব ১৯৯৮-২০১০, ফোকলোর বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পৃ.১
৫৭. এ. কে. এস শামসুল আলম, jvjevM `M I hv`Ni (ঢাকা: প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার) পৃ. ১১
৫৮. অধ্যক্ষ তোফায়েল আহমদের প্রথম মৃত্যু বার্ষিকী ২৮ মার্চ ২০০৩ উপলক্ষে স্মরণিকা, chZ cwil` evsjvNi †jvK I Kvi…wkí msMÖn c. 2
৫৯. সাক্ষাৎকার, ২০০৮. তোফায়েল আহমেদের পুত্রবধূ শিল্পী।
৬০. সাক্ষাৎকার, মোহাম্মদ সাইদুরের পুত্র হারেস-এর থেকে তথ্য প্রাপ্ত
৬১. মোহাম্মদ সাইদুর ¯§iKMš', সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১২ পৃ. ৫
৬২. সৈয়দ আমীরল ইসলাম, প্রাগুক্ত পৃ. ৭২
৬৩. J.W.Y Higgs, ***Folk Life Collection and Classification*** Ibid, p26-27
৬৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮
৬৫. আহমদ, wkíKjvi BwZnvm, পৃ. ৩
৬৬. ঐ পৃ. ২১৪
৬৭. পল্লব সেন গুপ্ত, †jvKms¯‥wZi mxgvbv I ¯^iƒc , পৃ. ৪৭
৬৮. Shyam Chand. ***Folklore Museum*** , P. xvi.
৬৯. মাযহারুল ইসলাম†dvK‡jvi cwiwPwZ Ges †jvK mvwn‡Z¨i cVb-cvVb, , পৃ. ১৮
৭০. তুষার চট্টপাধ্যায়, †jvK ms¯‥wZi ZËi|c I ¯^i|c mÜvb (কলিকাতা: এ মুখার্জী ১৯৮৫) পৃ. ৭
৭১. ঐ, পৃ. ১৯
৭২. ঐ, পৃ.৭
৭৩. সেন গুপ্ত, †jvKms¯‥wZi mxgvbv I ¯^iƒc পৃ. ৪৮
৭৪. ঐ, পৃ. ৪৮
৭৫. ওয়াকিল আহমদ, †jvKKjv ZË I gZev`, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭
৭৬. মাযহারুল ইসলাম,পৃ. ১৭
৭৭. ঐ পৃ.৭০
৭৮. ঐ, পৃ.৭১
৭৯. সম্পা. আবুল আহসান চৌধুরী, Kzwóqv: BwZnvm HwZn¨ (ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, কুষ্টিয়া সাহিত্য পরিষদ, ১৯৭৮) পৃ. ১৯৫
৮০. মোমেন, চৌধুরী, †jvKms¯‥vi I wewea cÖm½ (ঢাকা: বাংলা একাডেমী,১৯৯৭) পৃ. ৪৯

৮১. মোবারক হোসেন, খান সম্পাদক, wkí Kjv Ivb‡bi‡K cwÎKv, বাংলাদেশের শিল্পকলা একাডেমি, ষষ্ঠদশ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৯৯২। পৃ. ৩২
৮২. মোমেন, চৌধুরী, পৃ. ৩২, ৩৩
৮৩. এম এ রহিম, evsjvi mvgvwRK I mvs¯‹…wZK BwZnvm c_g LÐ পৃ. ৩৯
৮৪. আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, evsjv‡`‡ki cZœm¤ú` (ঢাকাঃ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৮৪) পৃ. ৩৫৪
৮৫. মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০১৩ , বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়- পৃ. ৬৪
৮৬. এম এ রহিম, evsjvi mvgvwRK I mvs¯‹…wZK BwZnvm c_g LÐ পৃ. ২৯৯
৮৭. প্রদ্যোত ঘোষ, evsjvi †jvKwkí, (কলকাতাঃ পুস্তক বিপনি, ২০০৪) পৃ. ৭
৮৮. Gurusaday Dutt, ***Folk Arts and Crafts of Bengal***: *The collected papers,*(Calcutta: Seagull books, 1990.) p. 58
৮৯. ফরিদা জামান, Aviwb‡K wPÎKjvq †jvK wk‡íi cfve (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি ১৯৯৮)পৃ. ১০
৯০. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান,পৃ.১০
৯১. ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় †jvKwkí ebvg D"P gvMxq wkí, পৃ. ১৩-৩০
৯২. মোঃ মোকাম্মেল,পৃ.৩৭
৯৩. ফয়েজুল আজিম, Pviæ Kjvi fvgKv (বাংলা :একাডেমি ঢাকা, ১৯৯২) পৃ. ৩
৯৪. এবনে গোলাম সামাদ, Bmjvgx wkíKjv (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯) পৃ. ২৭
৯৫. Henry, Glassie, ***Traditional Art of Dhaka (*** Dhaka,: Bangla Academy, 2000) p. 1
৯৬. ঐ p. 1
৯৭. খগেশ কিরণ তালুকদার, evsjv‡`‡ki †jvKvqZ wkíKjv পৃ.৪৮
৯৮. বাংলাদেশের সমকালীন HwZn¨evnx †jvKwkí c`kbx I †gjv 21 †g-21 RjvB 200 বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর পৃ. ৫
৯৯. ঐ
১০০. Gurusaday Dutt, p. 58
১০১. ঐ p. 57
১০২. জাহাঙ্গীর খান, বোরহান উদ্দিন, wPÎwkí (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি, ১৯৭৪)পৃ. ১৪
১০৩. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, (সম্পাঃ) evsjv‡`‡ki †jvKwkí (ঢাকাঃ বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন, ১৯৮৩) c. 45
১০৪. ফয়েজুল, আজিম Pviæ Kjvi fvgKv পৃ. ১
১০৫. বাংলাদেশের সমকালীন ঐতিহ্যবাহী †jvKwkí c`kbx I †gjv, পৃ. ৫
১০৬. সম্পা সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, পৃ. ১২
১০৭. Parveen Ahmad, ***The Aeshthetics & Vocabulary*** (Dhaka: Bangladesh National Museum, 1997) p. 6
১০৮. খগেশ কিরণ তালুকদার পৃ. ২২
১০৯. সৈয়দ মাহবুব আলম, (সম্পা) †jvKwkí (†jvKKviæwkí †gjv I †jvKR Drme) ২০০১ বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, পৃ. ৫০
১১০. evsjv‡`‡ki †jvK I Kviæwk‡íi bw_f³KiY c_g chvqt XvKv AÂj (বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন সোনারগাঁও নারায়ণগঞ্জ ১৯৯৩)পৃ. ৯
১১১. খগেশ কিরণ তালুকদার, পৃ. ২২
১১২. A.H Dani, *Muslim Architecture of Bengal* (Dacca) p. 12
১১৩. পল্লব সেন গুপ্ত, †jvKms¯‹…wZi mxgvbv I ¯^iƒc, পৃ.
১১৪. তোফায়েল, আহমদ, †jvK HwZ‡n¨i `k w`MšÍ (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি, ১৯৯৯) পৃ. ৮২
১১৫. ফয়েজুল, আজিম , পৃ. ৫
১১৬. তোফায়েল, আহমদ, পৃ. ৮১
১১৭. পল্লব সেন গুপ্ত, পৃ. ৩৬
১১৮. আবদুল, হালিম, নূরুন নাহার বেগম, gvb‡li BwZnvm cvPxb hM (ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৩) পৃ. ৮২
১১৯. কামাল আহমদ wkíKjvi BwZnvm, পৃ. ১২

১২০. ড. আবদুল ওয়াহাব (সম্পা) এ কে এম শাহনাওয়াজ,"প্রত্নতত্ত্ব চর্চা এবং সাম্প্রতিক গবেষণা বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পুনর্গঠনের সম্ভাবনা" (পৃ. ৪৯)
১২১. রবিউল হুসাইন, evsjv‡`‡ki ¯'vcZ¨ ms¯'wZ পৃ. ২৫
১২২. ঐ পৃ. ২
১২৩. কামাল আহমদ, পৃ. ১৩।
১২৪. অলোক মুখোপাধ্যায় wekwk‡íi i/c‡iLv c. ৭৯
১২৫. অশোক, মিত্র, পৃ. ৬০
১২৬. বিনয় ঘোষ, c. 58
১২৭. অলোক, পৃ.৭৯
১২৮. ঐ পৃ. ৭৩
১২৯. ফিওদর করোভকিন, cw_exi BwZnvm: cvPxb hM (মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, 1983) পৃ. ১০৫
১৩০. ঐ পৃ.
১৩১. বিজন কুমার, মন্ডল msMnkvjv I †jvKwkí, পৃ. ২৭
১৩২. H Sarkar, ***Museums and protection of Monuments Antiquities in India***, Ibid 17
১৩৩. ফিওদর করোভকিন পৃ. ৯৫
১৩৪. ঐ পৃ. ১৩৯
১৩৫. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, cvPxb Pxb mf¨Zv (ঢাকা: বাংলা একাডেমি), ১৯৮৫, পৃ. ৮৬
১৩৬. শ্রী অতুল চন্দ্র রায়, fvi‡Zi BwZnvm (কলিকাতা: মৌলিক লাইব্রেরি, ১৯৯০) c. 59
১৩৭. ঐ পৃ. ১৫
১৩৮. ঐ পৃ. ৮০
১৩৯. শ্রী অতুল চন্দ্র রায়, পৃ. ২২
১৪০. অশোক, মিত্র, fvi‡Zi wPÎKjv c_g LÐ (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৫) পৃ. ২৮
১৪১. ঐ পৃ. ৩২
১৪২. ঐ পৃ. ৩৮
১৪৩. ফিওদর করোভকিন, c. 168
১৪৪. ঐ ১৭০
১৪৫. ঐ, ১৭২
১৪৬. অলোক মুখোপাধ্যায়, wekwk‡íi i/c‡iLv, পৃ. ২০
১৪৭. Islam, (chapter one). A. Gullaume (A Pellcan Book, 1954 এবনে গোলাম সামাদ, Bmjvgx wkíKjv, পৃ ১৮
১৪৮. ঐ পৃ.
১৪৯. আবুল বাশার মোশাররফ হোসেন, Avie ¯'vcZ¨ (ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি) ১৯৯৩, পৃ. ২
১৫০. ঐ পৃ. ৮
মসজিদ কথাটির শব্দগত অর্থ হলো প্রণত হবার স্থান।
১৫১. মাহমুদুল হাসান, Bmjv‡gi BwZnvm (ঢাকা: গ্লোব লাইব্রেরি), ১৯৯২ পৃ. ১৭৮
১৫২. K.A.C. Creswall, ***Early Muslim Architecture Vol.11*** (Oxford: Clarendon Press 1940) p. 6
১৫৩. এবনে গোলাম সামাদ, Bmjvgx wkíKjv, পৃ. ১৮
১৫৪. ঐ পৃ. ৪৭
১৫৫. মাহমুদুল হাসান, Bmjv‡gi BwZnvm, পৃ. ৫১৬
১৫৬. কামাল আহমদ,পৃ. ১২৩
১৫৭. ফয়েজুল, আজিম PviæKjvi fwgKv , পৃ. ৭২
১৫৮. নাজিমুদ্দিন আহমেদ, gnv¯'vb, gqbvgZx, cvnvoci, পৃ. ১৮
মধ্য এশিয়ার ইসলাম ধর্ম প্রচারের আগে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছিলো মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম। এই সব বৌদ্ধরা স্তূপ নির্মাণ করতো। পিরের মাজারের সাথে বৌদ্ধ স্তূপের মিল আছে। সম্ভবত তাই মরমিবাদ, পিরবাদ ইত্যাদি বাংলায় প্রাধান্য পেয়েছে।
১৫৯. অলোক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭
১৬০. এ রহিম, মমিন, মহিউদ্দিন, সিরাজুল ইসলাম, evsjv‡`‡ki BwZnvm (ঢাকা: নওরোজ কিতকিস্তান ১৯৮৭)
১৬১. ঐ পৃ. ৮১
১৬২. মোশারফ হোসেন, পৃ. ১৩৬

১৬৩. মোঃ মোশারফ হোসেন এবং মো. শফিকুল আলম, cÖZœZË¡ (ঢাকা: প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৯২) পৃ. ২৩

১৬৪. আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, evsjv‡`‡ki cÖZœm¤ú` (ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৮৪) পৃ. ১৬১

১৬৫. হাবিবুর রহমান, BUv‡Lvjv wenvi (7g-13k kZK chšÍ †eŠ× mf¨Zvi wb`kb) (ঢাকা: প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর সংস্কৃতি বিষয়মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার) পৃ. ১

১৬৬. সুখময়, মুখোপাধ্যায়, evsjvi BwZnv‡mi `‡kv eQi ¯vaxb mjZvb‡`i Avgj (কলকাতা: আরজী বুক হাউস, ১৯৮৮) পৃ. ৩৬৩

১৬৭. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, fviZe‡l©i BwZnvm, gmwjg I weªwUk kvmb (ঢাকা: গ্লোব লাইব্রেরি প্রাঃ লিমিটেড ১৯৭৬) পৃ. ২২

১৬৮. সফর আলী আকন্দ (সম্পা) evOvjx©i AvZ¥cwiPq (রাজশাহী: ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ ১৯৯১) পৃ. ৭৭
বাংলাদেশে অনেক মুসলিম জ্ঞানীগুনী এসেছেন ধর্ম প্রচার করতে। আবার অনেক ভণ্ডও এসে নিজেকে জাহির করতে চেয়েছে জ্ঞানী বলে। কিন্তু এসব ভণ্ডরা হয়তো ধরা পড়ে যেতো এদেশের মানুষের কাছে। ফারসি ভাষায় 'কুজুগূ মাননে জ্ঞানী। কিন্তু বাংলায় 'বজরুক' বলতে বোঝায়, যে লোক অলৌকিক শক্তির জ্ঞান করে-প্রতারক।

১৬৯. মুহাম্মদ, মোখলেছুর রহমান, mjZvbx Avg‡j ¯vc‡Z¨i weKvk (রাজশাহী: প্রেস প্রকাশনা ও জনসংযোগ দপ্তর রা,বি) ১৯৯৬, পৃ. ২

১৭০. এ কে এম, শাহনাওয়াজ, evsjv‡`‡ki mvs¯…wZK HwZn¨ (ঢাকা: নভেল পাবলিশিং হাউস, ২০১০) পৃ. ৬৭

১৭১. শ্রী রমেশচন্দ্র, মজুমদার, evsjv‡`‡ki BwZnvm wØZxq LÐ (কলকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স) ১৯৮৭, পৃ. ৪৪৪

১৭২. ঐ, পৃ. ৪৪৫

১৭৩. পবিত্র আল কোরআন, সুরা-২, আয়াত-৪০

১৭৪. রবিউল হুসাইন, evsjv‡`‡ki ¯vcZ¨ ms¯…wZ (ঢাকা: সন্দেশ আজিজ সুপার মার্কেট) ১৯৯৬

১৭৫. গোলাম সামাদ, Bmjvgx wkíKjv, পৃ. ৯৭

১৭৬. মোহাম্মদ যাকারিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৪

১৭৭. গোলাম মুরশিদ, nvRvi eQ‡ii evOvwj ms¯…wZ (ঢাকা: প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ২০০৬) পৃ. ৪১১

১৭৮. সাক্ষাৎকার গ্রহণ: ১০/০৪/২০১৪

১৭৯. তোফায়েল আহমেদ (সম্পা) ceÜ mwd-mvaK‡`i I ik I †gjv, পৃ. ৩৭-৩৮
সূফিরা হলেন ইসলামী চিন্তার প্রতিনিধি। সব ধর্মের ক্ষেত্রেই কোনো না কোনো সময়ে উদ্ভব হয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মের ক্ষেত্রে জাপানে উদ্ভব হয়েছে জেন (Zen) মতবাদ; ইহুদীদের ক্ষেত্রে হাসিদিম (Hasidim) মতবাদ; খ্রিস্টানদের মধ্যে উদ্ভব হয়েছে একাধিক মিস্টিক সম্প্রদায়ের, যেমন কোয়েকার (Quaker)। সব মিস্টিকদের চিন্তার মধ্যেই মিল আছে।

১৮০. Percy Brown, ***Indian Architecture (Islamic Period***) (Bombay, D.B Taraporevala Song pvt Lim 1956) p. 6

১৮১. ইফতিখার, উল-আউয়াল (সম্পাঃ) HwZnwmK XvKv gnvbMix: weeZb I m¤¢vebv XvKv: (ঢাকা: জাতীয় জাদুঘর ২০০৩)

১৮২. এস এম ইলিয়াস, HwZnwmK Kviievjv (ঢাকা: মধুকুঞ্জ প্রকাশনী, ২০১১) পৃ. ১১৯
মহররম উদযাপন উপলক্ষে ঢাকার আজিমপুরে সাপড়া মসজিদের সামনে গ্রামীণ মেলার মতো বিরাট মেলা বসে। এই মেলায় মেয়েদের কাঁচের চুড়ি থেকে আরম্ভ করে দা, বটি, রুটি তৈরির জন্য বেলন পিঁড়ি, বিভিন্ন ধরনের তৈজসপত্র, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন ধরনের খেলনা সামগ্রি কিনতে পাওয়া যায়। মহররমের এই মেলা আর হিন্দুদের রথের মেলার মধ্যে কোনো পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায়না। শোকের অনুষ্ঠান না আনন্দের অনুষ্ঠান বোঝা মুশকিল হয়ে যায়।

১৮৩. নূরুল্লাহ মাসুম, `wÿ‡Yi ev`kv Lvb Rvnvb Avjx (in:) (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১৯৯৬) পৃ. ২৬

১৮৪. এম এ রহিম, evsjvi mvgvwRK I mvs¯…wZK BwZnvm (c_g LÐ) পৃ. ২৫১

১৮৫. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত) evsjv‡`‡ki BwZnvm (ivR‰bwZK BwZnvm) 1704-1971, প্রথম খন্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ১১৫

১৮৬. বিজন কুমার, মন্ডল msMnkvjv I †jvKwkí, পৃ. ২৯

১৮৭ সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত) evsjvwcwWqv ,পৃ. ১৪

১৮৮. সৈয়দ ইসলাম আমীরুল,evsjv‡`‡k wgDwRqvg, পৃ. ২৪

১৮৯ ইসলাম, evsjvwcwWqv, পৃ. ১৫

১৯০. D.T Mukherjee, ***Catalogue of Indian Museum publications (1867-1989) (Calcutta:*** Indian Museum 1989) p. ii
১৯১. ***Catalogue of Indian Museum*** publications(1867-1989) Indian museum First published in 1949, p. 2
১৯২. Ibid, p. 3
১৯৩. আমীরুল ইসলাম, evsjv‡'‡k wgDwRqvg, পৃ. ২৫
১৯৪. ঐ পৃ. ১০২
১৯৫. বিজন কুমার, পৃ. ৩১
১৯৬. আমীরুল ইসলাম, পৃ. ১০৩
১৯৭. ঐ , পৃ. ৩১
১৯৮. বিজন কুমার, msMnkvjv I †jvKwkí, পৃ. ৩২
১৯৯. আমীরুল ইসলাম,পৃ.১০৩
২০০. সরেজমিন
২০১. বিজন কুমার, পৃ. ১১১
২০২. সরেজমিন
২০৩. সাক্ষাৎকার বিজন কুমার মণ্ডল, পরিচালক গুরুসদয় লোকসংগ্রহশালা পৃ. ৩২

wØZxq Aa¨vq

†jvKmsMnkvjvi Kvhµg

সংগ্রহশালা হলো সংস্কৃতির ভাণ্ডার ক্ষেত্র। প্রতিটি সংগ্রহশালার প্রধান লক্ষ থাকে সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরে দর্শকের চাহিদা মেটানো। বর্তমানে বাংলাদেশে সরকারি, বেসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত এবং ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনায় বহুবিদ্যাসম্বলিত ও একমূখি বিদ্যাসম্বলিত সংগ্রহশালা গড়ে উঠেছে। স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত সংগ্রহশালার মধ্যে ডাক সংগ্রহশালা, শিশু সংগ্রহশালা, মৎস্য সংগ্রহশালা, মুক্তিযুদ্ধ সংগ্রহশালা, দেশবরেণ্য বিভিন্ন ব্যক্তিত্বদের নিয়ে স্মৃতি সংগ্রহশালা, লোক ও কারুশিল্প ইত্যাদি সংগ্রহশালা উল্লেখযোগ্য। তবে বাংলাদেশে নারায়ণগঞ্জের লোক ও কারুপল্লী ফাউন্ডেশন সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় একমাত্র প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গড়ে ওঠা লোকসংগ্রহশালা। বাংলাদেশের কুষ্টিয়ার ছেঁওড়িয়ায় অবস্থিত লালন শাহের মাজার প্রাঙ্গণে গড়ে লোকসংগ্রহশালাটি বাংলাদেশের অন্যতম লোকসংস্কৃতিচর্চার স্থান। এখানে দেশী বিদেশি পর্যটকদের ভীড়ে সারা বছর জাঁকজমকপূর্ণ অবস্থায় থাকে। লালন ভক্তরা বাউলশিল্পীদের কণ্ঠে লালনের গান শুনতে এবং মাজার দর্শনে এখানে আসেন।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পূর্বে ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং আর্কিওলোজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া'র উদ্যোগে বাংলাদেশের প্রাচীন প্রত্নস্থলগুলো উন্মোচিত হয়। এই উৎখনন ও অনুসন্ধানের মধ্যদিয়ে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন এলাকায় মহাস্থান, ময়নামতি ও পাহাড়পুর সাইট সংগ্রহশালা গড়ে ওঠে।[১] বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রাচীন সুলতানী ও মুঘল আমলের তৈরি মসজিদ, দুর্গ, মাজার, কদমরসূল ইত্যাদি ঐতিহাসিক স্থাপনা এখনও যা টিকে আছে। বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য ইসলামী স্থাপনাগুলোর মধ্যে রয়েছে বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদ, চাঁপাইনবাবগঞ্জের সোনামসজিদ, বাঘা মসজিদ, যশোরের বারো বাজারে প্রত্নখননে প্রাপ্ত সাতগাছিয়া মসজিদ, কুষ্টিয়ার ঝাউদিয়া মসজিদ, লালবাগের কেল্লা, হোসেনী দালানসহ অসংখ্য স্থান। এ সব ইমারতের পাশেই রয়েছে পিরের মাজার। বাংলার মুসলমানদের এখানে বিচরণ ঘটে প্রার্থণা, বিনোদন ও শিক্ষা লাভের আশায়। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বর্তমানে এ সব ঐতিহাসিক স্থান ও ইমারতসমূহ বাংলাদেশ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের নিয়ন্ত্রনাধীন

রয়েছে। যা হোক, সরকারি মর্যাদাসম্পন্ন যে কোনো প্রতিষ্ঠান সরকারি আইন-কানুন, নিয়ম নীতিমালা ও সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত হয়ে থাকে। বস্তুত প্রাতিষ্ঠানিক সংগ্রহশালাসমূহ পরিচালিত হয় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধিনে। বাংলাদেশের সরকারিভাবে পরিচালিত বহুবিদ্যাসম্বলিত 'বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরটি' এদেশের সর্ববৃহৎ এবং শ্রেষ্ঠ জাদুঘর। অন্যদিকে স্বায়ত্তশাসিত সংগ্রহশালাসমূহ অত্র প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নে এবং সরকারি অনুদানে পরিচালিত হয়। এ ধরনের সংগ্রহশালাগুলোর মধ্যে বরেন্দ্র গবেষণা সংগ্রহশালা, ঢাকা মহানগর সংগ্রহশালা অন্যতম প্রতিষ্ঠান। বাংলা একাডেমির লোক ঐতিহ্য সংগ্রহশালাটির কার্যক্রম পরিচালিত হতো বাংলা একাডেমির নিজশ্য তত্ত্বাবধানে। লালন শাহের মাজার ও সংগ্রহশালাটির কার্যক্রম কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসন কর্তৃক পরিচালিত হয়। আবার ব্যক্তিগত পর্যায়ে গড়ে ওঠা সংগ্রহশালা পরিচালনা, উপাদান সংগ্রহ, ও সংরক্ষণ সম্পূর্ণ ব্যক্তির নিজেস্ব অর্থায়নে পরিচালিত হয়।[২] বলা বাহুল্য, যে কোনো ধরনের সংগ্রহশালার পরিচালনা ও উন্নয়নের জন্য বিপুল অংকের টাকা, দক্ষ ও নিষ্ঠাবান জাদুঘরকর্মীর প্রয়োজন পড়ে।

একটি প্রাতিষ্ঠানিক লোকসংগ্রহশালার দুই ধরনের কার্যক্রম থাকে।

১. প্রশাসনিক কার্যক্রম

২. শিক্ষা কার্যক্রম

প্রশাসনিক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে থাকে সংগ্রহশালায় সংগৃহীত প্রতিটি নিদর্শনের ব্যাখ্যাকরণ, দলিলিকরণ, গুদামজাতকরণ, পুনরায়ন এবং নিদর্শন প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।[৩] এ ছাড়াও আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস পালন, আলোচনা সভা, সেমিনার, প্রদর্শক বক্তৃতা, বিশেষজ্ঞ বক্তৃতা, স্কুল প্রোগাম, ফিল্ম শো, প্রকাশনা, মেলার আয়োজন এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠানগুলোর আয়োজন করা। যেমন বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস, মাতৃভাষা দিবস পালন করা উল্লেখযোগ্য। তেমনি শিক্ষাকার্যক্রমের ভিত্তিতে সংগ্রহশালা হলো একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (Eductional Institution), গণবিশ্ববিদ্যালয়, (People's University), জ্ঞান ভাণ্ডার,(Store-house of Knowledge) অনুপ্রেরণা, বিনোদন ও তথ্যের (Unique source of knowledge, Inspiration, Enjoyment and Information) জন্য উত্তম উৎস। নিদর্শন হলো সংগ্রহশালার প্রাণ। এই নিদর্শনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ইতিহাস, ঐতিহ্য, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও ব্যবহারিক দর্শন সম্পর্কীয় যে শিক্ষা দেয়া হয় তাকে জাদুঘর শিক্ষা বলে। উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইউরোপে প্রথম শুরু হয়েছিলো।[৪]

৩ (ক) নিদর্শন সংগ্রহ (Collection)

যে কোনো সংগ্রহশালার প্রশাসনিক কার্যক্রমের প্রথম কাজ হলো সংগ্রহশালার ধরন অনুযায়ী নিদর্শন সংগ্রহ করা। বস্তুত একটি সংগ্রহশালার পরিচয় পাওয়া যায় নিদর্শনের ওপর ভিত্তি করেই। সুতরাং আধুনিক যুগে কোনো একটি নির্দিষ্ট জায়গায় স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ভবনে সংগ্রহশালা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সেখানে নিদর্শন সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাধারণভাবে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক সংগ্রহশালাসমূহে তিনভাবে নিদর্শন সংগ্রহ করা হয় ।

১. মাঠ পর্যায়ে সংগ্রহ ২. উপহার ৩. ক্রয়[৫]

মাঠ পর্যায়ে সংগ্রহ

সংগ্রহশালায় যিনি তথ্য-উপাত্ত ও নিদর্শন সংগ্রহ করেন তিনি হলেন সংগ্রাহক। পরিপূর্ণভাবে সংগ্রহশালা গড়ে তোলার পিছনে একজন সফল সংগ্রাহক সবচেয়ে বেশি অবদান থাকে । বিশেষ করে সংগ্রাহক যখন বিশেষ সংবাদের ভিত্তিতে মাঠ পর্যায়ে গিয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে কোনো নিদর্শন সংগ্রহ করেন তখন এ ধরনের নিদর্শনকে বলা হয় মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত উপাদান। বাংলাদেশে প্রথম গড়ে ওঠা বরেন্দ্র সংগ্রহশালার প্রতিষ্ঠাতা দয়ারামপুরের জমিদার শরৎরায়, অক্ষয় কুমার, রমাপ্রসাদ, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়সহ আরো কয়েকজন প্রমূখ পণ্ডিতবর্গ মাঠ পর্যায়ের সংগ্রাহক ছিলেন। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের অনেক পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন মাঠ পর্যায় থেকে সংগ্রহ করেছিলেন নলিনী ভট্টাশালী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, গুরুসদয় দত্ত যারা লোকশিল্পের বিভিন্ন নিদর্শন সংগ্রহ করে সংগ্রাহক হিসেবে অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেছিলেন।

চিত্র-১: নলিনীকান্ত ভট্টাশালি

উল্লেখ্য যে, এ দুজন ব্যক্তিত্ব যারা এপার বাংলা এবং ওপার বাংলার সংগ্রাহকদের পথ প্রদর্শক হিসেবে আজো চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। পাকিস্তান আমলে পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন সংগ্রহে ব্যক্তিগত পর্যায়ে আবুল কালাম মুহাম্মদ জাকারিয়া বিশেষ দায়িত্ব পালন করেছেন। তেমনি লোকশিল্পের বিভিন্ন নিদর্শন সংগ্রহে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন বিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছিলেন।

চিত্র-২: জয়নুল আবেদিন

বর্তমানে মাঠ পর্যায় থেকে নির্দশন সংগৃহীত হয় দুইভাবে। প্রথমত: প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। দ্বিতীয়ত: ব্যক্তিগত উদ্যোগে। কোনো প্রত্নতাত্ত্বিকস্থল থেকে খননের মাধ্যমে যে সব নিদর্শন সংগৃহীত হয় এ ধরনের উপাদান প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বলে বিবেচিত হয়। উল্লেখ্য যে, প্রত্নখননের উদ্যোগ কোনো প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করে। তা সরকারীভাবেও হতে পারে আবার কোনো প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগেও হতে পারে। বিশেষত সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত প্রত্নতত্ত্ববিদ, জাদুঘরকর্মী ও শ্রমিকদের সহায়তায় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ, অনুসন্ধান এবং সতর্কতার মাধ্যমে এই সব নির্দশন সংগ্রহের কাজ বেশি হয়েছে। এভাবে বাংলাদেশের প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন ময়নামতি, পাহাড়পুর, মহাস্থানগড়, উয়ারী বটেশ্বর থেকে খননের মাধ্যমে পাওয়া অনেক তথ্য নিদর্শনের ভিত্তিতে প্রাচীন বাংলার ও মধ্যযুগীয় ইতিহাস রচনায় সহায়ক ছিলো।

প্রাচীন মহাস্থানগড় থেকে খননের মাধ্যমে বিভিন্ন আকারের ও নানা রঙের মাটির পাত্র মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত হয়েছে। মৌর্য আমলের পাত্রগুলির মধ্যে বাটি, নল, বিশিষ্ট পাত্র ও পানপাত্রই বেশি দেখা গেছে। ময়নামতি থেকে খননে পাওয়া পাথর যুগের হাতিয়ার, তাম্রলিপি, তাম্রমুদ্রা, অলংকার, পোড়ামাটির চিত্রফলক, পোড়ামাটির সিল মোহর, স্বর্ণমুদ্রা, রৌপ্য মুদ্রা, প্রস্তর ভাস্কর্য, অলংকৃত ইট, পোড়ামাটির তৈজসপত্র, ব্রোঞ্জের নিদর্শন, পাথরের গুটিকা মাঠ পর্যায় থেকে সংগ্রহীত উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। বটেশ্বর উয়ারীর মাঠ পর্যায় থেকে প্রত্নবস্তু সংগ্রহ করে সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন জনাব হানিফ পাঠান।[৬]

চিত্র-৩ উয়ারী-বটেশ্বর খনন থেকে প্রাপ্ত উপাদান

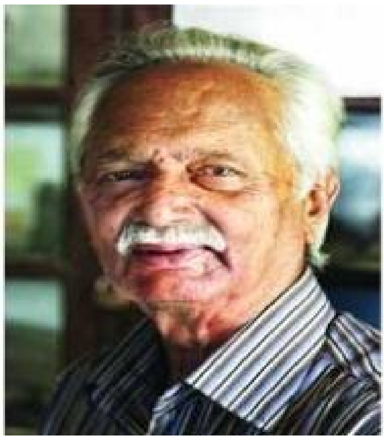

চিত্র-৪: হানিফ পাঠান

কয়েক বছর ধরে এখান থেকে পাথর ও অশ্মীভূত কাঠের হাতিয়ার, লোহার হাতকুঠার, মুদ্রা ও স্বল্প মূল্যবান পাথরের পুঁতির সন্ধান পাওয়া যায়। বাংলার প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন হিসেবে পোড়ামাটির ফলক, পুঁতি, তৈজসপত্র, মুদ্রা, শিলালিপি ইত্যাদি মাঠ পর্যায় থেকে সংগ্রহকৃত উপাদান বাংলাদেশের বিভিন্ন সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত আছে। ইসলামী স্থাপনাগুলোর মধ্যে প্রত্নখননের মাধ্যমে মসজিদ থেকে পাওয়া টেরাকোটা ও শিলালিপি মুসলিম শাসনামলের সময়কে নির্দেশ করে। বিশেষ করে কোন মুসলিম শাসকের সময় ধর্মীয় স্থাপনাটি নির্মিত হয়েছে সে সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায়। লক্ষ্যনীয় যে, বাংলাদেশে মুসলমান শাসকদের নির্মিত ধর্মীয় ইমারতের নিদর্শনসমূহ বর্তমানে গ্রাম বাংলার অজো পাড়াগাঁয়ের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত। কয়েকশ বছর ধরে টিকে থাকা এ সব ধর্মীয় ও লৌকিক ইমারত থেকে বয়সের কারণে কারুকার্যমণ্ডিত নকশাকৃত ইট বা টেরাকোটা এমনিতেই এই খসে খসে পড়ে গেছে। এ সব নকশাকৃত খসে পড়া টেরাকোটা স্থানীয় লোকজনদের হাতে চলে যায়। এ ক্ষেত্রে কারো কিছু বলার থাকে না। পরবর্তীতে মাঠ পর্যায়ের সংগ্রাহকদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে স্থানীয়দের সংগ্রহে থাকা টেরাকোটা সংগ্রহ করা হয়। এক সময় সম্পূর্ণভাবে মসজিদটি মাটির গর্ভে বিলীন হয়ে গেলে বাংলাদেশ সরকার প্রত্নতত্ত্ববিভাগ প্রত্নখননের মাধ্যমে পূর্ববর্তী মসজিদগুলোর মতো করে হুবহুভাবে মসজিদটির রূপ দেয়া হয়। কখন কখন খননের পূর্বে বোঝার উপায় থাকেনা পূর্বে এই স্থাপনাটি মসজিদ, মন্দির না বাসগৃহ ছিলো। জনশ্রুতি ও মসজিদ খননে প্রাপ্তনিদর্শনের ভিত্তিতে যেমন শিলালিপি, মিহরার, মিম্বর ইত্যাদি উপকরণ দেখে বোঝা যায় এটি মসজিদ ছিলো।

লক্ষণীয় যে, প্রত্নখননে প্রাপ্ত কোনো উপাদান সকলের অংশগ্রহণে ও সম্মিলিতভাবে সংগ্রহ করা হয়। মাঠ পর্যায় পাওয়া উল্লেখযোগ্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, ফাসিল, বিভিন্ন ধরনের মুদ্রা, লেখমালা, বিভিন্ন মন্দির, দূর্গ, মসজিদ থেকে প্রাপ্ত তোরণ, স্তম্ভ, স্থাপত্যিক নিদর্শন, কালো পাথর, ভাস্কর্য, হিন্দুদের ধাতবের তৈরি বহু পুরাতন দেবদেবীর মূর্তি, নকশিকাঁথা, পটচিত্র, বিভিন্ন ধাতব দ্রব্য, কাঠের নির্মিত

উপাদান, মাটির তৈরি নানা ধরনের পাত্র দীর্ঘদিন ধরে সংগ্রহ করা হয়েছে। এ ছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন মন্দির থেকে মূর্তি চুরি করে এক শ্রেণির চোরাচালান কারবারীরা গোপনে বিদেশে পাচার করে দেয়। কখনো কখনো পাচারকারীদের হাত থেকে অনেক অপ্রতুল উপাদান বাংলাদেশ পুলিশ, বিডিআর বর্তমান নাম (বিজিবি) এর সদস্যরা সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে উদ্ধার করে থাকে। এ সমস্ত উদ্ধারকৃত নিদর্শনসমূহ সরকারি উদ্যোগে বাংলাদেশের বিভিন্ন সংগ্রহশালায় সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হয়। বাংলাদেশ রাইফেলস সংগ্রহশালায় মাঠ পর্যায় থেকে পাওয়া অনেক নিদর্শন সংগ্রহে রয়েছে।[৭]

যা হোক, যে কোনো সংগ্রহশালার প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে মাঠ পর্যায়ে গিয়ে কী ধরনের নিদর্শন সংগ্রহ করা হবে সেটা সংগ্রাহক নির্বাচন করে থাকেন। যদি প্রাচীন যুগের কোনো ঐতিহাসিক নিদর্শন যেমন হাত কুঠার, মাটির পাত্র, পুঁতি ইত্যাদি ধরনের নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া সেক্ষেত্রে নির্দশনটি কোন অঞ্চলে, কোন ব্যক্তির কাছে রয়েছে এ সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত হয়ে নিদর্শনটি সংগ্রহ করা চেষ্টা করা হয়ে থাকে। বিশেষ করে নিদর্শনটির নির্মাণের সময় কাল সম্পর্কে অবগত হয়ে সে বিষয়টি সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই বাছাই ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিদর্শনটি সংগ্রহ করা হয়।

তবে সমকালীন যে কোনো বিষয়কেন্দ্রিক নিদর্শন সংগ্রহের বিষয়টি ব্যতিক্রম। ডাক বিষয়ক সংগ্রহশালায় সংগ্রহ করা হবে বাংলাদেশের বিভিন্ন পোস্ট অফিস থেকে পাওয়া অপ্রতুল দূলর্ভ উপাদান। সেখানে থাকবে অতীতকাল থেকে ব্যবহৃত লেটার বক্স ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের স্ট্যাম্প, স্কেল, ডাক প্রহরীদের ব্যবহৃত বর্শা, ব্রিটিশ আমলের ধাতব স্ট্যাম্প ও চিঠি। সুতরাং বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী উপাদান সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং প্রদর্শন করা হবে এটাই স্বাভাবিক।

তেমনি মুক্তিযুদ্ধ সংগ্রহশালার জন্য সংগ্রহ হবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীরসেনাদের নাম, যুদ্ধে ব্যবহৃত অশ্রশস্ত্র, চিঠি, গোলাবারুদ, শহীদদের মৃতদেহ থেকে সংগৃহীত হাঁড়, মাথার খুলি ইত্যাদি। অতএব প্রামাণ্য দলিলপত্র ইত্যাদি মাঠ পর্যায় থেকে সংগ্রহ করা মুক্তিযুদ্ধ সংগ্রহশালার কার্যক্রমের পর্যায়ভূক্ত।

স্মৃতি বিজরিত সংগ্রহশালার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সেই ব্যক্তির সকল কর্মকাণ্ডের নিদর্শন নিয়ে সংগ্রহ সংরক্ষণ করা হয়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির যে বাড়িতে প্রায় পরিবারের সকল সদস্যদের নিয়ে তিনি নিহন হয়েছিলেন সেই ঘটনাকে সকলের সামনে উপস্থাপন করার জন্য তৈরি করা হয়েছে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি সংগ্রহশালা। সুতরাং এখানকার সকল উপাদান বঙ্গবন্ধুকে ঘিরে। জয়নুল আবেদিন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি ব্যবহার সামগ্রী, কবিতা, সংরক্ষণ করা এ সংগ্রহশালার কার্যক্রমের মধ্যে পড়ে।

লোকশিল্পভিত্তিক সংগ্রহশালার কার্যক্রমের মধ্যে লোকশিল্প নির্বাচন করা। রাজশাহী, খুলনা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, সিলেট, ঢাকা ও রংপুর বিভাগের বিখ্যাত লোকশিল্পীদের তৈরি ঐতিহ্যবাহী লোক ও কারুশিল্প যথাঃ ধাতবশিল্প, নকশি কাঁথা, পটচিত্র, আইভরিশিল্প, মৃৎশিল্প, বাঁশও বেতজাত দ্রব্য, দারুশিল্প, নৌশিল্প নির্বাচন করে ওই সমস্ত এলাকার গ্রাম-গঞ্জ থেকে নির্বাচিত লোক ও কারুশিল্প সংগ্রহ করে সংগ্রহশালায় আনা হয়। সমকালীন লোকশিল্পের বাংলাদেশের কারুশিল্পীরা এদেশের সাধারণ মানুষ কাঠের রেহেলের মধ্যে কোরআন গ্রন্থটি রেখে পড়তে পারে এ জন্যে রেহেল নির্মাণে তারা যথেষ্ট পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছে। রেহেল যে কোনো স্থানে রেখে কোরআন তেলোয়াত করা যায়। বিভিন্ন ধরনের জায়নামাজ বাংলাদেশে তৈরি হয়। বাংলার গ্রামীণ সমাজে দরিদ্র মুসলমানরা খেঁজুর পাতায় তৈরি জায়নামাজে নামাজ আদায় করে। নিম্নমধ্যবিত্তদের অনেকে শীতলপাটি, নকশিকাঁথার জায়নামাজ এবং অভিজাত পরিবারের মুসলমানগণ মেশিনে নির্মিত উন্নত মোটা মখমল কাপড়ের তৈরি জায়নামাজে নামাজ পড়ে থাকেন। এ ধরনের অনেক উপাদান বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ করা লোকসংগ্রহশালার কার্যক্রমের একটি অংশ। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন ধরনের লোকশিল্পের নিদর্শন সংগ্রহ করেছিলেন দুইজন সংগ্রাহক। মোহাম্মদ সাইদুর এবং তোফায়েল আহমেদ। ১৯৬২ সালে জুলাই মাসে মোঃ সাইদুর বাংলা একাডেমিতে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগপত্র নিয়ে লোক সংগ্রাহক পদে যোগ দেন। বাংলা একাডেমির লোক ঐতিহ্য সংগ্রহশালাটিকে সমৃদ্ধভাবে গড়ে তোলার ব্যাপারে তাঁর অবদান ছিলো অসামান্য। এ ছাড়াও তাঁর লোকশিল্প সংগ্রহে সোনারগাঁও লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনে এবং বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে যথেষ্ট অবদান রয়েছে। ১৯৭৪ সালে বাংলা একাডেমিতে সাইদুরের একক লোকশিল্প সংগ্রহ প্রদর্শনী হয়। বাংলা একাডেমির লোক ঐতিহ্য সংগ্রহশালার জন্য নোয়াখালী লেমুয়া বাজার থেকে ধাতবের তৈরি জায়নামাজটি ১৯৮৩ সালে মোহাম্মদ সাইদুর সংগ্রহ করেছিলেন। তাদের প্রচেষ্টা ও উদ্যোগে মধ্যযুগীয়, নবাবী, ইংরেজ, পাকিস্তান এবং স্বাধীন বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বেশিরভাগ নিদর্শন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, কারুপল্লী ফাউন্ডেশন, বাংলা একাডেমির লোক ঐতিহ্য সংগ্রহশালায় এবং তাদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে গড়ে ওঠা সংগ্রহশালায় উপাদান সংগৃহীত হয়েছে।

আরবিলিপিমালায় লিখিত কোরআনের আয়াত, ধাতব ও কাঠের মধ্যে আল্লাহ, কলেমা, আয়তুল কুরসি, পবিত্র কোরআন গ্রন্থ প্রতিটি উপকরণ ইসলামী উপাদান।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-৫: সংগ্রাহক মোহাম্মদ সাইদুর

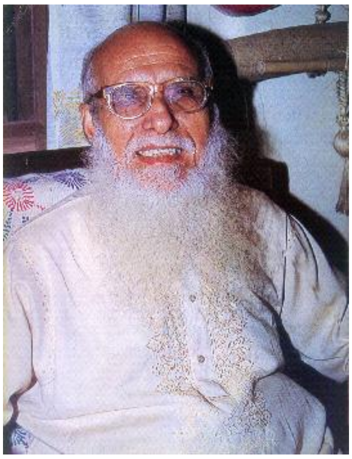

চিত্র-৬: সংগ্রাহক তোফায়েল আহমেদ

মাঠ পর্যায়ে উপাদান সংগ্রহের সমস্যা

প্রথমত, যে কোনো উপাদান সংগ্রহের পূর্বে কোথায় কী নির্দশন পাওয়া যাবে সেটা সংগ্রাহকের আগে থেকে জানা থাকে না। এ জন্যে দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থান করে ঘুরে ঘুরে নিদর্শন খুঁজে বের করতে হয়।

দ্বিতীয়ত, উপাদান খুঁজে বের করলেও নিদর্শনটি সহজে সংগ্রাহকের হাতে আসে না। যদি কোনো অপ্রতুল আকর্ষণীয় ও ঐতিহাসিক উপাদান ব্যক্তির কাছে থাকে স্বেচ্ছায় তিনি উপাদানটি সংগ্রহশালার জন্য দিতে চাননা। বিশেষ করে কারো ব্যক্তিগত এবং কোনো ব্যবহারিক বস্তু যেমন কাঠের খাট পালঙ্ক, সোনা, রুপার অলংকার ইত্যাদি উপাদান যদি হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তিকে রাজী করিয়ে উপাদানটি সংগ্রহ করতে অনেকটা সময় লেগে যায়। এমন পরিস্থিতিতে সংগ্রাহকদের দিনের পর দিন অনেক ধৈর্য্যের পরীক্ষা দিতে হয়। থাকা, খাওয়ার কষ্ট এবং অর্থ কষ্ট পোহাতে হয়। সুতরাং অনেক ত্যাগের বিনিময়ে একজন দক্ষ সংগ্রাহক হওয়া সম্ভব। তাই কেবলমাত্র একজন দক্ষ সংগ্রাহকের পক্ষেই সম্ভব যে কোনো ব্যক্তির মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাতে।[৮]

উপহার

নিদর্শন সংগ্রহের সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হলো উপহার গ্রহণ। সমাজের অনেক বিদ্যোৎসায়ী, অভিজাত পরিবার তাদের পারিবারিক ঐতিহ্যের বিভিন্ন নিদর্শন সংগ্রহশালায় দান করে থাকেন। সংগ্রহশালার কর্তৃপক্ষ দাতাদের কাছ থেকে এ ধরনের নিদর্শন উপহার হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন। বিশেষ করে দাতাদের মধ্যে উপহার হিসেবে সংগ্রহশালায় কিছু দান করার ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় কাজ করে।

প্রথমত, অপ্রতুল বস্তুটি পরবর্তী উত্তরাধিকারীদের কাছে মূল্যহীন হতে পারে

দ্বিতীয়ত, পারিবারের ঐতিহ্য সম্পর্কে দেশবাসীকে জানানোর মানসিকতায়

তৃতীয়ত, পরিবার ভাঙ্গনের কারণে দূর্লভ বস্তুটি নিজের সংগ্রহে রাখা অসম্ভব মনে হওয়া ইত্যাদি।

সুতরাং যে কারণেই হোক না কেনো নির্দশনটিকে দীর্ঘদিন ধরে টিকিয়ে রাখার অন্যতম স্থান হিসেবে সংগ্রহশালাকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে উপহারদাতাগণ বিবেচনা করে থাকেন। বাংলাদেশের রাজশাহী, খুলনা, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রংপুর,বিভাগের বিভিন্ন জেলা থেকে অনেক উদার এবং বিদ্যোৎসায়ী ব্যক্তিদের কাছ থেকে বহু খাটপালঙ্ক, তৈজসপত্রাদি, লোকভাস্কর্য, অলংকার, মসলিন, ধাতবের তৈরি বস্তু ইত্যাদি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, বরেন্দ্র গবেষণা সংগ্রহশালা, লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনে উপহার হিসেবে পাওয়া গেছে।

ইসলামী উপাদানের মধ্যে পবিত্র কোরআন শরিফ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। বরেন্দ্র গবেষণা সংগ্রহশালা, লালবাগদূর্গ ও জাতীয় জাদুঘরে পবিত্র কোরআনের যে নিদর্শনগুলো দেখতে পাওয়া যায় এর বেশিরভাগই দানে প্রাপ্ত। বরেন্দ্র গবেষণা সংগ্রহশালায় রয়েছে তসবি। আল্লাহর নাম জঁপতে পুঁতির তৈরি একটি তসবি ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের কাছে খুব পবিত্র একটি উপকরণ। বিভিন্ন মসজিদের শিলালিপি, মুদ্রা, কোরআন শরিফ, উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো উপহারে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলোর উপহার দাতার নাম, প্রাপ্তি স্থান, নমুনা বস্তুটি কী উপাদান দিয়ে তৈরি ইত্যাদি লেখা থাকে। এর ফলে সংগ্রহশালায় আসা শিক্ষার্থী, দর্শক এবং গবেষক সেই নিদর্শনটি সম্পর্কে এবং উপহার দাতা সম্পর্কে অবগত হতে পারে।

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অনন্য নিদর্শন ঢাকাই মসলিন। ঢাকার রক্ষণশীল ও সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের মেয়ে জাহানারা খাতুন ২০০০ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহে থাকা ঢাকাই মসলিন ১টি এবং ১টি বেনারসি শাড়ি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে উপহার দিয়ে জাদুঘরের সংগ্রহে সমৃদ্ধ করেন। উল্লেখ্য ১৯৩০ সালে এই মসলিন শাড়িটি স্বামী মনসুর রহমান, নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে ২০০৬ সালে উপহার হিসেবে আরো একটি পাওয়া গেছে একটি ঢাকাই মসলিন শাড়ি (চিত্র-১)। এই মসলিন শাড়িটি রাজবাড়ি জেলার সজ্জলকান্দা গ্রামের ডা. ছরওয়ার জান চৌধুরী ১৯৪০ সালে কলকাতা থেকে সাড়ে ছয় টাকা দিয়ে তাঁর স্ত্রীর জন্য কিনেছিলেন। এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মসলিন শাড়িটি জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালকের নিকট হস্তান্তর করেন ডা. ছরওয়ার জান চৌধুরী।[৯] চিত্রে ডা. ছরওয়ার জান চৌধুরীসহ জাদুঘরের মহাপরিচালককে দেখা যাচ্ছে। এ রকম অসংখ্য উপাদান রয়েছে যা দান থেকে প্রাপ্ত।

চিত্র-৭: জাতীয় জাদুঘরে মসলিন উপহার গ্রহণের দৃশ্য

উপজাতিদের মধ্যে গারো সম্প্রদায়ের গৃহস্থালী তৈজসপত্রের মধ্যে রাং – উল্লেখযোগ্য। এটি উপহার দেন ফাদার হোমারিক এবং জাতীয় জাদুঘরের সংগ্রহ নং জ-৮৭.৭৪৮৭ নিদর্শনটি সংগ্রহে আছে। গারো সমাজে রাং নানাবিধ কাজে ব্যবহৃত হয়, যেমন - মদ খাওয়া, বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা, মৃতের সংস্কার কাজে ব্যবহার ইত্যাদি। যে ব্যক্তির যতবেশি রাং আছে সে ততবেশি ধনবান হিসেবে সমাজে গারো সমাজে পরিচিতি লাভ করেন।[১০]

রাজশাহীর বরেন্দ্র গবেষণা সংগ্রহশালায় নকশি কাঁথা দান করেছেন মোছাঃ হাজেরা বেগম স্বামী-মোঃ আব্দুর রউফ সরকার গ্রাম-সৈয়দ দমিপাড়া (সরকার পাড়া, শিবগঞ্জ বগুড়া)। রাজশাহীর মাস্টারবাড়ি থেকে আজমিরী বেগম দান করেছেন বঙ্গ লক্ষীঝাপিটি। রাজশাহীর বরেন্দ্র গবেষণা সংগ্রহশালায় পবিত্র কোরআন শরিফ পরিমাপ: দৈর্ঘ্য ২৭ মিলি মিটার, প্রস্থ ২০ মি.লি মিটার, উচ্চতা ১০মিলি মিটার, দান করেছেন জনাব খন্দকার জয়নুল আবেদিন। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে আঠার শতকে নির্মিত আরবি লিপিযুক্ত চীনামাটির ডিশটি মৌলভী আবুল হাসনাত আহমেদ খান সাহেব উপহার হিসেবে দান করেন। সুতরাং উপাদান সংগ্রহের অন্যতম মাধ্যম হলো উপহারে পাওয়া উপাদান। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে পাওয়া নির্দশনসমূহের একটি বিবরণ সারণির মাধ্যমে তুলে ধরা যেতে পারে।

সারণি-১

µ. bs	msMn b¤i	msM‡ni ZwiL	wb'k‡bi weeiY	msM‡ni aiY	Dcnvi 'vZvi bvg	cwß¯vb	cwigvc	mgqKvj
১	জ-২০০২.১৮০	০৯.০৬.০২	মৃৎশিল্প পোড়ামাটি হাতি, আরোহীসহ	উপহার	মরণ চাঁদ পাল	ঢাকা	উচ্চ.৫৬ সেমি	একবিংশ শতাব্দী
২	জ-২০০২.১৮৮	০৯.০৬.০২	মৃৎশিল্প: পোড়ামাটি মা ও শিশু	উপহার	মরণ চাঁদ পাল	ঢাকা	উচ্চ.৫৬ সেমি	একবিংশ শতাব্দী

µ. bs	msMn b¤i	msM‡ni ZvwiL	wb‘k‡bi weeiY	msM‡ni aiY	Dcnvi ‘vZvi bvg	cwß¯’vb	cwigvc	mgqKvj
৩.	জ.২০০২.১৯১	০৯.০৬.০২	জনজীবন নিদর্শন: হাতের আংটি	উপহার	জনাব মো. বিল্লাল হোসেন বিক্রমপুরী	নারায়ণগঞ্জ	আংটির ব্যাস ১.৫ সেমি	একবিংশ শতাব্দী
৪.	জ.২০০২.৩২	২০.০৩.০২	নকশি কাঁথা: সুতি; জায়নামাজ	উপহার	শামসুর নাহার বেগম	চাপাইনবাবগঞ্জ	দৈ:১১৮ সেমি, প্র: ৫৮.৫ সেমি	বিংশ শতাব্দী
৫.	জ.২০০২.৩৩	২০.০৩.০২	নকশি কাঁথা: সুতি; ওয়াল ম্যাট	উপহার	শামসুর নাহার বেগম	চাপাইনবাবগঞ্জ	দৈ:৪৬ সেমি, প্র: ৩৩ সেমি	বিংশ শতাব্দী
৬	জ.২০০২.১৬৫	২০.০৫.০২	অংলকার; খাদযুক্ত রৌপ্য, হাতের বাহুর অলংকার	ক্রয়		ছাতক সিলেট	৩১ তোলা/ ৩৬১.৪৬ গ্রাম	বিংশ শতাব্দী
৭.	জ.২০০২.১৬৫	২০.০৫.০২	অংলকার; খাদযুক্ত রৌপ্য, মান্তাসা	ক্রয়		কক্সবাজার	১২ তোলা/ ১৩৯.৯২গ্রাম	বিংশ শতাব্দী
৮.	জ.২০০২.১৬৫	২০.০৫.০২	ধাতব শিল্পকর্ম: ধাতব ও কাঠ, হুক্কা,নকশাযুক্ত	ক্রয়		কুমিল্লা	উ.১০৯.৫ সেমি	বিংশ শতাব্দী
৯.	ই.২০০২.২৭৪	২৩.১১.০২	মুদ্রা: স্বর্ণ; আব্বাসীয় খলিফা আল মুকতাফী বিল্লাহ	ক্রয়		ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ওজন ৪.২৫ গ্রাম	২০০২ খ্রি.
১০	স.২০০২.২১৭	২৬-০৭-০২	বিশ্বসভ্যতার নিদর্শন: অর্নামেন্ট বক্স: প্লাস্টিকের ঝিনুকের কারুকাজ খচিত	উপহার	মি. থাকসিন সিনা ওয়াত্রা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, থাইল্যান্ড	থাইল্যান্ড, চীন থেকে ঢাকায় উপহার হিসেবে প্রেরিত	১১	

জাতীয় জাদুঘরে ২০০২ সালে নিদর্শন সংগ্রহ ও কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ[১১]

ক্রয়

সংগ্রহশালার জন্য নিদর্শন ক্রয় করে উপাদান সংগ্রহ করা আরেকটি মাধ্যম। সংগ্রহশালা কর্তৃপক্ষ (সরকার) নির্দিষ্ট অর্থ বাজেটের মাধ্যমে সংগ্রহশালার নিদর্শনের জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পছন্দমত উপাদান মালিকের কাছ থেকে দলিল করে ক্রয় করতে হয়। উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে যে, এই ক্রয়কৃত উপাদানের ওপর বিক্রেতার কোনো অধিকার থাকে না। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরসহ বিভিন্ন সংগ্রহশালায় বিভিন্ন সময়ের স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা বিশেষ করে আব্বাসীয় খলিফাদের সময়ের প্রাপ্ত এবং মৌর্য যুগের অসংখ্য মুদ্রা ক্রয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা।[১২] বাংলা একাডেমির লোক ঐতিহ্য সংগ্রহশালা, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, বরেন্দ্র গবেষণা সংগ্রহশালা, লোক ও কারুপল্লী ফাউন্ডেশনের বেশির ভাগ উপাদানই ক্রয়কৃত। কখনও কখনও ঋন হিসেবেও সংগ্রহশালায় নিদর্শন সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। অবশ্য এ ধরনের ঋণ সাময়িক, স্থায়ী অথবা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হতে পারে। অনুরূপভাবে বিনিময়ের মাধ্যমেও নিদর্শন সংগ্রহ করা হয়। এক প্রতিষ্ঠান থেকে অন্য প্রতিষ্ঠানের নিদর্শন বিনিময়ে মাধ্যমে নিদর্শন সংরক্ষণ করা হয়।

৩ (খ) নথিভূক্তকরণ (Registration) বা দলিলীকরণ

সংগ্রহশালার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজের অংশ হলো সংগ্রহশালার নিদর্শনসমূহ নথিভুক্ত বা দলিলিকরণ করে তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা। এ কাজটিতে জাদুঘরের কিউরেটিয়াল বিভাগগুলোকে প্রাথমিকভাবে সহায়তা করে থাকে (Offfice of the Registrar) রেজিস্ট্রেশন বা নিবন্ধন শাখা।. মাঠ পর্যায় থেকে সংগ্রহকৃত, ক্রয়কৃত অথবা দানে প্রাপ্ত যে ধরনের নিদর্শন হোক না কেন সংগ্রহশালায় তা আসা মাত্রই সেটা নিয়ে আসা হয় রেজিস্ট্রার অফিসে।[১৩] এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো এই যে, সাধারণত সংগ্রহশালায় নিদর্শন ঢোকার জন্য আলাদা দরজা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সে দরজা দিয়ে দর্শকরা সংগ্রহশালায় প্রবেশ করবে না এবং সে দরজা দিয়ে নিদর্শনসমূহ বাইরেও যেতে দেয়া হয় না।[১৪] দর্শকদের প্রবেশ পথ যদি পূর্বদিকে হয় তাহলে উপকরণ ও নিদর্শন প্রবেশের দরজাটি হবে পশ্চিম দিকে। এই প্রবেশ পথটি কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা রাখা হবে। সংগ্রহশালায় আসা নিদর্শনগুলো সাময়িকভাবে যে ভাবে নিয়ে আসা হয় সেভাবেই রেখে দেয়া হয়। পরে প্রতিটি নিদর্শনের ছবিসহ প্রাথমিক তথ্য একটি নির্ধারিত ফর্মের মধ্যে দুই কপি করে লিপিবদ্ধ করা হয়। রেজিষ্ট্রেশন অফিসার যথাযথভাবে প্রত্যয়নের পর নিদর্শনটি উক্ত ফরমের উপকরণের মধ্যে বিষয়ভিত্তিক নমুনাগুলো আলাদা করে নথিভুক্তকরণ করেন।[১৫]

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নির্দশন সংগ্রহের দায়িত্ব পালন করে থাকে Exploration Branch-এর দায়িতপ্রাপ্ত কিউরেটিয়াল বিভাগগুলো। সুতরাং যে কোনো নিদর্শন সংগ্রহশালায় আসা মাত্রই সংশ্লিষ্ট কিউরেটরিয়াল বিভাগ তা সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

নিদর্শন সংগ্রহের দুটি দিক রয়েছে

১. স্টোরেজ বা গুদামজাতকরণ ও ২. নিরাপত্তা

লক্ষণীয় বিষয় হলো, সংগ্রহকৃত উপকরণগুলোর মধ্যে যদি কোনো উপাদান অধিক পুরাতন ও অপ্রতুল থাকে তাহলে সে নমুনাগুলো যথেষ্ট গুরুত্ব ও সাবধানতার সাথে নথিভুক্তকরণ করা হয়। তাছাড়া সংগ্রহকৃত উপাদানটির জন্য কয়েকটি বিশেষ পদক্ষেপ নেয়া জরুরি। দর্শক ও গবেষকগণ সহজেই যেন উপাদানটির মূল্যায়ন করতে পারে।[১৬]

সংগৃহীত উপকরণগুলিকে প্রথমে মূল নথিভুক্তকরণ খাতায় লিপিবদ্ধ করে নথিভুক্ত নম্বরটি লিখতে হবে। কি উপায়ে উপাদানটি সংগৃহীত হয়েছে তাও উল্লেখ করতে হবে। উপাদানটি যদি কেনা হয়ে

থাকে তাহলে তার দাম লিখতে হবে। যদি দানের মাধ্যমে উপাদান সংগৃহীত হয় সেটাও লিখে উপাদানটির বাজার দাম উল্লেখ করতে হবে। মূল নথিভুক্তকরণ খাতায় লেখার পর এগুলো পুনরায় বসীকরণ খাতায় লিখতে হবে। প্রতিটি বিষয় আলাদাভাবে আলাদা খাতায় লিখে বিষয় অনুযায়ী একই বিষয়ের উপাদানগুলির নাম একটি খাতায় আবার লিপিবদ্ধ করতে হবে। বসীকরণ খাতায় একই বিষয়ে উপাদান যেভাবে লিপিবদ্ধ হবে, সেইভাবে ক্রমানুযায়ী ১,২,৩,৪ ইত্যাদি লিখতে হবে।[১৭]

ইনডেক্স কার্ড ও কাটালগ কার্ড

ডকুমেন্টশন এর দুইটি উল্লেখযোগ্য কাজ হলো ইনডেক্স কার্ড ও কাটালগ কার্ড তৈরি করা। সংগ্রহশালার সংরক্ষিত উপাদান গবেষকদের সরাসরি হাতে না দিয়ে ইনডেক্স কার্ড ও ক্যাটালগ কার্ডের মাধমে সেই সর্ম্পকে তথ্য প্রদান করা হয় । সাধারণত ক্যাটালগ কার্ড উন্নতমানের মোটা কাগজের তৈরি হয়ে থাকে। ক্যাটালগ কার্ডে যে বিষয়গুলো উল্লেখ করতে হয় তা নিম্নরূপঃ

১. যে উপাদানটির জন্য কার্ড তৈরি করা হয় উপাদানটির নাম, নির্মাণ উপাদান, নির্মাণ সময়কাল, সংগ্রহের ধরণ, গঠন, প্রাপ্তিস্থানের নাম, সাইজ, উচ্চতা ইত্যাদি নথিভুক্তকরণ খাতায় নম্বর উল্লেখ করতে হবে।[১৮]

২. উপাদানটির বর্তমান অবস্থান কোথায় সে সম্পর্কে উল্লেখ করতে হবে। যদি উপাদানটি প্রদর্শনীতে থাকে তাহলে কত নম্বর প্রদর্শনী আছে সেটা উল্লেখ করতে হবে।

৩. বাক্সের নম্বর, প্রদর্শনী কক্ষের নম্বর, যে বাক্সে-এ উপাদানটি রয়েছে সেটাও উল্লেখ করতে হবে।

৪. উপাদান যদি প্রদর্শনীতে না থাকে তবে সেটা গুদাম কক্ষের কোথায় রয়েছে সেই স্থানটি সম্পর্কে উল্লেখ করতে হবে।

৫. উপাদান সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্য লিপিবদ্ধ হবে খুবই সংক্ষিপ্ত আকারে।

৬. ক্যাটালগ কার্ডের সামনের দিকে যে সব তথ্য থাকে তা হলোঃ ক্যাটালগকারী ক্রমিক সংখ্যা অনুসারে ধারাবাহিকভাবে উপাদানগুলির নাম লিখতে হবে এবং সে অনুযায়ী ক্যাটালগ নম্বর বসাতে হবে।

৭. 'মূল নথিভূক্তকরণ' খাতায় উপাদানসমূহের বিষয় উল্লেখ করতে হবে। বসীকরণ, উপাদানটি যে বিষয়ের সেই বিষয় অনুযায়ী ইনডেক্স কার্ড করা হয়েছে-এর নম্বর উল্লেখ করতে হবে।

৮. মূল উৎস, অর্থাৎ উপাদানটি তৈরির কারণ সর্ম্পকে তথ্যগুলি লিপিবদ্ধ করতে হবে। যেমন ধর্মীয় প্রয়োজনে ব্যবহৃত হলে, কোন ক্ষেত্রে তা ব্যবহৃত হয় ইত্যাদি।

৯. ইতিহাস ফাইল নং, অর্থাৎ কোনো উপাদান সর্ম্পকে যদি কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা কিংবা অন্য কোনো ঘটনা জড়িত থাকে সেটা লিপিবদ্ধ করে ফাইলে রাখা হয়, সেই ফাইল নং এখানে উল্লেখ থাকতে হবে।

১০. উপাদান বস্তুটি কিভাবে তৈরি, কাগজ না কাপড়ে, কোন সময়ের উপাদান সে বিষয়ে উল্লেখ করতে হবে। প্রদর্শনী উপাদানটি সর্ম্পকে পেপার পত্রিকা, বই কোথাও কোনো তথ্য যদি প্রকাশিত হয়ে থাকে সেটা উল্লেখ করতে হবে।

১১. প্রতিটি উপাদানের ছবি থাকা জরুরি। মূল নথি খাতায় ছবির নেগেটিভ নম্বর লিখে রাখতে হবে।[১৯]

১২. বর্তমানে নথিভূক্তকরণ খাতা ছাড়াও কম্পিউটারের মধ্যে সমস্ত নথিপত্রের তালিকা নির্দিষ্ট ফাইল করে সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

৩(গ) নিদর্শন পরিচিতি ও ব্যাখ্যাকরণ (Interpretation)

লোকসংগ্রহশালার নিদর্শন দর্শকদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া সংগ্রহশালার গুরুত্বপূর্ণ কাজের একটি অংশ। এ কারণে অবশ্যই নির্দশনের পরিচিতি এবং ব্যাখ্যাকরণ প্রয়োজন। যে কোনো লোক ও কারু শিল্পের নিদর্শন সংগ্রহের সময় স্থান, সময়, উপাদান বস্তুটিকে পুঙ্খানুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হয়। যাতে দর্শক ও গবেষকরা খুব সহজেই যেন উপাদানটি সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে পারেন। এসব নিদর্শনের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানদের ব্যবহারিক ও ধর্মীয় জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট উপাদানসূমহ আলাদা করে পরিচয় করিয়ে দেবার লক্ষ্যে সেভাবে নিদর্শন পরিচিতি ও ব্যাখ্যাকরণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বাংলাদেশে বসবাসরত হিন্দু মুসলমানের একই সংস্কৃতি। শুধু মাত্র ধর্মীয় অনুশাসনের পার্থক্য রয়েছে। নকশিকাঁথা, আলপনা, নকশি পাখা, ধাতবের তৈরি তৈজসপত্র, মৃৎপাত্র যায় বলা হোক না কেন দুই ধর্মের মানুষ এর ব্যবহার একইভাবে করে। ব্যবহারিক, নান্দনিক কাজে নির্মিত অনেক নিদর্শনসমূহ লোক ও কারুশিল্পের পর্যায়ভুক্ত হলেও মুসলমানদের ধর্মীয় জীবনের সাথে এর সংশ্লিষ্টতা থাকে। যেমন শীতলপাটি ও কাপড়ের ওপর সুতার কাজে তৈরি জায়নামাজ, কাঠের তৈরি রেহেল, যুদ্ধে ব্যবহৃত কারুকার্যময় ছোরা, ধাতবের ওপর আরবিলিপিমালায় তৈরি নকশাকৃত গ্লাস, মসলিন, বিভিন্ন ধরনের মুসলমানদের ব্যবহারিক পোশাক উল্লেখযোগ্য। এটা ঠিক যে বাংলাদেশে মসলিন কাপড়ের প্রসার ঘটেছিলো মুসলমান শাসকদের শাসনামলেই। সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীদের ব্যবহারিক বস্ত্র ছিলো মসলিন। মসলিনের ব্যবহার ও এর ইতিহাস সম্পর্কে লিখিতভাবে পরিচিতি তুলে ধরতে হবে। মুসলমানগণ রেহেল কী কারণে ব্যবহার করে থাকেন এ সম্পর্কেও ব্যাখ্যা থাকা প্রয়োজন। দেখা গেছে আদিম সমাজ থেকে মানুষ লড়াই করে

সমাজে টিকে থাকতে হয়েছে। আদিম সমাজে মানুষ বল্লমের সাহায্যে পশুপাখি শিকার করে খাদ্যের প্রয়োজন মিটিয়েছে। পরবর্তীতে মানুষের সাথে মানুষের লড়াই করার ক্ষেত্রেও অস্ত্রের প্রয়োজন পড়েছিলো। কালক্রমে সমাজে এসেছে নানা ধরনের অস্ত্রশস্ত্র। ঢাল, তরোয়াল, তীর, ধনুক, ছোরা, বন্দুক, কামান ইত্যাদি ধরনের হাজারো উপাদান। ইসলাম ধর্ম আবির্ভাবের পর মহানবি (স.) স্বয়ং যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে যুদ্ধ করেছেন। সুতরাং ইসলামে শত্রু মোকাবেলায় অস্ত্র হাতে তুলে নেয়ার বিধান সব ধর্মেই রয়েছে। দিন বদলের সাথে সাথে মেধাবী মানুষগুলো যুদ্ধে ময়দানের জন্য আত্মরক্ষার জন্য সৃষ্টি করেছে উন্নত থেকে উন্নতর অশ্রসস্ত্র। এর মধ্যে ছোরা ও তলোয়ারের বাটে কারুশিল্পীরা আরবিলিপিমালায় লেখা আল্লাহর বাণী নকশা ও অলংকরণে সমৃদ্ধ করে মুসলমানদের জন্যেই তৈরি করা হয়েছিলো এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে। পবিত্র কোরআন, শিলালিপি, মিনিয়েচার, পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে সঠিক তথ্য তুলে ধরতে হবে। আরবি লিপিমালার মধ্যে কোনটি তুঘরা, কোনটি নখস এবং কোনটি কুফিক লিপিমালায় লিখিত হয়েছে সে সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে সঠিক ব্যাখ্যাকরণ অত্যন্ত জরুরি। কারণ এ সব নিদর্শন দেখে মানুষ শিক্ষা লাভ করে এবং গবেষণার উপাত্ত হিসবে গবেষণগণ ব্যবহার করে থাকেন। বর্তমান বিশ্ব আজ বিজ্ঞানের সাথে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে গেছে বহুদুর। আজ হতে শতবর্ষ আগে মানুষ সম্পূর্ণভাবে লোক ও কারুশিল্পের উপর নির্ভরশীল ছিলো। মানুষের ব্যবহারিক, নান্দনিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত প্রতিটি জিনিস ছিলো হাতে তৈরি। শিল্পবিপ্লবের কারণে মানুষ যান্ত্রিকভাবে তৈরি বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। ধীরে ধীরে অনেক লোক ও কারুশিল্পের চাহিদা কমতে কমতে এমন পর্যায় এসে পৌঁছে গেছে যে বাংলাদেশের অনেক লোকশিল্পই আজ বিলুপ্তির পথে। ফলে সূদুর অতীত কাল থেকে বাংলার নানা অঞ্চলের মানুষের ব্যবহৃত মৃৎশিল্প, ধাতবশিল্প, দারুশিল্প, নকশি কাঁথা শীতলপাটি হারিয়ে যাওয়া অপ্রতুল লোকশিল্প বর্তমান সময়ে লোকসংগ্রহশালায় সংরক্ষণের জন্য সংগ্রহ করার প্রয়োজন পড়েছে। তাই লোকসংস্কৃতি চর্চার অন্যতম বিষয় লোকশিল্পভিত্তিক সংগ্রহশালার গুরুত্ব বর্তমানে অনেক বেশি। উপাদান বা নিদর্শনটি সুবিন্যস্ত করে গ্যালারিতে এমনভাবে সাজিয়ে রাখা প্রয়োজন যেন নিদর্শনটি দেখা মাত্রই দর্শক নিদর্শনটি সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানতে পারে।

উপাদান সংগ্রহের সময় সংগ্রাহক যে বিষয়গুলো লিখিতভাবে তালিকা প্রস্তুত করবেন তা নিম্নরূপ:

c_gZ, উপাদানটির স্থানীয় নাম কি ও উপাদানটির ব্যবহারিক উপযোগিতা।

wØZxqZ, সংগৃহীত উপাদানটির প্রাপ্তি ঠিকানা, স্থান, থানা, জেলা, বিভাগ ইত্যাদি।

ZZxqZ, যে ব্যক্তির কাছ থেকে উপাদানটি সংগ্রহ করা হবে, তার নাম, ঠিকানা, পেশা, জাতি, বয়স ইত্যাদি।

PZ_Z, উপাদানটির তৈরি পদ্ধতি ও উপকরণের বিস্তারিত বিবরণ। যেমন তৈরি কারকের নাম, ঠিকানা, পেশা, জাতি ইত্যাদি।

cÂgZ, উপাদানটি তৈরি করতে কতদিন সময় লেগেছে এবং কতদিন আগে তৈরি হয়েছে।

lôZ, সংগৃহীত উপাদানটি তৈরি করতে কি কি উপকরণ ব্যবহার করতে হয়েছে।[২০]

mßgZ, উপাদানগুলোর শ্রেণি বিন্যাস করা। যেমন নকশি কাঁথা ভিত্তিক উপাদান, মৃৎশিল্পের পর্যায়ভুক্ত নানা উপাদান ইত্যাদি।

AógZ, উপাদানগুলির ক্ষেত্র নির্ধারণ। যে অঞ্চল থেকে উপাদানটি সংগ্রহ করা হয়েছে সেই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নির্ণয় করা। রাজশাহী জেলা থেকে যদি সঁখের হাড়ি সংগ্রহ করা হয়ে থাকে তাহলে রাজশাহী অঞ্চলের ঐতিহাসিক পটভূমি বর্ণনা করতে হবে।

begZ, লোকশিল্পীর সাথে লোকশিল্পের কতখানি সম্পৃক্তা রয়েছে তা খুঁজে বের করা। যেমন লোকশিল্পীর বাসস্থান, বর্ণ, গোত্র, বয়স, মূল পেশা ইত্যাদি।

'kgZ, উপাদান নির্মাণের মূল কারণ, বাণিজ্যিক সম্ভাবনা, বাজারের প্রসারণ ইত্যাদি।

GKv'kZg, পারিবারিক পরিচয়, কর্মী সংখ্যা, আর্থিক মান, কৃষি ও শিল্পের পারস্পারিক নির্ভরশীলতা

Øv'kZg, উপাদানের উপকরণ। রঙ, রঙের তাৎপর্য, প্রসাধন।

Î‡qv'kZg, উপাদান প্রদর্শনের উপযুক্ত গ্যালারি নির্মাণ। শ্রেণিবিন্যাস, আসন নির্মাণ, সংরক্ষণের ব্যবস্থা। পরিচয় লিপি প্রস্তুতকরণ, সংগ্রহের কাল, সংগ্রাহকের নাম, ঠিকানা, বয়স, বর্ণ, শিক্ষা ইত্যাদি।

PZ'kZg, সংগৃহীত উপাদানের বিস্তৃত তালিকা, সূচক সংখ্যা ইত্যাদি সূচকপত্রে নিবন্ধীকরণ।

এরপর বিস্তারিত বিবরণসহ সংগ্রাহক নিদর্শন সংগ্রহ করে সংগ্রহশালায় জমা দেবেন।

উপাদান সংগ্রহের পর সংগ্রাহক কয়েকটি বিশেষ প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে থাকেন।[২১] সংগ্রাহক এ সব তথ্য সংগ্রহের সময় রেকর্ডার, ভিডিও ক্যামেরা, মোবাইল ফোন ইত্যাদি ব্যবহার করে সঠিকভাবে কাজ সম্পন্ন করতে পারেন। উপাদান সংগ্রহের সময় একটি কাগজে তথ্যগুলি নথিভুক্ত করে উপাদানের সাথে আটকে দিতে হবে। উপাদানটি ছোট হলে প্যাকেটের মধ্যে উপাদানের তথ্যসহ তালিকাটি আটকে দিতে হবে। এছাড়াও তথ্য সংগ্রহের সময় সংগ্রাহক যদি ভিডিও ক্যামেরা ও টেপরেকর্ডার ব্যবহার করে থাকে তাহলে রেকর্ডকৃত অংশ সিডি করে উপাদানের সাথে সংযুক্ত করে দিতে পারবেন।[২২]

৩(ঘ) উপাদান সংরক্ষণ (Conservation)

কোনো উপাদান বিশেষভাবে সংরক্ষণ (Conservation) প্রক্রিয়াকে মূলত দুইভাবে করা হয়ে থাকে।

প্রথমত: উপাদানকে সযত্নে সুরক্ষা করা (Preservation)

দ্বিতীয়ত: নষ্টের হাত থেকে উপাদান পুনরুদ্ধার করা (Restoration)

কোনো উপাদান বাহিরের ঘাত প্রতিঘাত থেকে রক্ষা করা সংগ্রহশালার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজের অংশ। তাই উপাদান সংরক্ষণের জন্য সংগ্রহশালার নিজস্ব রসানাগার খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ।[২৩] এই বিভাগ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উপাদান সংরক্ষণের কাজটি সম্পন্ন করে থাকে। তবে বাংলাদেশে বেশির ভাগ সংগ্রহশালায় এখন রসায়নাগার বিভাগ প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় অনেক উপাদানই সংরক্ষণ করা জাদুঘরকর্মীদের পক্ষে সম্ভব হয় না। বাংলাদেশে কেবলমাত্র বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সুরক্ষণ ও নিদর্শন পুনরায়নের উদ্দেশ্যে ১৯৭৫ সালে সংরক্ষণ রসানাগার বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। (চিত্র ৯)

চিত্র-৮: জাতীয় জাদুঘর সংরক্ষণ রসানাগার বিভাগ

এই বিভাগে যারা কাজ করে থাকেন তাদের বেশিরভাগ কর্মকর্তাই রসায়নে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী এবং এ বিষয়ে বিশেষ ট্রেনিংপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন। রসায়নাগার বিভাগের দায়িত্ব হলো নিদর্শন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা, নিদর্শনের অনুকৃতি তৈরি করা, গ্যালারি ও স্টোরের আলো, আদ্রতা ও তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রন করা এবং ক্ষতিকর পোকামাকড় নিধনের ব্যবস্থা করা। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের এ বিভাগে পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতির অভাব ও দক্ষ জনবলের স্বল্পতা রয়েছে। এই বিভাগ থেকে ।বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে নিদর্শন সংরক্ষণ সংক্রান্ত গবেষণা, সংরক্ষণ বিষয়ে পরামর্শ ও প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ওয়ার্কশপ, সেমিনার ও বিশেষজ্ঞ বক্তৃতার আয়োজনের ব্যবস্থা করা হয়।

বস্তুত বাংলাদেশের আবহাওয়াজনিত কারণে সব ধরনের উপাদান খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। বিশেষ করে লোক ও কারুশিল্পের বেশিরভাগ নিদর্শন নির্মাণ উপাদানের কারণে খুব বেশিদিন টিকে থাকতে পারেনা।[২৪] এ কারণে লোকশিল্পভিত্তিক উপাদানগুলো পুনরায়নের মধ্যে টিকিয়ে রাখতে হয়। কোনো নিদর্শন প্রাথমিকভাবে রক্ষার জন্যে সংগ্রহশালাকক্ষ, প্রদর্শনী বাক্স ও শোকেস পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। প্রতিদিন জীবানুনাশক ঔষধ যেমন ফিনায়েল, সেভলন, রক, দিয়ে প্রদর্শনী কক্ষ ও প্রদর্শনী বাক্স পরিস্কার করা উচিত। টিকটিকি, তেলাপোকা, ইদুর, নানাধরনের পোড়ামাকড়ের হাত থেকে রক্ষা পেতে কীটনাশক ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এছাড়াও সূর্যের আলো যাতে কোনো উপাদানের ওপর গিয়ে না পড়ে সে দিকে বিশেষ লক্ষ রাখা প্রয়োজন। সংগ্রশালার জন্যে তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা মাপার জন্য থার্মোমিটার, সাইক্রোমিটার, হেয়ার হাইড্রোমিটার ও থার্ম-হাইড্রোমিটার যন্ত্র ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

লোকসংস্কৃতি সংগ্রহশালার জন্য ২০°- ৩৫° ডিগ্রী হলো সঠিক তাপমাত্রা। তবে বিভিন্ন উপাদানের তাপমাত্রার পার্থক্য নির্ভর করে বাতাসে ৪৫-৬০ শতাংশ আর্দ্রতার উপাদানগুলি স্বাভাবিক ভাবে থাকে। অতিরিক্ত তাপমাত্রায় সংগ্রহশালার জানালা-দরজা বন্ধ রেখে ফ্যান, এসি চালিয়ে আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে।[২৫] চিত্রিত উপাদান, সুতি কাপড়ের উপাদানের ক্ষেত্রে ৫০ লাক্স এর বেশি আলো ব্যবহার করা উচিত নয়। অন্যান্য উপাদানের ক্ষেত্রে ১৫০ কীটপতঙ্গের হাত থেকে রক্ষার জন্য Respira poison, Conatct poison এবং Stomach poison করা হয়ে থাকে। Respira Poison এর ক্ষেত্রে পেরা ডায়াক্লোরো বেঞ্জিন ($C_6H_6Cl_2$) থামইল প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়। Contact এর ক্ষেত্রে ডি.ডি.টি.বি.এইচ.সি, পামওয়েল ইত্যাদি ব্যবহার হতে পারে এবং Stomach Poison এর ক্ষেত্রে বেগন (Began) জিঙ্ক ফসফাইড (ZnPh) এলড্রিন (Aldrin) প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া সংরক্ষিত উপাদান অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হলে সেই উপাদানটিকে 'সংরক্ষণ বিভাগে' পাঠানো হয়ে থাকে।

ধাতু শিল্প সংরক্ষণের জন্য তিনটি পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে:

১. দ্রাবক ব্যবহার রাসায়নিক, ২. তড়িত বিজারণ, ৩. যান্ত্রিক পদ্ধতি

ধাতব দ্রব্য আর্দ্র ও অক্সিজেন যুক্ত পরিবেশে বেশিদিন থাকলে খুব দ্রুত বিবর্ণরূপ ধারণ করে। বস্তুত ধাতব অক্সসাইডের পাতলা আস্তরণ পড়ার ফলে এ ধরনের পরিবর্তনটি দেখা দেয়। ধাতুর অক্সসাইড ধর্মে ক্ষারীয় সাধারণত ঘন ও লঘু হাইড্রোক্লোরিক ও সালফিউরিক লাগানো হলে ধাতুর অক্সসাইড দ্রবীভূত হয়ে যায়। এছাড়া ক্লোরিণ ব্যবহারেও আস্তরণ দ্রবীভূত হয়ে থাকে। দ্রাবক ব্যবহারের ফলে

আস্তরণটি নরম হয়ে গেলে ধাতব ছুচাঁলো বস্তু দিয়ে ওপরের অংশ পরিস্কার করা যায়। এ জন্যে ডিজেল ব্যবহার করা হয় ব্রাশের সাহায্যে। পরে বস্তুটিকে ধুয়ে পরিস্কার করে নিতে হয়। বস্তুটি পরিস্কার করা হয়ে গেলে তাপ ও অ্যাসিটোন দাহ ব্যবহার করে শুকানো হয়ে থাকে।

ধাতু শিল্পকে সালফার গ্যাস ও ধুলাবালিমুক্ত পরিস্কার, পরিমিত আদ্র ও তাপমুক্ত স্থানে সংরক্ষণ করা অত্যন্ত জরুরি। বয়ন শিল্পের উপাদানের মধ্যে নকশি কাঁথা ও শাড়ি কৃত্রিম আলোতে প্রদর্শিত করা হয়। এই শিল্প সংরক্ষণে সঠিকভাবে যত্নের প্রয়োজন। সাময়িকভাবে ন্যাপথলিন ও আদ্রতার জন্য সিলিকাজেল ব্যবহার করা যায়। এছাড়াও ধুলাবালি নিবারণের জন্য ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ব্যবহার করা জরুরি।[২৬]

প্রতিদিন দর্শকের প্রদর্শনী কক্ষে প্রবেশের আগে এবং প্রদর্শনী শেষে আবার পুনরায় কক্ষটি পরিস্কার করানোর ব্যবস্থা থাকে। সংগ্রহশালায় সূর্যের আলো সরাসরি যে কোনো প্রদর্শন কক্ষে প্রবেশ করলে উপাদানগুলোর দ্রুত ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং সংগ্রহশালায় যথেষ্ট বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবহারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। সাধারণভাবে প্রদর্শনী বাক্সে সিলিকাজেল ব্যবহার করা হয় আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যে। তবে সংগ্রহশালায় বৈদ্যুতিক আলো ব্যবহারের নিয়ম অনুযায়ী প্রদর্শনী বাক্সের মধ্যে কোনো বাড়তি আলো ব্যবহার করা উচিত নয়। যদি প্রদর্শনী বাক্সে আলোর প্রয়োজন পড়ে তাহলে টিউব বা এনারর্জি বাল্ব ব্যবহার করা অন্য কোনো আলো ব্যবহার করা ঠিক নয়। [২৭]

৩(ঙ) পুনরুদ্ধার করা (Restoration)

নষ্ট হয়ে যাওয়া উপাদান পুনরুদ্ধার করা যে কোনো সংগ্রহশালার জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজের অংশ। প্রতিটি নিদর্শন হলো নিরাময়মূলক সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারের কাজটি হয়ে থাকে জ্ঞানসম্মত উপায়ে Conservation Laboratoy তে। লোকসংগ্রহশালার নিদর্শন জৈব ও অজৈব ধারায় বিভক্ত করা হয়ে থাকে। যেমন পুঁথি, কাঠ, বাঁশ ইত্যাদি শিল্প জৈব আর ধাতু বা মাটির তৈরি নিদর্শন অজৈব শিল্প। এই দুই ধরনের নির্দশনের জন্য রসায়নবিদরা আলাদা আলাদা পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকেন। জাতীয় জাদুঘরের জ্ঞানভিত্তিক সংরক্ষণ ও পুনরায়নের আওতায় ২০১০ সাল পর্যন্ত চারটি শাখা জাদুঘর ও দেশের অন্যান্য জাদুঘরের মাত্র ২২ হাজার নিদর্শনের সংরক্ষণ করতে পেরেছে।[২৮] পুঁথি সাধারণত তিন ধরনের উপাদান দিয়ে তৈরি হয়। তালপাতা, ভূর্জপত্র ও তুলোট কাগজ। পুঁথি চিত্রে তাল পাতার ব্যবহারই সবচেয়ে প্রাচীন। বিভিন্ন কারণে এই সব পুরনো পুঁথি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে। তালপাতাগুলি কার্বন কালি দিয়ে লেখা হলে ক্ষতিগ্রস্থ অংশগুলি

শিফন কিংবা সিল্ক আঠার দিয়ে লাগালে ক্ষতিগ্রস্থ অংশগুলি শক্ত হয়ে যায়। তবে কোনো উপাদান যদি ভেঙ্গে বা ছিঁড়ে যায় তাহলে সেই অংশটি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দক্ষকর্মী দিয়ে সারিয়ে নিয়ে পূর্বের আকৃতিতে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের অনেক শিল্পকর্ম পুনরায়ন করেছে। বয়সের ভারে ও এদেশের উচ্চ তাপমাত্রার কারণে অনেক চিত্রকর্ম বায়োলজিক্যাল, ফিজিক্যাল ও কেমিক্যাল প্রক্রিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সংরক্ষণ সম্পর্কীয় জ্ঞান ও সুযোগের অভাবে হয়ত এক দশকের মধ্যে নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিভিন্ন ধরনের জলরঙের চিত্রগুলো থায়মল ফিউমিগেশন গৃহে দু'সপ্তাহ থায়মল দিয়ে ধূমায়িত করা হয়। এই গৃহ থেকে চিত্রকর্মগুলো বের করে নরম স্যাবল হেয়াল ব্রাশ দিয়ে ছত্রাক স্পোর, কীট ও এর বর্জ্য পরিস্কার করা হয়। এরপর মখমল কাপড় ও তুলা দিয়ে ঘষে তুলে ফেলা হয়। এ প্রক্রিয়ায় সুপারফিসিয়াল ময়লার আবরণ পরিস্কার হয়ে যায়।

(চিত্র ৩) আলোকচিত্রের সাহায্যে জাতীয় জাদুঘরের একটি নিদর্শন উদাহরণ স্বরূপ দেখানো যেতে পারে। এখানে একটি বিবর্ণ হয়ে যাওয়া ফুলদানি পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হয়েছে। যা হোক উপাদানকে অবশ্যই ধুলোবালি, দূষণ, আর্দ্রতা, তাপমাত্রা, আলো ও জীব জগত থেকে দূরে রাখতে হবে। কেননা উপাদান ধুলাবালি জমে সবচেয়ে বেশি নষ্ট হয়ে যায়।[২৯]

চিত্র-৯: পুনরুদ্ধারকৃত ফুলদানি

৩(চ) গুদামজাতকরণ (storage)

সংগ্রহশালার জন্য নিদর্শন সংগ্রহ করা এটি চলমান একটি প্রক্রিয়া। আধুনিক যুগে গুদামঘর এবং প্রদর্শনী কক্ষ একইরকম করে সাজানো হয়ে থাকে। সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠার শুরুতে সব নিদর্শন গুদামঘরেই থাকতো এবং এভাবেই দর্শকরা উপাদান প্রদর্শন করতো। পরবর্তীতে গুদামঘর এবং প্রদর্শনী কক্ষ আলাদা করা হয়েছে। সংগ্রহশালার জন্য সব ধরনের নিদর্শন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই সংগ্রহশালায় নিদর্শন আসা মাত্রা সংগ্রহ করে রেখে দিতেই হবে। কারণ প্রতিটি নিদর্শনের সাথে ইতিহাস, ঐতিহ্য ও স্মৃতিচিহ্ন জড়িত থাকে। দীর্ঘদিন ধরে জাদুঘরে উপাদান সংগ্রহের কারণে এ সময় উপাদানের পরিমাণ অনেক বেশি হয়ে যায়। সে ক্ষেত্রে প্রদর্শন গ্যালারির কক্ষে জায়গা সংকুলান না হলে বাকি অন্যান্য নিদর্শন সংরক্ষণের জন্য গুদামজাতকরণের প্রয়োজন পড়ে। সুতরাং পর্যাপ্ত উপকরণ সংরক্ষণ করার অন্যতম উপায় এই গুদামজাতকরণ। অনেকদিন ধরে একই উপাদান প্রদর্শনী কক্ষে প্রদর্শিত হওয়ার হবার রুচি বদলের জন্য সেখানে বদলি করে নতুন কিছু প্রদর্শনের ব্যবস্থা নিতে হয়। পুরাতন উপাদানটি তখন গুদামজাতকরণ করতে হয়। এছাড়া একেবারে নষ্ট হয়ে যাওয়া উপাদানও গুদামে রেখে দেয়া হয়। আবার দেখা যায় যে সংগ্রহশালার জন্য উপাদানটি সংগৃহীত হলেও সব উপাদান প্রদর্শনীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় না। দেখা গেছে একই ধরনের উপাদানের সংখ্যা অনেক বেশি হয়ে যায়। আবার সময়ের কারণে উপাদান পুরনো হয়ে গেলে এর জৌলুস ক্রমশ নষ্ট হয়ে যেতে থাকে। এ ধরনের উপাদান বেছে বেছে আলাদা করতে হয়। তবে এ সব উপাদানগুলোর মধ্যে যেগুলো বেশি আকর্ষণীয় থাকে সেগুলো নির্বাচিত করে অবশিষ্ট নিদর্শনসমূহ সংগ্রহশালার গুদামে বাধ্য হয়েই রেখে দিতে হয়।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে বাংলাদেশের সংগ্রহশালাসমূহে মাত্র ১০০ ভাগের মাত্র ৫ থেকে ১০ ভাগ নিদর্শন প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়ে থাকে। বাকি অবশিষ্ট নিদর্শনসমূহ বাধ্য হয়েই গুদামে রেখে দিতে হয়। যে কারণে বেশিরভাগ গুদামঘর স্থাপিত হওয়া উচিত বিশালায়তনে। উন্নত রাষ্ট্রগুলোতে গুদামঘরটিকে সুসজ্জিত করা হয় যথোপযুক্ত আসবাবপত্র দ্বারা। এই গুদামঘরের নিদর্শনসমূহ অনেকটা প্রদর্শনীর মতো করে সাজিয়ে রাখা হয় যাতে গবেষকগণ সহজেই সেগুলো পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। গুদামঘর সাধারণত জনসাধারণের দৃষ্টি ও নাগালের বাইরে থাকে।

তবে গুদামের উপাদানসমূহের প্রতিটি নির্দনের একটি নির্দিষ্ট তালিকা নম্বর ও লেবেলিং সিস্টেম রাখা হয়। উপরন্তু উপাদান গুদামজাতকরণের সময় লক্ষ রাখা হয় যেন একটি নিদর্শন অন্য নিদর্শন থেকে স্বতন্ত্র ও আলাদাভাবে থাকে। অনেক সময় অতিরিক্ত উপাদান গাদাগাদি করে রেখে দিলে

নিদর্শনগুলো খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়।[৩০] তাছাড়া লোকসংগ্রহশালার শতকরা ৯০ ভাগের বেশি নিদর্শন জায়গার অভাবে গুদামেই রেখে দিতে হয়। তবে অধিক মূল্যবান উপাদান যেমন স্বর্ণঅলংকার, মূল্যবান ধাতব বস্তু, পুরাতন দিনের নকশি কাঁথা, বাক্সবন্দী করে রাখা জরুরি হয়ে পড়ে। আবার কষ্টিপাথরের বৃহৎ আকারের ভাস্কর্য, খাট পালংক ইত্যাদি ভারি উপাদান স্তূপ আকারে রেখে দিতে দেখা যায়। এ কারণে প্রদর্শনী রুমের মতই গুদামগুলোর আয়তন অনেক বড় হওয়া খুবই অত্যাবশ্যক।

গুদাম ঘরে সংরক্ষিত উপাদানসমূহ যত্ন করে রাখা অত্যন্ত জরুরি। গুদামঘরে আলো বাতাসের ব্যবস্থার বিষয়টি খেয়াল রাখতে হয়। গুদামঘর বদ্ধ অবস্থায় রাখার কারণে দুর্গন্ধের যেন সৃষ্টি না হয়। এ কারণে এর দরজা খোলামেলা ধরনের হওয়া জরুরি। গুদামঘরের বিদ্যুৎ ব্যবস্থার সঠিক ব্যবহার করতে হবে। সুইচ এজন্যে বাইরে রাখা হয় বিশেষ করে কন্ট্রেলিং সুইচ। এর ফলে প্রয়োজনে বাইরে থেকে একে চালু এবং বন্ধ করা যেতে পারে। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, কারুপল্লী ফাউন্ডেশনে জায়গা স্বল্পতার কারণে সংগ্রহীত প্রায় ৮৬ হাজার নিদর্শনের মধ্যে মাত্র ১৫ শতাংশ দর্শক দেখার সুযোগ পেয়ে থাকে।[৩১] রাজশাহীর বরেন্দ্র গবেষণা সংগ্রহশালার স্টোরের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। বহু মূল্যবান উপাদান গুদামঘরে বন্দি অবস্থায় সংরক্ষণ করা হচ্ছে। আর বাংলাদেশের বাকি অন্যান্য সংগ্রহশালাগুলোর ক্ষেত্রেও এই একি কথা প্রযোজ্য তাহলো জায়গার অভাব। জাদুঘরকর্মীদের অবহেলার কারণেও গুদামজাত অনেক উপাদান নষ্ট হয়ে যায়। যেহেতু গুদামঘর সকলের আড়ালে থাকে এ কারণে এখানকার অনেক উপাদান যথাযথভাবে যত্নের অভাবে একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত উপাদানটি একেবারে নষ্ট হয়ে গেলে ডাস্টবিনে ফেলে দিতে হয়।

৩(ছ) প্রদর্শনী উপস্থাপন শাখা

যে কোনো সংগ্রহশালার প্রদর্শনী উপস্থাপন শাখার কার্যক্রম হলো গ্যালারি প্রদর্শনী উপস্থাপন, পরিকল্পনা প্রণয়ন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশেষ প্রদর্শনী চমৎকারভাবে উপস্থাপন করা। সুতরাং কোনো সংগ্রহশালাকে চমৎকারভাবে উপস্থাপন করার ওপর নির্ভর করে সেই সংগ্রহশালার সার্বিক শৈল্পিক সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য। শুধুমাত্র উপস্থাপনার জন্য জাদুঘর কর্মীর বিশেষ অভিজ্ঞতা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন।[৩২] বিশ্বের উন্নত রাষ্ট্রের বড় বড় সংগ্রহশালাসমূহে প্রদর্শনী উপস্থাপন শাখাটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ছাড়া অন্যান্য সংগ্রহশালার প্রদর্শনী উপস্থাপন শাখাটি বিশেষ উন্নত নয়। এছাড়াও প্রকাশনার জন্য, নিদর্শন সংরক্ষণের আগে ও পরে আলোকচিত্র ধারণ করে থাকে। প্রকাশনা শাখাটি জাদুঘর সমাচার, সাময়িকী, প্রদর্শনীর জন্য ক্যাটালগ, গবেষণামূলক বই ও

ভিউকার্ডসহ বিভিন্ন ধরনের প্রকাশনার কাজে এই শাখাটি নিয়োজিত থাকে। শ্রুতচিত্রন শাখা সংগ্রহশালার নিদর্শনভিত্তিক ও জেলা ঐতিহ্যের ওপর প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণসহ কথ্য ইতিহাস ও সংগ্রহশালার অনুষ্ঠানাদির শ্রুতিচিত্র ধারণ করে থাকে।।

বাংলাদেশে উন্নত শোকেস, আকর্ষণীয় ডিওরামা, অডিও-ভিজুয়াল উপস্থাপন এবং তথ্য জ্ঞাপন পদ্ধতিতে জাতীয় জাদুঘরের পদমর্যাদা ও গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। কোনো কিছু জীবন্তভাবে উপস্থাপনের জন্য ত্রিমাত্রিক পদ্ধতিতে অর্থাৎ অবিকল মানুষ, প্রকৃতি পরিবেশ সৃষ্টি করে ডিওরামার সাহায্যে উপস্থাপন করা সংগ্রহশালার একটি কার্যক্রমের অংশ। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, শিশু সংগ্রহশালা, বরেন্দ্র গবেষণা সংগ্রহশালা, কারুপল্লী ফাউন্ডেশন, বাংলা একাডেমির লোক ঐতিহ্য সংগ্রহশালা এই পদ্ধতি বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনের সাথে সম্পর্কিত কৃষি, হাটবাজার, গ্রামীণ পেশায় নিয়োজিত কামার কুমার জেলে তাঁতিদের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি দেখানোর ব্যবস্থা রয়েছে।

চিত্র-১০: ডিওরমা লোক ঐতিহ্য সংগ্রহশালা বাংলা একাডেমি

চিত্র-১১: কলকাতা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল মিউজিয়াম

যে কোনো সংগ্রহশালার প্রদর্শনীর গুণগত মান নির্ভর করে built in-showcase। প্রতিটি সংগ্রহশালার মূল উদ্দেশ্যই থাকে সংগ্রহশালার প্রদর্শনী কক্ষে উপাদান সমূহ আকর্ষনীয়ভাবে প্রদর্শন করা। কারণ প্রদর্শনীর ভেতর দিয়ে সংগ্রহশালার একদিকে যেমন অস্তিত্বের বহিঃপ্রকাশের সাথে অপরদিকে প্রদর্শন বস্তুটি দেখে দর্শকদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় সংগ্রহশালাটি কী ধরনের। সুতরাং সংগ্রহশালার স্থাপত্যিক নকশার সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রর্দশন গ্যালারি তৈরি করা হয়।

ডিসপ্লের ক্ষেত্রেও শোকেস সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অতএব শোকেস নির্মাণ করা হয় বস্তুটির আকার আকৃতির উপর নির্ভর করে। যাতে শোকেসের গ্লাসের ভেতর দিয়ে উপাদানটিকে আরো আকর্ষণীয় দেখানো যায়। সংগ্রহশালার পরিচালক এবং সংগ্রশালায় দ্বায়িত্বরত কর্মকর্তাবৃন্দ প্রতিটি উপাদানের গুরুত্ব নির্ণয় করে সেগুলো প্রর্দশনীর জন্য ব্যবস্থা করে থাকেন।

বতর্মানে বিভিন্ন ডিজাইনের সোকেস প্রদর্শনী কক্ষে দেখা যায়। বিশেষ করে কাঠ, স্টিল, হার্ডবোর্ড, স্টিলনেস স্টিল ও গ্লাসের তৈরি শোকেস ও বাক্সের ভেতর ছোট ছোট অপ্রতুল নিদর্শনগুলো নিদর্শন কক্ষে উপস্থাপন করা হয়। আলোকচিত্রের সাহায্যে (চিত্র -৬) কারপল্লী ফাউন্ডেশনে সোকেসের মধ্যে প্রর্দশিত উপাদানসমূহ দেখা যাচ্ছে ।

চিত্র-১২: কারুপল্লী ফাউন্ডেশনের জয়নুল গ্যালারি

লক্ষনীয় যে, এই শোকেসের আকৃতি নির্ভর করে প্রদর্শনী কক্ষের আয়তনের ওপর। বাংলাদেশের লোকসংগ্রহশালাগুলোর প্রদর্শনী কক্ষের শোকেস কয়েক ধরনের দেখতে পাওয়া যায়।[৩৩]

1. দেয়ালে সংযুক্ত করে
2. দণ্ডায়মান দেয়াল বাক্স
3. আলমারি ধরনের ছোট বড় বাক্স

প্রদর্শিত বাক্সের মধ্যে বড় সাইজের নকশি কাঁথা ও জামদানি শাড়ি ও মসলিন ঝুলিয়ে গ্লাসের ভেতর দিয়ে প্রদর্শন করা হয়ে থাকে। তবে ঝুলানো অংশটার বর্ডারের অংশটা মোটা কাপড়ের সাথে সংযুক্ত করে চারপাশটা হালকাভাবে মুড়িয়ে দেয়া হয়। নকশি কাঁথাটি প্রথমে কাঠের বোর্ডের মধ্যে চারপাশে পিন দিয়ে আটকে নিয়ে ঝুলিয়ে দেয়া হয়। নকশি কাঁথা সেলাইয়ের মধ্যে বোচকা কাঁথা, দস্তরখানা, পান কাঁথা, আর্শীলতা, বটুয়া, জায়নামাজ ইত্যাদি আলাদাভাবে প্রদর্শন করা হয়ে থাকে।

শীতলপাটি, মাদুর, দরমা, ভেরকি, ঝাউঝাপ ইত্যাদি নকশি কাঁথা প্রদর্শনের মতো করে সাজানো হয়। তেমনিভাবে নকশি পাখা বাক্সের মধ্যে একটি একটি করে সাজিয়ে প্রদর্শন করা হয়।[৩৪]

হাতির দাঁতের শিল্প দেয়াল জুড়ে কাঁচের বাক্সের ভেতর প্রর্দশন করা হয়। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে হাতির দাঁতের শিল্পের সমৃদ্ধ উপাদান সংরক্ষিত আছে। বিশেষ করে হাতির দাঁতের তৈরি মাদুর এমন দূর্লভ বস্তু বিশ্বের আর কোথাও এ ধরনের নির্দশন দেখা যায় না।

বাঁশ ও বেতজাত দ্রব্য, দারুশিল্প ও মৃৎশিল্পের নিদর্শন সাজানো নির্ভর করে উপাদানের ধরণ ও সাইজের ওপর। লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের সর্দার বাড়িতে একটি পালকি, জমিদারদের ব্যবহৃত কাঠের বাক্স, কাঠের সর্দল ইত্যাদি খোলা অবস্থায় প্রদর্শনী কক্ষে রয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের দারুশিল্প প্রদর্শনী কক্ষটিতে কোনো শোকেস ছাড়াই কাঠের পালঙ্ক, কাঠের তৈরি শুরদেবী সজ্জিত করা হয়েছে। মৃৎ শিল্পের মধ্যে প্রাচীন টেরাকোটা কাঁচের বাক্সের মধ্যে রেখে প্রদর্শন করা হয়। বিশাল আকৃতির কলস, মুটকি, চাড়ি এগুলো প্রদর্শন কক্ষের খালি মেঝেতে প্রদর্শন করা হয়ে থাকে। ধাতব বস্তু কাঁচের বক্সের মধ্যে প্রদর্শন কক্ষে সজ্জিত করা হয়। অলংকার প্রদর্শন করা হয় দেয়াল বাক্সের মধ্যে। কানের দুল, বালা, চুড়ি দেয়ালের মধ্যে আলাদাভাবে প্রদর্শন করা হয়। [৩৫] অত্যন্ত কারুকার্যমণ্ডিত পবিত্র কোরআন শরিফসমূহ (চিত্র ৬) শোকেসের মধ্যে রেখেই উপস্থাপন করা হয়। এভাবে বিভিন্ন ধরনের পাণ্ডুলিপি, দলিল দস্তাবেজ খোলা অবস্থায় শোকেসের মধ্যে খুব যত্নসহকারে উপস্থাপন করা হয়। ঢাকা মহানগর সংগ্রহশালায় তারজালি কাজের নমুনা শোকেসের মধ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে ভিন্ন আঙ্গিকে। নকশি জগ, নকশি বদনা ও নকশি পানির সুরাটি একটি শোকেসের মধ্যে উপস্থাপন করা হলেও গ্লাস দিয়ে আলাদা অংশ করে সাজানো হয়েছে (চিত্র১০)। উল্লেখ যে, সোনা রুপার তৈরি এই তারজালি কাজের ব্যবহার মুঘল আমলে এক শ্রেণির স্বর্ণকারগণ শুরু করেছিলেন। তবে এ ধরনের নিদর্শন অভিজাত পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো। ঢাকার নবাবী পরিবারের অনেকের ঘরে তারজালি কাজের নমুনা পাওয়া সংগ্রহে ছিলো। বরেন্দ্র গবেষণা সংগ্রহশালার কক্ষের বাইরে বারান্দার মধ্যে বিভিন্ন মসজিদ থেকে পাওয়া নকশামণ্ডিত পাথরের অলংকরণ খালি অবস্থায় প্রর্দশনীতে রাখা হয়েছে।

চিত্র-১৩: বরেন্দ্র গবেষণা সংগ্রশালা

চিত্র-১৪-১৫ : জাতীয় জাদুঘরের নির্দশন প্রদর্শনের জন্য ব্যবহৃত শোকেস

চিত্র-১৬: ঢাকা মহানগর সংগ্রহশালার শোকেসের মধ্যে প্রদর্শিত নমুনা

চিত্র– ১৭ -১৮: বরেন্দ্র গবেষণা সংগ্রশালা

c_gZ, লোকসংগ্রহশালার জন্যে সংরক্ষিত উপাদান কোনো বিশেষ অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী হতে হবে। কারণ এক অঞ্চলের লোকশিল্পের সাথে আরেক অঞ্চলের পৃথক বৈশিষ্ট্য থাকে। [৩৬]

wØZxqZ, লোকসংগ্রহশালায় সংরক্ষিত মৃৎ শিল্প, অলংকার শিল্প, শোলা শিল্প গ্রামীণ বাস্তুভিটা শিল্প, ধাতব শিল্প, কাঠ শিল্প, বস্ত্রশিল্প (জামদানি, তাঁতে বোনানো বস্ত্র) বংশপরম্ভরায় নিয়োজিত কারুশিল্পীদের নির্মিত শিল্প হতে হবে।[৩৭]

ZZxqZ, লোকসংগ্রহশালায় সংরক্ষিত বস্তুটির সাথে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় অনুভূতি, আবেগ জড়িত থাকতে হবে। যেমন: মুসলমানদের জন্য জায়নামাজ, কোরআন রাখার রেহেল, মসজিদের গায়ে অলংকৃত নকশা ইত্যাদি।

PZ_Z, লোক সমাজে ব্যবহৃত ব্যবহারিক ও নান্দনিক উপাদান। যেমন আলপনাচিত্র, নকশি কাঁথা, নকশি পাখা, নকশি শিকা, রন্ধনকলা, নকশি পিঠা ইত্যাদি। এই লোকশিল্পের নির্মাতা গ্রামবাংলার মেয়েরা।[৩৮] প্রদর্শনী কক্ষটির গ্যালারিটি সৌন্দর্য ও উজ্জ্বলময় করে তোলার জন্যে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবহার বিশেষ জরুরি। কারণ আলো ছাড়া নিদর্শনগুলো ভালোভাবে দেখা যায় না। বেশিরভাগ সংগ্রহশালায় এনার্জি বাল্ব এবং রড বাল্ব জ্বালানো হয়। সংগ্রহশালায় বিভিন্ন ধরনের সংগীত ও যন্ত্রসংগীতের রেকর্ড বাজানো হয় দর্শকদের বাড়তি আনন্দ দানের জন্য। দর্শকরা সুরের মূর্ছনায় উপাদানের মাঝে হারিয়ে যেতে পারে।[৩৯]

৩(জ) শিক্ষা ও সেবা

লোকসংগ্রহশালা মানুষের মাঝে আনন্দ, বিনোদন ও শিক্ষা প্রদান ছাড়াও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন এবং ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে সহয়তা করে। এ সব নিদর্শন সময়ের ব্যবধানে বহু প্রাচীনও হতে পারে আবার এ কালেরও হতে পারে। ফলে দর্শক অল্প সময়ের মধ্যে অনেক নিদর্শন একসাথে দেখে নিতে পারেন। এ ক্ষেত্রে দর্শক দুইটি সুবিধা লাভ করেন। প্রথমত, সময় এবং দ্বিতীয়ত অর্থ সাশ্রয়। ধরা যাক কোনো মানুষ জীবনে কখনও হাতির দঁতের তৈরি পাটি দেখেনি। এ ধরনের উপাদান বাংলাদেশের জাতীয় জাদুঘর ছাড়া আর কোথাও নেই।

বর্তমানে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা হলো ক্লাস কেন্দ্রিক, পরীক্ষা নির্ভর এবং তত্ত্বভিত্তিক। পাঠ্য সূচীর অনেক বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থী সেই উপাদান চাক্ষুষভাবে পরিচিত হতে পারেনা। এ কারণে যারা বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্নতত্ব বিভাগ, ইতিহাস ও ইসলামের ইতিহাস, জাদুঘরবিদ্যা, ফোকলোর, চারুকারুশিল্পে ওপর উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য লেখাপড়া করছে তাদের জন্যে জাদুঘর পরিদর্শন অত্যন্ত জরুরী। সুতরাং সংগ্রহশালা উপাদানের সাথে ছাত্রছাত্রী চাক্ষুসভাবে পরিচয় করিয়ে দেয়। সংগ্রহশালায় গিয়ে অনুভব করা যায় অতীতের হারিয়ে যাওয়া সময় এবং মানুষের রুচি পরিবর্তন। পালযুগের চিত্রলিপি আর পোষ্টমর্ডান আর্ট এক নয় তা যে কেউ দেখে বুঝতে পারে সংগ্রহশালার নিদর্শন দেখে। সুতরাং উপাত্ত ও নিদর্শন একটি সমাজের শ্রেণি বিন্যাসের ধারা, অর্থনৈতিক অবস্থা ও মানসিক উৎকর্ষের ধারাবাহিকতার পরিচয় দিয়ে থাকে।[৪০] এভাবে সংগ্রহশালার নির্দশনের সাথে ছাত্রছাত্রী জাদুঘরকর্মীদের এবং পাশাপাশি দর্শকদের মধ্যে যোগসূত্র তৈরি হয়। প্রতিবছর নতুন নতুন বিষয়ে নিয়ে সেমিনারের আয়োজন করা হয়। ১৯৯৫ সাল থেকে সেমিনার অনুষ্ঠানকে লোক উৎসবের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। লোক সংগীত, গ্রামীণ খেলাধুলা, লোকবাহন, মৃৎশিল্প, জামদানি শাড়ি, শোলার কারুশিল্প, দারুশিল্প, তামা-কাঁসা, রূপা, অলংকার ইত্যাদি বিষয়ভিত্তিক সেমিনার অনুষ্ঠান করা হয়েছে।

স্কুল প্রোগ্রাম

সংগ্রহশালা যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অথবা সংগঠনের শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। তবে এ ধরনের শিক্ষা প্রোগাম শুধু স্কুলশিক্ষার্থীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই বাংলাদেশের বিভিন্ন কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যেও শিক্ষা প্রদান করা হয়ে থাকে। বিশেষ করে স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের সংগ্রহশালা গ্যালারিতে নিয়ে গিয়ে নিদর্শন সংক্রান্ত বিষয়ে জ্ঞান প্রদান করাই হলো স্কুল প্রোগামের উদ্দেশ্য। এ ধরনের শিক্ষা

প্রদানের পিছনে উদ্দেশ্য থাকে নিদর্শন দেখে শিশু ও শিক্ষার্থীরা যাতে শিক্ষা লাভ করে আগামীতে তারা কোনো কিছু সংরক্ষণের ব্যাপারে আগ্রহী ও উদ্যোগী হয়ে ওঠে এবং দুর্লভ নিদর্শন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করে। তাদের মধ্যে দেশপ্রীতি ও জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হতে সহায়ক হয়।

বাংলাদেশে একমাত্র বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে শিক্ষা কর্মসূচীর আওতায় স্কুল প্রোগাম রয়েছে। ১৯৭৬ সালে এই স্কুল প্রোগাম চালু হয়। এই প্রোগামটি দুইভাবে পরিচালিত হয়। জাদুঘরের নিজস্ব পরিবহনে শিক্ষার্থীদের সংগ্রহশালায় আনা হয়। এরপর সূচনা বক্তব্য দিয়ে গ্যালারিতে ৬ জন প্রদর্শক প্রভাষক নিয়ে যায়। ৪২টি গ্যালারির ৮/১০ হাজার নিদর্শন থেকে শিক্ষা দিয়ে আবার জাদুঘরের পরিবহনে স্ব-স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পৌঁছে দেয়া হয়। তবে এই পরিবহন সুবিধাটি অনিয়মিত। তবে বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংগ্রহশালা প্রদর্শনে এলে শিক্ষা অফিসার শিক্ষার্থীদের ৬ জন প্রদর্শক প্রভাষকের মধ্যে ভাগ করে গ্যালারিতে পাঠানো হয়।

১৯৭৬-১৯৮০ সাল পর্যন্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিলো ৮৬৫৭০ জন, ১৯৮১ -১৯৮৫ সাল পর্যন্ত ৫০৩৯২ জন, ১৯৮৬-১৯৯০ পর্যন্ত ২৯১২১ জন ১৪ বছরে ১৭৮ টি স্কুল থেকে ১,৬৬,০৮৩ জন শিক্ষার্থী সংগ্রহশালা পরিদর্শন করেছে। শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আরো একটি বিষয় রয়েছে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা। নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর চিত্রাঙ্কন, বিতর্ক ও উপস্থিত বক্তৃতার প্রতিযোগিতা আয়োজন করা। এই প্রতিযোগিতা জাতীয় জাদুঘরে ১৯৮৫ সাল থেকে চলে আসছে।[৪১] কারুপল্লী ফাউন্ডেশনেও এ ধরনের প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা রয়েছে।

wPÎ-19: wPÎv¼b cwZ‡hwMZv

চিত্র-২০: বিদেশি শিক্ষার্থীদের স্কুল প্রোগাম

চিত্র-২১: ভারতীয় কূটনৈতিকের পরিদর্শন

প্রদর্শক বক্তৃতা

গ্যালারিতে প্রদর্শিত নিদর্শনের ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রযুক্তি জ্ঞান, দর্শন ও ব্যবহার দর্শকদের সম্মুখে তুলে ধরতে যে কথাগুলো বলা হয় তাকে বলা হয় প্রদর্শক বক্তৃতা। এই বক্তৃতা দেন প্রদর্শক প্রভাষক। তিনি নিদর্শনের ওপর শিক্ষা প্রদান করেন।

নিদর্শন শিক্ষা দুইভাগে বিভক্ত:

১. সংগ্রহশালার অভ্যন্তরে শিক্ষা

২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিংবা গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে নিদর্শন ধার প্রদান করে শিক্ষা দেয়া।

সংগ্রহশালার অভ্যন্তরীণ শিক্ষা ব্যবস্থায় গ্যালারিতে প্রদর্শিত নিদর্শন থেকে শিক্ষা দেয়া হয়। নির্দশনের সাথে যে ছোট স্টিকার থাকে, তাকে বলা হয় লেবেল। এই লেবেলে যে তথ্য থাকে তাতে নিদর্শনের intangible information থাকে না। বস্তুত একজন দর্শক যখন নিজে নিজে সংগ্রহশালা পরিদর্শনে গিয়ে যে জ্ঞান অর্জন করবেন তার পরিপূর্ণতা সাধনে প্রদর্শকের বক্তৃতার প্রয়োজন। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে যারা প্রভাষক পদে চাকুরীতে নিয়োজিত আছেন তারা পরিদর্শক এবং শিক্ষার্থীদের মাঝে বক্তৃতা প্রান করে থাকেন।

লাইব্রেরি

যে কোনো সংগ্রহশালার অন্যতম অংশ হলো গ্রন্থাগার শাখা। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, বরেন্দ্র গবেষণা সংগ্রহশালা, কারুপল্লী ফাউন্ডেশনের গ্রন্থাগারে দেশ বিদেশের হাজার হাজার বই সংরক্ষিত আছে। বিশেষ করে জাতীয় জাদুঘরের লাইব্রেরিটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এখানে প্রায় ৩৬ হাজার বই রয়েছে। বর্তমানে এসব বইয়ের নাম পরিচয় সংবলিত তথ্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে জাতীয় জাদুঘরের ওয়েব সাইডে দেয়া আছে। এর ফলে বিশ্বের যে কোনো স্থান থেকে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের লাইব্রেরির ক্যাটালগ সার্চ করে প্রয়োজনীয় বইয়ের তথ্য জানার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।[৪২] কারুপল্লীতে গবেষণার জন্য বর্তমানে দশ হাজার গবেষণা-ধর্মী গ্রন্থসহ ম্যাগাজিন অডিও ও ভিডি এবং সিডি করে মেলা ও লোকজ উৎসবের ডকুমেন্ট সংরক্ষিত রয়েছে।

চিত্র-২২: চিত্র-২৩: জাতীয় জাদুঘরের লাইব্রেরি

ভ্রাম্যমান প্রদর্শনী

সারা বিশ্বে সংগ্রহশালা সাধারণত শহরে অবস্থিত। গ্রাম বসবাসরত মানুষের জন্য শহরে এসে সংগ্রহশালা পরিদর্শন করা কঠিন হয়ে যায়। ভ্রাম্যমান গাড়িতে বিভিন্ন ধরনের প্রদর্শনীর উপকরণ সাজিয়ে গ্রামাঞ্চলে পাঠানো হয়ে থাকে। এ ধরনের ভ্রাম্যমান প্রদর্শনী বাস সাধারণত মিনি সংগ্রহশালার কাজ করে থাকে। এই প্রদর্শনী মূলত গ্রামের মানুষের মাঝে সংগ্রহশালা সম্পর্কে জানানো এবং তাদের মধ্যে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেওয়ার বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থা। ভ্রাম্যমান প্রদর্শনীর ব্যবস্থা বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে শুধু চালু ছিলো ১৯৭৯ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত। জরিপে দেখা গেছে যে এই সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় ২৬,১০,২৯৬ জন দর্শক ভ্রাম্যমান প্রদর্শনী পরিদর্শন করেছে। [৪৩]কারুপল্লী ফাউন্ডেশন, বরেন্দ্র গবেষণা সংগ্রহশালায় এ ব্যবস্থা চালু নেই।

Dhaka University Institutional Repository

ডকুমেন্টেশন সেন্টার

নিদর্শন ও ডকুমেন্ট এ স্থিরচিত্র ও ভিডিও চিত্রের ভূমিকা অপরিসীম। সংগ্রহশালা ফটোগ্রাফিকে দুইভাগে বিভক্ত করা হয়।

১. ডকুমেনটেশন ফটোগ্রাফি

২ .সৃজনী ফটোগ্রাফি

সংগ্রহশালা ফটোগ্রাফির ক্ষেত্রে হুবহু ফটোগ্রাফি করার নিয়ম মানতে হয়। প্রমাণের জন্য নির্দশনের বিভিন্ন দিকের স্বাভাবিক চিত্র রাখা হয়। যাতে চিত্রটি দেখলে সহজেই নিদর্শনের সঠিক তথ্য অনুধাবন করা যেতে পারে।

ফটোগ্রাফি দুটি ধারায় প্রচলিত:

১. স্থিরচিত্র গ্রহণ

২. চলচ্চিত্র গ্রহণ

চিত্রগ্রহণ ফটোগ্রাফি দুটি মিডিয়াতে বিভক্ত। একটি ফিল্ম মিডিয়া অন্যটি ইলেকট্রনিক মিডিয়া অর্থাৎ ভিডিও মিডিয়া। তবে সংগ্রহশালা ফটোগ্রাফির ক্ষেত্রে ডকুমেন্ট হিসেবে স্থিরচিত্রের গুরুত্ব অনেক বেশি। স্থিরচিত্রই প্রধানত প্রমাণ করে নির্দশন তথ্য।

সুতরাং যে কোনো প্রতিষ্ঠানের সংগৃহীত নিদর্শনের সম্পৃক্তকরণ, তালিকাকরণ, সংরক্ষণ এবং গবেষণা বা প্রকাশনার ক্ষেত্রে স্থিরচিত্রের ভূমিকাই হলো আসল। ডকুমেনটেনশন ফটোগ্রাফি এবং সৃজনী ফটোগ্রাফির নির্মাণ প্রক্রিয়ায় বিশেষভাবে সমন্বিতকরণের ব্যপ্তি লাভ করে চলচ্চিত্র। চলচ্চিত্র হলো ফিল্ম মিডিয়া এবং ভিডিও মিডিয়া উভয়কেই বোঝায়। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে আলোকচিত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশনসমূহের মধ্যে ষাটগম্বুজ মসজিদ, মহাস্থানগড়, ময়নামতি, লালাবাগদূর্গের আলোকচিত্রের মাধ্যমে প্রর্দশনীতে দেখানো হয়েছে। ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীন বাংলাদেশ গ্যালারিটি সম্পূর্ণ আলোকচিত্রের মাধ্যমে সাজানো হয়েছে। লোক ও কারুশিল্পীদের জীবনচিত্র প্রামাণ্যচিত্রে দেখানো সম্ভব। বাংলাদেশ জাতীয় সংগ্রহশালার নীচতলায় জাদুঘরের ওপর নির্মিত ডকুমেন্টারী প্রদর্শনীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। বাংলাদেশে লোকসংগ্রহশালা আলোকচিত্র শাখাটি সংগ্রহশালার সংরক্ষিত নিদর্শন, অনুষ্ঠানাদি, দেশের প্রত্নস্থানসমূহের মন্দির, মসজিদ ও ঐতিহাসিক ইমারতাদির আলোকচিত্র গ্রহণের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে।

শিক্ষার অন্যতম মাধ্যম চলচ্চিত্র। প্রামাণ্য চলচ্চিত্রের মাধ্যমে দেশি বিদেশি ইতিহাস ঐতিহ্য দর্শকদের সামনে সহজে তুলে ধরা যায়। এই চলচ্চিত্র উপভোগ করে অতীতের ইতিহাস দেশ ও জাতির অর্থনৈতিক সামাজিক, রাজনৈতিক প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে জানা সম্ভব। বাংলাদেশের অনেকে প্রত্নতাত্ত্বিক স্থল পরিদর্শন করেনি। এসব স্থানের প্রামাণ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করা সহজ হয়।[৪৪] বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে প্রতি শনি ও সোমবার বিকাল ৩টায় সুফিয়া মিলনায়তনে প্রবেশ মূল্য ছাড়া শিক্ষামূলক প্রামাণ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

চিত্র-২৪: ডকুমেন্টেশন সেন্টার বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

ওয়েব সাইটের ব্যবহার

বর্তমানে বিশ্বের প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রই তাদের সংগ্রহশালাগুলো সম্পর্কে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ওয়েব সাইটের মাধ্যমে বিস্তারিত বর্ণনা সহকারে তথ্য প্রদান করে থাকে। ফলে ইন্টারনেটের মাধ্যমে খুব সহজেই যে কোনো সংগ্রহশালা সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে। আজ হতে বিশ বছর আগেও এ ব্যবস্থা চালু ছিলো না। ব্রিটিশ মিউজিয়াম, লুভ্যের মিউজিয়াম যদি পরিদর্শন করা কোনদিন সুযোগ না ঘটে ইন্টারনেটের মাধ্যমে শুধু ব্রিটিশ মিউজিয়াম কেন বিশ্বের যে কোনো বিখ্যাত সংগ্রহশালার ছবি, তথ্য, গ্যালারি সম্পর্কে জানার সুযোগ ঘটে যাচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশের জাতীয় জাদুঘরের নিজস্ব ওয়েব সাইটে এই সংগ্রহশালা সম্পর্কে অনেক তথ্যই জানা সম্ভব। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে Management information system (MIS) এর আওতায় ৫টি সফটওয়্যার যেমন: (১) ডাইনামিক ওয়েবসাইট (Dinamic website), (২) Object Identification System (Object ID), (৩) মানব সম্পদ তথ্য ব্যবস্থা (Human Resource Information system), (৪) একাউন্টিং ম্যানেজমেন্ট ব্যবস্থা (Accounting Management System), (৫) Library amd Archives Management system সংস্থাপন করা হয়েছে। ফলে সফটওয়্যার ও সংস্থাপিত ডাটাজেসমূহ জাতীয় জাদুঘরের স্থায়ী সম্পদ এ পরিণত হয়েছে।[৪৫]

দর্শকদের ভূমিকা

সংগ্রহশালার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো নিদর্শন। এই নিদর্শন প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সংগ্রহশালায় দর্শকের উপস্থিতি। দর্শক কেন এবং কী ধরণের সংগ্রহশালায় গমন করবে তা সম্পূর্ণটাই নির্ভর করে দর্শকের উদ্দেশ্য, মনোযোগ ও অভিরুচির ওপর। দর্শক শ্রেণিকে তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

১. প্রথম শ্রেণির দর্শক যারা কৌতূহলবশত কেবল নিছক চিত্ত বিনোদন ও সময় কাটানোর উদ্দেশে সংগ্রহশালায় গমন করেন। এখানকার উপাত্ত্যসমূহ সম্পর্কে খুব একটা গুরুত্বের সাথে উপলব্ধি করতে পারে না। চোখের দেখা দেখেই তার কৌতূহল মিটে যায়। পরবর্তী সময়ে উপাত্ত দেখে শিক্ষা লাভ করে কোথাও প্রয়োগ করার ইচ্ছে প্রকাশ করে না।

২. দ্বিতীয়ত শ্রেণির দর্শক হলো শিক্ষার্থীবৃন্দ। যারা পাঠ্যসূচির সম্পৃক্ত বিষয়বস্তু নিয়ে উপাদানগুলো দেখার চেষ্টা করে। এই শ্রেণির দর্শক স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী শিক্ষক পর্যায়ে পড়ে।

৩. তৃতীয়ত পর্যায়ের দর্শকরা হলেন গবেষক। তারা গবেষণার বিষয়বস্তু ভিত্তিক উপাত্ত সংগ্রহ করে থাকেন। সত্য মিথ্যা যাচাই বাছাই করে ফলাফল বের করবার চেষ্টায় উপনীত হন।[৪৬]

দর্শকদের সাথে সংগ্রহশালার যোগাযোগের ক্ষেত্রে কেউ কেউ পাঁচটি সূত্র আবিস্কার করেন। প্রথমত নিদর্শন হলো ব্যবহার ও দর্শনের জন্য দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক দর্শকই নিদর্শন, তৃতীয়ত প্রতিটি নিদর্শনই দর্শক চতুর্থত, দর্শকের সময় বাঁচায় এবং সংগ্রহশালা সব সময় বিকাশশীল। কোনো কিছু চাপিয়ে দিলে সে কাজে আগ্রহ তৈরি হয় না। কাজের মধ্যে থাকা চাই আনন্দ। যেমন ধরা যাক- একটি ক্লাসের শিক্ষার্থীদের শিক্ষক জানালেন তাদের জাদুঘরে নিয়ে যাওয়া হবে। জাদুঘরে যা দেখা হবে ফিরে এসে তা নিয়ে একটি রচনা লিখে দেখাতে হবে। এ ঘোষণায় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আগ্রহের সৃষ্টি হতে পারে। ।

জাতীয় জাদুঘরের ও তার নিয়ন্ত্রণাধীন সংগ্রহশালাগুলো বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক ছুটি এবং শুক্রবার দুপুর ২-৩০ থেকে রাত আটটা পর্যন্ত এই সংগ্রহশালাগুলো দর্শকদের জন্য খোলা থাকে। বাকি শনিবার থেকে বুধবার সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৬টা পর্যন্ত দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত থাকে। এখানে অসংখ্য দর্শনার্থীর আগমন ঘটে। বস্তুত সংগ্রহশালায় দর্শনার্থীদের মধ্যে বেশিরভাগই ঢাকার বাইরের জেলা থেকে আসা। লালবাগের কেল্লা ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর রবিবার সাপ্তাহিক ছুটি থাকে। রাজশাহী বরেন্দ্র গবেষণা সংগ্রহশালাটি সর্বস্তরের দর্শক দেশি-বিদেশিদের জন্য শনিবার থেকে বুধবার সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত খোলা থাকে। বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক ছুটি থাকে।[৪৭] তবে এটা ঠিক যে, দর্শক সংগ্রহশালা প্রদর্শনে না আসলে ধীরে ধীরে সেই সংগ্রহশালার গুরুত্ব কমে যেতে থাকে

৩(ট) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের বিভিন্ন কক্ষের পরিচয় ও প্রদর্শিত উপাদান

যে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক সংগ্রহশালার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে পড়ে উপাদানসমূহ প্রদর্শনীর জন্য বিভিন্ন কক্ষে আলাদাভাবে গ্যালারি বিন্যাস করা। প্রাচীন বাংলার ঐতিহ্য তথা হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলিমসহ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক উপাদান, প্রত্ননিদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল নিদর্শন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মূল আকর্ষণ। ঐতিহাসিক নিদর্শনাদি যেমন প্রস্তর ভাস্কর্য, পোড়ামাটির ফলক, প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় মুদ্রা, শিলালিপি, তুলট কাগজ এবং তালপাতায় লেখা সংস্কৃত, বাংলা ও আরবি-ফার্সি পাণ্ডুলিপি সংগ্রহশালায় সংগৃহীত উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। এ ছাড়াও মধ্যযুগীয় অস্ত্রশস্ত্র, বাংলাদেশের কারুশিল্প, নকশি কাঁথা, কারুময় দারুশিল্প, সমকালীন চারুশিল্প এবং বিশ্বসভ্যতা ও সংস্কৃতির নিদর্শন সংগ্রহশালার প্রদর্শনীতে রয়েছে।

প্রথম তলা: সংগ্রহশালার মহাপরিচালকের অফিস এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম অফিস, বেগম সুফিয়া কামাল মিলনায়তন, নলিনীকান্ত ভট্টাচার্য্য প্রদর্শনশালা, জাদুঘর থেকে প্রকাশিত বই পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্র।

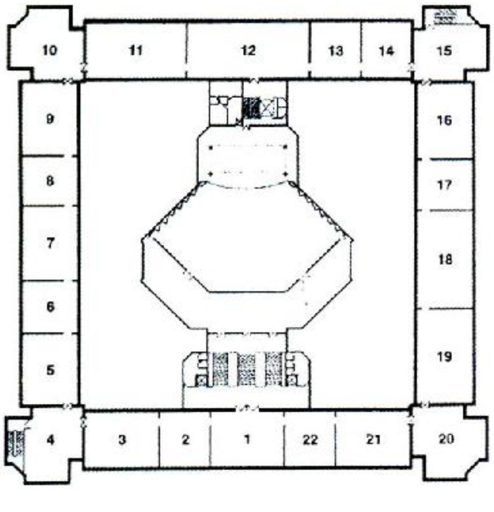

wØZxq Zjv c_g M¨vjvwi

জাতীয় জাদুঘরের দ্বিতীয় তলায় ২০১ নম্বর কক্ষটির নাম বাংলাদেশের মানচিত্র। নানা তথ্য সম্বলিত রয়েছে আটটি মানচিত্রে।

২০২. কক্ষটি গ্রামীণ বাংলাদেশ

২০৩. কক্ষটির নাম সুন্দরবন

২০৪. কক্ষটি শিলা ও খনিজ

২০৫. নম্বর কক্ষটি বাংলাদেশের গাছপালা

২০৬. নম্বর কক্ষটি ফুলফল লতাপাতা,

২০৭. কক্ষটি জীবজন্ত,

২০৮. কক্ষটি পাখি,

২০৯. কক্ষটি বাংলাদেশের স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং ২১০. কক্ষটি হাতির

২১১. কক্ষটির নাম বাংলাদেশের জনজীবন, বাঁশও বেতের গৃহস্থালি নির্দশন, মাছধরার সরঞ্জাম, শখের হাঁড়ি ও নকশি শিকা, পাখা, নকশি পাটি, রেহেল, পিঠার ছাঁচ, আমসত্ত্বের ছাঁচ, পাথরের নিদর্শন, বাংলাদেশের লোকবাদ্যের নমুনা, কৃষি সরঞ্জাম ইত্যাদি।

২১২. নম্বর কক্ষটি নাম বাংলাদেশের নৌকা।

২১৩. কক্ষটি উপজাতি,

২১৪. উপজাতি,

২১৫. কক্ষটি বাংলাদেশের মাটির পাত্র।

২১৬. কক্ষটি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন

২১৭ .ভাস্কর্য

২১৮. ভাস্কর্য

২১৯. স্থাপত্য।

২২০. লেখমালা

২২১. মুদ্রা, পদক ও অলংকার

২২২. নম্বর কক্ষটি হাতীর দাঁতের শিল্পকর্ম।

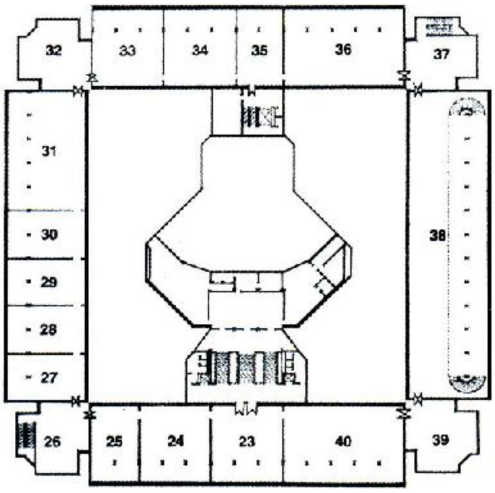

ZZxq Zjv

৩০২৩. নম্বর কক্ষটি অস্ত্র-শস্ত্র

৩০২৪. ধাতব শিল্পকর্ম

৩০২৫. চীনামাটির ও কাঁচের শিল্পকর্ম

৩০২৬. কক্ষ বিশ্রাম কক্ষ।

৩০২৭. কক্ষ পুতুল ও পুতুলের কাহিনী

৩০২৮. বাদ্যযন্ত্র

৩০২৯. বস্ত্র ও পোশাক-পরিচ্ছদ

৩০৩০. নকশি কাঁথা

৩০৩১. কাঠের শিল্পকর্ম

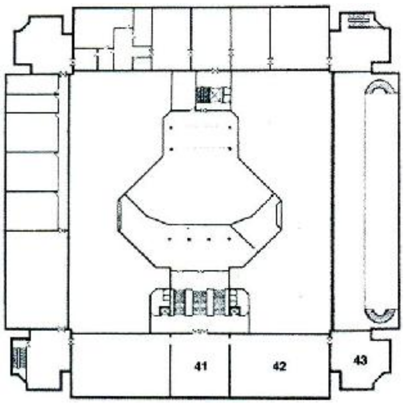

PZ_ Zjv

১. পাণ্ডুলিপি

২. দলিল

৩. প্রচ্ছদ চিত্র

৪. চিঠি

৫. প্রাচীন চিত্রকলা ও মিনিয়েচার শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন

৬. সমকালীন শিল্পকলা সমকালীন শিল্পকলা

৭. স্মরণীয়-বরণীয়, আবহমান বাংলাদেশ

৮. মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধ

৯. বিশ্ব শিল্পকলা

১০. বিশ্ব মনীষী প্রতিকৃতি[৪৮]

৩(ঠ) বরেন্দ্র গবেষণা সংগ্রহশালার কক্ষ বিন্যাস

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পূর্বে সবচেয়ে পুরাতন বরেন্দ্র গবেষণা সংগ্রহশালায় ৩/৪ টি গ্যালারিতে এবং বারান্দায় নিদর্শন প্রদর্শন করা হতো। বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর নতুন ভবন নির্মাণ করা হয় এবং ভবনের কিছু অংশ সম্প্রসারণ করা হয়। সংগৃহীত নিদর্শনের সংখ্যা রয়েছে প্রায় দশ হাজারের মত। এর বিভিন্ন কক্ষগুলোতে রয়েছে

১. ভাস্কর্য

২. প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু সভ্যতা

৩. মহাস্থান, নালন্দা ও পাহাড়পুরের বহু নিদর্শন

৪. বাংলাদেশের প্রাক ইসলামী যুগের শিলালিপি

৫. মুদ্রা

৬. তাম্রলিপি

৭. দলিল

৮. ফরমান

এছাড়া এখানকার লাইব্রেরিতে রয়েছে দুস্প্রাপ্য বই ও পত্রিকা। প্রাচীন ভাস্কর্য, রয়েছে ৯ হাজার, পাণ্ডুলিপি ৪ হাজার, ১ হাজার ১০০ প্রস্তর ও ধাতব মূর্তি, ৬১টি প্রাচীন লেখচিত্র, ১ হাজার ৩০০ প্রাচীন মুদ্রা, ৯০০ পোড়ামাটির ভাস্কর্য, ৩২টি অস্ত্রশস্ত্র, ২১টি আরবি-ফার্সি দলিল।

মুসলিম ঐতিহ্য কক্ষে সংযোজন করা হয়েছে আব্বাসীয়, মুঘল সুলতানী, নবাবী আমলের অসংখ্য নিদর্শন, কোরআন শরিফ, মুসলিম নবাব ও সুলতানদের হাতে লেখা ফরমান, মুসলিম পুঁথি, শিলালিপি, পেইন্টিং, অলংকৃত ধাতবপত্র, যুদ্ধাস্ত্র, কামান, তলোয়ার, নানা মূর্তি।

আবহমান বাংলা গ্যালারিতে গ্রাম বাংলার লোক ঐতিহ্যকে নিপুণভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতি উপজাতির নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র, অস্ত্রশস্ত্র ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি।[৪৯]

৩(ড) সোনারগাঁয়ের কারুপল্লী ফাউন্ডেশন গ্যালারি বিন্যাস

নারায়ণগঞ্জে সোনার গাঁয়ের লোক ও কারুশিল্প সংগ্রহশালাটি ১১টি গ্যালারিতে বিভক্ত।

১. নিপুণ কাঠ খোদাই

২. গ্রামীণ জীবন পট ও মুখোশ

৩. নৌকার মডেল

৪. উপজাতি

৫. লোকজ বাদ্যযন্ত্র ও

৬. পোড়ামাটির নিদর্শন

৭. লোহার তৈরি নিদর্শন

৮. তামা- কাঁসা পিতলের তৈজসপত্র

৯. লোকজ অংলকার

১০. বাঁশ-বেত শীতল পাটি ও

১১. বিশেষ প্রদর্শনী গ্যালারি।[৫০]

শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প সংগ্রহশালা দুটি গ্যালারিতে বিভক্ত

প্রথম তলায় নিপুণ কাঠখোদাই গ্যালারিটি কাঠের তৈরি প্রাচীন ও আধুনিক সময়ের বিভিন্ন নিদর্শনে সজ্জিত। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশে কাঠ থেকে নানাধরনের কারুপণ্য তৈরি ও বিক্রয় প্রক্রিয়া ডিওরোমা মডেলের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে।

॥দ্বতীয়তলাটি জামদানি ও নকশি কাঁথা দিয়ে গ্যালারি বিন্যাসিত করা হয়েছে। সোনারগাঁওয়ে তৈরি বিভিন্ন মটিফ ও রঙের জামদানি প্রদর্শিত হচ্ছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার নকশি কাঁথা এখানে রয়েছে। ডিওরোমার সাহায্যে তুলা থেকে বস্ত্র তৈরির পদ্ধতি দেখানোর ব্যবস্থা রয়েছে। সংগ্রশালায় সংগৃহীত দ্রব্যের সংখ্যা প্রায় ৪৫০০ হাজার। গ্যালারিতে প্রদর্শন করা হয় ৯৪০টির মতো। বাকি সব ষ্টোরে সংরক্ষিত রয়েছে।

৩(ঢ) লালবাগ দুর্গ সংগ্রহশালার গ্যালারি

লালবাগ দূর্গ সংগ্রহশালায় উল্লেখযোগ্য নিদর্শন সমূহের মধ্যে রয়েছে

১. মোগল আমলের অস্ত্রশস্ত্র

২. পাণ্ডুলিপি

৩. মুদ্রা (অনুকৃতি)

৪. মৃৎশিল্প

৫. কার্পেট

৬. ক্ষুদ্রাকার চিত্র

৭. হস্তলিপি ও

৮. রাজকীয় ফরমান ইত্যাদি।

সংগৃহীত দ্রব্যের স্বল্পতা ও সংগ্রহশালার সীমিত আয়তনের পরিপ্রেক্ষিতে সময়ানুক্রমিকভাবে প্রত্নবস্তুর প্রদর্শন এখানে সাজানো হয়নি। একই ধরনের জিনিসপত্র একই স্থানে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে।

লালবাগকেল্লার নীচের তলার তিনটি কক্ষেই যুদ্ধাস্ত্র প্রদর্শিত হয়েছে। দ্বিতীয় তলার দক্ষিণ-পূর্ব পার্শ্বের ছয়টি প্রদর্শনী আধারে পবিত্র কোরআন ও অন্যান্য পাণ্ডুলিপি প্রদর্শিত হয়েছে।

মুঘল মুদ্রা (অনুকৃতি) প্রদর্শিত হয়েছে পশ্চিম পার্শ্বে, পূর্ব পার্শ্বের মাঝখানের কুলুঙ্গিতে পরিবিবির মাজারে প্রাপ্ত শিলালিপি ও পশ্চিমের কুলুঙ্গিতে সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীরের সাম্রাজ্যের বিভিন্ন টাকশাল চিহ্নিত মানচিত্র প্রদর্শিত হয়েছে।[৫১] মুঘল স্বর্ণ মুদ্রার কয়েকটি বৃহদাকার প্রতিকৃতি ও প্রদর্শনী আধারের উপরে দেয়ালে গাত্রে সংস্থাপন করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় কক্ষে মুঘল আমলের মৃৎশিল্পের কিছু নমুনা প্রদর্শিত হয়েছে। অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার পাত্রগুলি প্যাডেস্টাল এর ওপরে এবং বাকি ছোট ছোট বাসন ও অলংকৃত পাত্র প্রদর্শনী আধারে প্রদর্শিত হয়েছে পূর্ব দিকের খিলানের সাথে মুঘল আমলে ব্যবহৃত ঝাড়বাতি ও তার নীচে কার্পেট ঝুলিয়ে বাখা হয়েছে। পশ্চিম দিকের দুইটি প্রদর্শনী আধারে মিনিয়েচার প্রদর্শন করা হয়েছে। উত্তরের ছোট কক্ষের পূর্ব পার্শ্বে কিছু প্রাচীন হস্তলিপির নমুনা ও পশ্চিম পার্শ্বে কয়েকটি রাজকীয় ফরমান ও দলিল প্রদর্শিত হয়েছে।

প্রদর্শিত নিদর্শনের মধ্যে সংগ্রহশালার নীচের তিনটি কক্ষে প্রদর্শিত বিভিন্ন প্রকার যুদ্ধাস্ত্রগুলির বেশির ভাগই মুঘল রাজত্বের শেষ পর্যায়ের আঠারশ ও উনিশ শতাব্দীতে ব্যবহৃত হতো। পুরাতন অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে তীর, ধনুক, বর্শা, কুঠার, বল্লম, তরবারি, ছোরা ও অন্যান্য ক্ষুদ্রাস্ত্র।[৫২]

3(Y) Avnmvb gwÄj msMnkvjvi M¨vjwi

১৯৯২ সালের ২০ সেপ্টেম্বর আহসান মঞ্জিল জাদুঘরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ও জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। আহসান মঞ্জিল সংগ্রহশালাটি ২৩টি গ্যালারিতে বিভক্ত।

১ এবং ২নং গ্যালারি আহসান মঞ্জিল পরিচিতি পর্বে সাজানো হয়েছে। এই গ্যালারি দুটিতে তারজালি কাজের তৈরি প্রাসাদের মডেল আছে এবং প্রাসাদ ভবনের সাথে জড়িত ঐতিহাসিক অনেক তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। প্রাসাদটির আদি স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য, বিবর্তন রূপ আলোকচিত্রের মাধ্যমে প্রদর্শিন করা হচ্ছে। এছাড়াও এখানে রয়েছে প্রাসাদে ব্যবহৃত কাটগ্লাসের ঝাড়বাতি ও তৈজসপত্রের নমুনা।

৩ নং গ্যালরিতে আছে প্রাসাদের ডাইনিং রুম

৪ নং গ্যালারি হলো গোলঘর নিচতলা

৫ নং গ্যালারিটি প্রধান সিঁড়ি ঘর (নিচতলা)

৬ নং গ্যালারি আহসানুল্লাহ মেমোরিয়াল হাসপাতাল

৭ নং গ্যালারি হলো মুসলিম লীগ কক্ষ

৮ নং গ্যালারি হলো বিলিয়ার্ড কক্ষ

৯ নং গ্যালারি সিন্দুক কক্ষ

১০ নং গ্যালারি নওয়াব পরিচিত

১১ নং গ্যালারিটি ১৩ নং গ্যালারিটি প্রতিকৃতি দিয়ে সাজানো

১২ নং গ্যালারিটি নওয়াব সলিমুল্লাহ স্বরণে

১৪ নং গ্যালরিটি হিন্দুস্থানী কক্ষ

১৫ নং গ্যালারি প্রধান সিঁড়িঘর (দোতলা)

১৬ নং গ্যালারি লাইব্রেরি কক্ষ

১৭ নং গ্যালারিটি কার্ডরুম

১৮ নং গ্যালারি নওয়াবদের অবদান ঢাকায় পানীয় জলের ব্যবস্থা

১৯ নং গ্যালারি স্টেট বেডরুম ২০নং গ্যালারিটি নওয়াবদের অবদানে ঢাকায় বিদ্যুৎ ব্যবস্থা

২১ নং গ্যালারি প্রাসাদ ড্রইং রুম

২২ নং গ্যালারি গোলঘর (দোতলা)

২৩ নং গ্যালারি বলরুম (নাচঘর)। ঢাকার নওয়াবগন ছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় প্রকার সংস্কৃতি সমঝদার। নওয়াব আবদুল গনি ছিলেন গান ও কবিতার একজন পৃষ্ঠপোষক। তাঁর পুত্র নওয়াব আহসানুল্লাহ নিজেই একজন উঁচুমানের সঙ্গীতজ্ঞ, বাদক এবং বিশিষ্ট কবি।[৫৩]

৩(ত) মেলার আয়োজন

আমরা জানি যে সোনারগাঁওয়ের বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের লোকশিল্প প্রদর্শনের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও বৃহত্তম স্থান। আবহমান বাংলার গ্রামীণ পরিবেশে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্পের ১৫০ বিঘা আয়তনের কমপ্লেক্সর দুইটি সংগ্রহশালার গ্যালারিতে লোক ও কারুশিল্পের প্রদর্শন ছাড়াও ১৯৮০ সাল থেকে মেলা ও লোকজ উৎসবের আয়োজন করে আসছে। প্রথমদিকে এই মেলা একদিনের জন্য ব্যবস্থা করা হতো। ১৯৯২ সাল সময় বাড়িয়ে সপ্তাহে ২দিন করে এভাবে মাসব্যাপী মেলা চলত। ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত এই মেলা অব্যাহত ছিলো।

১৯৯৫ সাল থেকে ফাউন্ডেশন একমাস ধরে লোক কারুশিল্পমেলা ও লোকজ উৎসব এর আয়োজন করে আসছে। এই মেলার শুভ উদ্বোধন করে থাকেন বাংলাদেশ সরকারের যে কোনো মাননীয় মন্ত্রী। ফাউন্ডেশন আয়োজিত মেলা প্রতি বছরই নানারূপে নতুন আঙ্গিক শৈল্পিক সাজসজ্জায় উপস্থাপিত হয়ে থাকে। লোক ও কারুপল্লী ফাউন্ডেশনের প্রাঙ্গনে হাজার হাজার দর্শনার্থীর আগমনে এর উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে গ্রামীণ পরিবেশে বিভিন্ন কারুশিল্প নির্মাণ স্বচক্ষে দেখার সুযোগ লাভ করেন। কারুপল্লী ফাউন্ডেশন একদিকে যেমন সংগ্রহশালার নির্দিষ্টকক্ষে পৃথক পৃথক গ্যালারিতে লোকশিল্প প্রদর্শনের ব্যবস্থা রয়েছে অন্যদিকে সরাসরি গ্রামীণ পরিবেশ দেখার সুযোগ রয়েছে। এখানে সারা বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্রছাত্রী শিক্ষাসফরে আসে আবার পিকনিক স্পট হিসেবে এটি একটি চমৎকার স্থান হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। দর্শকরা নারায়ণগঞ্জের এই ঐতিহাসিক স্থানে এসে একদিকে যেমন ঐতিহাসিক বিভিন্ন ইমারত পরিদর্শন করে গ্রামীণ পরিবেশে এসে শহরের ক্লান্তি দুর করতে সক্ষম হয়।

২০০৮ সাল পর্যন্ত মোট মেলার সংখ্যা ছিলো ৩২টি। এর মধ্যে বিশেষ প্রদর্শনী হয়েছে ১৫টি। সেমিনার হয়েছে ৫১টি। কর্মরত কারুশিল্পীদের ১৯৯৬ সাল থেকে আয়োজন শুরু হয়েছে। প্রতিবছর এদের মেলার অনুষ্ঠিত হয়। বিদেশেও মেলার ব্যবস্থা করা হয়। এর মধ্যে কোরিয়ায় ১৯৮৯ সালে,ব্যাংককে ১৯৮১ সালে, দিল্লীতে ১৯৮৩ সালে এবং ১৯৯৫ সালে পাকিস্তানে মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে।[৫৪] জাতীয় পর্যায়ে লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব উপলক্ষে প্রতি বছরই নানারূপে নতুন আঙ্গিকে শৈল্পিক সাজসজ্জায় উপস্থাপন করা হয়। মেলার অনুষ্ঠানের মধ্যে আকর্ষণীয় পর্ব হলো লোককসঙ্গীত অনুষ্ঠানের আয়োজন। জারি, সারি, ভাটিয়ালী, ভাইয়াইয়া, মুর্শিদী, মারফতি, লালনগীতি, হাসন রাজার গান, কবিগান, গীতনাট্য, লোকজগল্প বলা, উপজাতীয় সংগীত, আলকাপগান, গম্ভীরাগান পরিবেশিত হয়। প্রায় দুই হাজার সঙ্গীত শিল্পী, লোক নৃত্যশিল্পী ও লোকজবাদ্যযন্ত্রী অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে ।

চিত্র-২৫: কারুপল্লী ফাউন্ডেশনের মেলা চলাকালীন সময়ের বাউল গান পরিবেশনের দৃশ্য

ফাউন্ডেশনের খেলার মাঠে ১৫টি স্কুলের প্রায় ১৫শ স্কুলের ছেলেমেয়ে গ্রামীণ খেলায় অংশ নিয়ে থাকে। যেমনঃ দোক খেলা, হা-ডু-ডু খেলা, দাড়িয়াবান্দা ইত্যাদি খেলা মেলা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। লোকজীবনের বিলুপ্ত প্রায় দৃশ্যাবলীর প্রদর্শন, নাগরদোলায় চড়া, শিশুদের ঘোড়ায় চড়া, দোলনায় চড়া, নৌকা ভ্রমণ, যেমন খুশি তেমন সাজো ইত্যাদি মেলায় ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়াও বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী লাঠি খেলারও আয়োজন করা হয়ে থাকে।[৫৫]

ফাউন্ডেশনের অন্যতম লক্ষ হলো হারানো ঐতিহ্যকে পুনরায় আবিষ্কার করা, অজানা কারুশিল্প ও শিল্পীকে মেলা পরিদর্শনে আসা মানুষের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা। যারা দীর্ঘদিন ধরে এই শিল্পের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত রেখেছে তাদের উৎসাহিত এবং প্রেরণা যোগাতে এবং কারুশিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করাই হলো ফাউন্ডেশনের লক্ষ। প্রতিবছর সংগ্রহশালার প্রাঙ্গনে আয়োজিত মেলায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অজানা দক্ষ কারুশিল্পীর শিল্পীকে ‘কর্মরত কারুশিল্পী প্রদর্শনের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়।[৫৬]

লোককারু শিল্পমেলা ও লোকজ অনুষ্ঠানে প্রচুর দর্শক সমাগম ঘটে। বিকেল ৫টা থেকে লোকজ অনুষ্ঠান দেখবার জন্য প্রতিদিন গড়ে ৫০০০ হাজার লোকের সমাগম হয়। মেলা উৎসবে প্রায় দেড় লক্ষ লোকের সমাগম ঘটে। এ ছাড়াও অনেক বিদেশি দর্শক, কূটনৈতিক মেলা ও উৎসব পরিদর্শন করেন। দেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রের সাংবাদিক, বাংলাদেশ বেতার, বিটিভি, বিভিন্ন বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলো লোকশিল্প মেলা ও উৎসব নিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের প্রামাণ্যচিত্র ও সংবাদ পরিবেশন করে থাকে।[৫৭]

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর গ্যালারি প্রদর্শন ছাড়াও কারুশিল্প মেলার আয়োজন করে থাকে। এর মধ্যে ২১ মে-২১ জুলাই ২০০০ সালে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের সমকালীন ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্প প্রদর্শনী ও মেলা এই শিরোনামে এবং বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের দ্বারোদঘাটন দিবস উপলক্ষে কারুশিল্প মেলা ২০১০ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

২০০০ সালে অনুষ্ঠিত মেলায় ২৫ জন লোকশিল্পীর শিল্পকর্ম স্থান পেয়েছিলো। তাঁদের মধ্যে ছিলেন বাংলাদেশের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ লোকশিল্পী। এ প্রদর্শনীতে মরণ চাঁদ পালের পোড়ামাটির পুতুল, গোবিন্দ পাল,সন্তোষ পাল ও অমূল্য পালের পোড়ামাটির ফলক, আব্দুল হামিদ মোল্লার বাঁশের কাজ, শওকত আলী ও এনামুল হকের জামদানি, ফুলনজয় দাস ও বারীন্দ্র চন্দ্র দাসের শীতল পাটি, পারুল আক্তার, রোশনা বেগম ও রাহেনা আক্তারের মাদুর (বোটনি) তপতি রানী দে-র রিকশা পেইন্টিং, আনিচ মিসিত্রর রিকশা, সুধীর আচার্যের গাজীর পট, মোক্তার হোসেনের পিতলের খোদাই কাজ, হরিপদ পালের সিমেন্টের তৈরি বঙ্গবন্ধু ও রাধা-কৃষ্ণের ভাস্কর্য, রাশেদ মোশাররফ, আনন্দ পাল ও আহম্মদ আলীর পিতলের ভাস্কর্য এবং আলেয়া খানমের নকশিকাঁথা উপস্থাপন করা হয়। এ সব লোকশিল্পীর শিল্পকর্মের নকশার মধ্যে ছিলো নিজস্ব চিন্তা চেতনা। এই প্রদর্শনীটি ছিলো দুইভাগে বিভক্ত। মূল ভবনের নীচতলায় অস্থায়ী প্রদর্শনী কক্ষে উপস্থাপিত করা হয় বিভিন্ন লোকশিল্পীর শিল্পকর্ম এবং মূল ভবনের উত্তর দিকের খোলা জায়গায় লোকশিল্পীদের নিজেদের তৈরি শিল্পকর্ম বিক্রির ব্যবস্থা। এ ছাড়াও ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক একটি ভিডিও তৈরি করে প্রর্দশনী কক্ষে তা দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়।[৫৮]

২০১০ সালের ৪ ডিসেম্বর থেকে ৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত কারুশিল্পের জাদুঘরের দ্বারোদঘাটন দিবস উপলক্ষে জাতিতত্ত্ব ও অলংকরণ শিল্পকলা বিভাগ কারুশিল্পের মেলার আয়োজন করে। এ মেলার উদ্দেশ্য ছিলো দেশের জনগণকে কারুশিল্প সম্পর্কে সচেতন করে তোলা। একই সাথে একই জায়গায় বিভিন্ন মাধ্যমের কারুশিল্পকে যেমন জনগণ দেখতে পাবে তেমনি কারুশিল্পের নির্মাণ পদ্ধতি অবলোকন করতে পারবে। বাংলাদেশের সাতটি বিভাগের কারুশিল্পীদের মেলায় আসার জন্য জাতীয় জাদুঘর আমন্ত্রন জানায়। এর মধ্যে ঢাকা বিভাগের জামদানি, নকশি কাঁথা, টেপা পুতুল, নকশি সুতার পাখা, ধাতবশিল্প, পুঁতির মালা, দারুশিল্প, মৃৎশিল্প চামড়াশিল্প। চট্টগ্রাম বিভাগের ছিলো বাঁশশিল্প, বস্ত্রশিল্প, হোগলাশিল্প। সিলেট বিভাগের ছিলো শীতলপাটি। রংপুর বিভাগের শতরঞ্জি, রাজশাহী বিভাগের মুখোশ ও শখের হাঁড়ি। খুলনা বিভাগের ছিলো শোলাশিল্প। এই কারুশিল্প মেলায় ২৪ জন কারুশিল্পী অংশ নেয়।[৫৯]

৩(থ) বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম

সোনারগাঁও একসময় ছিলো বাংলার রাজধানী এবং এখানকার কারিগরগণ মসলিন বুননে ছিলো জগৎখ্যাত। একদিকে এই স্থানটি যেমন ঐতিহাসিকভাবে সমৃদ্ধ তেমনি এই অঞ্চলটির আবহাওয়া, জলবায়ু ও ভৌগোলিক পরিবেশ লোকশিল্পের জন্য সহায়ক। লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের সম্পূর্ণ বেষ্টনীর জায়গা জুড়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ঘরের মডেল কৃত্রিম হ্রদ এবং এর চারিদিকে গাছপালা শ্যামল ঘন ভৌগোলিক পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। এই ফাউন্ডেশনের আরো একটি উদ্দেশ্য ছিলো বর্ণ ও বৃত্তিভুক্ত লোকশিল্পীদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেয়া। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের কারুশিল্পীরা ফাউন্ডেশনের প্রাঙ্গণে জন্মসুত্রে পাওয়া শিল্পকর্ম সৃষ্টি করবেন এবং দর্শকরা চাক্ষুসভাবে এই সৃষ্টি পদ্ধতি ও শিল্প নমুনা দেখবেন। কিন্তু এই প্রকল্প বাস্তবায়িত না হলেও বাংলা নববর্ষ, বসন্ত উৎসব উৎযাপন উপলক্ষে ফাউন্ডেশনের প্রাঙ্গনে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কারুশিল্পীদের দোকান বরাদ্দ দেয়া হয়। তারা এ সময় জামদানি শতরঞ্জি নকশিপাখা নকশি শিকা, শোলার কাজ, বাঁশজাত দ্রব্যের মধ্যে গহনার বাক্স, কুলা, ঝুড়ি, ডালা প্রদর্শনীর সাথে সাথে তাঁতিরা জামদানি নির্মাণের পদ্ধতিও দেখিয়ে থাকে। গবেষণা কর্মসূচীর আওতায় ফাউন্ডেশন থেকে বাংলাদেশের লোক ঐতিহ্যের নৃতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক ও আর্থসামাজিক এবং নন্দনতাত্ত্বিক অজানা তথ্য, তত্ত্ব উদ্বাবনে গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারের উন্নয়ন প্রকল্পে এ পর্যন্ত ৪টি প্রকল্প বাস্তবায়িত ফাউন্ডেশনের বাস্তবায়িত হয়েছে।[৬০]১৯৯৮ সালের ৬ মে মহান জাতীয় সংসদে 'বাংলাদেশের লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন আইন ১৯৯৮ (সনের ৮নং আইন)' শিরোনামে আইন প্রণীত হয়। এ আইনের আওতায় ফাউন্ডেশনের যাবতীয় কার্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। ৩ জুন ২০১২ বাংলাদেশ গেজেটে "লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের কর্মচারী (অবসর ও আনুতোষিক) প্রবিধানমালা, ২০১২" শিরোনামে পেনশনবিধি প্রকাশিত হয়েছে। অনুমোদিত এ প্রবিধানমালার আওতায় ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা কর্মচারীগণ সরকারি নিয়ম মোতাবেক পেনশন সুবিধা ভোগ করবেন।[৬১]

১. সোনারগাঁও লোকশিল্প জাদুঘর শিল্পগ্রাম প্রতিষ্ঠা (১৯৭৭-১৯৮৯) প্রকল্প ব্যয় ৪৯.৩৪ লক্ষ টাকা।

২. শিল্পগ্রাম-ক্ষুদাকার বাংলাদেশ (১৯৮০-১৯৮৫) প্রকল্প ব্যয় ৬৫.৩৫ লক্ষ টাকা।

৩. সোনারগাঁও লোকশিল্প জাদুঘর (সংশোধিত) (১৯৮৭-১৯৯০) প্রকল্প ব্যয় ৪৯৬.৩২ লক্ষ টাকা।

৪. সোনারগাঁও কারুশিল্প গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প ব্যয় ৭৩২০০ লক্ষ টাকা (১৯৯৮-জুন থেকে ২০০৬)

প্রকল্পটির উদ্দেশ্য ছিলো বাংলাদেশের মানুষের সৃষ্টি করা শিল্পকলা লোক ও কারুশিল্পের ঐতিহ্যের নিদর্শন সংগ্রহ, সংরক্ষণ প্রদর্শন ও উৎপাদন এবং পুনরুজ্জীবনের লক্ষে ফাউন্ডেশনের ১৭০ বিঘা আয়তনের কমপ্লেক্সে কারুশিল্প গ্রাম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ১৭০ বিঘা ভূমিকে ক্ষুদ্রাকার বাংলাদেশে পরিণত করা। এই গ্রামে বাংলাদেশের চিরায়ত গ্রামীণ প্রকৃতি ও পরিবেশে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা কারুশিল্পীরা তাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে শেখা কারুশিল্প যা বর্তমানে হারিয়ে গেছে তা তৈরি করবে। কারুশিল্পগ্রাম প্রকল্পে বাংলাদেশের ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশকেন্দ্রিক গ্রামের সাধারণ মানুষের ঘরবাড়ি, বিশেষ করে কারুশিল্পীদের আঞ্চলিক ঘরবাড়ি সংবলিত গ্রামীণ স্থাপত্যের অনুপুঙ্খের বাস্তব গঠন ও গড়নের অবকাঠামো তৈরির ব্যবস্থা নিয়েছে। শিল্পগ্রামে বাংলার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের বৈচিত্রময় লোকজ স্থাপত্যের প্রাচীন এবং চলমান রূপের ধারাটি তুলে ধরবে। ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন জাতীয় সংসদে অনুমোদিত হয় এবং ৬ মে ১৯৯৮ তারিখে সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হয়। এর আইন অনুযায়ী ফাউন্ডেশনের কার্যাবলীর মধ্যে দশটি বিষয়কে পরিকল্পনা প্রকল্পের গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়।[৬২]

c_gZ, ঐতিহাসিক লোক ও কারুশিল্প সংরক্ষণ করা।

wØZxqZ, কারুশিল্প বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

ZZxqZ, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে লোকশিল্প বিষয়ক সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠা করা।

PZ_Z, নারায়ণগঞ্জ জেলার অন্তর্গত সোনারগাঁয়ে শিল্পগ্রাম প্রতিষ্ঠা করা।

cÂgZ, লোক ও কারুশিল্প বিষয়ে গবেষণা করা এবং গবেষণালব্ধ তত্ত্ব ও তথ্যাদির প্রকাশনার ব্যবস্থা করা। লোক ও কারুশিল্পে নিদর্শনাদির সংরক্ষণ এবং ঐতিহ্যবাহী লোক ও কারুশিল্পের উৎসাহ দান।

IôZ, লোক ও কারুশিল্পের উন্নয়নে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

mßgZ, লোক ও কারুশিল্পের গবেষণায় নিয়োজিত যে কোনো ব্যক্তি ও সংস্থাকে সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান। লোক ও কারুশিল্প উন্নয়ন নীতি প্রণয়নে সরকারকে সাহায্য করা এবং এ সম্পর্কিত যে কোনো বিষয়ে সরকার, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ দেয়া।

AógZ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে দেশি, বিদেশি ও আর্ন্তজাতিক লোক ও কারুশিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে একই বিষয়ে যৌথ কর্মসূচি গ্রহণ করা এবং প্রতিটি বিষয়ের কার্যাদির সম্পূরক ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য কাজ করা।[৬৩]

বাস্তবায়িত প্রকল্পের বিষয়াবলী

বাংলাদেশের বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন ১৭০ বিঘা জমির ওপর নির্মিত হয়েছে। ভূ-দৃশ্যের স্থানে লোক কারুশিল্প জাদুঘর এবং শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পটির উদ্দেশ্য ছিলো ১৭০ বিঘা ভূমিকে ছোট্ট একটি বাংলাদেশের মডেলে পরিণত করা। এই আয়তনের মধ্যে সংগ্রহশালার স্থাপত্য নকশা অনুযায়ী বাংলাদেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সমতলভূমি, জলাভূমি ও কৃত্রিম সাধারণ বৈশিষ্ট্য সংবলিত আঁকাবাঁকা হ্রদ নির্মাণ করা হয়েছে। আঁকাবাঁকা জলাশয় ও খাল, সবুজ গাছপালার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সংগ্রহশালার সমস্ত এলাকা জুড়ে অপূর্ব নান্দনিক দৃশ্যের সূচনা হয়েছে। আভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ, ভূমি উন্নয়ন, ডকুমেন্টেশন ভবন ও সেল সেন্টার নির্মাণ, পাবলিক টয়লেট নির্মাণ, কারু ব্রিজ বড় ১টি ও ছোট ২টি নির্মাণ, সীমানা প্রাচীর নির্মাণ ও সীমানা প্রাচীর অলংকরণ অঞ্চলভিত্তিক ঘরবাড়ি (কারুশিল্পগ্রাম) মৃৎশিল্প, কাঠ ও কাঠখোদাই কারুশিল্প, হস্তনির্মিত কাগজ কারুশিল্প, শাখা-ঝিনুক-মুক্তা নারিকেলের কারুশিল্প, জামদানি শাড়ি তৈরি, নকশি কাঁথা, তাঁতশিল্প রেশম শিল্প, পাটজাত কারুশিল্প বাঁশ-বেত কারুশিল্প, তামা, কাঁসা, সোনা ও রপার কারুশিল্প ইত্যাদি।[৬৪]

গ্রামীণ স্থাপত্য

বাংলাদেশের ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশকেন্দ্রিক গ্রামের সাধারণ মানুষের ঘরবাড়ি, বিশেষ করে কারুশিল্পীদের আঞ্চলিক ঘরবাড়ি সংবলিত গ্রামীণ স্থাপত্যের রীতি অনুযায়ী বাস্তব গঠন ও গড়নের অবকাঠামো প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এখানে প্রায় ৩১টি কুঁড়েঘর কারুশিল্প উৎপাদন প্রদর্শন ও বিক্রির ব্যবস্থা আছে। শিল্পগ্রামে বাংলার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের বৈচিত্র্যময় লোকজ স্থাপত্যের প্রাচীন এবং চলমান রূপের ধারা তুলে ধরা হয়েছে। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন শৈল্পিক অনুভূতি দিয়ে কারুশিল্প আদর্শ গ্রাম গড়তে চেয়েছিলেন। তার আদর্শ গ্রামের মধ্যে ভূতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক এবং অন্যান্য পরিচয় পাওয়া যাবে।[৬৫]

evsjv‡‘k †jvK I Kviæwkí dvD‡Ûkb cwiPvjbv †ev‡Wi mfvcwZ hviv wQ‡jb Zv‡‘i bv‡gi ZwjKv I mgqKvj: সারণি ২

bvg	mgqKvj
শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন	০১/০৬/৭৫ - ১২/০৫/৭৬
প্রফেসর এ কে নাজমূল করিম	১৩/০৫/৭৬ - ১৭/০৯/৭৮

bvg	mgqKvj
জনাব এ বি এম সফদার	১৮/০৯/৭৮ - ২১/১১/৭৮
জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান	২২/১১/৭৮ - ২১/১০/৮১
জনাব হেদায়েত আহম্মদ	২২/১১/৮১ - ১৩/০৫/৮২
জনাব মঞ্জুর মোর্শেদ	১৪/০৫/৮২ - ১৪/০৫/৮৪
জনাব শামসুল হুদা চৌধুরী	১৫/০৫/৮৪ - ১৫/০৮/৮৬
জনাব মোমেন উদ্দিন আহাম্মদ	১৬/০৮/৮৬ - ০৫/১২/৮৬
জনাব মাহবুব রহমান	০৬/১২/৮৬ - ০৭/০৭/৮৮
জনাব নূর মোহাম্মদ খান	০৮/০৭/৮৮ - ১৯/০৬/৮৯
সৈয়দ দীদার বখত	২০/০৬/৮৯ - ২৭/০১/৯১

৬৬

৩(দ) একটি পূর্ণাঙ্গ সংগ্রশালার বিভাগ ও শাখাসমূহ

১. কিউরেটরিয়াল
২. প্রদর্শনী
৩. স্টোর
৪. নিরাপত্তা
৫. নিবন্ধন
৬. প্রশাসন
৭. সংরক্ষণ রসায়নাগার
৮. শিক্ষা
৯. এক্সপ্লোরেশন
১০. পাঠাগার
১১. প্রকাশনা
১২. রেপ্লিকা
১৩. আলোকচিত্র ও শ্রতিচিত্রণ
১৪. প্রকৌশল
১৫. কম্পিউটার
১৬. অডিটোরিয়াম

একটি আদর্শ সংগ্রহশালার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদবী

মহাপরিচালক, কিউরেটোরিয়াল কর্মকর্তা (পরিচালক/কীপার/কিউরেটর, রেজিস্ট্রশন অফিসার, এক্সপ্লোরেশন অফিসার, ডিসপ্লে অফিসার, জনশিক্ষা কর্মকর্তা, প্রদর্শক প্রভাষক, প্রকাশনা কর্মকর্তা, জনসংযোগ কর্মকর্তা, রেপ্লিকা ম্যানুফেকচারার, টেক্সিডার্মিস্ট, গ্রন্থাগারিক, সংরক্ষণ রসায়নবিদ, শ্রুতিচিত্রণ কর্মকর্তা, আলোকচিত্রী, মাইক্রোফিল্ম/ফিস ফটোগ্রাফার, অডিটরিয়াম ম্যানেজার, মুভি ক্যামেরাম্যান, ফিল্ম এডিটর, সাউন্ড রেকর্ডিস্ট, নিরাপত্তা কর্মকর্তা, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, গুদাম কর্মকর্তা, প্রকৌশলী, ড্রাফটসম্যান, সার্ভেয়ার, এয়ারকন্ডিসনিং ম্যাকানিক, ইলেকট্রিশিয়ান, প্রজেকশন ম্যান, লিফট অপরেটর, পাম্প মিস্ত্রি কাম অপরেটর, স্টেজ সহকারী, মডেলার, অডিও ইকুইপমেন্ট অপারেটর, প্লাম্বার, কাঠমিস্ত্রি, পেইন্টার, স্টেনোগ্রাফার, কম্পিউটার, অপরেটর, কেয়ারটেকার, ক্যাশিয়ার, বিক্রয়কারী, অভ্যর্থনাকারী, রেকর্ডকীপার, ডেসপাচ-সহকারী, বুক বাইন্ডার, গ্যালারি এটেনডেন্ট, নিরাপত্তা প্রহরী, মালি ও সুইপার-কাম ক্লিনার।

উপসংহার

যে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক সংগ্রহশালার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম। এই প্রাতিষ্ঠানিক সংগ্রহশালাকে পরিপূর্ণভাবে সমৃদ্ধশালী করে তুলতে হলে প্রয়োজন দক্ষ, সৎ, নিষ্ঠাবান, যোগ্যতা সম্পন্ন জাদুঘরকর্মীদের একান্ত সহযোগিতার প্রয়োজন। কারণ উপাদান সংগ্রহ, সংরক্ষণ, দলিলিকরণ গুদামকরণ, শিক্ষা কার্যক্রম প্রাতিষ্ঠানিক সংগ্রহশালা কর্মকর্তা, কর্মচারী ও জনগণের সকলের অংশ গ্রহণে পরিচালিত হয়। সংগ্রহশালার প্রতিটি উপাদান অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ। এ সম্পদ কারো একার সম্পদ নয়। যে কোনো ধরনের সংগ্রহশালা কেবল ঐতিহাসিক নিদর্শনের সংগ্রহশালা নয়, এটি আমাদের গর্বের জায়গা। ছবি যেমন কথা বলে, তেমনি সংগ্রহশালা জড় নিদর্শনগুলো শিক্ষা প্রদানকরে। সুতরাং সংগ্রহশালাকে জন সম্মুখে উপস্থাপন করতে নিদর্শন শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। এই শিক্ষা প্রদান করা হয় সংগ্রহশালার কার্যক্রমের মাধ্যমে।

Z_¨mÎ

১. Firoz Mahmund, Habibur & Rahman, ***The Museums in Bangladesh***, p. 72
২. বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর ৮৫ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন ০৭ আগস্ট ১৯৯৮ পৃ. ১৬-২১
৩. Dean David & Edson Gary, ***The Handbook for Museums***, Landon, Routledge,1996, p.1
৪. জাদুঘর সমাচার, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৫, পৃ.৫
৫. Wittlin, S Alma ***The Museum***, p. 29
৬. মো. শফিকুল আলম ও লাভলী ইয়াসমিন, cZ¦PPv, (ঢাকা: প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার) পৃ. ১
৭. সরেজমিন পর্যবেক্ষণ
৮. Shyam Chand Mukherjee , ***Folklore Museum***. p. 39
৯. জাদুঘর সমাচার, জুলাই- সেপ্টেম্বর ২০০৬, পৃ. ১৪
১০. জাতীয় জাদুঘর পর্যবেক্ষণ
১১. বিশেষ প্রদর্শনী নিদর্শন সংগ্রহ ও কর্মকাণ্ড ২০০২ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, পৃ ৬.
১২. বিজন কুমার মন্ডল, msMnkvjv I †jvKwkí পৃ. ৬২
১৩. J.W.Y Higgs Ibid, p. 41
১৪. সৈয়দ আমীরুল ইসলাম,evsjv‡'‡k wgDwRqvg, (ঢাকা: জ্যোতিপ্রকাশ), ২০০৬, পৃ. ৩০
১৫. ঐ পৃ. ৪২
১৬. ঐ পৃ. ৩০
১৭. কুমার মণ্ডল, পৃ. ৬৬
১৮. ঐ পৃ. ৬৫
১৯. Vinod P., Dwivedi, Smita J Baxi, P 135
২০. J.W.Y Higgs, p. 41
২১. Shyam Chand. Mukherjee, p. 40
২২. Ajit Mookerjee, ***Folk Art of India*** (India: Clarion Books. Delhi –1986) p. 41
২৩ . Dean David & Edson Gary, ***The Handbook for Museums***, P.2
২৪. পল্লব সেন গুপ্ত, †jvKms¯wZi mxgvbv I ¯iæc, পৃ. ৪৭
২৫. কুমার মণ্ডল, পৃ. ৭১
২৬. ঐ পৃ. ৭৪
২৭. ঐ পৃ. ৭১
২৮. সৈয়দ আমীরল ইসলাম, evsjv‡'‡k wgDwRqvg পৃ. ১২.
২৯. জাদুঘর সমাচার ২০০৩ পৃ.১১
৩০. Vinod P, Dwivedi, Smita J Baxi, ***Modern Museum***, sp. 133
৩১. ইসলাম, পৃ. ৩৫
৩২. Shyam Chand. Mukherjee, p. 45
৩৩. কুমার মণ্ডল, পৃ. ৬৩
৩৪. সৈয়দ আমীরল ইসলাম,পৃ. ৩৩
৩৫. সরেজমিন পর্যবেক্ষণ
৩৬. তোফায়েল আহমদ, †jvK HwZ‡n¨i 'k w'Mš Í, পৃ. ৬৩
৩৭. খগেশ কিরণ তালুকদার, পৃ. ১১
৩৮. রবীন্দ্র, গোপ,†jvKwk‡íi wbewPZ ceÜ, (নারায়ণগঞ্জ:বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ২০১০) পৃ.২২৮
৩৯. Shyam Chand Mukherjee p. 45
৪০. সৈয়দ আমীরল ইসলাম, evsjv‡'‡k wgDwRqvg পৃ. ৩৯
৪১. জাদুঘর সমাচার অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৫, পৃ. ৫
৪২. ঐ, পৃ. ৬২

৪৩. ঐ পৃ.৬
৪৪. ঐ, পৃ. ৫
৪৫. HwZn¨ msiÿ‡Y Rv'Ni, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের শততম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে দু'বছরব্যাপী অনুষ্ঠানমালার অংশ হিসেবে দুর্লভ বই ও সাময়িকীর বিশেষ প্রদর্শনী ১ থেকে ১০, ২০১৩
৪৬. Mahmund & Habibur, Rahman, p. 4
৪৭. ঐ, p.4
৪৮. বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে পরিচিতি পৃ.৩
৪৯. আমীরুল ইসলাম, পৃ,২২
৫০. সরেজমিন
৫১. এ. কে. এম শামসুল আলম,, jvjevM 'M I hv'Ni, (ঢাকাঃ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,) পৃ ১০
৫২. ঐ পৃ. ১১
৫৩. সরেজমিন পর্যবেক্ষণ
৫৪. gvme¨vcx †jvKKvi"wkí †gjv I †jvKR Drme 2013, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় পৃ. ১৪
৫৫. ঐ পৃ. ২২
৫৬. সৈয়দ মাহবুব আলম (সম্পাঃ), †jvKwkí †jvKKvi"wkí †gjv I †jvKR Drme (bvivqYMÄ: বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, ২০০১) পৃ. ৭
৫৭. ঐ পৃ. ৩
৫৮. বাংলাদেশের সমকালীন ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্প প্রদর্শনী ও মেলা বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, পৃ. ২
৫৯. ঐ পৃ. ৩
৬০. ঐ পৃ. ৯
৬১. gvme¨vcx †jvKKvi"wkí †gjv I †jvKR Drme 2014, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় পৃ. ৪১
৬২. H পৃ. ১০
৬৩. Mahud Shsfique, ***Intangible Cultural Heritage and Sonargaon Folk Museum*** (Narayangonj: Bangladesh Folk Art & Crafts Foundation Sonargaon Ministre of Cultural Affairs, 2004) p, 11
৬৪. মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০১১ পৃ. ৩৬
৬৫. স্মরণিকা, মাসব্যাপী লোককারুশিল্প, ২০০৮, পৃ. ১২
৬৬. ঐ c. 7

Dhaka University Institutional Repository

ZZxq Aa¨vq

evsjv‡'‡ki †jvKmsMnkvjvq msiw¶Z Bmjvgx Dcv'vb

বাংলাদেশ নামের যে ভূখণ্ডটি বিশ্বের মানচিত্রে রাষ্ট্রীয় সত্তা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে সে ভূখণ্ডের অধিবাসী জনগোষ্ঠীর সিংহভাগ বাঙালি এবং মুসলমান। সিংহভাগ বাঙালি মুসলমানের অস্তিত্ব সংলগ্ন হয়ে আছে সংখ্যাগোরিষ্ঠ বাঙালি হিন্দু। কিন্তু জনমিতির কারণে এ ভূখণ্ডের শিল্প ও সংস্কৃতি মুসলমানের বলাটাই যুক্তিসঙ্গত।[১] ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজির বাংলা বিজয়ের মধ্য দিয়ে এই অঞ্চলের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন ঘটে। রাজনৈতিক ভাবে হিন্দু-বৌদ্ধদের স্থলে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা ছাড়াও বাঙালি সমাজ ও ধর্মীয় জীবনে বিরাট পরিবর্তন আসে। দেশে একটি নতুন ধর্মমত ইসলাম এবং একটি নতুন সমাজব্যবস্থা–ইসলামী সমাজব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। বিশেষ করে মুসলিম শাসকগণ ইসলাম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে যে সমস্ত অঞ্চলে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েম করতে পেরেছিলো সে সব অঞ্চলের সংস্কৃতির সাথে নিজেদের খাপ খাপিয়ে নিয়েছে। যে কারণে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ ও ধর্ম পালন করলেও তারা তাদের হাজার বছরের নিজস্ব সংস্কৃতির বাইরে আসতে পারেনি। পোশাক পরিচ্ছেদ, কুসংস্কার, আচার আচরণ, রীতি-নীতি একটি রাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক পরিচয় বহন করে। ফলে বহিরাগত মুসলমান এবং বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে বিশেষ সাংস্কৃতিক পার্থক্য রয়েছে।

বস্তুত মুসলিম বিশ্বে ইসলামী শিল্পকলার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে ধর্মীয় অনুপ্রেরণা ছাড়াই কেবল সৃজনশীলতা এবং শৈল্পিক অভিব্যক্তির ভেতর দিয়ে। যে কারণে ইসলামী শিল্পকলায় মানুষ ও প্রাণীর মূর্তি নির্মাণে মুসলিম সমাজে বিশেষ আগ্রহ কম দেখা যায়। যদিও মুসলমানরা ভাস্কর্য তৈরি করেছে সেখানে দেহের বিভিন্ন অঙ্গের আনুপাতিক পরিমাপ (Proportion) হুবহু রাখার চেষ্টা করা হয়নি। মূর্তির সাথে বাস্তব চেহারার সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়না। জীবন্ত প্রতিচ্ছবি বলে মনে হয় না।[২] ভাস্কর্যে দেহের এনাটমীর বিষয়টি প্রাধান্য দেয়া হয়নি। ইসলামী ভাস্কর্য, চিত্রকলা এবং কারুশিল্প দ্বিমাত্রিক (Two dimentional) ও বিমূর্ত শিল্পকলা (Abstract art) এবং অলংকরণ ও নকশা (decoration) বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।[৩] বাংলায় ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার পর বস্তুগত উপাদান যথাঃ স্থাপত্য,

Dhaka University Institutional Repository

আরবিলিপিমালায় লিখিত কোরআন শরিফ, শিলালিপি, মুদ্রা, টেরাকোটা, দারুশিল্প, যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র, বস্ত্রশিল্প, মৃৎশিল্প, তারজালিকাজ অর্থ্যাৎ স্বর্ণকারদের সোনারুপার তৈরি জটিল নকশার কাজ , মিনা কাজ ও আইভরি কাজের মধ্যে ইসলামী উপাদান খুঁজে পাওয়া যায়। এছাড়াও ইসলামী চিত্রকলা, পোশাক, বস্ত্র ও পুস্তক সজ্জিতকরণে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। আলোচ্য অধ্যায়ে বাংলাদেশের লোকসংগ্রহশালায় নির্দিষ্টভাবে মুসলিম ইতিহাস ঐতিহ্য সম্পর্কিত যে সব উপাদান প্রদর্শন কক্ষে লক্ষ করা যায় এ সম্পর্কে আলোকপাত ও বিশ্লেষণ করা হবে।

৪(ক) বাংলায় প্রাগ মুসলিম শিল্পকলার চর্চার ধারা

বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে এদেশের ধর্মীয় অবস্থা ও শিল্পকলাচর্চার বিষয় সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন। প্রাক মুসলিম যুগে অবিভক্ত বাংলার একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষ বৌদ্ধ ছিলো। সমগ্র ভারতবর্ষে মৌর্য যুগে একদিকে যেমন দরবারী শিল্পকলার বিকাশ হয় তেমনি তার পাশে এই লোকশিল্পের ধারা অব্যহত ছিলো। এই লোকশিল্পকে খাঁটি দেশজ শিল্প বলা যেতে পারে। এ যুগে সম্রাট অশোক বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারে মনোনিবেশ করেছিলেন। ধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসে প্রস্তর খোদাইকার্যে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। মৌর্য শিল্পে আকিমিনীয় এবং হেলেনিষ্টিক প্রভাব লক্ষ্যণীয়। আলেকজান্ডারের আক্রমনের আকিমিনীয় সাম্রাজ্যের পতনের পরে ব্যাক্ইট্রিয়া প্রভৃতি গ্রিক উপনিবেশগুলিতে পারসিক শিল্পী ও কারিগরদের আগমন হয় এবং ঐ অঞ্চলের সৌধগুলি পারসিক ও হেলেনিষ্টিক শিল্প-ধারার মিশ্রণে গড়ে ওঠে। অবশ্য প্রাচীন যুগের শেষের দিকে বৌদ্ধধর্মের পৃথক সত্তা কমে যায়। তেমনি জৈন ধর্মের প্রভাবও প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিলো। সুতরাং বাংলার প্রাচীন ও মধ্যযুগের ধর্ম ও সমাজের মধ্যে একটি গুরুতর প্রভেদ লক্ষ্যণীয়।[৪]

প্রাচীন যুগে রাজ-রাজড়া এবং সমাজের সমৃদ্ধ শ্রেণির পৃষ্ঠপোষকতায় অসংখ্য দেবমন্দির গড়ে ওঠে। বিশেষ করে শিল্পীরা বিহার ও মন্দির স্থাপত্য সম্পৃক্ত অলংকরণ ফলক-স্থাপত্যাংশ অথবা ধর্মগত পুরাণ কাহিনীর প্রস্তরীকৃত প্রতিকৃতিতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু দুর্গা, সরস্বতী, গণেশ এবং শিবলিঙ্গ ইত্যাদি পাথরে খোদাই করে দেব-দেবীর মূর্তি উৎকীর্ণ করতো। বেদে দেবদেবী তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। স্বর্গের দেবতা, অন্তরীক্ষ লোকের দেবতা ও মর্ত্যের দেবতা। স্বর্গের দেবতাদের ক্ষমতাই শুধু বোঝা যায়। তারা মর্ত্যলোকে বা পৃথিবীতে আসেন না। যেমন সূর্য, যম, বরুণ প্রভৃতি। অন্তরীক্ষের দেবতারা পৃথিবীতে আসেন কিন্তু তারা অবস্থান করে না। যেমন ইন্দ্র ও বায়ু। ইন্দ্র বৃষ্টি ও শিশিরের দেবতা। পৃথিবীর দেবতারা পৃথিবীতেই থাকেন পৃথিবীতেই অবস্থান করেন। যেমন অগ্নি। অগ্নি পৃথিবীতে অবস্থান করে বলে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে, বেদের মন্ত্র উচ্চারণ করে দেবতাদের আহবান

জানানো ও শ্রদ্ধা জানানো হয়। বেদের মন্ত্র উচ্চারণ করে দেবতাদের কাছে মঙ্গলপ্রার্থনা করা একে বলে যজ্ঞ। তবে বৈদিক যুগে দেবতাদের কোনো বিগ্রহ বা মূর্তি ছিলোনা। পৌরাণিক যুগে পুরাণে যে সব দেবতাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেভাবে তাদের মূর্তি ও মন্দির নির্মাণ করে পত্র-পুষ্পের অঞ্জলী দিয়ে নৈবদ্য বা ভোগ দিয়ে বাজনা বাজিয়ে ঘটা করে পৌরাণিক দেবতাদের পূজা করা হয়। কোনো দেব-দেবীর পূজা প্রতিদিনই করা হয়। যেমন শিব ও লক্ষ্মীর। বিশেষ তিথিতে করা হয় দূর্গা, কার্তিক ও সরস্বতীর পূজা। বেদে অগ্নি, সূর্য, ইন্দ্র, বিষ্ণু, সোম, বরুণ, রুদ্র, যম, প্রভৃতি দেব ঊষা, সরস্বতী প্রভৃতি দেবীর বর্ণনা পাওয়া যায়। যক্ষ-যক্ষিনী, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর-বিদ্যাধরী, কিন্নর-কিন্নরী, প্রভৃতি দেব-দেবী বাংলার সাধারণ মানুষের মধ্যে সমানভাবে গ্রহণযোগ্যতা ছিলো। প্রাচীন যুগের মূর্তিগুলির বেশির ভাগ তৈরি হতো বেলে পাথরে। সেন যুগে মূর্তি নির্মাণে রাজ মহলের কালো পাথর অধিক পরিমানে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। ধাতব পদার্থের অনেক মূর্তির মধ্যে ব্রোঞ্জ নির্মিত মূর্তির সংখ্যাই ছিলো বেশি। অন্যান্য ধাতুর মধ্যে সোনা ও রুপার তৈরি অতি অল্প সংখ্যক মূর্তির সন্ধান পাওয়া মিলেছে। বৌদ্ধ মূর্তির মধ্যে বুদ্ধ অবলোকিতেশ্বর, লোকনাথ, মঞ্জুশ্রী, জম্ভল, প্রজ্ঞাপারমিতা, মারিচী, বজ্রতারা, ভ্রুকুটি তারা, শ্যামতারা, পর্ণশবরী, মহাপ্রতিশরা, হারিতী প্রভৃতি দেবদেবীর মূর্তি এবং হিন্দু দেবদেবীর মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, বিভিন্ন অবতার, গরুড়, শিবলিঙ্গ, অর্ধানারীশ্বর, সদ্যোজাত, গণেশ, সূর্য, রেবন্ত, লক্ষ্মী, স্বরসতী, দুর্গা, গৌরী, পার্বতী, মহামায়া, সর্বাণী, মনসা প্রভৃতি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও বরেন্দ্র গবেষণা সংগ্রহশালার সংগ্রহে রয়েছে।[৫]

৪(খ) ভারতীয় মুসলিম শিল্পকলা

ভারতীয় মুসলিম শিল্পকলা দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়। সুলতানী এবং মুঘল। আরবরা ইসলাম ধর্ম সম্প্রসারণ এবং দেশ জয়ের আকাঙ্ক্ষায় বিশ্বের নানা জায়গায় বসতি গড়ে তোলে। ৭১২ খ্রিস্টাব্দে মুহম্মদ বিন কাশিস সিন্ধু ও মুলতান অঞ্চল জয় করেন। এই অঞ্চলে আরব শাসন প্রায় দুশো বছর স্থায়ী হয়। কিন্তু শিল্পকলার ইতিহাসে ভারতে ইসলাম ধর্মের প্রচারে ও প্রতিষ্ঠায় কোনো স্থায়ী ছাপ পড়েনি। কিন্তু নতুন ঘটনা ছিলো ভারতে আসা মুসলমানগণ নতুন এক ধর্মমত নিয়ে এসেছিলো। লক্ষণীয় যে, পাক-ভারত উপমহাদেশে ইসলাম ধর্মকে যারা স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করেন তাঁরা সকলেই ছিলেন মধ্য এশিয়ার লোক। তুর্ক, তাজিক, তাতার। এরা সবাই আরবদের কাছ থেকে এই ধর্মমত পেয়েছিলো। বারে বারে মধ্য এশিয়া থেকে যেসব মানুষ এসেছে তারা মিশে গিয়েছে এই উপমহাদেশের মাটিতে। কিন্তু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর একেবারে এক হয়ে যেতে পারল না ধর্মীয় কারণে। মুসলমানরা মূর্তি পূজাকে স্বীকার করতে পারল না। এদেশের যারা নতুন ধর্মমত গ্রহণ করলো তারা জীবন দৃষ্টি থেকে অনেক আলাদা হয়ে গেল।

সমগ্র ভারতবর্ষে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিশ্বের নানা জায়গা থেকে দক্ষ শিল্পী ও কারিগর এদেশে নিয়ে এসেছিলেন মসজিদের গায়ে অলংকরণ কাজে ও বস্ত্রবয়নের জন্য। বহিরাগত এই কারিগর শ্রেণিটি স্থানীয় বৌদ্ধ স্থাপত্যের ধারার সাথে মধ্য এশিয়া ইরান থেকে আসা স্থাপত্য ও নকশাকলার ধারার সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন।[6] ফলে ভারতীয় শৈল্পিক রীতির সাথে পারসিক ভাবধারার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে নতুন একটি শিল্পধারার সৃষ্টি হয়, যাকে ইন্দোরীতি বলা হয়।[৭] উল্লেখ্য যে, ভারতে দিল্লীকে কেন্দ্র করে সুলতান কুতুবুদ্দীন আইবকের সময় থেকে (১২০৬-১২১০) ইন্দোরীতির সূচনা হয়। প্রাচীন হিন্দু শিল্পরীতির সাথে পারসিক শিল্পরীতির অপূর্ব সমন্বয় সুলতানি আমলের স্থাপত্য-শিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রথমদিকে তুর্কিগণ আরব ও পারসিক স্থাপত্য শিল্পকলার ঐতিহ্য বহন করে এনেছিলো এবং বিশেষ করে পারসিক শিল্পকলার অনুকরণে ভারতে তুর্কিদের স্থাপত্য শিল্পকলার প্রবর্তিত হয়। তবে এই শিল্পরীতি হিন্দু ও বৌদ্ধ শিল্পরীতি থেকে পৃথক ছিলো। কিন্ত কালক্রমে হিন্দু স্থপতি নিয়োগের ফলে হিন্দু ও পারসিক শিল্পরীতির পার্থক্য সীমিত হয়ে যায়। ভারতীয় ভাবধারা ও রীতি পারসিক শিল্পরীতির ওপর প্রভাব বিস্তার করে। অবশ্য সেই সঙ্গে পারসিক ভাবধারাও অক্ষুন্ন থাকে। অবশ্য বাংলার স্থানীয় কারিগর এবং পারসিক শিল্পরীতির ভাবধারায় নির্মিত হয়েছিলো বক্রাকৃতির ছাদ। সুতরাং ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানদের দালানকোঠা, মসজিদ, সমাধিসৌধ ইত্যাদি নির্মাণ পদ্ধতিতে স্থানীয় রীতির সকল উপাদানের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। সুলতানী আমলে যেসব মসজিদ তৈরি হয়েছে তার পিলার সাধারণত চতুর্ভুজাকৃতি ও মোটা মোটা। এই থাম এই স্থাপত্যকে দিয়েছে একটা ভারী ভাব। এসব মসজিদের নকশায় আছে সনাতন ভারতীয় নকশাকলার প্রভাব। এসব নকশাকলায় দেখা যায় সাপের মতো আঁকাবাকা রেখা। অনেক বেশি লতা পল্লবমণ্ডিত ও পদ্মফুল নকশার সমারহে। ইসলামী শিল্পকলা তাই ভৌগোলিক কারণেও হয়েছে মণ্ডন বা নকশাপ্রধান।[৮] মুঘল আমলে সুলতানী আমলে স্থাপত্যের ভারি ভাব কেটে গিয়ে হালকা ভাব আসে। এছাড়াও মুসলমান নির্মাতাদের স্থানীয় ও সহজলভ্য মালমসলা ও রাজমিস্ত্রি এবং পরিবেশের ওপর নজর রাখতে হতো। সঙ্গত কারণেই স্থানীয় চিন্তাধারা ও রীতিনীতির কিছুটা প্রভাব মুসলিম স্থাপত্যের ওপর গিয়ে পড়েছিলো।[৯] মুঘল স্থাপত্যের পর চিত্রকলার ছিলো। হুমায়ুন তাব্রিজ থেকে মীর সাইদ ও সিরাজ থেকে খাজা আবদুস সামাদ নামে দুজন শিল্পী নিয়ে আসেন। এরা ইরানি রীতিতে ছবি আঁকবার রীতি প্রচলন করেন। এদের সংস্পর্শে এসে দিল্লীতে গড়ে ওঠেন একদল চিত্রশিল্পী। মুঘল চিত্রকলা প্রথম দিকে ইরানি ছবিরই অনুকরণ ছিলো। কিন্তু কালক্রমে চিত্ররীতিতে যুক্ত হতে থাকে এদেশীয় বিষয়। গাছপালা, জীবজন্তু, মানুষ ও তাদের বেশভূষণ।

লিপিকলা ইসলামী শিল্পকলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আকবরের সময় এদেশে ইরানি নাস্তালিক লিপি চালু হয়। এ যুগে কুফী লিপি লেখা থেকে বাদ দেয়া হয়। মুঘল আমলের গালিচায় জীব-জন্তুর সাহায্যে করা হয়েছে বৈশিষ্ট্যময় নকশা। ভারতীয় গালিচার পটভূমির রঙ ,ইরানি কার্পেটের মতো অত গাঢ় নয়, অনেক হালকা। আর নকশায় ইরানি কার্পেটের মতো সুক্ষ্ম লতাপাতার জটিল নকশা ব্যবহার করা হয়নি।

৪(গ) ইসলামে বিধি নিষেধ ও বিভিন্ন সভ্যতার প্রভাব

ইসলামের সাথে অন্যান্য ধর্মের বড় পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্য হলো বিশ্বাসের। সুতরাং ইসলাম ধর্মচর্চায় শিল্পকলা প্রাধান্য পায়নি। নিরাকার আল্লাহ, তাই আল্লাহর সান্নিধ্য পেতে প্রতিমারূপে সৃষ্টিকর্তাকে কখনই ভাবা হয়নি। প্রাগ ইসলামী যুগে আরব সমাজের সমাজে মানুষ দেবদেবী ও পৌত্তলিক পূজা করতো। ইসলাম ধর্মে দেবদেবীর পূজা করা অন্যায় বলে গৃহীত করা হয়েছে। অবশ্য মনে রাখবার বিষয় হলো জীব-জন্তুর ও মানুষের ছবি আঁকা অনুচিত বলে বিশেষভাবে বিবেচিত হয়েছে সহী হাদিস সংকলনের পর থেকে।[১০] নবম শতকের আগে অন্যান্য মুসলিম অঞ্চলে জীবজন্তুর ও মানুষের ছবি প্রচুর আঁকা হতে দেখা যায়। এসব ছবি আঁকা হয়েছিলো খুব প্রথাগত ভাবে। কোরআন ও হাদিসে ছবি আঁকা, ভাস্কর্য নির্মাণে বিধিনিষেধ থাকা সত্ত্বেও ধর্মীয় সম্পৃক্ততার পরিবর্তে তা শৈল্পিক চর্চার অংশ হিসেবে অনেকটা শিথিলভাবে দেখা হয়েছে। এটা অবশ্য সম্ভব হয়েছে মুসলমান শাসকদের উদার মানসিকতার কারণে। তবে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের অনেকের মধ্যে এ নিয়ে মতবিরোধের সৃষ্টি হয়। তাঁদের ধারণা হলো প্রাণী ও মানুষের ছবি আঁকা অন্যায় এবং এটা ইসলামবিরোধী কাজ। ইসলামের অমোঘ বাণী হলো 'লা শরিক আল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর কোনো অংশীদার নেই। হাদিস বুখারি অনুসারে, প্রাণী ও মানুষের ছবি আঁকা অন্যায়। এ ব্যাপারে অবশ্য পবিত্র কোরআন শরিফে সুস্পষ্টভাবে কিছু বলা হয় নি।[১১]

পবিত্র কুরআনে মূর্তি অথবা পাথরকে পবিত্রজ্ঞানে পূজা করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে (সুরা ৫, আয়াত ৯২)। মুসাব্বির' শব্দের অর্থ পটশিল্পী, প্রতিকৃতি অংকনকারী,ভাস্কর,আকৃতিদানকারী। আল-হাশর সুরা উদ্ধৃত করে মুসলিম ধর্মবেত্তাদের ব্যাখ্যা হলো 'আল্লাহ হলেন একমাত্র শিল্পী এবং তাঁর সৃষ্টিকর্মে হস্তক্ষেপ করার অধিকার কারো নেই।' যদি কেউ ছবি আঁকে, প্রতিমা বানায় তবে সে কাজ হবে মূর্তি পূজার সমতুল্য, অন্যায় কাজ। তিনি যেহেতু ছবিতে অথবা খোদিত প্রতিকৃতিতে প্রাণ দিতে সক্ষম নন, এ জন্যে তাকে নরকে নিক্ষেপ করা হবে।[১২] এ বিষয়ে ইসলাম ধর্মে প্রাণী ও মানুষের ছবি আঁকা নিষিদ্ধ করার পিছনে যৌক্তিক কারণ রয়েছে। তবে কেউ যদি পূজার মনোভাব না নিয়ে শুধু শিল্পীর

মনোভাব নিয়ে ছবি আঁকেন ও মূর্তি গড়েন তাহলে সেটা ধর্মবিরোধী কাজ বলে গণ্য করা হবে না। ঐতিহাসিক ইবনে সা'দের বর্ণনা হতে জানা যায় যে, মহানবি (সা) বিবি আয়েশাকে যখন বিয়ে করেন তখন তাঁর বয়স ছিলো মাত্র নয় বছর। বিয়ের পর স্বামীরগৃহে আগমনের সময় তিনি সঙ্গে করে খেলার পুতুল নিয়ে এসেছিলেন। নবিজি তাঁকে পুতুল সম্পর্কে প্রশ্ন করলে আয়েশা (রা) উত্তরে বলেছিলেন, এটা সোলাইমানের ঘোড়া। নবিজি এ কথা শুনে আয়েশা (রা) খেলনাটি ভেঙ্গে ফেলতে বলেননি।[১৩]

এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে ধর্মীয় অনুভূতির পরিবর্তে নিছক খেলনার জন্য তৈরি জীবজন্তুর প্রতিকৃতি তৈরি ইসলামী বিধিনিষেধ কঠোরভাবে দেখা হয়নি। আর তা না হলে নবিজি অবশ্যই ভিন্নমত পোষণ করতেন। ইসলামে আরো একটি ঘটনার বর্ণনা রয়েছে যেখানে শিল্পবোধ প্রাধান্য পেয়েছে। হজরত ওমর (রা) এর খিলাফতের সময় বিজিত অঞ্চল থেকে অসংখ্য যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যাদি মদিনায় প্রেরণ করা হতো। এ সব মূল্যবান দ্রবাদির মধ্যে তৈজসপত্র, প্রাণীর নকশাবলী দ্বারা সুশোভিত ধাতবপাত্র থাকত। জেরুজালেম থেকে ফেরার সময় হজরত ওমর (রা) ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে প্রাণীর প্রতিকৃতি খোদিত একটি আতরদান মদিনা মসজিদের জন্য এনেছিলেন। ৭৮৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সেটা অক্ষত ছিলো। তবে ৭৭৫-৮৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে আব্বাসীয় খলিফা আল মাহদী প্রতিকৃতিটি নষ্ট করে দেন।[১৪] তাহলে একটি বিষয় স্পষ্ট করে বলা যেতেই পারে যে, মহানবির সময় থেকে খোলাফায়ে রাশেদীনের সময় পর্যন্ত ইসলামী শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে যে বিধি নিষেধ বজায় ছিলো উমাইয়া খলিফাদের রুচি ও মনমানসিকতার কারণে মুসলমানদের মধ্যে শিল্পচর্চার পথ অনেকটাই প্রসস্থ হয়ে যায়। লক্ষণীয় যে, ইসলামের সম্প্রসারণের সাথে সাথে মুসলমানগণ ইরাক, সিরিয়া, মিসর, উত্তর আফ্রিকা, স্পেন এবং ভারতবর্ষের সিন্ধু অঞ্চল অধিকার করলে তারা বিজিত রাজ্যের শিল্পকলার ঐতিহ্যের সংস্পর্শে আসে। অমুসলমান দক্ষ কারিগর, স্থপতি, শিল্পীদের প্রভাব বিশেষ লক্ষণীয়। মহানবি জীবিত থাকা অবস্থা থেকে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের প্রাধান্য ছিলো এবং সমগ্র আরবদেশে এ প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। অমুসলমান শিল্পীগণ ইসলামে ধর্মান্তরিত হলেও তারা প্রাচীন শিল্পধারাকে বর্জন করতে পারেনি। অনেক ক্ষেত্রে অমুসলমান শিল্পীর নির্দেশে মুসলমান শিল্পীরা অনৈসলামিক শৈল্পিক উপাদান ব্যবহার করেছে। এ কারণে মুসলিম শিল্পকলায় প্রধানত ছয়টি শিল্পধারার অবদান লক্ষ করা যায়।

(১) বায়জানটাইন, (২) ম্যানিকিয়ান, সাসানীয়, (৩) চীনা (বৌদ্ধ), (৪) কপটিক (৫) প্রাচীন ভারতীয়

ইসলামের সম্প্রসারণের সাথে সাথে আরবগন সর্বপ্রথম প্রাচ্যদেশিয় হেলেনিক সভ্যতার সংস্পর্শে আসে। গ্রীক উপাদান এবং রোমান রীতির যে রূপান্তর খ্রিস্টান শিল্পীদের হাতে ঘটে তাই বাজানটাইন

শিল্পকলা। খোলাফায়ে রাশেদুনের খিলাফতের পর উমাইয়া আমলে আরব মুসলিম সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিলো সিরিয়ার দামেস্ক শহরে। এই দামেশক শহরকে কেন্দ্র করে প্রথম ইসলামী শিল্পকলার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এ সময় আরব মুসলমানরা হেলেনিস্টিক, রোমান ও বাইজান্টাইন ঐতিহ্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়। বস্তুত প্রাথমিক অবস্থায় ইসলাম ধর্ম জামজমকপূর্ণ ভাবে পালন করা হলেও সিরিয়ার প্রাচীন ঐশ্বর্যময় এই তিনটি সভ্যতার প্রভাব মুসলমানদের ওপর পড়েছিলো। সিরিয়ার খ্রিস্টানরা গীর্জা বানাতো খুব জাঁকজমক করে। বলাবাহুল্য যে, মুসলমানরা খ্রিস্টানদের ধর্মীয় ইমারতের সাথে পাল্লা দেবার মানসিকতা নিয়ে ইসলামী স্থাপত্য নির্মাণের দিকে মনোনিবেশ করেছিলেন। উমাইয়া শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরি মসজিদ পরবর্তীতে ইসলামী রাষ্ট্রগুলোতে এ ধরনের মসজিদ নির্মাণের রীতি প্রচলিত হয়। বিশেষ করে মোজাইক, পাথরের খোদাই কাজ, ভাস্কর্যের সাথে পরিচিতি হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, জেরুজালেমের কুব্বাতুস সাখরা ও দামেশক মসজিদের প্রাচীরের গায়ের মোজাইক শিল্প বিশ্বব্যাপী খুবই প্রসিদ্ধ লাভ করেছিলো। এই মোজাইক রীতি ছিলো সম্পূর্ণ বাইজানটাইন। এই মোজাইক দেয়ালের গায়ে রঙিন চৌকো কাচের টুকরা বসিয়ে করা হয়েছিলো। দামেশক মসজিদের দেয়ালে মোজাইক করে আঁকা হয় ভূদৃশ্য-গাছপালা। বাইজানটাইন ছবি ও মোজাইক এর কাজের পটভূমি তৈরি করা হতো সোনালি রঙের। বিশেষ করে বাইজানটাইন শিল্পীরা সোনালি রঙের সাহায্যে স্বর্গের আলো বোঝাতে চাইতেন।

এছাড়াও উমাইয়া শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রাসাদ স্থাপত্যে চিত্রাঙ্কন রীতি দেখা যায়। এর উল্লেখযোগ্য নির্দশন হলো কুশায়ের আমরার প্রাসাদ চিত্র। এখানকার চিত্রের বিষয়বস্তুতে লতাপাতা, ফলমূল, জীবজন্তু এবং নর-নারীর চিত্রের প্রাধান্য পায়। চিত্রাঙ্কিত উল্লেখযোগ্য দৃশ্যাবলীর মধ্যে ছিলো স্নানরত নগ্ন মহিলার পুন্যাঙ্গ চিত্র স্নানের দৃশ্য এবং নৃত্যরত রমণী। ইসলামে যেখানে মানুষের ছবি আঁকা নিষিদ্ধ বলে দাবি করা হয় সেখানে নগ্ন মহিলার ছবি আঁকার কথা অসম্ভব বলে মনে হয়। এখানে উল্লেখ করার মতো বিষয় হলো যেখানে ছবি আঁকা সেটা একটি স্নানাগার। সেখানে সকল শ্রেণির মানুষের বিচরণ নিষেধ ছিলো। শুধুমাত্র আনন্দের খোরাজ জোগাতে এ ধরনের দৃশ্য মুসলিম শাসকরা চিত্রায়িত করার মনোভাব দেখিয়েছিলেন। তবে এটা ঠিক যে মুসলিম শাসকদের কেউই মসজিদের প্রতিমূর্তি অংকন করার ঔদ্ধত্য দেখানোর সাহস দেখাতে পারেনি। বলাবাহুল্য যে, উমাইয়া খিলাফতে ইসলামী সভ্যতার অন্যতম প্রধান উৎস ছিলো খ্রিস্টান বাইজানটাইন প্রভাব। চারু ও কারুশিল্পে খ্রিস্টান প্রভাব ছাড়া উমাইয়া সভ্যতার উন্মেষ সম্ভব ছিলো না। ধর্মীয় ইমারতে ফুললতামণ্ডিত নকশায় সজ্জিতকরণ এই ধারাটি সম্পূর্ণটাই মধ্যপ্রাচ্য থেকে আমদানিকৃত।[১৫] মুসলিম মুদ্রা ব্যবস্থা প্রচলনে বাইজানটাইন মুদ্রার প্রভাব অনস্বীকার্য।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম চিত্রকলার ইতিহাসে সাসানীয় সভ্যতার অবদান লক্ষ করা যায়। হযরত ওমরের (রাঃ) সময় থেকে ইরাক ও পারস্য বিজয়ের পর মুসলমানরা প্রাচীন পারস্য সভ্যতার ধারক ও বাহক হয়ে পড়ে। উমাইয়াদের সাম্রাজ্যের পতনের পর (৭৫০ খ্রিস্টাব্দে) আব্বাসীয়রা ক্ষমতায় এলে আরব- মুসলিম সাম্রাজ্যের রাজধানী স্থানান্তরিত হয় ইরাকের (মেসোপটেমিয়ার-র) বাগদাদ শহরে। এই শহর প্রতিষ্ঠা করেন আল মনসুর। ইসলামী শিল্পকলার ইতিহাসে উমাইয়া খলিফাদের সময়কে সাধারণত উল্লেখ করা হয় প্রারম্ভ পর্ব হিসেবে। দামেশক শহরকে কেন্দ্র করে ঘটে প্রথম স্থাপত্যের উদ্ভব। বাগদাদকে কেন্দ্র করে প্রথম রূপলাভ করে ইসলামী মণ্ডনকলা। বাগদাদ আসলে ছিলো প্রাচীন পারস্যেরই অংশ ও পারস্যের সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত। ফলে আব্বাসীয় খলিফাদের সময় মুসলিম বিশ্বে ওপর প্রাচীন পারস্য শিল্প-সংস্কৃতির বিপুল প্রভাব পড়ে। বিশেষ করে সাসানী প্রভাব। সাসানিকদের সময় সমগ্র পারস্য ও মেসোপটেমিয়ার- বিরাট অঞ্চল জুড়ে প্রতিষ্ঠিত ছিলো জারাথুস্ত্র ধর্ম। আরবরা পারস্য জয় করে ৬৪২ খ্রিস্টাব্দে। পারস্যে এই সময় জারাথুস্ত্রের ধর্মের প্রচলিত ছিলো।

মুসলিম শিল্পকলার ইতিহাসে প্রথম মানুষ ও জীবজন্তুর ছবি আঁকা বিশেষভাবে আরম্ভ হয় মঙ্গোলদের প্রভাবে, ইরানে। এই ধারণা মুঘলরা ভারতে নিয়ে আসে। সম্রাট আকবরের সময় মুসলিম ধর্মবেত্তাগন প্রশ্ন তুলেছিলেন ছবি আঁকার বৈধতা নিয়ে। আকবর মনে করতেন শিল্পী যখন ছবি আঁকেন তখন তিনি উপলব্দি করেন ছবিতে প্রাণ দেয়া তো দূরে থাক-শারীরিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে ঠিকমত আঁকা যথেষ্ট কঠিন।[১৬] শিল্পীর মনে তখন সৃষ্টিকর্তার প্রতি আরো শ্রদ্ধা ভালোবাসা বেড়ে যাবে। সুতরাং এটাই বক্তব্য যে কোরআন ও হাদিসে ছবি আঁকা, ভাস্কর্য নির্মাণে বিধিনিষেধ থাকা সত্বেও ধর্মীয় সম্পৃক্ততার পরিবর্তে মুসলিম বিশ্বে তা শৈল্পিক চর্চার অংশ হিসেবে অনেকটা শীথিল ভাবে দেখা হয়েছে। আব্বাসীয় খিলাফতে সাহিত্যচর্চায় যে উৎকর্য সাধিত হয় এর ফলে গ্রিক এবং পারস্য ভাষায় লিখিত পুস্তকাদি আরবি ভাষায় অনূদিত হয় এবং পরবর্তীসময়ে বিভিন্ন চিত্রশালায় এ সব গ্রন্থ চিত্রিত করা হয়।

ইসলামের আবিভার্বের পরে মুসলমানদের চীনের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। মহানবী স্বয়ং চীন দেশের প্রতি সম্মান জানিয়ে বলেছেন, যদি প্রয়োজন হয় তাহলে চীনে গিয়ে জ্ঞান অর্জন কর। উমাইয়া খিলাফতের সময় মধ্য এশিয়ায় ইসলামের প্রতিপত্তি সুদৃঢ় হয়। আব্বাসীয় খিলাফতের সময় রাজধানী বাগদাদে স্থাপিত হলেও নদীপথে চীনের সাথে বাণিজ্য করা সুযোগ হয়। আরবদের চীনের মৃৎপাত্র সিল্ক ও কস্তুরী খুব পছন্দের ছিলো। মানব সভ্যতায় চীন দেশের কাছে মানুষ খুব ঋণী। মুসলমানরা অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ সময়ে সমরকন্দে কাগজের সংস্পর্শে আসে এবং চীন দেশের কাগজের

অনুকরণে তারা এর উৎপাদন শুরু করে। মুসলিম মৃৎশিল্পে চীনা প্রভাব অনস্বীকার্য। সুসা ও সামাররায় সে সব মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে তাতে তাং বংশের মৃৎশিল্পের প্রভাব রয়েছে। বলা বাহুল্য যে, এ সমস্ত চীনা মডেল হতে অনুকরণ করে আব্বাসীয় কারিগর ও মৃৎশিল্পীরা তৈজসপত্র নির্মাণ করতেন।[১৭]

মুসলিম চিত্রশিল্পে ধর্মীয় বিষয়বস্তু চিত্রায়ন নিষেধাধা থাকা সত্ত্বেও ধর্মীয় বিষয়বস্তু চিত্রায়ন শুরু হয় ইলখানি যুগ থেকে (১৩০৭-১৫)। মুসলমান চিত্রকরগণ পাণ্ডুলিপির ঘটনাকে চিত্রায়িত করেছে সুলতানদের মনোতুষ্টির জন্য এবং চাকুরীর অংশ হিসেবে। সর্বপ্রথম জামী আত-তাওয়ারিখে রাসুলুল্লাহ (সা) এর জীবনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার অবলম্বনে চিত্রাঙ্কন শুরু হয় তাব্রিজে। এই পাণ্ডুলিপিতে খ্রিস্টান সাধু বাহিরার সাথে সাক্ষাৎকার, কাবা শরিফে কালোপাথর স্থাপন, জীবরাঈলের (আ) নিকট হতে দৈব্যাদেশ লাভ, হজরত আবু বকরের সাথে রাসুলুল্লাহর (সা) এর মদিনায় হিজরত, বুরাকে চড়ে মিরাজে গমন প্রভৃতি বিষয়বস্তুর চিত্রায়ন এই পাণ্ডলিপিতে রয়েছে। বলা বাহুল্য যে, ইলখানি আমলে তাব্রিজে অংকিত চিত্রাবলীতে চীনা প্রভাব ছিলো প্রকট। রাসুলুল্লাহ ছাড়াও হজরত আদম (আ), হজরত মুসা হজরত ঈসা ও বিবি হাওয়ার প্রতিকৃতি অঙ্কিত হয়েছে। তবে বলা বাহুল্য যে, এটা চিত্রাঙ্কনগুলো ছিলো সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত।[১৮]

ইসলামে মহানবি (সা) এর প্রতিচ্ছবি চিত্রায়নের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তবে এ বিষয়টিকে বিশ্বের মুসলমানরা সহজভাবে গ্রহণ করেছে। যা হোক, বাংলায় ইসলামসম্প্রসারিত হওয়ার পর সুলতানি এবং মুঘল শাসকদের উদারতার কারণে বাঙালি সংস্কৃতির ওপর আঘাত আসেনি। বরং মুসলিম শাসন প্রবর্তনের পর হিন্দু সমাজে একটি সুদুর প্রসারী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিলো। মুসলমানদের সামাজিক সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব উদারতা, ধর্ম ও জীবনের সরলতা এবং তাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি ইত্যাদি নানাভাবে হিন্দুদের মধ্যে জাগরণের সঞ্চার করে।

4(N) †Ui‡KvUv

বাংলাদেশের লোকসংগ্রহশালায় সংরক্ষিত উল্লেখযোগ্য ইসলামী উপাদানের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন মসজিদ থেকে খসে পড়া টেরাকোটার কিছু নমুনা। আমরা জানি, বাংলার লোকসংস্কৃতির সবচেয়ে প্রাচীন শিল্প হলো মৃৎশিল্প। এই শিল্পের সাথে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সম্পর্ক সুদীর্ঘদিনের। বাংলাদেশ পলিমাটির দেশ। এদেশে ইট তৈরির উপযুক্ত মাটি পাওয়া যায়। ফলে টেরাকোটার ব্যবহার শুধু মসজিদের অলংকরণেই নয় হিন্দু-বৌদ্ধদের মন্দির ও বিহারে জীবজন্তুর আকার আকৃতি দেখা যায়।[১৯] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মুসলমানদের এদেশে ক্ষমতা দখলের আগে খ্রিস্টীয় অষ্টম শতক থেকে বাংলার

শিল্প- স্থাপত্যে এক নবযুগের সৃষ্টি হয়। বৌদ্ধ শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলার সমতট ও বরেন্দ্রী অঞ্চলে সমন্বিত বিহার মন্দির স্থাপত্য পরিপূর্ণ রূপ লাভ করেছিলো। ইটের তৈরি এ স্থাপত্যের পূর্ণ বিকাশ ঘটে ঘটে কুমিল্লার জেলার ময়নামতি-লালমাই পর্বতমালায় আবিস্কৃত শালবন বিহার, আনন্দ রাজার প্রাসাদ বা বিহার, পাহাড়পুরের সোমপুর বিহারে। বাংলার বিহার-মন্দিরসমূহের অলংকরণে বিচিত্র বিষয়বস্তু উৎকীর্ণ মৃৎফলকের ব্যাপক প্রয়োগ দেখা গেছে। বিহারের দেয়ালে অলংকরণের উদ্দেশ্যে নির্মিত যে বিপুল সংখ্যক পোড়ামাটির ফলক পাওয়া যায় প্রকৃতপক্ষে এই ফলকগুলি বাংলার লোকায়ত শিল্পের সর্বোত্তম নিদর্শন এবং পাহাড়পুরে পাওয়া টেরাকোটা ফলকের সমতুল্য বিবেচিত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলার প্রেরণাই ছিলো ধর্মমূলক। রামায়ন-মহাভারতের কাহিনী হিন্দু ও বৌদ্ধ এই দুই সম্প্রদায়ের কাছে হয়তো সমান জনপ্রিয় ছিলো আর তাই পাহাড়পুরের ফলক গাত্রে বিভিন্নভাবে চিত্রিত হয়েছে কাহিনীচিত্র।[২০] তবে কালের গর্ভে সেই সভ্যতা বিলীন হয়ে গেলেও প্রত্ন খননের মাধ্যমে পুরাতাত্ত্বিক অনেক নিদর্শনই পাওয়া গেছে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও বরেন্দ্র গবেষণা সংগ্রহশালায়।

এই ফলকসমূহে সমকালীন বাংলার আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক পটভূমির আলোকে গ্রামীণ কৃষিনির্ভর গণজীবনের অভিব্যক্তিতে ভরপুর ছিলো। এই শিল্পকর্মের সৃষ্টিকারী ছিলো সাধারণ গ্রামীণ কুম্ভকার। ফলে পাহাড়পুরের সোমপুরবিহারের ফলকগুলোতে ধর্মীয় বিষয়বস্তুর চেয়ে লৌকিক উপাদানের প্রাধান্য বেশি দেখা গেছে।[২১] অন্যদিকে ময়নামতিও ছিলো প্রাচীনকাল থেকে পোড়ামাটি পাথর এবং ধাতব মূর্তি নির্মাণের কেন্দ্র। এদেশে মুসলমানদের বসতি স্থাপনের সাথে সাথে বাংলার সুলতানরা এদেশে মসজিদ স্থাপত্য নির্মাণে সবচেয়ে গুরুত্ব দেন। এর ভেতর দিয়ে মুসলিম আধিপত্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। বাংলাদেশে যেহেতু পাথরের পর্যাপ্ততা অপ্রতুল ছিলো এ কারণে বাংলার ইট দিয়ে নির্মাণ করা হয় মসজিদগুলো।

উপরন্তু মসজিদে হিন্দু মন্দিরের ন্যায় অংলকরণ তৈরিতে টেরাকোটাই প্রাধান্য পায়। বহিরাগত মুসলিম শাসকরা বাংলার প্রজাদের মনমানসিকতার সাথে তাল মিলিয়ে এদেশে শাসন করতে বাধ্য হয়েছে। কোনো কোনো শাসক স্থানীয় ধংসপ্রাপ্ত পরিত্যাক্ত মন্দির থেকে দেবদেবীর অংশটুকু বাদদিয়ে ফুল-লতামণ্ডিত অলংকৃত সেই পাথর মসজিদে ব্যবহার করেছে। ফলে গেছে মন্দিরের মধ্যে টেরাকোটায় দেবদেবীর ফলক তৈরির পরিবর্তে শুধু ফুল লতাগুল্ম ও জ্যামিতিক প্যার্টানে তৈরি টেরাকোটা নকশাকলা নতুন শাসকদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।[২২] বস্তুত মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় আদিনা মসজিদ থেকে শুরু করে মধ্যযুগের মুসলিম শিল্পকলাটি এখনো অনেক পুরনো

ইমারতে, মসজিদের দেয়ালে, মন্দিরের দেয়ালে শোভা পাচ্ছে। এরূপ ফলকচিত্র মণ্ডিত সুলতানী আমলের বিখ্যাত ইমারতের মধ্যে রাজশাহীর পুঠিয়া মসজিদ, বাঘা মসজিদ, কুসুম্বা মসজিদ, পুঠিয়ার রাজবাড়ির মন্দির, বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদ স্থাপনার নাম করা যেতে পারে। এ ছাড়াও মুঘল এবং বৃটিশ আমলের নিদর্শনের মধ্যে ঢাকার বড় কাটরা, ছোট কাটরা, লালবাগের দুর্গ, বিনত বিবির মসজিদ, খান মুহাম্মদ মৃধার মসজিদ, ঢাকেশ্বরী মন্দির, তারা মসজিদ, সাতগম্বুজ মসজিদ, নারায়ণগঞ্জের হাজিগঞ্জ দুর্গ, সোনাকান্দা দুর্গ, মুন্সিগঞ্জের ইন্দ্রাকপুর দুর্গ, পাবনার জোড়বাংলা মন্দির, ফরিদপুর মথুরাপুর দেউল, জোড়বাংলা মন্দির, ময়মনসিংহে এগার সিন্দুর সাদী মসজিদ, শাহ মুহাম্মদ মসজিদ, সিলেট শাহজালালের মাজার, শাহপরানের মাজার, চট্টগ্রামের বায়েজিদ বোস্তামীর মাজার এবং এমনি আরো কিছু ইমারত ও স্থান। বলা বাহুল্য যে মৃৎ-মাধ্যম মুসলিম শিল্পীদের হাতেই নন্দনশিল্পের পর্যায়ে উন্নীত হয়।

এটা প্রতীয়মান হয়েছে যে, সুলতানী আমলে তৈরি মসজিদের বেশির টেরাকোটা কাজের নকশা একই রকমের। উদাহরণ স্বরূপ টেরাকোটা নিদর্শন আলোকচিত্রের মাধ্যমে (চিত্র ১) দেখানো যেতে পারে। ষাট গম্বুজ মসজিদে টেরাকোটার যে অলংকরণ দৃশ্যমান হচ্ছে এই নকশাটি বলা হয় রোজেট। প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার লোক গোল বৃত্তের মধ্যে ফুল এঁকে একরকম নকশা করতো। প্রতি বৃত্তের মধ্যে থাকত একটি ফুল। বৃত্তের কেন্দ্রে থাকত সম্মুখ থেকে দেখে করা ফুলের মাঝখানটা। পাপড়িগুলো করা হতো বৃত্তের কেন্দ্রের সাথে সংগতি রেখে।

চিত্র-১: বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদের একাংশ

আবার বাংলার স্থাপত্যিক ইমারতে পারসিক ভাবধারায় রোজেট নকশা তৈরি করতে চাইলেও দেখা গেছে নকশাটি শেষ পর্যন্ত পদ্ম ফুলের আকৃতিতে পরিণত হতো। এই রোজেট নকশার নির্দশন (চিত্রঃ ২, ৪)

চিত্র-২: পাথরের তৈরি রোজট নকশা

চিত্র-৩: টেরাকোটা অ্যারাবেকস বরেন্দ্র গবেষণা সংগ্রহশালা

চিত্র-৪: টেরাকোটা রোজেট

চিত্র-৫: খিলান নকশা

Gwkqvb BDwbfwmwU Ae evsjv‡'‡ki Bmjv‡gi BwZnvm I mf¨Zv wefvM wgDwRqvg

হোসেন শাহের আমলে (১৪৯৩-১৫১৯) তৈরি গৌড়ের ছোট সোনামসজিদ স্থাপত্যের একটি অনন্য উদাহরণ। মসজিদটির ইটের দেয়াল বাইরের দিকে আংশিকভাবে প্রস্তরমণ্ডিত। এইসব পাথরের ফলকে অংকিত রয়েছে বৈশিষ্ট্যময় নকশা। নসরত শাহের নির্মিত ১৫২৬ সালে বড় সোনামসজিদটি ও বাঘা মসজিদের বাইরে (চিত্র ৬ ও ৭) টেরাকোটায় নির্মিত ইসলামী জ্যামিতিক নকশা, লতাপাতা, ফুল, ঝোলানো ঘন্টা শিকল, ঝোলানো বাতিদানি ইত্যাদি নকশা দেখা যায়। টাসেল ঝাপ্পা থুপি - নকশা করা হয়েছে। একটা মোটা দড়িমাথায় বড় গ্রন্থি থেকে ঝাকড়া চুলের মতো লাগে খানিকটা দেখতে। আবার ঝুমকো দুলের মতো মনে হয়। তরসাদ হলো মোটা দড়ির অনুকরণে করা নকশা।

বৌদ্ধস্তূপের গায় (পাহাড়পুর ও ময়নামতিতে) নকশা ও চিত্রকরা ইট দেখা যায়। কিন্তু মেজাজ ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে এই বৌদ্ধ শিল্পকলা ছিলো যথেষ্ট আলাদা।[২৩]

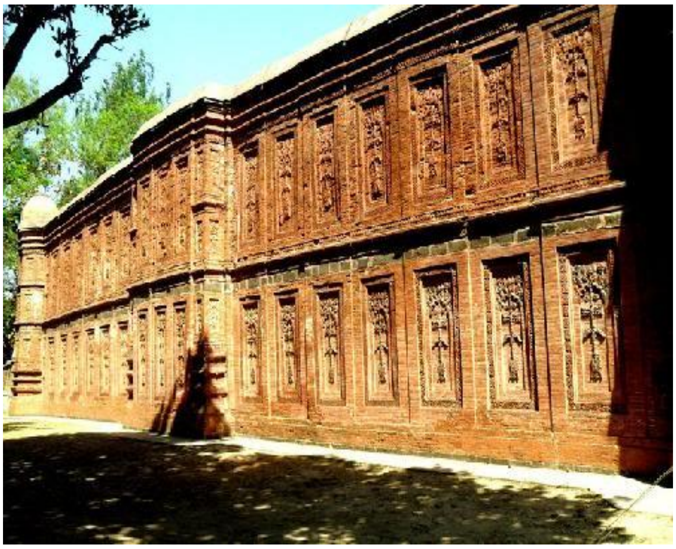

চিত্র-৬: বাঘা মসজিদ

চিত্র-৭: পাথরের উপর অলংকৃত নকশা
ছোট সোনামসজিদ গৌড়

চিত্র-৮: টেরাকোটা নকশা (বাঘা মসজিদ)

পোড়ামাটির নকশা করা ইট বানানো হতো কাঁদাকে ছাঁচে ফেলে। প্রথমে নকশাটি কাঠের ছাঁচে খোদাই করে নেয়া হতো। এই ছাঁচের মধ্যে কিছু বালু দিয়ে তারপর খাদা দিয়ে চাপ দিলেই নরম গায়ে নকশা উঠে আসতো। প্রতিটি নকশার বিভিন্ন অংশ আলাদাভাবে ছোটছোট ইটের ওপর তৈরি করে এই সব গাঁথা ইট রোদে শুকিয়ে পোড়ানো হতো। তারপর নকশা করা ইটকে ঠিকমতো মিল করে সাজিয়ে দেয়ালে গেঁথে দেয়া হতো।[২৪]

বাংলার প্রাচীন ভাস্কর্যশিল্পের নিদর্শনও কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। তবে টেরাকোটা বা পোড়ামাটি শিল্পের বেশ কিছু প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রায় দুই হাজার বছর ধরে একটি জীবন্ত অবিচ্ছিন্ন ঐতিহ্য হিসেবে এই শিল্প এখনো বিদ্যমান। বাংলার শাসকরা শুধুমাত্র মসজিদ নির্মাণে পৃষ্ঠপোষকতা করেনি হিন্দুদের অনেক মন্দিরও তৈরি হয়েছে। তবে হিন্দু মন্দিরে আগে যেমন দেব-দেবী উৎকীর্ন করে অলংকরণের প্রাধান্য ছিলো এর পরিবর্তে জ্যামিতিক নকশা ও ফুল-লতামণ্ডিত আলংকারিক নকশাকলার প্রাধান্য পেয়েছে। ১৭৫২ সালে মহারাজা পাননাথ ও মহারাজা রামনাথ কর্তৃক নির্মিত দিনাজপুরের নবরত্ন কান্তনগর মন্দির বাংলার টেরাকোটা শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন। এই মন্দির নির্মাণের মধ্যে মুঘল সম্রাট আকবরের দীন-ই এলাহির বিষয়টি লক্ষ করা যায়। [২৫]টেরাকোটা কাজে হিন্দু ও মুসলমান রীতি বৈশিষ্ট্য হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যের সম্প্রতির বিষয়টি উঠে এসেছে। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ৩৪৩০ কক্ষে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সমূহের মধ্যে টেরাকোটা (Terracotta Plaque) বাংলাদেশের বিভিন্ন মসজিদের ইসলামী অলংকরন সমৃদ্ধ নিদর্শন রয়েছে।

চিত্র-৯: জাতীয় জাদুঘর

১। জ্যামিতিক অলংকরণ, প্রাপ্তিস্থান : বগুড়া, সংগ্রহ নং : ৭৯.১৫০৪

২। জ্যামিতিক অলংকরণ, প্রাপ্তিস্থান : রাজশাহী, সংগ্রহ নং : ৭৭.১২৩০

৩। বেল ও চেন অলংকরণ, প্রাপ্তিস্থান : খুলনা, সংগ্রহ নং : ৬৬.৪২১

৪। জ্যামিতিক অলংকরণ, প্রাপ্তিস্থান : বগুড়া, সংগ্রহ নং : ৬.১০৪১

৪(ঙ) আরবি লিপিশৈলির বিভিন্ন রীতি

মুসলিম ধর্মীয় গ্রন্থ কোরআন যা পৃথিবীতে নাজিল হয়েছে সমগ্র মানব জাতির জন্য জীবন নির্দেশিকা হিসেবে। সুতরাং কোরআন নাজিল হওয়ার পর মানুষের মধ্যে কোরআনের বাণী সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে আরবিলিপিমালায় লিখিতভাবে তা প্রকাশ করা হয়। কিছু লিপিকার স্বেচ্ছায় পবিত্র কোরআন হস্তলিখনের মাধ্যমে এ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ শ্রেণিটি সমাজে ক্বাতিব নামে পরিচিত ছিলো। এই ক্বাবিতরা এ ধরনের লেখনির সাহায্যে কুরআন শরিফের প্রচ্ছদপট ও অভ্যন্তরীন অলংকরণ চিত্র নানা রঙের সমাহারে এমন নিঁখূতভাবে অংকন করতেন শেষ পর্যন্ত গ্রন্থটি হয়ে উঠতো বেহেশতি ফুলের মতো অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত (চিত্র-১০)।[২৬] প্রচ্ছদ এক ধরনের শিল্পে পরিনত হয়।[২৭] এটা ঠিক যে, বিশ্বজুড়ে ইসলামী শিল্পকলা চর্চায় আরবি লিপিমালা (Calligraphy) অলংকরণের মাধ্যমে ইসলামী শিল্পকলায় দেখিয়েছে চরম উৎকর্ষতা।[২৮] হজরত আলী (রাঃ) বলেছেন, সুন্দর হস্তলিপির মাধ্যমে ধর্মের বাণী প্রচারের একমাত্র উপায়। মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থাপত্য, চিত্রকলা, মৃৎপাত্র, ধাতবপাত্র প্রভৃতি ইসলামী শিল্পকলার পাশাপাশি মুসলিম লিপিমালা ললিতকলা পরিণত হয়।

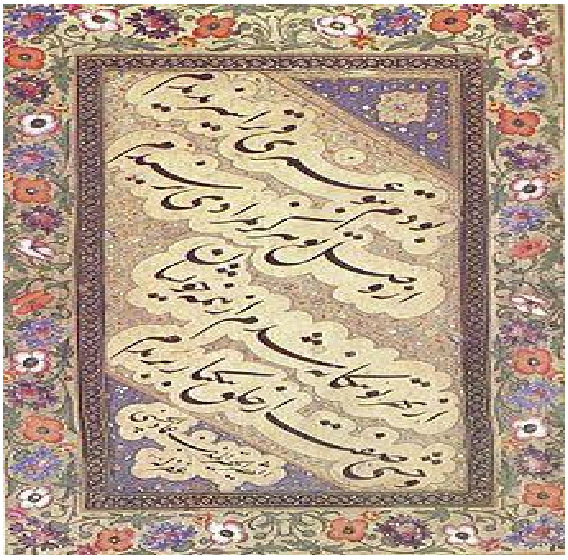

চিত্র-১০: আল কুরআনের প্রচ্ছদপট

লক্ষণীয় যে, বিশ্বজুড়ে ইসলাম সম্প্রসারিত হওয়ার পর মসজিদ নির্মাণে শাসকদের সবচেয়ে মনোযোগী হতে দেখা যায়। সুতরাং মসজিদ ইসলামী শিল্পকলার একটি অংশ হিসেবে নব দিগন্তের সূচনা করে। মুসলমানদের কাছে মসজিদ হয়ে ওঠে একাধারে শিক্ষাকেন্দ্র, উপাসনালয় ও শিল্পকলা চর্চার অন্যতম স্থান। মসজিদে ধর্মীয় ছবি বা আইকন-এর অভাব পুরণ করেছে সুন্দর করে লেখা

Dhaka University Institutional Repository

কোরআনের আয়াত। আইকন শব্দটি গ্রিক থেকে এসেছে। শব্দগত অর্থে আইকন মানে প্রতিবিম্ব (Image)। আইকন বলতে বোঝায় গীর্জার দেয়ালে আঁকা অথবা মোজাইক করা অথবা খ্রিস্টিয় সাধু সন্তদের ছবি। আইকন শব্দটি প্রথমে প্রথমে প্রয়োগ করা হতো বাইজানটাইন গীর্জার বিশেষ ধরনের ছবি সম্পর্কে। পরে আইকন বলতে বোঝাতো যে কোনো বর্ণ চিত্র বা প্রতিমা। সুন্দর লিপিকলার মাধ্যমে চেষ্টা হয়েছে ইসলাম ধর্মের প্রচার, ধর্মের কথা লোকের মনে গেঁথে দেবার চেষ্টা।[২৯]

৬৮৪ খ্রিস্টাব্দে উমাইয়া যুগে খলিফা আব্দুল মালিকের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় জেরুজালেমে নির্মিত হয় কাবার প্রতিভূ হিসেবে ধর্মীয় ইমারত কুব্বাত আস সাখরা। এই ভবনের গম্বুজের পিপা (Drum) উপরিভাগের চতুর্দিকে (চিত্র-১১) এবং উন্নত বপ্র গাত্রে নখস লিপিতে লিখিত 'বনি ইসরাইল' ও 'ইয়াসিন' সূরার অংশবিশেষের সাথে জ্যামিতিক নকশা, ফুল নকশা, আরব্য নকশা ও লিপি নকশায় বিশেষ রূপ সৃষ্টি করেছিলো। এটি ছিলো মুসলমানদের আরবি লিপিতে কোনো ইমারতে নকশা করার প্রথম উদাহরণ। লক্ষণীয় বিষয় হলো, ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে কোরআনের আয়াত ধর্মীয় ইমারতে লিখনীর মাধ্যমে প্রকাশ করলেও বাংলাদেশে এ ধরনের চর্চা মধ্যযুগে দেখা যায়নি।

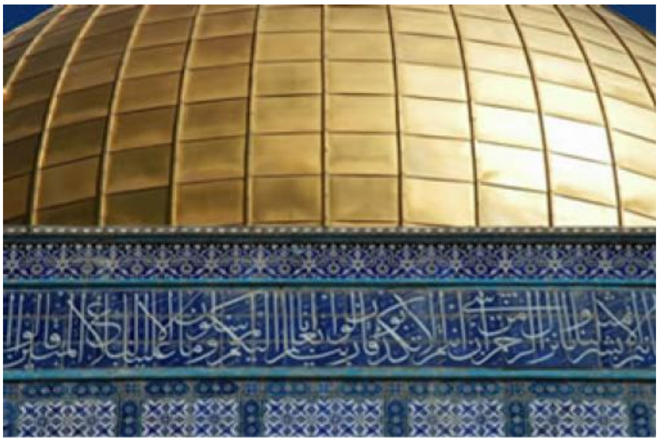

চিত্র-১১: আরবি লিপিমালা কুব্বাত আস সাকরা

৭০৭ খ্রিস্টাব্দে খলিফা প্রথম ওয়ালিদ মদিনা মসজিদ ভেঙ্গে পুনর্নির্মাণের নির্দেশ দেন। এই পুনর্নির্মিত মদিনা মসজিদ একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জন্য বিশেষ লাভ করে। নামাজ গৃহের অভ্যন্তরের দক্ষিণ দেয়ালের উপরাংশ কোরআনের ১নং এবং ৯১ হতে ১১৪ নম্বর সূরা উৎকীর্ণ করা হয় এবং এই লিপিটি হস্তলিপি বিশারদ খালিদ ইবনে আবুল সাইয়াজ লিপিবদ্ধ করেন।[৩০]

মদিনা মসজিদের পর দামেশক মসজিদটি মুসলমানদের তৈরি অনন্য একটি স্থাপত্যিক ইমারত। মুসলমানরা মসজিদ ভবনের অভ্যন্তরভাগ এবং বহির্ভাগে জাকজমকপূর্ণ ফুল লতাপাতা নকশা,

ক্যালিওগ্রাফি দিয়ে সজ্জিতকরণ এ দুটি ইমারত থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছিলো। হস্তলিপি শিল্পের সাথে জড়িত যে কোনো দেশের মুসলিম শিল্পীরা সম্পূর্ণ পবিত্র কোরআন এবং কোরআনের আয়াত অনুলিপি করেছেন অত্যন্ত যত্নসহকারে ও নির্ভূলভাবে। চিত্রকলা এবং হস্তলিপি বিদ্যার ক্ষেত্রে পারস্যের অবদান শুরু হয় আব্বাসীয় যুগের আগে। সপ্তম শতাব্দীর শেষের দিকে সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল ইরাক, বসরা এবং কুফা নগরীতে খুব সুন্দর করে কোরআন শরিফ লেখা আরম্ভ হয়। প্রথমে বাইরের দিকে কোনো অঙ্গসজ্জা করা হতো না। পরে গ্রিক আর্কেইক স্টাইলে অঙ্গসজ্জা করা হয়েছে। অস্টম এবং নবম শতাব্দীতে ইসলামী শিল্পকলার অন্যতম হস্তলিপি শাখা বাগদাদের খলিফার অনুপ্রেরণায় উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছায়।[৩১]

দশম শতাব্দী থেকে চামড়ার পরিবর্তে পারস্যে কাগজের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। কাগজের ওপর হস্তলিপির সাহায্যে ধর্মীয় পুস্তকগুলো এ সময় হতে নকশার মাধ্যমে চিত্রিত করা হতো। তাছাড়া মুসলিম শিল্পীরা পবিত্র কোরআন শরিফের অনুলিপি প্রস্তত করা এবং নকশা অলংকারে শোভামণ্ডিত করা পুণ্যের কাজ বলে মনে করতেন। যে কারণে বিশ্বের মুসলিম শিল্পীরা প্রতিভাবলে হাতের লেখা একটি চমৎকার শিল্পকলার পর্যায়ে উন্নীত করতে পেরেছিলো। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, আরবি লিখনের মাধ্যমে সৌন্দর্যমণ্ডিত শুধুমাত্র কাগজের মধ্যে করা সীমাবদ্ধ থাকেনি। মসজিদ, বিভিন্ন ধরনের ঘর-বাড়ি এবং দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন মাধ্যমের ব্যবহৃত জিনিসের ওপরেও কোরআনের বাণী আকর্ষনীয়ভাবে উৎকীর্ণ করা হয়েছে।[৩২] ধর্মপুস্তককে সুন্দর করে লিখে তাকে যত্ন করে বাঁধাই করে, লোকের মনে ধর্মের বাণীকে গেঁথে দেবার চেষ্টাও করা হয়েছে ইসলামে।[৩৩] বিশ্বে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার পর হাতে লেখার পরিবর্তে ছাপাখানা থেকে কোরআন প্রকাশিত হচ্ছে। ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী প্রতিটি মুসলমানের গৃহে পবিত্র কোরআন গ্রন্থ থাকা অপরিহার্য। প্রতিটি মুসলমানের ওপর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া যেমন ফরজ করা হয়েছে সেই সাথে কোরআন তেলোয়াত করা ফরজ করা হয়েছে। সুতরাং প্রতিটি মুসলমানের কাছে কোরআনের গুরুত্ব অপরিসীম।

বাংলাদেশের মাতৃভাষা বাংলা। বাংলায় মধ্যযুগে ইসলাম সম্প্রসারিত হওয়ার পর বাঙালি মুসলমানদের কাছে বাংলা ভাষার পরে আরবি ভাষার গুরুত্ব বেশি পেয়েছে। পবিত্র কোরআন বিশ্বের প্রতিটি ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে কোরআনের বাণী প্রতিটি মসুলমান নিজ ভাষায় বোঝার জন্যে। কারণ মাতৃভাষায় যে বিষয়টি সহজে অনুধাবন করা সম্ভব অন্য কোনো ভাষায় তা সম্ভব নয়। তবে বাংলা অনুবাদ হওয়ার পর কোরআনের বাহ্যিক প্রচ্ছদ একই রকম থাকে। শুধু আরবি ও বাংলায় লেখা হয়েছে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে "যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করবে

আল্লাহ তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত।" (সুরা আল ফাতহ: ১৭)। "যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনে না আমি সে কাফিরদের জন্য জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত রেখেছি" (সূরা আল ফাতহ: ১৩)।[৩৪]

আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে মানুষকে আল্লাহর বাণী সম্পর্কে জানাতে এবং প্রত্যেক মুসলমানদের কোরআন পড়তে উদ্বুত্ত করতে আরবিলিপির এই উৎকর্ষকতার অন্যতম কারণ ছিলো। কুরআনে বলা হয়েছেঃ "ইকরা বিইসমি রাব্বিকাল লাজি খালাক, খালাকাল ইনসানা মিন আলাক" অর্থ: পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্ত থেকে। পড়, কারণ তোমার প্রভু পরম দয়ালু; তিনিই মানুষকে শিখিয়েছেন, মানুষ যা জানতো না।

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝
اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝

(৯৬:১-৫)[৩৫]

(Read in the name of your Lord Who created, Created man from a clot of blood. Read, your Lord is most Generous.Who taught by the pen. Taught man what he did not know.)

সুতরাং ইসলামী শিল্পকলায় বর্ণের ব্যবহার করা হয়েছে নকশাকলার অঙ্গ হিসেবে কোনো জিনিসের বাস্তবতাকে চিত্রিত করবার জন্য নয়।[৩৬] মসজিদে ধর্মীয় ছবি বা আইকন- এর অভাব পুরণ করেছিলো সুন্দর করে লেখা কোরআনের আয়াত।

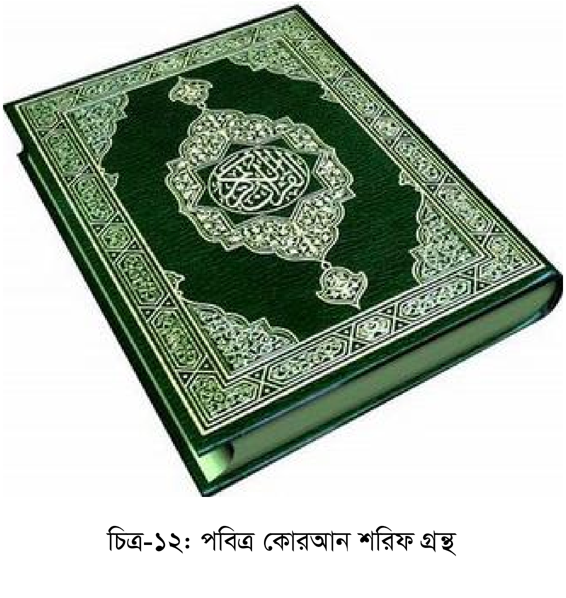

চিত্র-১২: পবিত্র কোরআন শরিফ গ্রন্থ

Dhaka University Institutional Repository

মামলুক (১২৫২-১৫১৭) শাসনামলে মিশর ও উত্তর- আফ্রিকায় বই বাঁধাইয়ের কাজের খুব উন্নতি হয়। দামি চামড়ার মলাট দিয়ে বাঁধানো হতো কুরআন শরিফ। এই মলাটের ওপরও করা হতো একই রকমের নকশা। এমনকি মলাটে সোনা জালে করে লেখা হতো।[৩৭]

ইসলামী কারতুস নকশা ব্যবহার করা হয় ক্যালিওগ্রাফিকে আরো সৌন্দর্য মণ্ডিত করে তুলতে। নিম্নের আলোচ্য এই (চিত্র ১৩) চিত্রটি কারতুস নকশার। কারতুসের নকশাকৃত নির্দিষ্ট জায়গায় আরবিলিপিমালা লেখা হয়েছে।

wPÎ-13: KviZm bKkv

আরবিলিপিমালা তিন ধরনের:

১. কুফি ২. নাখস ৩. তুঘরা[৩৮]

কুফি অর্থাৎ কোণাকৃতি আরবি লিপিমালা ১৭ হিজরি ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে কুফা নগরী প্রতিষ্ঠার প্রায় এক শতাব্দী আগে উদ্ভাবিত হয়। বলা বাহুল্য যে, কুফা নগরীর নাম থেকে কুফি লিপিশৈলির নামকরণ হয়েছে। কুফা শহরে সর্বপ্রথম সরকারিভাবে এ ধরনের লিপিকলার প্রয়োগ করা হয়। কুফি আরবিলিপিমালা হস্তলিপির বর্ণগুলো চৌকো ও চোখাচোখা আকৃতিবিশিষ্ট। বর্ণগুলোর মূল বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আরো রয়েছে শিরকোণ ও তীর্যক রেখা। সেলজুক শাসনামলে আরবি কুফি লিপি কাপেট ও আসবাবপত্র খোদাইয়ে পেয়েছে বিশেষ প্রথাগত রূপ। প্রত্যেক অক্ষরের মাথাকে করা হয়েছে ছুঁচাল বাঁকা বাঁকা। তার মধ্যে করা হয়েছে জ্যামিতিক রেখা ও আকৃতি দিয়ে নকশা।

চিত্র-১৪: কুফি লিপি পদ্ধতিতে আল্লাহু লেখা

নাখস হস্তলিপির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো গোল-বক্রাকৃতির বর্ণসজ্জা। খ্রিস্টীয় ১৩ শতক থেকে এর বিকাশ শুরু হয়। সাধারণত পবিত্র কোরআন এবং আরবি ভাষায় লেখা পুস্তকগুলোতে নাখসের ব্যবহার বেশি দেখা যায়।

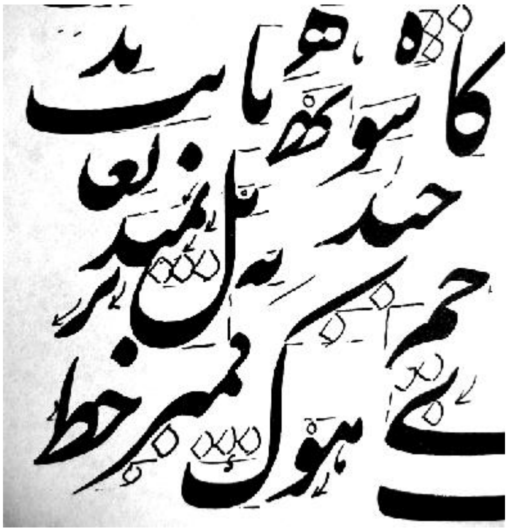

চিত্র-১৫: নাখস লিপিমালার নমুনা

তুর্কিদের লিপিকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হলো তুঘরা। তুঘরা বলতে বোঝায় তুর্কি সুলতানদের নিজস্ব নামের প্রকরণ বা মনোগ্রাম। এইসব মনোগ্রাম লেখা হতো খুব সুন্দর করে। হরফকে করে তোলা হতো কোনো কিছুর আকৃতির অনুরূপ। সুতরাং তুঘরা পদ্ধতিতে লেখা লিপিমালা অত্যন্ত আলংকারিক ভাবে লেখা হয়ে থাকে। তুঘরা লিপিতে অলংকরণের প্রয়োজনে হরফগুলো কখনো লম্বা, কখনও বক্র আবার কখনো চিত্রাকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এই হরফের মধ্যে তীর, ধনুক, সেনাছাউনি, নৌকা, বৈঠা, হাঁস, চালাঘরের মতো ছবি ফুটে ওঠে।[৩৯]

চিত্র-১৬: তুঘরা লিপিমালায় হাতির প্রতিকৃতি

চিত্র-১৭: তুঘরা লিপিমালায় ময়ূরের প্রতিকৃতি

মুসলিম শিল্পীরা কুরআন শরিফের কোনো লাইন অথবা সূরার অংশ বাঘ, হাতি, ময়ূর আকৃতিতে লিপিবদ্ধ করে লিপিকলায় চিত্রের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে। ফলে দেখা গেছে যে, তুঘরায় লিখিত সূরা মানুষের প্রতিচ্ছবিও ফুটিয়ে তোলা সম্ভব। বাংলাদেশে দরবেশের প্রতিকৃতি তুঘরা লিপিতে বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে। বস্তুত এভাবে আরবলিপি ইসলামী শিল্পকলায় ভিন্ন বৈশিষ্ট্য এনে দেয়। সুলতান হোসেন শাহের রাজত্বের সময়ে নির্মিত মসজিদগুলোর শিলালিপিতে তুঘরা হরফনামার নমুনা বেশি পাওয়া যায়।[৪০]

বরেন্দ্র গবেষণা সংগ্রহশালা ও জাতীয় জাদুঘরে পবিত্র কোরআন শরিফ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সংরক্ষিত আছে। বাংলা একাডেমির লোক ঐতিহ্য সংগ্রহশালায় রয়েছে আরবি লিপিমালায় লিখিত আল্লাহ এবং রাসুলের নাম। বিশেষ করে বরেন্দ্র গবেষণা সংগ্রহশালায় রয়েছে পেপিরস কাগজের উপর লিখিত আয়তুল কুরসি (চিত্র ১৮)। পবিত্র কোরআন মজিদের মধ্যে 'আয়াতুল কুরসি' বা সিংহাসন স্তবক বিশেষ মর্যাদা সম্পন্ন। একে সর্বপ্রকার ভয়-ভীতির নিরাপত্তা কবচ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।[৪১] আয়তুল কুরসির চারপাশে বর্ডার লাইনে অলংকরণ করা হয়েছে ঢেউ তোলা নকশার সাথে পাতা নকশার। প্রাচীন মিসরে লিপির উদ্ভব হলে (খ্রিস্টপূর্ব ৪র্থ সহস্রাব্দ) নীল নদের নানা জায়গা থেকে ৪-৫ মিটার উঁচু নলখাগড়া জাতীয় এক ধরনের গাছ থেকে তৈরি হতো লেখার উপকরণ। এই গাছের নাম ছিলো পাপিরস। পাপিরাস গাছের কাণ্ড খুব পাতলা করে চেরাই করে তার এই গাছের পাতার উপর আঠা দিয়ে সেঁটে দিত। এই পাপিরসের পাতা ছিলো কাগজের মতো দেখতে। পাপিরসের পাতা রঙে চুবিয়ে নিয়ে তার ওপর মিসরিয়রা লিখতো। লিখতে লিখতে পাতার সংকুলান না হলে পাতার নিম্নাংশে আরেকটা পাতা দিয়ে কাগজের পরিসর বাড়িয়ে নিতো। পাপিরস পাতা থেকে তৈরি এই লেখার কাগজ একেও পাপিরস বলা হতো।[৪২]

চিত্র-১৮: AvqZj Kiwm (e‡i›' M‡elYv msMnkvjv)

বরেন্দ্র গবেষণা সংগ্রহশালা চিত্রের কোরআন শরিফ দুটি ক্ষুদ্রাকৃতির (চিত্র ১৯)। কোরআনের প্রচ্ছদ থেকে শুরু করে সমস্ত গ্রন্থের প্রতিটি পাতার বর্ডার লাইনে ফুল, লতা-পাতা নকশায় সজ্জিতকরণ করা হয়েছে। বিশেষ করে বরেন্দ্র গবেষণা সংগ্রহশালার ছোট আকারের কয়েকটি কোরআন শরিফের মধ্যে চকচকে রূপার পাতে তৈরি করা কোরআন শরিফের নমুনাটি ইসলামী শিল্পকলার অন্যতম উদাহরণ। সুতরাং বাংলাদেশের সংগ্রহশালায় কোরআন শরিফের যে নমুনা দেখতে পাওয়া যায় এগুলোর আরবিলিপিমালা এবং সুসজ্জিত অলংকরণের মধ্যদিয়ে ইসলামী শিল্পকলার বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। কোরআন শরিফ ছাড়াও আরবি ভাষায় লেখা হয়েছে ইসলাম ধর্ম বিধান সংক্রান্ত গ্রন্থ, পাণ্ডুলিপি শাহনামা বিচিত্র, কামিল পাসের সনদ, মানুষ বেচাকেনার দলিল। আরবিভাষায় লিখিত এ সব দৃষ্টান্ত বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, লালবাগদুর্গ সংগ্রহশালা, বরেন্দ্র গবেষণা সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত আছে। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে নাস্তলিক পদ্ধতিতে আল্লাহু লেখার মধ্যে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে সাপের আকৃতি। এর সাথে পারিপার্শ্বিকভাবে জ্যামিতিক নকশা ফুল-লতাপাতার সম্মিলিত রূপে অপূর্ব নকশার সৃষ্টি করা হয়েছে।[৪৩]

চিত্র-১৯: পবিত্র কোরআন শরিফ

cwe Î †KviAvb kwid (বরেন্দ্র গবেষণা সংগ্রহশালা)

evg cv‡ki wPÎ: পরিমান: দৈর্ঘ্য ২৭ মিলিমিটার, প্রস্থ ২০ মিলি মিটার, উচ্চতা ৭ মিলিমিটার
দাতা: জনাব মো. ওয়ারেশ আলী, সপুরা শালবাগান, রাজশাহী।

Wvb cv‡ki wPÎ: পরিমাণ: দৈর্ঘ্য ২৭ মিলিমিটার, প্রস্থ ২০ মিলিমিটার, উচ্চতা ১০ মিলিমিটার
দাতা : জনাব খন্দকার জয়নুল আবেদিন, পাঠানপাড়া রাজশাহী

জাতীয় জাদুঘরের ২০ নং আলোচ্য আলোকচিত্রটির পবিত্র কোরআন শরিফের পৃষ্ঠার মধ্যে কোরআনের আয়াত অত্যন্ত জাকজমকপূর্ণভাবে লেখা হয়েছে। এই পবিত্র কোরআনের পাতার পটভূমি তৈরি করা হয়েছে সোনালি রঙের। এর সাথে সোনালি ও নীল রঙের মিশ্রণে অপূর্ব

কারুকার্যময় অলংকরণ সৃষ্টি করা হয়েছে। এই ধর্মীয় গ্রন্থটির মধ্যে শৈল্পিক নান্দনিক রূপ চমৎকার ভাবে বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছে। জাতীয় জাদুঘরের আরেকটি নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে (চিত্র ২১) নাস্তালিক আরবিলিপির সাথে জ্যামিতিক ও ফুল-পাতার সমন্বয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে ইসলামী শিল্পকলার অপূর্ব নিদর্শন।

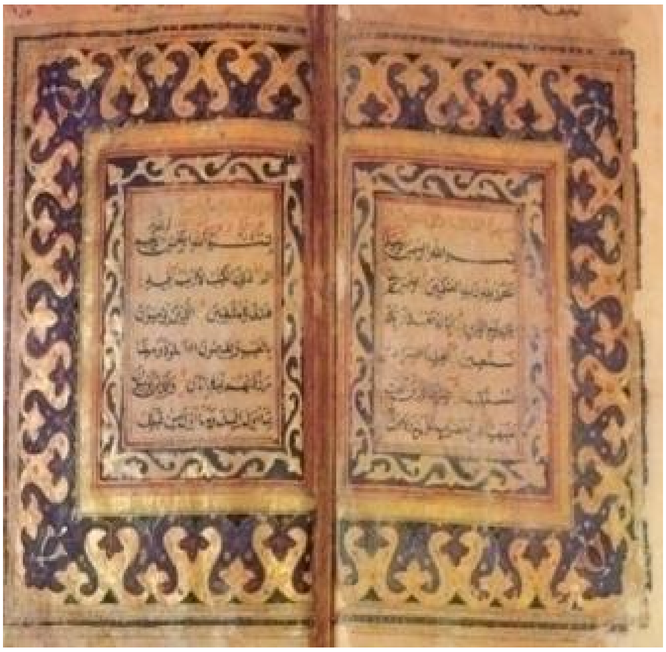

চিত্র-২০: জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত

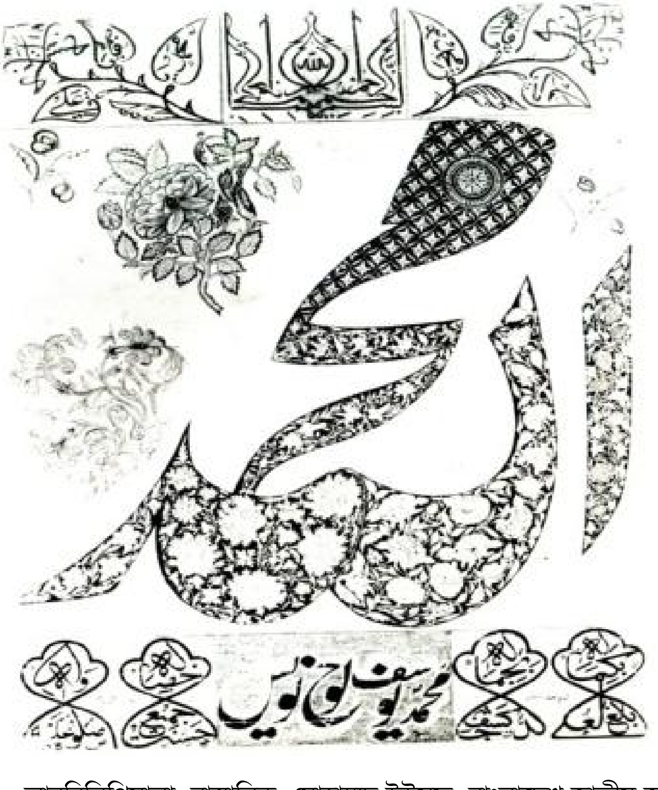

চিত্র-২১: আরবিলিপিমালা, নাস্তালিক, মোহাম্মদ ইউসুফ, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

Dhaka University Institutional Repository

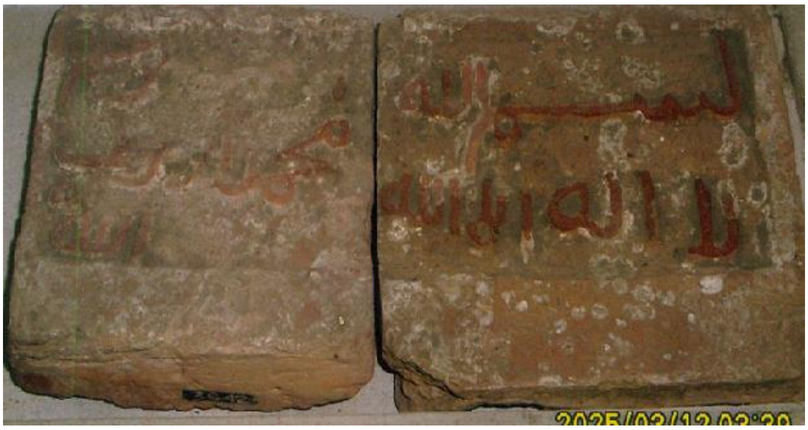

চিত্র-২২: বরেন্দ্র গবেষণা সংগ্রহশালা পোড়ামাটির টেরাকোটার ওপর লেখা লাইলাহা ইল্লালাহু মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ

এছাড়াও (চিত্র ২৩) টিনের পাতে এবং কাগজের মধ্যে আরবি হরফনামায় লেখা হয়েছে সূরা আম্বিয়া এবং অপর পাতায় আল্লাহু ও মুহাম্মদ।

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٨٧﴾

বঙ্গানুবাদ: ‘তুমি ব্যতীত কোনো ইলাহ নাই; তুমি পবিত্র মহান! আমি তো সীমালংঘনকারী’ (২১ : ৮৭)

চিত্র-২৩: বাংলা একাডেমি লোক ঐতিহ্য সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত আরবিলিপি মালা

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নোক্ত কোরআনের বাণী সম্বলিত উপাদান জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে

পানির গ্লাসঃ কাঁচ

আয়াতুল কুরসি (খোদিত), সময়কালঃ বিংশ শতাব্দী, প্রাপ্তিস্থানঃ ঢাকা, সংগ্রহ নং জ-৭৭.৬৩৩

ডিশঃ চীনামাটি

সময়কালঃ আঠার শতক, উপহারদাতাঃ খান সাহেব মৌলভী আবুল হাসনাত আহমেদ, প্রাপ্তিস্থানঃ ঢাকা, সংগ্রহ নং জ-১৩১০

শহর-ই-রুবাইয়াত (ইসলাম ধর্মের বিধান সংকান্ত গ্রন্থ)

রচয়িতাঃ আব্দুর রহমান আল জামী, লিপিকালঃ হি. ৮৮২/ খ্রি. ১৪৭৭-৭৮, লিপিকারঃ মুলতান আলী আল মাশাহাদী, প্রাপ্তিস্থানঃ হিরাত, সংগ্রহ নং- ২৬৫০

ফতেয়া-ই-আলমগীরা (ইসলাম ধর্মের বিধান সংকান্ত গ্রন্থ)

মোগল সম্রাট আওরংগজের আমলে (১৬৫৮ – ১৭০৭ খ্রী.) মোল্লা নিযামুদ্দিন বুরহানপুরীর নেতৃত্বে খ্যাতনামা আলেমদের সমন্বয়ে গঠিত বোর্ড কর্তৃক রচিত, লিপিকালঃ হি. ১২৪৩/ খ্রী. ১৮২৭, লিপিকারঃ শেখ নজিবুল্লাহ, সৌজন্যঃ সর্ব জনাব সিদ্দিকুল হামানত, ওবায়দুল হাসান ও সাইদুল হাসান সংগ্রহ নং ৬৭-২৪১

পাণ্ডুলিপিঃ শাহনামা

পারস্যের কবি আবুল কাশেম ফেরদৌসী রচিত বিখ্যাত ঐতিহাসিক মহাকাব্য, লিপিকালঃ অজ্ঞাত, সৌজন্যেঃ জনাব ইজতে বাউর রহমান খান

mb': gvIjvbv Ave †Zvive gn¤§' BmgvBj †_‡K c'Ë gv'vmvn-G Gg'w'qv giv'vev' Gi Kwgj gnvÏxg cv‡ki mb', ভাষাঃ আরবি, সময়কালঃ ১৩২০ হি./১৯০২ খ্রি., পরিমাপঃ দৈর্ঘ্য ১২৮ সে. মি., প্রস্থ ৩৫ সে. মি., সৌজন্যেঃ জনাব আবু মুহম্মদ কুদ্দুস

৪(চ) শিলালিপি (Stone inscription)

শিলালিপি হলো পাথরের ওপর খোদাই করে লিখিত বাণী। এই লেখার মধ্যে কবিতা, কোরআনের আয়াত এবং কোনো কিছু নির্মাণ সম্পর্কে সঠিক তথ্য ধরে রাখার সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। বাংলাদেশে বহুসংখ্যক শিলালিপি পাওয়া গেছে।[৪৪] এই শিলালিপি বাংলার স্থাপত্য নির্মাণের কারিগর শ্রেনিদের দিয়ে নির্মাণ করানো হতো। সুতরাং ইতিহাসের সাক্ষ্য হিসেবে এগুলো অত্যন্ত মূল্যবান।[৪৫] শিলালিপিতে আরবি, ফারসি ও বাংলায় লিখিত বর্ণমালায় উৎকীর্ণ মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মাণ বিষয়ক তথ্যগুলো সরবরাহ করে। অনেক শিলালিপির মধ্যে ফুল-লতা নকশাকৃত অলংকরণের

মধ্যে লিখিত বক্তব্য তুলে ধরা হয়। ফলে শিলালিপি থেকে যে তথ্য পাওয়া যায় সেটা সঠিক তথ্য হিসেবে ধরে নেয়া হয়। বাংলাদেশের সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত আছে বিভিন্ন মসজিদের শিলালিপি, ঢাকার বড় কাটরার উত্তর দিকের ফটকের শিলালিপি,সমাধিলিপি, তোরণ শিলালিপি, ফচৌকি শিলালিপি, সেতুনির্মাণ উপলক্ষে সিলেট শিলালিপি, ইমারতের শিলালিপি ইত্যাদি।

হাদিসে বলা হয়েছে যে, 'তোমরা জ্ঞান অন্বেষণ কর, যদি সেজন্য এমনকি, চীনেও যেতে হয়।', 'মাতৃক্রোড় থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞান আহরণ কর।'[৪৬] উদাহরণ স্বরূপ বাগেরহাটের ঠাকুর দিঘি বা খাঞ্জালী দিঘির উত্তর তীরে প্রাচীরবেষ্টিত প্রাঙ্গণে খান-ই-জাহানের মাজারের শিলালিপিতে একটি ফারসি কবিতার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কবিতারটির অনুবাদ এ ধরনের, 'হে বন্ধুগণ, স্মরণ রেখো, মৃত্যু অনিবার্য। কাননে কণ্টক আছে, মৃত্যু অনিবার্য। সকল সৃষ্টির প্রবল শত্রু মৃত্যু এবং [সে আছে দৃঢ়] প্রত্যয় নিয়ে; [সে] অন্য শত্রুদের মতো নয়, মৃত্যু অনিবার্য, মৃত্যু অনিবার্য।'[৪৭] সুতরাং মাদ্রাসা ও মসজিদ এবং সমাধিসৌধের গায়ে উৎকীর্ণ শিলালিপিসমূহে খোদিত এ ধরনের বাণীসমূহ মানুষের মধ্যে ইসলাম ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা বিদ্যা শিক্ষা অর্জনের দিকে মনোযোগী করে তুলতো। সুলতান হোসেন শাহের রাজত্বের সময়ে নির্মিত মসজিদগুলোর শিলালিপিতে তুঘরা হরফনামার নমুনা বেশি পাওয়া যায়।[৪৮]

চিত্র-২৪: খান জাহান আলীর সমাধি বাগেরহাট

বরেন্দ্র গবেষণা সংগ্রহশালায় যে সব শিলালিপি রয়েছে এখানে বরেন্দ্র অঞ্চলের প্রস্তরলিপিতে তুঘরায় লিখিত বিভিন্ন প্রকারের অনুকৃতি লক্ষ করা যায়। তীর ধনুক অনুকৃতি এবং সাঁতাররত হংস প্রতিকৃতি অনেক পাথরে লিপিতে দেখা যায়। এ ছাড়াও লোকনকশার মটিভও শিলালিপিতে দৃশ্যমান হয়। শামসউদ্দিন মুযাফফার শাহের আমলের পাণ্ডুয়ায় অবস্থিত ছোট দরগার ৮৯৮ হিজরি ১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দে উৎকীর্ণ প্রস্তরলিপির মধ্যে চমৎকার পদ্ধতিতে তুঘরা উপস্থাপিত করা হয়েছে। এর অলংকরনের মধ্যে বাংলার দোচালা ঘরের প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। বিশেষ করে আলিফ ও লামের বর্শানুরূপ শির ফলক ও

অক্ষরের উল্লম্বদণ্ডের ওপর দিয়ে নুন ও ইয়ার অর্ধচন্দ্রাকৃতির সম্প্রসারণ লিপির আলংকারিক সৌন্দর্যকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। আলোচ্য প্রস্তরালিপিতে ব্যবহৃত অক্ষর ও বর্ণের উল্লম্ব দণ্ড ও আনুভূমিক বাহুর পারস্পারিক সংযুক্তি ও সুবিন্যস্ত করণের দ্বারা এমন অলংকার মটিফের সৃষ্টির মধ্যে দোচালার আকৃতির মতো দেখতে লাগে।[৪৯] বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের লেখমালা গ্যালারিতে আরবি লিপিমালা ছাড়াও বাংলা ও সংস্কৃত লিপিমালায় উৎকীর্ণ অনেক শিলালিপি সংরক্ষিত রয়েছে।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে (চিত্র ২৫) সংরক্ষিত আছে বাংলাদেশের প্রাচীনতম মুসলিম শিলালিপি। আবুল ফাতাহ উজবক আস সুলতানী এর শাসন আমলে কোনো একটি ধর্মীয় ইমারত নির্মাণ উপলক্ষে উৎকীর্ণ করেছিলেন। পরিমাপ : উচ্চতা ৩৭ সে.মি., দৈর্ঘ্য ১৩৩ সে.মি.। সময়কাল : ৬৫২ হি./ ১২৫৪ খ্রি., ভাষা : আরবি ফারসি, প্রাপ্তিস্থান : শীতলমঠ রাজশাহী সংগ্রহ নং : ই-৬৮.৮৯। জাতীয় জাদুঘরে শিলালিপিতে (চিত্র ২৬) আরবিলিপিমালার চারপাশে রোজট এবং ফুলের কুঁড়ি নকশা করা হয়েছে। এছাড়া ব্ল্যাক ওক্লোরাইড (চিত্র ২৭) এই শিলালিপিটি লালবাগ দুর্গের সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত আছে। তুঘরা পদ্ধতিতে লেখা ফারসি ভাষায় রচিত একটি কাসিদার ৫টি শ্লোক এখানে উৎকীর্ণ রয়েছে। শিলালিপিতে সম্রটের প্রশস্তিসহ তার শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও সম্ভবত ঢাকা নগরী সম্পর্কে লিখিত রয়েছে।

চিত্র-২৫: বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

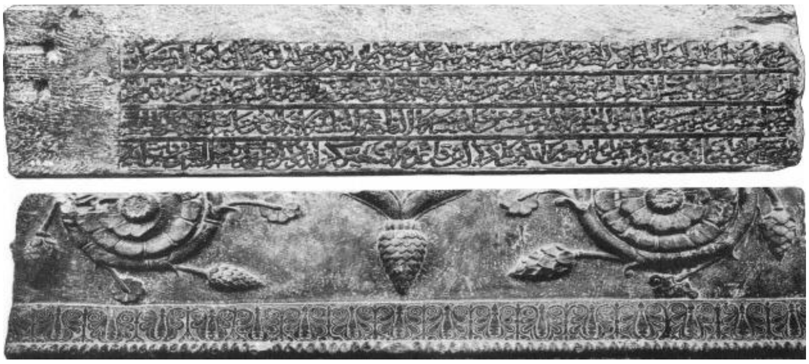

চিত্র-২৬: বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

চিত্র-২৭: লালবাগ দুর্গ

৩। বাংলা শিলালিপি

পাল রাজ গোপাল ৪র্থ (আনু. ১১২৮-৪৩ খ্রি.) এর ৯ম রাজ্যবর্ষে বৌদ্ধবিহার নির্মাণ উপলক্ষে উৎকীর্ণ, পরিমান: উচ্চতা ২৮ সে.মি., প্রস্থ ৫৭ সে.মি., লিপি: প্রাচীন বাংলা, ভাষা: সংস্কৃত, প্রাপ্তিকাল: দ্বাদশ শতাব্দীর ত্রিশ দশক, প্রাপ্তিস্থান: বদরগঞ্জ, রংপুর, সংগ্রহ নং : ই-৭৭.৩৮১

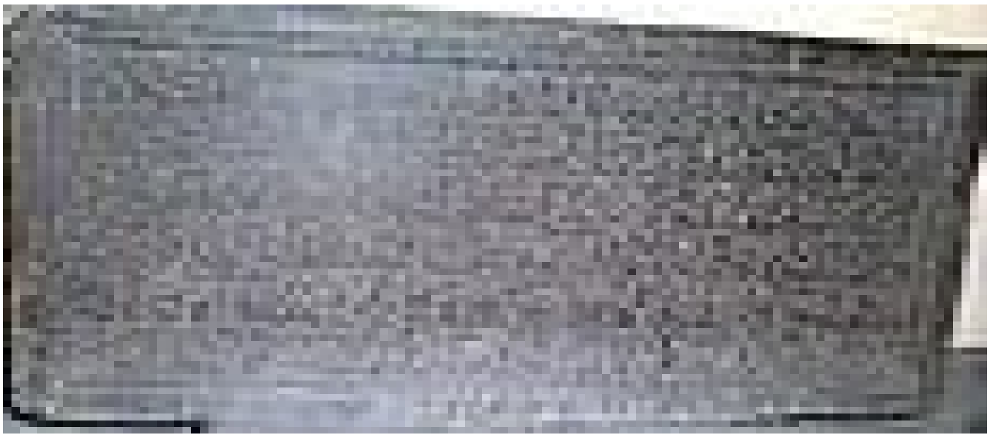

চিত্র–২৮: বাংলা ভাষায় লেখা শিলালিপি

চিত্র-২৯: বরেন্দ্র গবেষণা সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত শিলালিপি

৪(ছ) মুদ্রা

বাংলার সুলতানদের কিছুসংখ্যক আকর্ষনীয় মুদ্রার সন্ধান পাওয়া যায় গেছে। এসব মুদ্রার এক পিঠে প্রচলিত মুসলিম রীতি অনুযায়ী সুলতানের নাম, তারিখ, টাকশাল, সমকালীন বাগদাদের বা মিসরের ফাতমি খলিফাদের নাম এবং কলিমা খোদিত রয়েছে। আবার অন্য পিঠে থাকে অশ্বারোহীর মূর্তি অথবা দেবদেবীর প্রতীকী ছবি। অর্থ্যাৎ এই মুদ্রার মধ্যে নকশাকৃত অলংকরণ মুসলিম ধারার সঙ্গে হিন্দু সংস্কৃতির মিশ্রণ এ বিষয়টি গুরুত্বহ এবং তাৎপর্যপূর্ণ।[৫০]

একটি শাসনামলের অর্থনীতি, ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্পকারখানা, ধাতুবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ের খুঁটিনাটি বিবরণ মুদ্রার ভেতর দিয়ে লাভ করা যেতো। এ ছাড়াও মুদ্রার লেনদেনের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, সামাজিক সম্পর্ক দেশ হতে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। প্রাচীন বাংলায় ধর্ম প্রচারের জন্য বৌদ্ধ ভিক্ষুরা দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতেন। তাদের মাধ্যম একজন জনপদের মুদ্রা আরেক জনপদে হাতে হাতে পৌঁছে যেতো। [৫১]কোনো কোনো মুদ্রায় রাজ্য, সময়কাল, ধর্মবিশ্বাস ইত্যাদি সম্পর্কে লিপিতাত্ত্বিক অথবা প্রতীকী তথ্য সন্নিবেশিত থাকত। মহাস্থানগড়ে যেসব মুদ্রা পাওয়া গেছে এসব মুদ্রার অধিকাংশই তামা দিয়ে তৈরি। কুমিল্লায় পাওয়া মুদ্রাগুলোয় বেশি ব্যবহৃত চিহ্নের মধ্যে একাধিক হাতবিশিষ্ট মূর্তি সূর্য, নৌকা, চিংড়ি, মাছ, ছাগল, পাখি, ফুল, তীরের ফলা ও পাপড়ি সংবলিত বৃত্ত ইত্যাদি। কুশান (৮৫-১৭৫ খ্রি.) রাজবংশের শাসকরা সোনার তৈরি ও রাজার প্রতিকৃতি সংবলিত মুদ্রা প্রচলন করেন। গুপ্তযুগে মুদ্রাশিল্পের বিকাশ সবচেয়ে বেশি ঘটে। কারণ এ যুগের শাসকরা পৃষ্ঠপোষকতায় সোনা রুপা দিয়ে তৈরি বিভিন্ন উন্নত ধরনের লিপি সংবলিত ছাঁচে তৈরি মুদ্রার প্রচলন ঘটে। ধারণা করা হয় যে, খ্রিস্টপূর্ব তিন শতকের দিকে ছাপাঙ্কিত মুদ্রার পাশাপাশি ছাঁচে তৈরি মুদ্রার প্রচলন শুরু হয়।[৫২] বাংলাদেশের প্রাচীন মুদ্রা ছাপাঙ্কিত মুদ্রা নামে পরিচিত।

ছাপাঙ্কিত মুদ্রা তৈরির জন্য প্রথমে ধাতু গলিয়ে ফেলা হতো। তারপর গলিত ধাতু জমিয়ে একটি পট্ট তৈরি করে নেয়া হতো। এর প্রতিটি ফালিকে একই প্রক্রিয়ায় কতকগুলো ছোট ছোট চতুস্কোণাকার খণ্ডে বিভক্ত করে নির্ধারিত ওজনমাত্রা অনুযায়ী ছেঁটে ফেলা হতো। ফলে দেখা যেতো যে ছাপাঙ্কিত মুদ্রা বর্গাকার থেকে আয়তকার অথবা বলায়াকার অথবা ডিম্বাকার রূপ ধারণ করেছে। এর একপিঠে এক বা একাধিক ছাপচিহ্ন বসিয়ে দেয়া হতো। একটি ছাপযন্ত্রে কয়েক রকম চিহ্ন থাকত। সবচেয়ে প্রাচীন ছাপাঙ্কিত মুদ্রা তামা দিয়ে তৈরি হতো। এছাড়া রুপা, শিসা, টিন, মিশ্রধাতু দিয়ে তৈরি মুদ্রাও পাওয়া গেছে। এক ধাতুর ওপর অন্য ধাতুর প্রলেপ দিয়েও মুদ্রা তৈরি হতো। এই ছাপাঙ্কিত মুদ্রা খ্রিস্টিয় একশত বছর পর্যন্ত প্রচলিত ছিলো।

ইসলামী শাসনের শুরুতে মুদ্রার প্রধান পিঠের মাঝখানে কলেমা, একপ্রান্তে মুদ্রা প্রবর্তনের তারিখ এবং পিছনের পিঠে শাসকের নাম এবং উপাধি উল্লেখ থাকত। বাংলাদেশে বিভিন্ন স্থানে যথা ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, বগুড়া ও রাজশাহী অঞ্চলে লিপিবিহীন ছাপাঙ্কিত মুদ্রা, ছাঁচের ছাপযুক্ত মুদ্রা ও ছাঁচে ঢেলে তৈরি মুদ্রা প্রচুর পাওয়া গেছে। এসব মুদ্রা আকস্মিকভাবে অথবা বিক্ষিপ্ত অবস্থা থেকে সংগৃহীত করা হয়েছে। [৫৩]বাংলাদেশের জাতীয় জাদুঘরে ও রাজশাহীর বরেন্দ্র গবেষণা সংগ্রহশালা মহাস্থান, ময়নামতি, লালাবাগ দুর্গ, আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে অনেক মুদ্রা সংরক্ষিত রয়েছে।

চিত্র-৩০: মুদ্রা জাতীয় জাদুঘর

আহসান মঞ্জিল সংগ্রহশালায় সংগৃহীত আছে

শোকেস নং - ১

উপাদান ১-৭: মুদ্রাঃ রৌপ্য এক টাকা। সম্রাট শাহ আলম (২য়) এর ঊনবিংশ রাজ্যাংক, টাকশালঃ মুর্শিদাবাদ, ওজন : ১১.৫ গ্রাম

উপাদান ৮: মুদ্রাঃ রৌপ্য। সুলতান শেরশাহের আমলের। মুখ্য পিঠে কলেমা, গৌণ পিঠে সুলতানের নাম, ওজন : ১১.০ গ্রাম

উপাদান ৯: মুদ্রাঃ রৌপ্য, সম্রাট শাহজাহানের সময়ের, মূখ্য পিঠে কলেমা গৌণ পিঠে সম্রাটের নাম, ওজনঃ ১১.০ গ্রাম, প্রাপ্তিস্থানঃ আহসান মঞ্জিল, সংগ্রহ নং আ-৯০.১৭৩৮, আ-৯০.১৭৪৪, আ-৯০.১৭৫৪, আ-৯০.১৭৫৫

৪(জ) পুঁথিচিত্র

মুসলিম চিত্রকলার প্রথম বহিপ্রকাশ ঘটে ফ্রেস্কোর মাধ্যমে প্রতিকৃতি অংকণের মাধ্যমে। ইসলাম সম্প্রসারণের সাথে সাথে মুসলমানগন ইরাক, সিরিয়া, মিসর, উত্তর আফ্রিকা, স্পেন ও ভারতবর্ষের সিন্ধু অঞ্চলের চিত্রকলার সংস্পর্শে আসে। অমুসলমান শিল্পীগন ইসলামে ধর্মান্তরিত হলেও তার পূর্বের প্রাচীন শিল্পধারাকে বর্জন করতে পারেনি। সুতরাং মুসলিম চিত্রকলায় ছয়টি শিল্পধারা প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বায়জানটাইন, ম্যানিকিয়ান, সাসানীয়, চীনা, কপটিক ও প্রাচীন ভারতীয়। আরবরা

পারস্য জয় করে ৬৪১ খ্রিস্টাব্দে। পারস্যে সাফাভীরা ছিলেন শিয়া ও ইরানী বংশোদ্ভব। সাফাভী আমলে পারস্যের রাজধানী ছিলো ইস্পাহান। এই শহরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে শিল্পকলা। সাফাভী আমলের পুঁথিচিত্র বিখ্যাত ছিলো। সাফাভী পুঁথিচিত্রে অংকন করা হয়েছে প্রেমের কাহিনী। বিশেষ করে লাইলী মজনুর প্রেম। প্রেমকে দেখানো হয়েছে সূফি দর্শন রূপে। পুস্পিত বৃক্ষের শাখা প্রশাখা, ফুলে ভরা বাগান, পাথরের টুকরার উপর প্রবাহিত হয়ে ঝরে পড়া ধারা- এসব মনোরম করেছে চিত্র-পটভূমি। ছবির মানুষের গায়ে জামা কাপড় ও তার ওপরে নকশা আঁকার চেষ্টা করা হয়েছে। [৫৪]

তৈমুরের (১৩০০-১৫০০) বংশধর তাঁর পুত্র শাহরুখ পারস্যের হিরাট শহরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। হিরাটকে কেন্দ্র করে চিত্রশিল্প বিশেষ প্রাণ পেয়েছিলো। বাগদাদ থেকে অনেক শিল্পী কাজ করতে থাকেন হিরাটে এসে। মোঙ্গল আমলে পারস্যে বিশেষভাবে গল্প কাহিনীতে চিত্রিত করে পুঁথি লেখা আরম্ভ হয়। এইসব পুঁথিচিত্র মিনিয়েচার আঁকা আরম্ভ হয় প্রথমে মোঙ্গলদের বয়ে আনা চীনা প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে। এর সাথে ছবিতে নকশাকলার প্রভাব দেখা দেয়। সাধারণত পুঁথি, পুস্তক এবং কাহিনী চিত্রিত করার জন্য ভারতীয় শিল্পকলা এবং পারস্যের শিল্পকলার সমন্বয়ে এবং মিলিত চেষ্টায় মুঘল চিত্রকলার সৃষ্টি হয়। মুঘল সম্রাট বাবর পারস্য থেকে শিল্পী এনে এ চিত্রকলার প্রবর্তনের চেষ্টা করেন। মুসলিম শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল হিরাট সম্রাটকে অনুপ্রানিত করেছিলো। সম্রাট হুমায়ুনের রাজত্বের সময় সিরাজ নগরীর আবদুস সামাদ এবং তাব্রিজের মীর সাইদ আলী ভারতে আগমন করেন। এই শিল্পীদের ওপর দায়িত্ব ছিলো ১২০০ পৃষ্ঠার দাস্তান-ই আমীর হামজা নামক পুঁথিচিত্র অংকন করা। আমীর হামজার ‘দাস্তান পাণ্ডুলিপিটি ভারতবর্ষে মুসলিম চিত্রশিল্পের নবযুগের সূচনা করে।[৫৫]

খ্রিস্টিয় প্রথম শতাব্দীর আগে থেকে পূর্ব ভারতের বাংলা ও বিহার এবং পশ্চিম ভারতে তালপাতার পুঁথি রচিত হয়েছে। লিপিকার প্রথমে তালপাতার ওপর পুঁথি লিখত এবং ছবি আঁকার জন্য কিছুটা খালি জায়গা ছেড়ে যেতো। এগুলো ২ ইঞ্চি পরিমাণ প্রশস্ত রাখা হতো। শিল্পীরা সেই জায়গায় ছবি আঁকতেন। পরে তালপাতার এ পৃষ্ঠাগুলো একত্রে বেঁধে কাঠের মলাট দিয়ে বেঁধে রাখা হতো। প্রায় দুই হাজার বছর ধরে এ রীতিতে পুঁথি লেখা হলেও এগার শতকের পূর্বের কোনো পুঁথি আর এখন অবশিষ্ট নেই। পশ্চিম ভারতের এই চিত্ররীতি ছিলো মূলত দ্বিমাত্রিক ও নকশাধর্মী। প্রথমদিকে যে সমস্ত রং ব্যবহৃত হতো তা লাল, হলুদ, নীল, সোনালি, কালো এবং সাদা।[৫৬] বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে এ ধরনের পুঁথিচিত্র সংরক্ষিত আছে।

Dhaka University Institutional Repository

মাখযান-উল-আসরার

রচয়িতাঃ নিযামী, লিপিকারঃ মুহম্মদ আলী, লিপিকালঃ হিঃ ৯১৯/ খ্রিঃ ১৫১৩, উপহারদাতাঃ প্রফেসর এ বি এম হাবিবুল্লাহ।

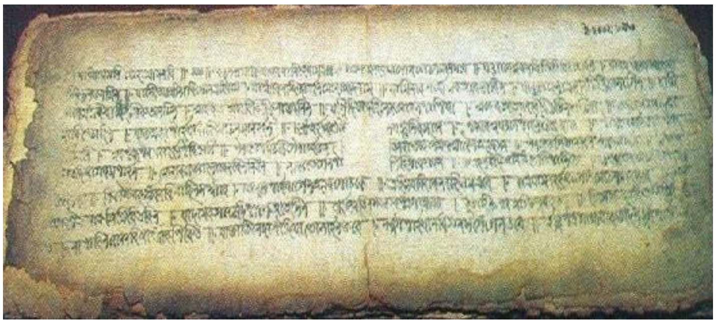

চিত্র-৩১ঃ পুঁথিচিত্র জাতীয় জাদুঘর

মকতুল হুসাইন

আরবি হরফে বাংলা পুঁথি, রচনাকাল-১৬৪৫ খ্রি. রচয়িতা- মুহাম্মদ খান, প্রাপ্তিস্থান–চট্টগ্রাম, সংগ্রহ নং- ২৮২৬

কেফায়াতুল মুসলল্লিন

আরবি অক্ষরে বাংলা পুঁথি, রচনাকাল-১২১৩/ ১৫৫১ খ্রি., সৌজন্য- সৈয়দ মুহাম্মদ তৈফুর

৪(ঝ) পাণ্ডুলিপি

মুঘল আমলে কাগজে পাণ্ডুলিপি লিখন আরম্ভ হয়। সময়ের পরিবর্তনে মোগল আমলের কাগজে লিখিত বইগুলোর বেশিরভাগ পাণ্ডুলিপিই আজ ধ্বংসপ্রাপ্ত। তবে এই দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপির কয়েকটি লালবাগ কেল্লার সংগ্রহশালার দ্বিতলের দক্ষিণ কক্ষের পূর্ব পার্শ্বে প্রদর্শিত হয়েছে।

পাণ্ডুলিপির মধ্যে রয়েছে সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীরের প্রথম দশ বছরের ইতিহাস "তারিখ-ই আলমগীর' উপনিষদের কয়েকটি পরিচ্ছদের ফারসি অনুবাদ 'সির-ই-আকবর' মাওলানা নাসিরুদ্দিন লাহোরি লিখিত ফতওয়া-ই-বুবহানীর ১০৯০ হিজরীতে কৃত অনুলিপি। ১০৯১ হিজরীতে ফকির মোহাম্মদ কাসিম দ্বারা অনুলিখিত 'দেওয়ান-ই-হাফিজ, ১০৯১ হিজরীতে অনুলিখিত আমির খসরব একটি মসনবী; মোল্লা হিরাতির ইউসুফ জুলেখার তফসির ও অতীন্দ্রিয়বাদ সম্পর্কে লিখিত শাহজাদা দ্বারা শিকোর মাজমাল - আল - বাহরিন।'

লালবাগ দুর্গ সংগ্রহশালায় দশটি হস্তলিপির নমুনা উত্তরের কক্ষের পূর্ব দিকের প্রদর্শনীতে রাখা আছে। কোরআন ও হাদিসের উদ্ধৃতি সংবলিত এই হস্তলিপিগুলি সাধারণত দেয়ালে টাঙানো হতো। সোনালি,

Dhaka University Institutional Repository

আকাশী ও অন্যান্য গাঢ় রং এর বর্ডার এর ভেতর নশক ও নাস্তালিক পদ্ধতিতে লিখিত হস্তলিপি গুলির মধ্যে রয়েছে ১২৮৪ হিঃ মোহাম্মদ হোসেন এর নাখস পদ্ধতিতে লিখিত কোরআনের অংশ বিশেষ। ১২৫৪ হিজরীতে মোহাম্মদ সালেহ্‌র নশ্‌ক, নাস্তালিক মিকায়তা এবং তুলুখ পদ্ধতির সংমিশ্রণে লিখিত কোরআনের অংশ বিশেষ। মোহাম্মদ রহিমের নাস্তালিক পদ্ধতিতে লিখিত ফারসি চতুষ্পদী। ১২০৮ হিজরীতে ফতেহ আলীর ফারসিতে লিখিত দরুদ ও ১৩০১ হিজরীতে সৈয়দ রহমত আলীর উর্দুতে লিখিত দরূদ। জাতীয় জাদুঘরে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে।[৫৭]

৪(ঞ) মিনিয়েচার

ভারতবর্ষে মোগল শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় মিনিয়েচার অংকনের সূচনা হয়।[৫৮] মিনিয়েচার শব্দটির বাংলা অর্থ অনেকে ক্ষুদ্রা-চিত্র বলেন। তবে এই শব্দের অর্থ নিয়ে মতবিরোধ আছে। মিনিয়েচার কথাটি এসেছে ল্যাটিন মিনিয়াম শব্দ থেকে। মিনিয়াম শব্দের অর্থ হলো লাল মেটে সিন্দুর। লাল মেটে সিন্দুরের বর্ডার বা পরিসীমা সীমা দিয়ে ইউরোপে এক সময় পুঁথি চিত্র আঁকা হতো বলে হাতে লেখা বইয়ের নাম হয়েছে মিনিয়েচার।[৫৯] এই চিত্রকলা লোকচিত্রের থেকে পৃথক শিল্প। মিনিয়েচার বলতে ক্ষুদ্রকৃতি চিত্রকলাকে বোঝায়। সম্রাট আকবরের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষকতায় আমীর হামজার ‘দাস্তান পাণ্ডুলিপিটি ভারতবর্ষে মুসলিম চিত্রশিল্পের নবযুগের সূচনা করে। ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে যুবরাজ আকবর পিতার হঠাৎ মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে বিষন্ন হয়ে পড়ার দৃশ্যটি।[৬০]

১৬০৫ হতে ১৬২৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল পর্যন্ত ছিলো মুঘল চিত্রকলার স্বর্ণযুগ। সম্রাট জাহাঙ্গীরের চিত্রশালায় তিন ধরনের চিত্র অংকিত হতো। প্রথমত: পাণ্ডুলিপি চিত্রাবলী মিনিয়েচার, দ্বিতীয়ঃ পট্রেট অর্থ্যাৎ প্রতিকৃতি এবং ফুল-লতাপাতা ও প্রকৃতি। ১৬০৬ খ্রিস্টাব্দে চিত্রিত জাহাঙ্গীরের চিত্রশালার অন্যতম প্রধান মিনিয়েচার হলো প্রেমিকার সাথে রাজকুমারের পলায়ন দৃশ্যটি। ছবিটি রামপুর স্টেট লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত রয়েছে। সম্রাট জাহাঙ্গীরের পুত্র শাহজাদা খুররমের বিবাহ উৎসব পালনের অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে।[৬১]

তবে সম্রাট শাহজাহানের চিত্রকলার পরিবর্তে স্থাপত্য শিল্পে মোহ থাকলেও মুঘল চিত্রশিল্পের গতির কোনো পরিবর্তন দেখা যায়নি। লাল পাথর ও মার্বেলের স্তম্ভ, নকশাকৃতি কার্পেটে ঢাকা মেঝে, মনিমুক্তা খোচিত চাঁদোয়া, জাঁকজমক পোশাক পরিহিত সভাসদবর্গ, পারস্য দরবার হতে আগত

সম্মানিত অতিথিবৃন্দের অপূর্ব বেশভূষা প্রভৃতির প্রয়োগে এই মিনিয়েচারটি ছিলো শাহজাহানের চিত্রশালার একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পকলার নিদর্শন। কিন্তু সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মুঘল চিত্রকলা সম্পূর্ণরূপে ব্যহত হয়। আওরঙ্গজেব চিত্রাঙ্কন মনে প্রাণে ঘৃনা করতেন এবং গান বাজনার প্রতি তিনি অস্বাভাবিক বৈরী মনোভাব পোষণ করতেন। বর্তমানে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, বরেন্দ্র গবেষণা সংগ্রহশালা লালবাগকেল্লার সংগ্রহশালায় মুঘল যুগের মিনিয়েচার সংরক্ষিত আছে।[৬২] বরেন্দ্র গবেষণা সংগ্রহশালার প্রদর্শন গ্যালারিতে প্রদর্শিত (চিত্র ৩২) মিনিয়েচারটির বিষয় বস্তু হলো 'দূরন্ত ঘোড়ায় চেপে শিকারে যাবার দৃশ্য'। এই চিত্র শৈলির বৈশিষ্ট্য হলো ঘোড়ার গতিবেগের সাথে শিকারী নিজেকে সামলে নিয়ে ঘোড়ার লাগাম ধরে আছে। তাছাড়া মিনিয়েচারের বর্ডার লাইনে ইসলামী নকশাকলায় সজ্জিত করা হয়েছে।[৬৩] মুঘল যুগে আঁকা এ ধরনের চিত্রকলার নিদর্শন বিশ্বের বিভিন্ন সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত আছে। এছাড়া মিনিয়েচার অংকন করা হতো মৃৎপাত্রের গায়ে। জাতীয় জাদুঘরের সংগ্রহে ল্যাম্প স্ট্যান্ডটি লাউয়ের খোলের মধ্যে (চিত্র ৩৩) চিত্রাঙ্কটির বিষয়বস্তু 'শাসক এবং তাঁর রাজকর্মচারীদের নিয়ে আলাপ আলোচনায় ব্যস্ত'।

চিত্র-৩২: মুঘল চিত্রকলা

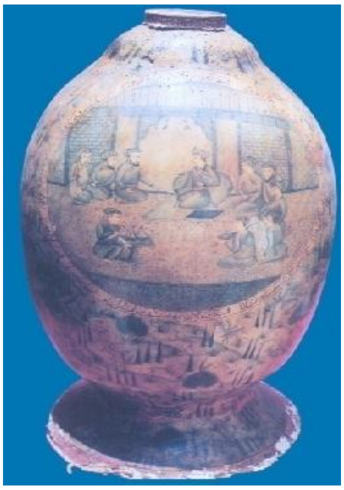

চিত্র-৩৩: ল্যাম্প স্টান্ড: লাউলের খোল: আঠার শতক, প্রাপ্তিস্থান: বিক্রমপুর, উচ্চতা ৪৬ সে,মি; সংগ্রহ নং জ ২০০৩.২৯২

গাজীর পট

বাংলার লোকচিত্রের সবচেয়ে বড় নির্দশন হলো গাজীর পট। এই চিত্রের ভেতর দিয়ে বাংলার লোক সমাজের চাত্রচিত্র ফুটে উঠত। পট চিত্রকর একই সাথে কন্ঠশিল্পীও হতেন। সম্ভবত ৮ম শতাব্দীতে পাল যুগে এই শিল্পের মাধ্যমের প্রসার ঘটে। পটচিত্র ছিলো একটি গ্রামীণ আনন্দ উৎসবের উপকরণ। এই মাধ্যমের চিত্রশিল্পীরা সমাজে পটুয়া নামে পরিচিত। পটুয়ারা গান গেয়ে পটে আঁকা ছবির কাহিনী ব্যাখ্যা করে থাকত।[৬৪] ইসলামী চিত্রকলার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিলো মূলত পাণ্ডুলিপি চিত্রে। ইসলামী

চিত্রকলা প্রধানত দ্বিমাত্রিকভাবে আঁকা হয় এবং উজ্জ্বল রংয়ের ব্যবহার বেশি থাকে। পটচিত্র চিত্ররীতিও দ্বিমাত্রিক। বাস্তব রূপ ও পরিপ্রেক্ষিতের কোনো ব্যবহার করা হয়নি ছবির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না।

পটের আদিরূপ দেয়ালচিত্র। চিত্রবিদ্যার সূচনা দেয়াল অবলম্বন করে। পটে কাহিনীচিত্র খোপে খোপে দেখানো হয়। তার বিন্যাস উপর থেকে নিচে কখনো পাশে পাশে। মধ্য প্রদেশের সিংনপুর, উত্তর প্রদেশের মির্জাপুর এবং যোগীমারা প্রভৃতি গুহার দেয়ালচিত্র পটচিত্রের সূচনা করে। গণজীবনে জাদুবিশ্বাস, লোকাচার অবলম্বনে ঘরের দেয়ালচিত্র অংকিত হতো।[৬৫] ছবিতে রেখার প্রাধান্য বেশি থাকে। তবে গাজীর পট অংকনের ক্ষেত্রে একটি স্বকীয় ধারা বিদ্যমান যা অজন্তা, বাঘ, প্রভৃতি গুহাচিত্রাবলীতে বিধৃত গুপ্তকালীন মার্গরীতি এবং পাল যুগের পুঁথি চিত্রে বিধৃত পূর্ণ ভারতীয় রীতি থেকে আলাদা।[৬৬]

গাজীর পটের অংকিত চিত্র (চিত্র ৩৪) বর্তমানে সোনারগাঁও লোক ও কারুপল্লী ফাউন্ডেশনের সর্দারবাড়ির একটি দেয়ালে দেখতে পাওয়া যায়। বাঘের পিঠে চড়ে গাজী বসে আছেন। পরনে পাঞ্জাবী পায়জামা। মুখে দাড়ি এবং মাথায় পাগড়ি। তাঁর সামনে এবং পিছনে যথাক্রমে মানিকপির, কালু দাঁড়িয়ে আছে। মানিক পিরের হাতের নিশান এবং কালুর হাতের ছাতাও ছাতার দুপাশে শুক ও সারি পাখি মকর মাছের পিঠে উপবিষ্ট গঙ্গাদেবী, বাঘ ও গাভীর সংঘর্ষ, বাঘে আক্রান্ত মহিলা, লক্ষ্মী ও তার বাহন পেঁচা, শাস্তিপ্রাপ্ত বক্ষিলা (কৃপণ) যমদূত, কালদূত মানুষের মাথা বন্দনারত যমরাজের মা ইত্যাদি বিষয়ের চিত্র । গাজীর পটের বর্ণনায় তিনটি বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে।

চিত্র-৩৪: গাজীর পটচিত্র লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন

পির জিন্দা গাজীর মাহাত্ম ও অলৌকিক ক্ষমতা, কৌতুক মিশ্রিত সামাজিক হিতোপদেশ এবং মৃত্যু তথা জান কবজকারী মানে যমদুতের ভয়। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো গাজী হলেন একজন মুসলিম পির। তিনি অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। তা না হলে মানুষের পক্ষে বাঘের পিঠে চড়ে বেড়ানো সম্ভব নয়। এই চিত্রটির হিন্দু ও মুসলমান সমাজের বিষয়কে উপস্থাপন করা হয়েছে।

পটুয়ারা যে কাপড়ের উপর পটচিত্র আঁকত তা দৈর্ঘ্যে ১২ থেকে ১৬ ফুট এবং প্রস্থ ৬ ইঞ্চি থেকে ৩ ফুট হত। চিত্রাঙ্কনে খনিজ এবং ভেষজ রং ব্যবহার করা হতো।[৬৭] এ ছাড়া লক্ষণীয় বিষয় হলো এই যে, গাজীর পটে পির গাজীর বর্ণনার ভেতর দিয়ে এই লোকচিত্রে মুসলিম চিত্রকলার বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠত। বাংলাদেশে এক সময় ময়মনসিংহ, সিলেট, কুমিল্লা, নোয়াখালী, যশোর, খুলনা ও রাজশাহী অঞ্চলে বিনোদনের সবচেয়ে বড় মাধ্যম ছিলো গাজীর পট। বর্তমানে বিনোদনের নানা মাধ্যম প্রসারিত হয়ে এই মাধ্যমটি বিলুপ্তির পথে।

আলম মুসাব্বিরের চিত্রকর্ম

১৯৪৭ সালে দেশভাগের আগে ঢাকায় প্রাতিষ্ঠানিক শৈল্পিক পরিবেশ গড়ে না উঠলেও ঢাকাকে ঘিরে বিচ্ছিন্নভাবে শিল্পকলার চর্চা হয়েছে। আলম মুসাব্বির নামের এক শিল্পীর ঊনবিংশ শতকের প্রথমদিকে ঢাকার ঈদ ও মুহরমের মিছিলের ৩৯টি জলরঙে আঁকা ছবি খুব জনপ্রিয় হয়েছিলো। এ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত ঢাকাতে ঈদ, মহররম ও জন্মাষ্টমী ইত্যাদি উৎসব উপলক্ষে মেলা ও মিছিলের প্রধান আকর্ষণ তাজিয়া ও ঘোড়া নানা বর্ণে ও বৈশিষ্ট্যের সাথে অলংকৃত করার জন্য সুদক্ষ শিল্পী নিয়োগ করা হতো। অষ্টাদশ শতকে মুর্শিদাবাদের নওয়াবরা নানা রকমের মিছিলের আয়োজন করতেন। এর মধ্যে মুহরমের মিছিল (চিত্র ৩৫) ও খাজা খিযিরের মিছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৬৮] মুহররমের চাঁদ দেখার সাথে সাথে উৎসব শুরু হয়ে যেত। সেই রাত থেকে ইমামের বাড়িতে ‘নওবত খানায় নওবতের সুর বাজানো হতো। এ সময় থেকে মাতমে মজলিশ শুরু হয়ে যেত। ইমামবাড়ির দেয়ালে দেয়ালে মোমবাতি জ্বালান হতো। চারদিনের দিন মর্সিয়া শোক সংগীত শোনার জন্যে ইমামবাড়ির লোকেরা সমবেত হতো। পঞ্চম দিনে পানিবাহকরা পাজামা আচ্ছাদিত মোটা সবুজ লুঙ্গি ও সবুজ শার্ট বা আচকান বহু রঙের ঝালরবিশিষ্ট পাগড়ি পরে শহরে শোভাযাত্রায় বের হতো। তারা গলায় একখণ্ড কাফনের কাপড় (কাফনি), বুকে একটি (বাদ্দি) সুতার মালা, এবং নানাধরনের অলংকার পরে এক হাতে পানির গ্লাস ও এক পাশ্বে পানির বোতল অন্য হাতে একটি সুসজ্জিত লাঠি নিয়ে খালিপায়ে চলত। জলুসের মিছিলে সপ্তমদিনে ইমামবাড়া আলোক সজ্জিত করা হতো। [৬৯]

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে শিল্পকলার প্রাতিষ্ঠানিক চর্চার জন্য ১৯৪৮ সালে প্রথম ঢাকায় একটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। মূলত এই প্রতিষ্ঠানটির জন্মের পর এই কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে ঢাকায় চারুকলা চর্চার সুত্রপাত হয়। ঢাকায় আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠার পেছনে যে শিল্পীরা জড়িত ছিলেন তাঁরা হলেন জয়নুল আবেদীন, শফিউদ্দিন আহমেদ, আনোয়ারুল হক ও কামরুল হাসান। কলেজের প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক হিসেবে আরো ছিলেন শিল্পী সৈয়দ আলী আহসান, শেখ আনোয়ার, হাবীবুর রহমান প্রমুখ। জয়নুল আবেদীন কলকাতা আর্ট স্কুলের শিক্ষক ছিলেন এবং শিল্পী হিসেবে সর্বভারতীয় খ্যাতিও অর্জন করেন। শফিউদ্দিন আহমেদও খ্যাতিমান শিল্পী ছিলেন।[৭০] এই চিত্রকর্মটি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা মহানগর সংগ্রহশালা এবং মুক্তিযুদ্ধ সংগ্রহশালায় রয়েছে।

চিত্র-৩৫: শিল্পী মুসাব্বির ঈদের দিনের চিত্র

৪(ট) পিতল- কাঁসার কাজ

চাঁদতারা

ইসলামে আল্লাহ সাথে কারো তুলনা করা হয়নি। তিনি অসীম ক্ষমতার অধিকারী। এই নভোমণ্ডলের তিনি মালিক। মুসলমান শিল্পীরা মসজিদ অলংকরণে চাঁদতারা মটিফ ব্যবহার করেছেন এর অনেক উদাহরণ রয়েছে। তামা, রূপা, সোনার ওপর চাঁদতারা নকশার মধ্যে আরবিলিপিমালায় আল্লাহতায়ালার নাম খোদাই করে নান্দনিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে ইসলামী বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে। (চিত্র ৩৬) এ ধরনের উপাদান বরেন্দ্র গবেষণা সংগ্রহশালায় রয়েছে।[৭১]

চিত্র-৩৬: কাঠের ওপর তামা দিয়ে চাঁদ ও তারা নকশাকৃত আল্লাহ এবং পবিত্র কোরআনের বাণী

পাক-পাঞ্জাতন

প্রচলিত আছে যে আঙ্গুলসহ হাতের তালু পবিত্র পাক-পাঞ্জাতনের প্রতীক। শিয়া মুসলমানরা বিশ্বাস করে মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা) হজরত আলী (রা.), বিবি ফাতিমা (রা.), হজরত হোসেন (রা) এই পাঁচজন মিলে হয় পাক- পাঞ্জাতন। এজন্য মুহররমের ঝাণ্ডার ছড় বা দণ্ডের উপর স্থাপন করা হয় পাক-পাঞ্জাতন।[৭২] টিনের ওপর অথবা লোহার পাতে এই পাঞ্জাতন তৈরি করা হয়। এই ধরনের উপাদান তোফায়ের আহমেদের বাংলার ঘর ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত ছিলো। তোফায়েল আহমেদের মৃত্যুর পর বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটিকে বাংলার ঘর সংগ্রহশালার সব উপাদানসমূহ দান করে দেয় হয়। বর্তমানে এশিয়াটিক সোসাইটির সংগ্রহশালায় এই পাক-পাঞ্জাতনটি রয়েছে। বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত লোকশিল্প অ্যালবামের ছবিতে পাঞ্জাতনটির ছবি পাওয়া যায়।

বাংলাদেশে অসংখ্য পিরের মাজার রয়েছে। পারসিতে বলা হয় পির (শব্দগত অর্থে বয়োবৃদ্ধ, সুতরাং সম্মানীয়) আরবিতে সাধারণত বলে ওয়ালী। পাঁচ সংখ্যাটি হিন্দু মুসলমান ও বৌদ্ধদের মধ্যে একটি তাৎপর্যপূর্ণ সংখ্যা। মুসলমানদের ধর্মের পাঁচটি মূলনীতি আছে। যেমন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ইত্যাদি। হিন্দুরা পঞ্চসতী (পাঁচজন সতী রমণী), পঞ্চাবতী ও অন্যান্যদের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। পশ্চিম বাংলার সাধারণ মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায়ের মাঝে আনুষ্ঠানিকভাবে পাঁচ পিরের উপাসনা এখনো প্রচলিত।[৭৩] বরেন্দ্র গবেষণা সংগ্রহশালায় (চিত্র ৩৭) ব্রোঞ্জের তৈরি হাতপাঞ্জায় কোরআনের আয়াত লেখা আছে। এই হাতপাঞ্জার মধ্যদিয়ে ইসলামের পাঁচটি মূলনীতির বিষয় প্রকাশ পায়। তবে আহমেদের

সংগ্রহে যে হাতপাঞ্জানের (চিত্র ৩৮) নমুনাটি টিনে দিয়ে নির্মিত। বিশেষ করে এই পাঞ্জাতনটিকে চাঁদের মধ্যে হাতের আঙুল দেখানো হয়েছে। দেখলে মনে হয় চাঁদের মধ্যে তারা জ্বলে আছে।

wPÎ-37: e‡i›' M‡elbv msMnkvjv

fPÎ-38: †Zvdv‡qj Avn‡g‡'i evsjv Ni

জায়নামাজ

মুসলমানদের নামাজের জন্য অপরিহার্য হলো জায়নামাজ। বিশেষ করে জায়নামাজের মধ্যে মিহরাব নকশা করা হয়। মিহরাবের মধ্যে থাকে তিনটি স্তম্ভ; স্তম্ভের মুলে থাকে ফুলের গুচ্ছ। মিহরাবের নকশার মাঝখানে থাকে ঝুলন্ত বাতি। নারী পুরুষের একা ইবাদত করার জন্য জায়নামাজ আলাদা আলাদা ব্যবহার করা হয়। ইসলামে প্রার্থনা করার জন্যে পাক পবিত্র স্থান বেছে নিতে বলা হয়েছে।[৭৪] যে কোনো জায়গায় জায়নামাজ পেতে নামাজ পড়া যায়। পিতলের তৈরি (চিত্র ৩৯) এই জায়নামাজটির ওপরের অংশে কাবাগৃহ ও মসজিদের মিনার অলংকরণের সাথে নামাজের মাঝের অংশে মিহরাব নকশার মধ্যে ফুল-পাতা অংকিত করা হয়েছে। সাধারনত আকাশ বোঝানোর জন্য চাঁদতারা অংলকরণ তৈরি করা হয়। এ ধরনের জায়নামাজ আসলে ব্যবহারিক প্রয়োজনের পরিবর্তে নান্দনিক কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[৭৫] এই নিদর্শনটি বাংলা একাডেমি লোক ঐতিহ্য সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে।

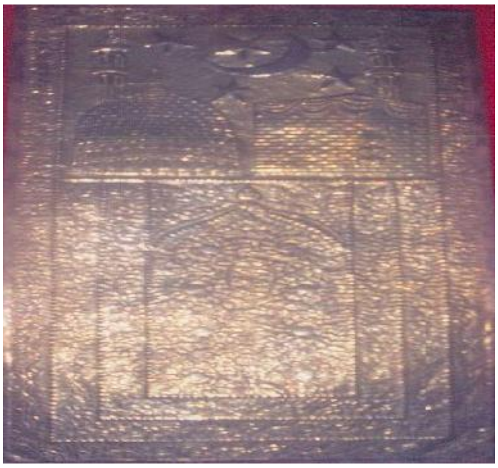

চিত্র-৩৯: জায়নামাজ

তাজমহল

মুঘল সম্রাট শাহজাহান তাজমহল সমাধিসৌধটি নির্মাণ করেছিলেন তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রীর বিয়োগান্তের পর। এটি একটি অনিন্দ্য সুন্দর স্থাপত্য। বিশ্বের সপ্তম আশ্চর্য্যের এটি একটি। এই ইমারতের ভেতর দিয়ে মুসলিম স্থাপত্যের ধারা ফুটে ওঠে। বিশেষত মুঘল স্থাপত্যের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। ভারত ও বাংলাদেশের কারিগরেরা বিভিন্ন মাধ্যমে তাজমহলের নকশা তৈরি করার চেষ্টা করেছে কাঠ, হাতির দাঁত, মাটি, বাঁশ, বেত ও ধাতবের ওপর। লোক কারুপল্লী ফাউন্ডেশনে এ ধরনের তাজমহলের মডেলের নিদর্শন রয়েছে।[৭৬]

চিত্র-৪০: পিতলের তৈরি তাজমহল

৪(ঠ) বস্ত্রশিল্প (Textiles & Costumes)

মসলিন

মসলিন বাংলাদেশের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বস্ত্রশিল্প ও বাঙালি জাতির অত্যন্ত গৌরবের বস্তু। মসলিন শব্দের মূল নির্ণয় করা কঠিন। মসলিন ফার্সি, বাংলা ও সংস্কৃত শব্দ কোনোটাই নয়। মসূল বর্তমান ইরাকের অন্তর্গত বিখ্যাত ব্যবসা কেন্দ্র। যেহেতু মসূল এলাকায় প্রাচীনকালে উৎকৃষ্ট ধরনের বস্ত্র তৈরি হতো, সম্ভবত ইউরোপীয়রা সুক্ষ্ম সুতি বস্ত্রকে সাধারণ ভাবে মসূলী বা মসূলিন বা মসলিন নামে অভিহিত করতো মসূল হলো ইরাকের অর্ন্তগত বিখ্যাত ব্যবসা কেন্দ্র। পরে ঢাকার সুক্ষ্ম বস্ত্রের সন্ধান পেলে তারা তাকেও মসলিন নাম দেয়।

এক সময় ঢাকাই মসলিন অত্যাশ্চর্য পণ্য হিসেবে বিবেচিত করা হয়েছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে ঢাকাই মসলিনের খ্যাতি-দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি আরব বণিকদের মারফত উত্তর আফ্রিকায় এর প্রভাব বিস্তার করেছিলো। মসলিন এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে রপ্তানি করা হতো।[৭৭] ফলে বাংলায় মসলিন শিল্পের ব্যবসা জমজমাট ছিলো। ঢাকাই মসলিন এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন ব্যবসা কেন্দ্র প্রায় একচেটিয়া অধিকার বিস্তার করতে সামর্থ হয়। প্রকৃতপক্ষে মুঘল আমলের মলবুস খাসই আঠার শতক এবং তার পরবর্তী সময়ে মলমল খাস নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। এ যুগের কাপড় অত্যন্ত সুক্ষ্ম ও মিহি ছিলো, এত সুক্ষ্ম ছিলো যে এর ওজন ৬/৭ তোলার বেশি ছিলো না এবং একে ছোট একটি আংটির ভেতরে অনায়াসে নাড়াচাড়া করা যেতো। আঠার শতকে মুঘল বাদশার জন্য তৈরি মলবুস খাস ছাড়াও অপেক্ষাকৃত সুক্ষ্ম ও কম মিহি নানা রকমের মলমল খাস তৈরি হতো।[৭৮] যা মুঘল শাসকদের পরিবারের মেয়েরা পরিধান করতেন বলে জানা যায়। বিশেষ করে সম্রাজ্ঞী নূরজাহান মসলিন ব্যবহার করতেন। তার একটি মসলিন শাড়ির দাম ছিলো তখনকার আমলে চারশ টাকা। যে কোনো বস্ত্র বয়নের তিনটি স্তর থাকে। কার্পাস সংগ্রহ, সুতা কাটা এবং কাপড় বয়ন। ঢাকাই মসলিনের বৈশিষ্ট্য ছিলো এই যে, এই তিন ধাপের প্রত্যেকটি বিষয় বাংলার মাটিতে হতো। বিদেশি কোনো জিনিস এখানে ব্যবহার করা হতো না শুধু মসলিন রপ্তানি ছাড়া। সুতরাং মসলিন পুরাপুরি ছিলো দেশজ শিল্প। আঠার শতকের শেষের দিকে মসলিন রপ্তানি অনেক কমে যায়। ইংল্যান্ডে আধনিক বস্ত্র কল আবিস্কারের ফলে ঢাকার বস্ত্র শিল্পের অবনতি দেখা দেয়।[৭৯] জাতীয় জাদুঘরে মসলিন ও জামদানির প্রদর্শনী রয়েছে। কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল মিউজিয়ামে মসলিন কাপড় (চিত্র ৪১) সংরক্ষিত আছে।

চিত্র-৪১: ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল সংগ্রহশালায় রক্ষিত মসলিন কাপড়

কাতান

বস্ত্রশিল্পে বাংলাদেশের ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। প্রাচীন ব্যাবিলন, মিসর, গ্রিস, রোম ও বাংলাদেশের সাথে মসলিনের পরিচয় ছিলো বলে জানা যায়। খ্রিস্টপূর্ব ১৪৬২ সালে মিসরের অষ্টাদশ বংশের শেষেরদিকে অধিকাংশ মমী মসলিন কাপড় দিয়ে আবৃত করা হয়েছিলো।[৮০] ক্ষোম, দুকূল, কাপাসিক বস্ত্রটির মধ্যে পত্রোর্নার বস্ত্রটি হলো এক ধরনের বুনো রেশমে বোনা বস্ত্র। ভারতের উত্তর প্রদেশে বানারসীর তাঁতীরা ঐতিহ্যগতভাবে বানারসী শাড়ি বয়ন করে চলেছে। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় বানারসী বয়নকারী মীরপুর অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে বস্ত্র বয়ন আরম্ভ করেন। ধীরে ধীরে মীরপুরের বিহারিরা এ শিল্পকর্ম আয়ত্ত করে ফেলে। জামদানীর মতো ডানে ওস্তাদ বামে সাগরেদ-। তবে জামদানির চেয়ে এ তাঁত অনেক বেশি জটিল। জমিনের নকশা জামদানির কায়দায় তাঁতে রেখে তোলা হয় সিরকি নামক ৫/৬ ইঞ্চি লম্বা বাঁশের কঞ্চি দিয়ে। এ কঞ্চিতে জড়ানো থাকে জরি। মিরপুর ১০, ১১, এবং বার নম্বর সেকশনের আবাসিক এলাকায় গড়ে উঠেছে বেনারসি কাতান বয়ন শিল্প।[৮১] বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে বেনারসি কাতান প্রদর্শনী কক্ষে রয়েছে।

†ebvim kvo (†ikg)

রেশমি ও রুপার সুতার অলংকরণ

মাধ্যম : রেশমি ও রুপার সুতা

সময়কাল : বিশ শতক

প্রাপ্তিস্থান : ১। মুর্শিদাবাদ ২। কিশোরগঞ্জ ৩। দিনাজপুর রাজবাড়ি

সংগ্রহ সং জ-৭৬.৩০১, জ-৮৯.৪০৯, জ-৯২০

সুঁচিশিল্প

সুলতানী আমলে ভারতবর্ষে অনেক ধরনের শিল্প গড়ে ওঠে। এর মধ্যে বস্ত্রশিল্প ছিলো অন্যতম। বাংলার রেশমি বস্ত্রের উৎপাদন নবাব, সুবাদার ও অভিজাত ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতায় সমৃদ্ধি লাভ করে।[৮২] বাংলায় তুঁত গাছ ও গুটি পোকার চাষ করা হতো বিশেষ করে মুঘল শাসকদের পরিবারের মেয়েরা পরিধান করতেন বলে জানা যায়। ভারতীয় উপমহাদেশের সুঁচিশিল্প অন্তত তিন হাজার বছরের পুরনো। চতুর্দশ শতাব্দীতে ঢাকাই মসলিনের পাশাপাশি সুঁচিশিল্প ভারতবর্ষ ও ইউরোপের মধ্যে বাণিজ্যের প্রধান উপকরণ ছিলো বলে জানা যায়। মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়ের লাভাল নামের একজন পর্যটকের বর্ণনায় ঢাকার সূঁচিশিল্পের কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। টেভারনিয়ারের সূত্র মতে ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে সূঁচিকর্ম শোভিত মসলিন ঢাকা থেকে রপ্তানি হয়েছিলো। ১৭৪২ সালে পাঁচটি জাহাজে ১, ২৫২ খানা জরি ও রেশমি কাজ করা বস্ত্র ফরাসি দেশে পাঠানো হয়।[৮৩] বিশেষ করে ঢাকা, লক্ষ্মৌ ও মুর্শিদাবাদে সুঁচিশিল্পের সুনাম বিশ্বে ছড়িয়ে যায়।

১৮৪০ সালে জেমস টেলর বয়ন ও সুতা কাটার পর সুঁচিশিল্পে মুসলমান কারিগরেরা বিশেষ স্থান দখল করে। জরদজি, কাশিদা, চিকনকারি ও রিফুগরি ছিলো এ শিল্পে কয়েকটি বিভাগ। কার্পাস, রেশম ও সোনারুপার কাজের ব্যবহারে তেরি সুঁচিশিল্পের বিভিন্ন নাম ছিলো। এর মধ্যে কারচর, ঝাপান, চারখানা, কলাবতন, কারচিকা ও কামদানি ইত্যাদি। মসলিন, পশমি সাল, রুমাল প্রভৃতির ওপর সোনারুপার রেশমি সুতার কাজকে বলা হয় জরদজি। ১৭৫০ -১৮১৩ সালের মধ্যে কলকাতা থেকে স্কার্ফ ও শাল ঢাকায় আনা হয় সোনা সুতা দিয়ে ফুলপাতা নকশায় জরদজি কাজ করানোর জন্যে। সুক্ষ্ম কাপড়ের জরির কাজ কলাবতন বা গোলাবতন এবং টুপির ওপর জরি ও রেশমের কাজের নাম পসু। পাগড়ি, ফুরসি হুক্কার নল ও চামড়ার জুতায় এ কাজের নাম ছিলো সালমা।[৮৪]

কাশিদা ছিলো সবচেয়ে জনপ্রিয় সুঁচিশিল্প। নবম শতাব্দীতে বসরা থেকে কাশিদা কাজ ঢাকায় আসে। কার্পাস ও রেশম- এ বুনট কাপড়ের কার্পাসে বোনা অংশে মুগা ও তসর শিল্কে রিপু ও সার্টিন ফোঁড়ে কাশিদার বুটি তোলা হতো। জেমস টেলরের তথ্য অনুযায়ী ১৮৪০ সালে ২০ হাজার কাশিদা অলংকরণ করা হয় এবং ইরান, মিসর ও তুরস্কে রপ্তানি করা হয়। ১৯১২ সালে ঢাকা থেকে আনুমানিক দুলক্ষ টাকার কাশিদা রপ্তানি হয়। সাদা মসলিন ও নয়নসুকের উপর সাদা সুতার কাজের নাম ছিলো চিকন। মুসলমানদের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং ইউরোপিয় বণিকদের মাধ্যমে ১৭শ থেকে ১৯শ শতক পর্যন্ত চিকন বাণিজ্য সুঁচিকর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। টান করে কাপড় সাট করে তার

ওপর সুঁচের ঘা দিয়ে দিয়ে সোনারুপার যে কাজ হয় তার নাম কারচর। কারচবের কাজ- ঢাকায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। বর্তমানে এ কাজকে কারচুবি, আড়ি ওইরি বলা হয়। আড়ি ইরি সুঁচের নাম।[৮৫]

চিত্র-৪২: কারচুপি তৈরি কাজের নমুনা

ঢাকার নায়েব নাজিম সাহেবের ব্যবহৃত ভেলভেটের ওপর কারচবের কাজ করা আঠার শতকের একটা ছাতা বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। এ শতকের একটা কুর্ত্তা এবং নবাব সলিমুল্লাহর (১৯১৫) ব্যবহৃত একটি ফেল্টের টুপিও সেখানে রক্ষিত আছে।[৮৬] সুতি মসলিনের কাপড়ের ওপর সোনারুপার কাজের নাম ছিলো কামদানী। অপেক্ষাকৃত কম সোনারুপার কাজের নাম কারচিকা। কার্পাস জমিনের ওপর রংগীন রেশম সুতার কাজের নাম ফুলকরি বা ফুলবুটি। রেশমের সাথে সোনা রুপার তার পাকানো সুতার নাম কলাবতন। এ সুতা সূচিকর্মে ব্যবহৃত হতো। সোনারুপার সুতার সূচের কাজ কলাবতন, কারচব, কারচিকা রেশম এর সুতার জাপন, জাব্বা ঢাকার সুঁচিশিল্পের বিশিষ্ট নাম। এ ছাড়াও পাঞ্জাবির মধ্যে মুসলমান কারিগরেরা কাজ করত।

ইসলামী পোশাক

পোশাক নির্ভর করে প্রধানত দেশের আবহাওয়া ও সংস্কৃতির ওপর। মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার সাথেও এর যোগ রয়েছে। এ ছাড়াও ভিন্ন সভ্যতার সাথে যোগাযোগের ফলে পোশাকে পরিবর্তন আসে। কিন্তু প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভাস্কর্য পোড়ামাটির ফলক ও পাণ্ডুলিপির চিত্রে সে যুগের লোকেরা কী ধরনের পোশাক পরতেন তা অনুমান করা যায়। নীহার রঞ্জন রায় এবং রমেশ চন্দ্র মজুমদারের

বর্ণনায় পাওয়া যায় বাংলার ছেলে ও মেয়েরা প্রাচীনকাল থেকে ধুতি অথবা শাড়ি পরিধান করতো লজ্জা নিবারণ এবং শীতগ্রীষ্ম থেকে রক্ষা পাওয়া জন্য। শাড়ির ও ধুতির মধ্যে পার্থক্য ছিলো এই যে, ধুতির চেয়ে শাড়ি দৈর্ঘ্যে এবং ঝুলে বড়ো হতো। সমাজের উচ্চশ্রেণির পুরুষেরা হাঁটুর নিচে খানিকটা নামিয়ে সেভাবে পরতেন। কিন্তু নিম্নশ্রেণির সাধারণ পুরুষগণ ধুতি পরতেন অত্যন্ত খাটো করে। এই ধুতির একটা অংশ পেছনের দিকে টেনে কোমরের সঙ্গে গুঁজে দিয়ে মালকোঁচা দিতেন তারা। অন্যদিকে মেয়েরা শাড়ি পরতেন প্রায় পায়ের কব্জি পর্যন্ত ঝুলের। নারী-পুরুষ-উভয়েই শরীরের ওপরের অংশ খোলা রাখতেন।[৮৭]

অবশ্য আনন্দ উৎসবে সমাজের অভিজাত নারীরার কখনো কখনো ওড়না পরতেন। তা ছাড়া, স্তন এবং উর্ধ্ববাহু ঢাকা এক রকমের খাটো জামা কখনো কখনো পরতেন। শীতের সময় নারী পুরুষ চাদরের মতো এক খণ্ড কাপড় পরিতেন বলে অনুমান করা হয়। লক্ষণীয় বিষয় হলো হিন্দু দেব-দেবীর যে বিশাল সংগ্রহ জাতীয় জাদুঘর এবং বরেন্দ্র গবেষণা সংগ্রহশালায় দেখতে পাওয়া যায় সেখানে দেবীর পরিপূর্ণ যৌবন খোলামেলা ভাবে বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে নির্মিত। যুগল দেব-দেবীর মূর্তির মধ্যে জৈবিক কামনা সুস্পষ্টরূপে ফুটে। এ দেবদেবীর শরীরে যে পোশাক দেখা যায় এটা মূলত ভারতীয় স্থানীয় পোশাক। প্রাচীন যুগের পর ইন্দো-মুসলিম যুগে পোশাকের গুরুত্ব পূর্ণ পার্থক্য লক্ষ করা যায়। এটা মুসলমানদের প্রভাবেই হয়েছিলো। মুসলমানগণ এমন-সব দেশ থেকে ভারবর্ষে আগমন করেছিলেন যেখানকার জলবায়ু চরম ছিলো প্রকৃতির। উপরন্তু, তাঁদের পোশাকের সাথে ধর্মীয় অনুশাসনওযুক্ত ছিলো। সুতরাং বাংলায় যখন বিদেশি মুসলমানগণ এসেছিলেন তখন তারা নিজেদের দেশিয় পোশাক বাংলায় এসে পরিধান করতে থাকেন। এই বহিরাগত শ্রেণিটির পোশাক স্থানীয় লোকেরা গ্রহণ করে সে ধরনের পোশাক পরিধান করতে আরম্ভ করে। ইন্দো-মুসলিম আমলের আগে সেলাই করা পোশাক পরার রীতি বাঙালি সমাজে ছিলো না বলেই জানা যায়। এই রীতি চালু করেন মুসলমানরাই। এ সময় থেকে দরজি বলে এক ধরনের দক্ষ শ্রমিকের সৃষ্টি হয়। ইন্দো মুসলিম আমল শুরু হওয়ার পর খুব ধীর গতিতে নতুন শাসকদের পোশাক প্রভাব বিস্তার করতে আরম্ভ করে। এ ধরনের পোশাক সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে প্রায় আশি বছর লেগে যায়। তেমনি ইউরোপীয় পোশাক প্রভাব ফেলতে আরম্ভ করে ইংরেজ শাসন শুরু হওয়ার প্রায় একশ বছর পরে। মুঘল আমলে যখন ইউরোপীয় বণিকদের সঙ্গে ব্যবসা শুরু হয় তখন সেই বণিকরা যেসব পণ্য নিয়ে আসতেন তার মধ্যে ছিলো পশমের তৈরি বস্ত্র।

অবশ্য ইসলামে পোশাক পরিচ্ছেদের ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। পবিত্র কোরআন শরিফের সূরা আরাফের ২৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে 'হে বনী-আদম তোমাদের লজ্জাস্থান ঢেকে রাখার জন্য ও বেশ-ভূষার জন্য আমি তোমাদেরকে পরিচ্ছেদ দিয়েছি তাক্ওয়ার পরিচ্ছদ, ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট। ইহা আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্যতম, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।'[৮৮] সুতরাং ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী আবৃত পোশাক পরিধান করা মুসলিম নর-নারীর ওপর ফরজ করা হয়েছে। টাইপ বা আটসাট পোশাকের পরিবর্তে ঢিলেঢালা পোশাক পরিধান করে লজ্জাস্থানের অবয়ব ঢেকে রাখতে হবে।

চিত্র-৪৩: ইসলামী পোশাকের উদাহরণ

বাংলায় ইসলাম প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পর অভিজাত পরিবারের মুসলমানদের বিশিষ্ট পোশাকের প্রচলন হয়। উচ্চশ্রেণির মুসলমানগণ ইজার বা পায়জামা এবং গোলাকৃতি কলারের ঢিলা পোশাক পরিধান করতেন। এই সার্ট একটি বড় রংগীন রুমাল দিয়ে কোমরে বাঁধা থাকত। তারা সাদা সুতি পাগড়ি ব্যবহার করতেন। এই পাগড়ি দৈর্ঘ্যে ৪০ ফুট এবং প্রস্থে ৬ ইঞ্চি ছিলো। সাধারণ মুসলমানদের পোশাক বলতে খাট সাদা সার্ট পরিধান করে এবং এগুলা উরুদেশ মাঝামাঝি পর্যন্ত লম্বা হয়। তারা তিন পাঁচের ক্ষুদ্র শিরাবরণ ব্যবহার করে। তাদের সকলেই চামড়ার জুতা পরে থাকে। অন্যান্যরা সুচারুকার্য করা রেশমি অথবা সোনালি সুতায় সেলাই করা চম্পল পরে।

ষোল শতকের প্রথম দিকে পর্তুগীজ বারবোসা বাংলাদেশে প্রধান একটি বন্দরের সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের সম্পর্কে লিখেছেন, মুসলমানেরা পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা সাদা জোব্বা পরে-এর তলে লুঙ্গির মতো কোমড়ে জরানো কাপড় এবং ওপরে কোমরে রেশমের কোমরবন্ধ হতে রৌপ্যখচিত দরবারি ঝুনানো থাকে। হাতে মণিমাণিক্যখচিত অনেক আংটি এবং মাথায় সুক্ষ্ম তুলার কাপড়ের টুপি। ধনীদের জুতায় রেশম ও সোনার কাজ থাকতো। ধনী মুসলমানদের সরকারি পোশাক ছিলো রেশম অথবা সুতির

তৈরি পায়জামা, চাপকান, মখমল ও ব্রোকেটের চুড়িদার পায়জামা, সুন্দর অসিসহ সাদা কোমরবন্দ এবং টুপি ও পাগড়ি। সাধারণত মুসলমানরা ঘরে ঘরে নানা বর্ণের লুঙ্গি এবং হিন্দুরা ধুতি ব্যবহার করতো। হিন্দু জমিদারগণ পোশাক পরিচ্ছদে ধনী মুসলমানদের অনুকরণ করতেন। উচ্চবংশের মুসলমান মহিলারা সালওয়ার-কামিজ, ঘাঘরা, উলের তৈরি কাবা, কাশ্মীরী শাল, সুতি বা রেশমের তৈরি দোপাট্টা ব্যবহার করতেন এবং মাথায় ঘোমটা দিতেন।

লক্ষণীয় হলো, হিন্দু যুগে বাংলায় সেলাই করা পোশাক পরার রেওয়াজ ছিলোনা। মুসলমানরা পোশাক-পরিচ্ছদে সেলাই করা জামা-কাপড় পরার পদ্ধতি প্রবর্তন ছাড়াও কাঠের তৈরি পাদুকা ব্যবহারের পরিবর্তে বাংলায় জুতা আমদানি করে সামাজিক পরিবর্তন আনে। বিশেষ করে মুসলমানদের এদেশে বসতি গড়ে তোলার পর পরিধানযোগ্য পোশাক পরিচ্ছদের বিশেষ পরিবর্তন সূচিত হয়।

মধ্যযুগ থেকে বাংলাদেশে টুপিশিল্প যথেষ্ট সমৃদ্ধ। নামাজের জন্য টুপি পরা মুসলমান পুরুষের জন্য সুন্নত। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে টুপি সংরক্ষিত (চিত্র ৪৩) আছে। এই টুপির উপর জরি ও মূল্যবান পাথরে কারচোবকাজযুক্তনকশা তৈরি করা হয়েছে। এ ধরনের টুপি রাজা, বাদশা এবং অভিজাত রাজপরিবারের লোকেরা পরিধান করতেন।[৮৯] এ ছাড়াও অভিজাত পরিবারের পুরুষেরা চোগা পরিধান করতো। চোগা বলতে এক ধরনের শেরওয়ানী বোঝায়। মুঘল যুগ থেকে হিন্দুরা মুসলমানদের অনুকরণে পোশাক পরা আরম্ভ করো যখন তারা সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় রাজকর্মচারী হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। ভারতে হিন্দুদের কোনো অভিজাত পোশাক যা বলতে বোঝায় তা ছিলো না। বরেন্দ্র গবেষণা সংগ্রহশালার ১ নং গ্যালারিতে সংরক্ষিত কাঠের তৈরি কৃষ্ণের মূর্তির গায়ে পরিধান করানো হয়েছে শেরওয়ানী পোশাক ও মাথায় রয়েছে টুপি। এ ধরনের পোশাক মুসলমান সমাজে প্রচলিত। সুতরাং হিন্দুরা মুসলমানদের অনুকরণে বস্ত্র পরিধান আরম্ভ করে।

টুপি

কারচোবকাজযুক্ত, মাধ্যম: মখমল ও জরি, সময়কাল: ঊনিশ শতক, প্রাপ্তিস্থান: ৪-৫ দিনাজপুর রাজবাড়ি, ৫। মুর্শিদাবাদ, সংগ্রহ নং জ-৭৯.১৮৫, জ-৯৩০, জ-৭৬.৩৪৮

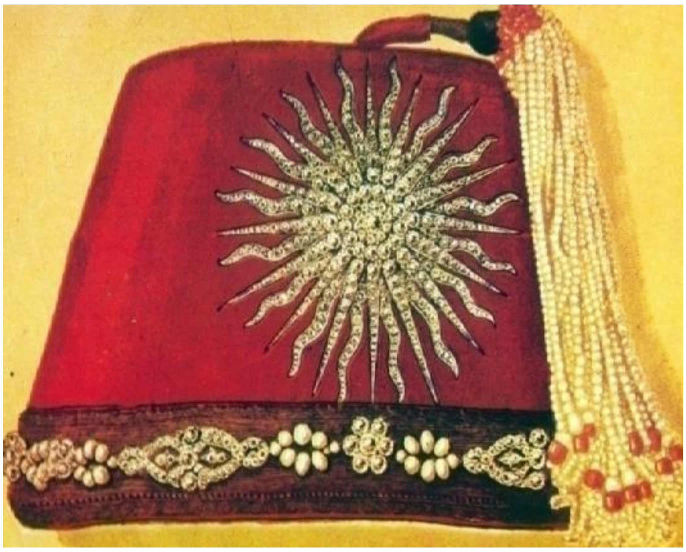

চিত্র-৪৪: টুপি

চাপকান

মুর্শিদবাদ পরিবারের ব্যবহৃত, মাধ্যম: রেশমি সুতা, সময়কাল: আঠার শতক, প্রাপ্তিস্থান: ঢাকা, সংগ্রহ নং জ-৭৬.৩৩১

WPÎ-45

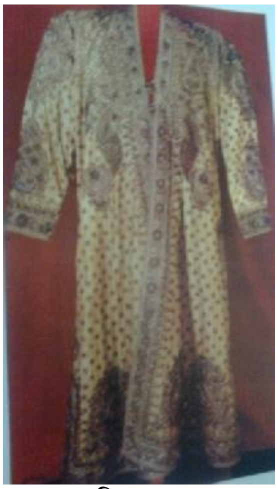

চিত্র–৪৬

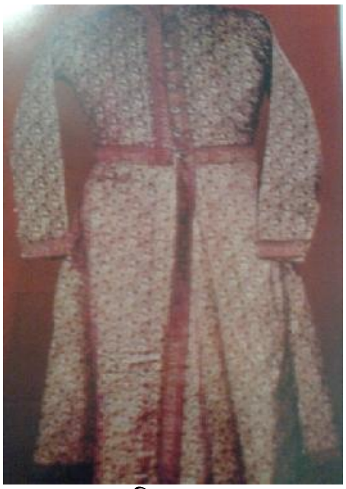

চিত্র-৪৭

চোগা

পশমি সুতার অলংকরণ, মাধ্যম: পশমি সুতা, সময়কাল: উনিশ শতক, প্রাপ্তিস্থান: ঢাকা, সংগ্রহ নং : জ-৭৭.৫৮৭

চোগা (বারচোব কাজ)

নবাব আব্দুল লতিফের আনুষ্ঠানিক পোশাক (১৮২৮-১৯৯৩), মাধ্যম: রেশমি ও সুতি সুতা, সময়কাল: উনিশ শতক, প্রাপ্তিস্থান : ঢাকা, সংগ্রহ নং জ-২৫০০

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকাই মসলিন পাগড়ি

মাধ্যম: সুতি সুতা, সময়কাল: উনিশ শতক, প্রাপ্তিস্থান: বলধা সংগ্রহ, ঢাকা, সংগ্রহ নং ২৫৭০

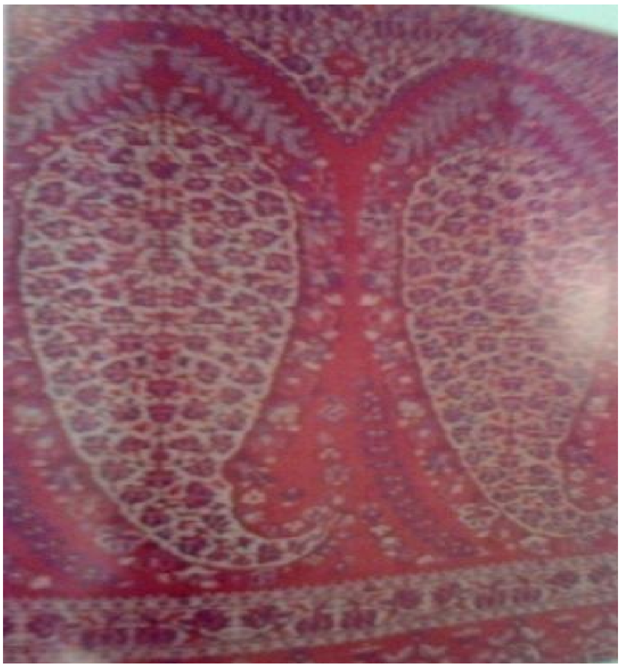

চিত্র-৪৮: কাশ্মীরী শাল

মুহররমের ঝাণ্ডা

মুহররমের মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের হাতে বহন করা লাল ও সবুজ রঙের কাপড়ে তৈরি প্রতীকী ঝাণ্ডা। লাল রংয়ের (চিত্র ৪৯) ঝাণ্ডা হজরত মুহাম্মদ (স.)- এর দৌহিত্র হজরত ইমাম হোসেন (রা.) এর সীমারের খঞ্জরে শাহাদাতবরণের প্রতীক। বিভিন্ন মোকামে ছোট-বড় আকৃতির বহু ঝাণ্ডা থাকে। মুহররমের মোকাম থেকে মিছিল নিয়ে তাজিয়া যাত্রার সময় মিছিলকারীরা এই ঝাণ্ডা বহন করে।

চিত্র-৪৯: মুহররমের ঝাণ্ডা তোফায়েল আহমেদের বাংলার ঘর

অলংকারাদি

অলংকার বলতে বোঝায় শরীরের বিভিন্ন অঙ্গকে আকর্ষণীয় করে তুলতে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গকে সুসজ্জিত করার বিভিন্ন উপকরণ।[৯০] বিভিন্ন ধরনের উপাদান দিয়ে এই অলংকার তৈরি হয়ে থাকে। এর মধ্যে ফুল, ফলের বীচি, দাঁত, মাটি, শঙ্খ, কড়ি, কাঁচ, লাক্ষা, কাঁসা, পিতল, বিভিন্ন ধাতব পদার্থ, সোনা, রুপা, মুনিমুক্তা, নানা রকমের পাথরের টুকরা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ধারণা করা হয়ে থাকে বৈদিক যুগ থেকে এ উপমহাদেশে স্বর্ণালঙ্কারের প্রচলন ছিলো।[৯১] অলংকার বাঙালি রমনীদের সবচেয়ে অহংকারের বিষয়বস্তু এবং নিজস্ব সম্পদ। মিসরের পিরমিড থেকে নৃত্তাত্তিকরা খুঁজে পেয়েছে নানা বৈশিষ্ট্যের অলংকার।

আর্যসভ্যতার উন্মেষের পর হিন্দু মেয়েরা বালা, চুড়ির সাথে শাখা, নোয়া ও গলার, বালা অলংকার হিসেবে পড়তো। সিন্ধু উপত্যকায় খনন কাজের সময় স্বর্ণ, রৌপ্য ও তম্র অলংকারের মধ্যে মূল্যবান পাথরখোচিত গলার হার, কানের দুল, চুলর কাঁটা, চুড়ি ইত্যাদি আবিষ্কৃত হয়। খ্রিস্টের জন্মের প্রায় এক হাজার বছর আগে বাংলাদেশের ওয়ারিবটেশ্বরে, পাহাড়পুরে ও মহাস্থানগড়ে প্রাচীনতম অলংকারের মধ্যে পাথরের পুঁতি, পোড়ামাটির বুটিকা পাওয়া গেছে। মুঘল আমলের অলংকারের ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় নবাব ও জমিদারদের সময় অলংকারে ভিন্ন মাত্রার প্রকাশ ঘটে। এসব অলংকারের মধ্যে ইউরোপীয় শৈলির প্রভাব সংযোজিত হয়।[৯২]

ঢাকার স্বর্ণ রৌপ্য শিল্পে নিয়োজিত কারিগরদের তৈরি তারজালি হাতের চুড়ি, গলার হার, আতরদান, গোলাপপাশ নিখুঁত ভাবে তৈরি হতো। তামা নির্মিত বিভিন্ন ধরনের তৈজস পাত্র এক সময় শুধু বাংলাদেশেই নয়, সারা ভারতজুড়ে ব্যবহৃত হয়েছে। বিত্তশালী সমাজে বিলাসোপকরণ হিসেবে সোনা, রূপা, মনিমুক্তা, হীরা এবং বিচিত্র দ্যোতিময় প্রস্তর সজ্জিত অলংকার শিল্প যে যথেষ্ট বিকশিত হয়েছিলো, প্রাচীন দেবদেবীর অলংকারের মধ্যে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।[৯৩]

অন্যভাবে এসব উপাদানকে গহনাও বলা হয়। অলংকার সাজ সজ্জার একটি মাধ্যম যা সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে বলে পৃথিবীর প্রায় সকল জাতিই বিশ্বাস করে। যে কোনো রমণীর কাছে স্বর্ণালংকার খুবই প্রিয়। সম্পদশালী ধনী পরিবারের মুসলিম মেয়েদের কাছে স্বর্ণালংকার নিজেদের বিপদের সাথী। প্রয়োজনে স্বর্ণালংকার বিক্রি করে বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। যে অলংকার মেয়েদের চুলের সিঁথি বরাবর চিকন সোনা বা রুপার শিকলের সাহায্যে মাথার মাঝখান থেকে টেনে এনে কপালের ওপর ঝুলিয়ে রাখা হয় তাকে বলে টিকলি। আব্বাসীয় খলিফা হারুন অর রশীদের স্ত্রী সম্রাজ্ঞী জুবাইদা রত্নখচিত স্বর্ণ অথব্য রৌপ্যনির্মিত পাত্র ব্যতীত তিনি তৈজসপত্র ব্যবহার করতেন না। রত্নখচিত জুতার ব্যবহার

তিনিই প্রচলন করেন। কপালের দাগ ঢাকবার জন্য হারুন-আর রশীদের বোন আব্বাসা প্রথম রত্নখচিত স্বর্ণনির্মিত টায়রা ব্যবহার করতেন তা পরবর্তীকালে পৃথিবীতে একটি সৌখিন অলংকারের মর্যাদা লাভ করে।[৯৪] বাংলাদেশে মুঘল যুগে অলংকার শিল্পের উন্নতমান সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিশেষ করে এ যুগে রংগীন মীনা নকশা ও রত্নখচিত করা টায়রা জড়োয়া গহনার প্রচলন ঘটে। তবে মীনা করা কাজে ঢাকার কারুশিল্পীরা বিশেষত্ব দেখাতে না পারলেও নায়েব ও নাজিমদের যুগে এবং নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতায় রুচিশীল জড়োয়া অলংকার প্রস্তুত করতে পেরেছিলো। ঢাকার প্রচলিত অংলকারগুলির মধ্যে ছিলো মাথা ও কেশসজ্জায় টায়রা, ঝুমকা, টিকা, সিঁথি বা সিঁথিপাটি, বেলকুঁড়ি ও বিনোদচিরুনী। এর মধ্যে সিঁথিপাটি সাধারণত হিন্দু পরিবারের মেয়েরা পরত। কানের দুলে মধ্যে কান বা কানপাতা, ফুল, ঝুমকা, মাকড়ি, লটকন, বালি, ছাল্লা ও পাশা, কানের পাশের লতিতে একাধিক ছিদ্র করে তাতে নানা নকশার বালি পরা হতো। পাশা সাধারণ মুসলমান মেয়েরা কম পরত। বাঙালি মুসলিম পরিবারে তিন/চার বছর বয়সী মেয়েদের কানে ছিদ্র করা বা কান বিধুঁনি অনুষ্ঠানে সাধ্য অনুযায়ী জাঁক জমকপূর্ণ অনুষ্ঠান পালন করা হতো। এই প্রথা ঢাকার অধিবাসীরা কেউ কেউ এখন এ অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। [৯৫]

আংটি হাত বা পায়ের পরিধেয় গোল ধাতব অলংকারের অংশ। আংটির মধ্যে খচিত থাকে দামি পাথর। গলার হারের মধ্যে রয়েছে চন্দ্রহার,চারনরী অর্ধহার, একাবলী, ইন্দ্রচ্ছদ্র, কণ্ঠি, গোটহার, গুঞ্জার, চেন, চিক, পাটিহার, পাঁচনরি, পুতি হার, ফুলোহার, মঙ্গলসূত্র, মধ্যমণি মালা, মতিহার, রশ্মিমালা, সাতনরি, হাসুলি, হেসোহার ইত্যাদি।[৯৬] মসলিম বাংলার অভিজাত রমণীরা স্বামীর মঙ্গল কামনায় দুহাতে সোনার চুড়ি পরে। এর মধ্যে পাটরী, কঙ্কন, লাউলতা, বালা, মান্তাশা, পঁহুছি, চুড়ি, অলিবান্দ বা রতনচূড় ইত্যাদি গহনা নামে পরিচিত। তেমনি বাংলাদেশে অনেক অঞ্চলে বিয়ের পর মুসলমান মেয়েদের নাকফুল বাধ্যতামূলত। বিবাহিত মেয়েদের বিয়ের যে নথ পরানো হতো তার ব্যাস তিন থেকে চার ইঞ্চি হতো তার মধ্যে লাল প্রবাল ও দুটি মুক্তা বা মতি অবশ্যই থাকতো। স্বামী যতদিন জীবিত থাকে ততদিন সে নাকফুল খুলতে পারবে না। ইসলামের সাথে এ ধরনের রীতিনীতির কোনোই সম্পর্ক নেই। এই রীতি আসলে বাঙালি রীতি। পৃথিবী জুড়ে স্বর্ণের মূল্যবৃদ্ধির কারণে স্বর্ণকারগণ গহনা প্রস্তুতে অমনোযোগী হয়ে উঠেছে।

Dhaka University Institutional Repository

wPÎ-50 Mjvi nvi I ‘j

wPÎ-51 Mjvi nvi I ‘j

৪(ড) দারুশিল্পের নির্দশন

কাঠ খোদাই করে কোরআনের আয়াত ও ফুল-লতাপাতা নকশামণ্ডিত করতে বাংলাদেশের কারুশিল্পীদেরও যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। কাঠ খোদাইয়ের কাজে এশিয়া মাইনর এর কারিগররা ছিলো সমৃদ্ধ। বিশেষ করে মসজিদের দরজার পাল্লার, মিহরাব ও কুরআন শরিফ রেখে পড়ার কাঠের বিশেষ ধরনের আসবাব বা রেহেল এর গায়ে করা নকশাকলায়।[৯৭] কাঠের ওপর (চিত্র ৫২) কাঠ দিয়ে আরবিলিপিমালায় আল্লাহর নাম লেখা হয়েছে। এই নিদর্শনটি রয়েছে বাংলা একাডেমি লোক ঐতিহ্য সংগ্রহশালা। বরেন্দ্র গবেষণা সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত আছে রেহেল এবং কাঠের তৈরি মেয়েদের গহনার বাক্স। (চিত্র ৫৩) এ গহনার বাক্সে খোদাই করে ফুল, লতা-পাতার নকশার মধ্যে মসজিদ এবং মিনারের দৃশ্য ফুটে উঠেছে। মসজিদের মিনার এসেছে সম্ভবতঃ পাহাড়া দেবার জন্য তৈরি রোমানের বুরুজ থেকে। মদিনার মসজিদে কোনো মিনার ছিলো না। হজরত মুহাম্মদ (স) বেলালকে আদেশ করেছিলেন উঁচুঘরের চাল থেকে আজান দিতে। সিরিয়ায় রোমান আমলের মন্দিরের সাথে থাকতো উঁচু বুরুজ।[৯৮] এখানে থেকে সম্ভবত পাহারা দেয়া হতো। এই সব বুরুজ থেকে সম্ভব মিনার গড়ার ধারণা আসে। উল্লেখ্য যে, এ ধরনের অলংকরণ চিত্রে জেরুজালেমের দামেশক মসজিদের অলংকরণের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। দামেশক মসজিদের অলংকরণে মোজাইকের ওপর ফুলে-ফলে সুশোভিত গাছ, বিখ্যাত শহরের স্থাপত্য নিদর্শন, পানি প্রবহমান নদীর দৃশ্য আঁকা হয়েছিলো।[99] মানুষ ও প্রাণীর পরিবর্তে মসজিদের ভেতরে ভূদৃশ্য চিত্রায়ন করার প্রবনতা মুসলমানদের মধ্যে এই মসজিদকে কেন্দ্র করেই প্রথম লক্ষ করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-৫২: বাংলা একাডেমির লোক ঐতিহ্য সংগ্রহশালা

চিত্র-৫৩: কাঠের গহনার বাক্স বরেন্দ্র গবেষণা সংগ্রহশালা

কাঠের তৈরি স্ট্যান্ডের মধ্যে (চিত্র ৫৪) আরবি হরফে আল্লাহ, কাবা, চাঁদ এবং মিনার নির্মাণ করা হয়েছে। অপর স্ট্যান্ডটির মধ্যে মসজিদ, মিনার ও চাঁদ তারা নির্মাণ করা হয়েছে (চিত্র ৫৫)। এই স্ট্যান্ড দুটি তোফায়েল আহমেদের বাংলার ঘরের প্রদর্শনীতে ছিলো ।

wPÎ-54: Av‡jøvû I Kvev Kv‡Vi ÷¨vÛ

wPÎ-55: Pv‘Zviv Kv‡Vi ÷¨vÛ

৪(ঢ) তারজালি কাজে স্থাপত্যশিল্প

ফিরিঙ্গ হলো সোনা বা রূপা দিয়ে তৈরি তারের জালি করা এক প্রকার সুক্ষ্ম শিল্পকর্ম। সাধারণভাবে অলংকারের মধ্যে এ ধরনের কাজ করা হয়ে থাকে। যেমন গলার হার, কানের দুল, কোমরের বিছা, হাতের চুরি ইত্যাদি। তবে সৌখিন অন্যান্য জিনিসপত্রের মধ্যে এ শিল্পের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন

আতরদান, পানদান, গোলাপপাশ, হুক্কা, তাস বাক্স, হাত বাক্স, বোতাম বোকলেস ইত্যাদিতে। খ্রিস্টপূর্ব আড়াই হাজার বছর আগে, সিরিয়া মেসোপটেমিয়ায়, এশিয়া মাইনর প্রভৃতি অঞ্চলে ফিরিঙ্গি কাজের সাক্ষাৎ মেলে। দক্ষিণ এশিয়ার ভারতের কটক, অন্ধ্রপ্রদেশ করিমনগর এবং বাংলাদেশের ঢাকা অঞ্চলে এ কাজের প্রচলন ঘটেছিলো।[100]

মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় বিখ্যাত ম্যান্ডিলা নামে এক ধরনের তারের কাজের প্রচলন হয় এবং ব্রিটিশ আমল পর্যন্ত ভাঙ্গাগড়ার ভেতর এ শিল্প টিকে থাকে। The Journal of India Art Vo. 1, Nos. - 16, No. 13 P. 97, Dacca Filigree Work' শীর্ষক প্রবন্ধে জাহাঙ্গীরের আমলের মেন্ডিলা কাজসহ তারের কাজের বর্ণনা পাওয়া যায়। বর্তমানে জাতীয় জাদুঘরে ১৯৩৫ সালে নির্মিত হোসেনী দালান ও আহসান মঞ্জিলের মডেলসহ ঢাকার ফিলিগ্রি কাজের কয়েকটি নিদর্শন সংরক্ষিত আছে।[১০১] এছাড়াও ঢাকা মহানগর সংগ্রহশালা, আহসান মঞ্জিল সংগ্রহশালায় উনিশ শতকের একটি গোলাপ পাশ, সুরমাদানি, পানদান ও একটি গহনার বাক্স, প্রদর্শনীশালায় সংরক্ষিত রয়েছে। তারজালি কাজের মাধ্যমে আহসান মঞ্জিলের মডেল ও হোসনী দালানের মডেল (চিত্র ৫৬ ও ৫৭) তৈরি করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে এ ধরনের কাজের কারিগর ছিলেন অত্যন্ত উঁচুমানের ।

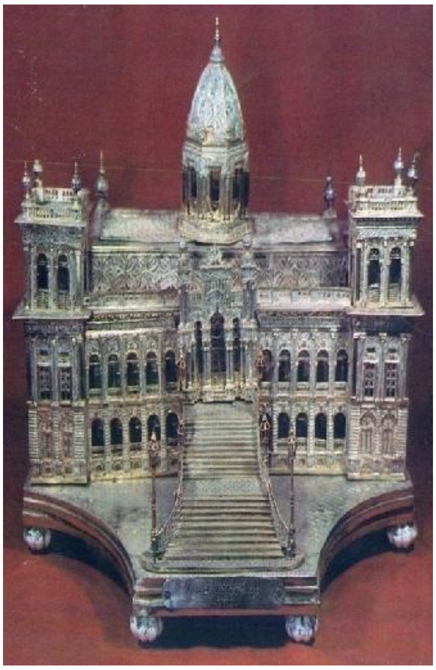

চিত্র-৫৬: আহসান মঞ্জিলের মডেল আহসান মঞ্জিল সংগ্রহশালা

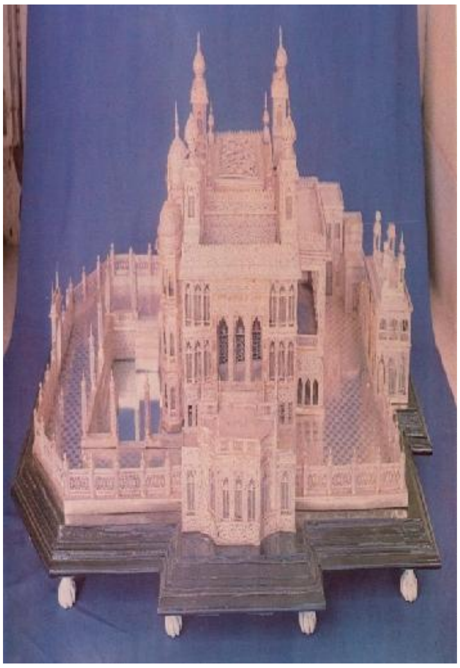

চিত্র-৫৭: হোসনী দালান বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

migv‘wb

তারজালির অন্যতম নিদর্শন সুরমাদানি। সুরমা এক ধরনের চোখে ব্যবহার করার কাগজ । এই কাগজ প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতা থেকে দেখা যায়। পরবর্তীতে সুরমা ব্যবহার মুসলিম নারী পুরষের

মধ্যে প্রবর্তিত হয়। সুরমা রাখার জন্য নানা ধরনের পাত্র তৈরি হয়েছে।[১০২] ভারতে ইসলাম সম্প্রারিত হওয়ার পর অভিজাত পরিবারে রমণীদের চোখের প্রসাধনী হিসেবে সুরমা অপরিহার্য ছিলো। মুসলমানদের মৃত্যুর পর গোছল শেষে মৃত ব্যক্তির দুচোখে সুরমা পরিয়ে দেয়া সুন্নত। সুতরাং মুসলিম সমাজে সুরমা অত্যন্ত পবিত্র প্রসাধনী ভাবা হয়। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, বরেন্দ্র গবেষণা সংগ্রহশালায় সুরমাদানি সংরক্ষিত আছে। কারুপল্লী ফাউন্ডেশন সংগ্রহশালার গ্যালারিতে প্রদর্শিত সুরমাদানিতে (চিত্র ৫৮) রোজেট নকশার বিশেষ প্রাধান্য লক্ষ যায়।

চিত্র-৫৮: সুরমাদানী নির্মাণ উপাদান তারজালি কারুপল্লী ফাউন্ডেশন

†Mvjvccvk

তারজালি কাজের রূপা দিয়ে আরেকটি নিদর্শন গোলাপপাশ অভিজাত পরিবারের জন্য তৈরি হতো। গোলাপপাশের মধ্যে গোলাপ পানি ঢুকিয়ে পবিত্র অনুষ্ঠানে ছিটিয়ে দেয়ার প্রচলন মধ্যযুগ থেকে শুরু হয়। বিশেষ করে মুসলমানদের ধর্মীয় উৎসবে এবং মৃতদেহের ওপর গোলাপ পানি ছিটানো ধর্মীয় উৎসবের মধ্যে পড়ে। বাংলার সবশ্রেণির মুসলমানদের মধ্যে এ সংস্কৃতি প্রচলিত রয়েছে।[১০৩] অভিজাত প্রতিটি পরিবারে এই গোলাপপাশ সংগ্রহে থাকত।[১০৪] বর্তমানে এ ধরনের গোলাপপাশ ব্যবহারের প্রচলন উঠে গেছে। মানুষ এখন দোকান থেকে গোলাপ পানির বোতল কিনে এনে সরাসরি ধর্মীয় উৎসবে ছিটিয়ে দেয়।

চিত্র-৫৯: গোলাপপাশ কারুপল্লী ফাউন্ডেশন

চিত্র-৬০: তারজালি কাজ ঢাকা মহানগর সংগ্রহশালা

4(Y) eqbwkí (MwjPv)

ইসলামী শিল্পকলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচয় গালিচা। সাফাভী আমলের গালিচা খুবই বিখ্যাত ছিলো। এই আমলে কতগুলি বিখ্যাত গালিচা প্রস্তুত করা হয়েছিলো মসজিদে বিছানো এ পিরের কবর ঢেকে রাখার জন্য। কার্পেটে পশমের সাথে জরি দিয়ে সুক্ষ্ম জরির কাজ করা হতো। সাফাভী আমলের গালিচার নকশার মধ্যে পদকাকৃতির নকশা খুব জনপ্রিয় ছিলো। বৃহৎ পদকের মত নকশার মধ্যে করা হতো ফুল লতাপাতা দিয়ে জটিল নকশা। অনেকের ধারণা এই পদকাকৃতি বা মেডালিয়নকে ভাবা হতো সূর্য। এর সাথে নকশার সামঞ্জস্য রেখে করা হতো চীনা কায়গায় সাদা মেঘ। আবার ফুলে ভরা ফুলদানিও নকশায় অলংকরণ করা হতো। তুর্কিরা মধ্য এশিয়ায় ভেড়ার লোম দিয়ে গালিচা তৈরি করতে পারতো।

ষোড়শ শতাব্দীতে তুরস্কে পারস্য গিঁট পদ্ধতিতে খুব উন্নতমানের গালিচা তৈরি হতে থাকে। এসব গালিচা, নামাজের আসন (জায়নামাজ) হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। মুসলিম সুলতানদের মেঝেতে কার্পেট বিছানো থাকতো। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও লালবাগ কেল্লার সংগ্রহশালায় গালিচা সংরক্ষিত আছে। তবে বাংলাদেশে গালিচা বয়নের ঐতিহ্য অতি প্রাচীন হলেও গালিচার ব্যবহার এদেশে মধ্যপ্রাচ্য থেকে আমদানিকৃত।

ইসলামী রাষ্ট্রগুলোতে গালিচা ব্যবহার বাংলাদেশের চেয়ে অধিক দেখা যায়। আরবে তাঁবুতে বসবাসকারীরা তাদের শিল্পবোধের পরিচয় দিয়েছিলো সুন্দর গালিচা বুননের মধ্যে। তারা গালিচা তাঁবুর মধ্যে বিছিয়ে পূরণ করতে চেয়েছিলো অন্য আসবাবের অভাব। তবে লক্ষণীয় বিষয় হলো বাংলাদেশে গালিচার ব্যবহার শহরবাসীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেছে। বাংলার সাধারণ মানুষ ও গ্রামীণ

সমাজে গালিচার পরিবর্তে মাদুর ও শীতলপাটি ব্যবহার করে থাকে।[১০৫] জাতীয় জাদুঘরের গ্যালারিতে (চিত্র ৬১) যে গালিচাটি রয়েছে নীল রঙের পটভূমিতে বিভিন্ন রঙের সমাহারে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ফুল লতাপাতা নকশা।

wPÎ-61: RvZxq Rv‘Ni beve wmivRD‡Ï Šjvi e¨eüZ MwjPv

4(Z) gxbv KvR

ইসলামী শিল্পকলার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো মিনা কাজ। আব্বাসীয় আমলের একাদশ শতাব্দীতে দলে দলে তুর্কিরা আসতে থাকে পারস্যে ও মেসোপটেমিয়াতে। শিল্পকলার ক্ষেত্রে নবযুগের সূচনা হয় সেলজুক তুর্কদের অভ্যুদয়ের ফলে। সেলজুক আমলে পারস্যের মৃৎপাত্র শিল্প খুব খ্যাতি লাভ করে। এই মৃৎপাত্র শিল্পও বিশেষভাবে অনুপ্রেরণা লাভ করে চীন থেকে রপ্তানি করা চীনামাটির বাসনপত্র থেকে। মাটিকে সাধারণভাবে পোড়ালে তা লাল হয়ে যায়। এই লাল হবার কারণ, মাটির মধ্যে যে লোহা থাকে তা ফেরাস থেকে ফেরিক অক্সাইডে রূপান্তরিত হয়। সাধারণত মাটির বাসন ও ইট খুব বেশি উত্তাপে পোড়ানো হয় না। কারণ তাতে মাটির উপাদান গলে গিয়ে ঝামা হয়ে যায়। সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়া লৌহ ও সিলিকা যুক্ত নানা প্রকার উপাদানের তারতম্য ঘটিয়ে মাটিকে অধিক তাপসহ করা যায়। এ সময় মাটিকে অনেক উত্তাপে পোড়ান চলে। এভাবে অধিক তাপে পোড়ালে মাটির পাত্র অনেক শক্ত হয়। এভাবে অধিক উত্তাপে পোড়ান পাত্রকে ইংরেজিতে বলা হয় স্টোনওয়ার।[১০৬]

গ্লেজ করা বলতে বোঝায় মাটির জিনিস বা পাত্রের গায়ে কাচ উৎপাদক দ্রব্যের প্রলেপ দিয়ে পোড়ান। উত্তাপে গলে গিয়ে এই প্রলেপ পাত্রের ওপর কাচের একটি চিকন আবরণ সৃষ্টি করে। গ্লেজ কবরার জন্য বিভিন্ন প্রকার কাচ উৎপাদক ব্যবহার করা হয়। এই গ্লেজ করাকে বাংলায় বলা হয় মিনা করা। মিনা বলতে বোঝায় উন্নত ধরনের গ্লেজ। বাগদাদের কুম্ভকারা মাটিকে শক্ত করে পোড়াবার ও

বিভিন্নভাবে গ্লেজ করবার কৌশল আয়ত্ত করে। বাগদাদ ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলের মৃৎপাত্র নির্মাতা গ্লেজকরা মৃৎপাত্রের উপর ধাতু দীপ্তি দিতে জানত। এরা রূপা ও তামার অক্সাইড রজনের সাথে মিশিয়ে উত্তপ্ত করতো। এভাবে উত্তপ্ত করলে ধাতব যৌগিক ও রোজিন মিলে রোজিটেন বা রজন যৌগিক সৃষ্টি হয়। এই রজন যৌগিক তারপিন জাতীয় তেলে গুলে মৃৎপাত্রের গায়ে লাগিয়ে পোড়ালে মৃৎপাত্রের গায়ে একটা সোনালি প্রলেপ পড়ে যা আলো পড়ে চকচক দেখায়। মনে হয় সোনা দিয়ে তৈরি। এই রকম সোনালি প্রভা যুক্ত মৃৎপাত্র মুসলিম সমাজে খুবই জনপ্রিয়তা পায়।[১০৭] কারণ গোড়া ইসলামী মতে, সোনা ও রুপার ব্যবহার নিষিদ্ধ (হারাম)। কিন্তু এইসব পাত্র মাটির তৈরি অথচ দেখে মনে হয় সোনা দিয়ে তৈরি। এসব পাত্রে অনেক রকম নকশাও তৈরি হতো। জীবজন্তুর ছবি আঁকা হতো।

এছাড়াও কুফি লিপিও খুব ব্যবহার হয়েছে এ যুগে। এদের পটভূমিতে অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে চেরাপাতা যুক্ত আঙ্গুরলতার নকশা । এসব নকশায় অনেক রঙ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থ্যাৎ এ ধরনের মৃৎপাত্র নির্মাণ কেবল শিল্পজ্ঞান থাকলেই চলত না ; থাকতে হতো সুনিপুণ কারিগরি দক্ষতা। এভাবে করা বাটি, ফুলদানি, বয়ম, প্রভৃতি খুবই সুন্দর হতো। সেলজুকরা জীবজন্তু ও মানুষের ছবি আঁকার খুব গোঁড়ামির পরিচয় দেন নি। জীব-জন্তু ও মানুষের ছবি পারস্যে যত ছবি আঁকা হয়েছে এত ছবি কোথাও আঁকা হয়নি। সেলজুক আমলের শিল্পকলার বৈশিষ্ট্য এই যে, এ যুগে কেবল নকশাকলাতেই মানুষের মন ভরে নি এ যুগের অনেক মৃৎপাত্রের গায় দেখা যায় ছবির মাধ্যমে অনেক গল্প কাহিনী চিত্রিত করা হয়েছে মৃৎপাত্রে।

মসজিদের দেওয়াল সুন্দর মিনা করা টালি ও ইট দিয়ে সাজানো সম্ভব হয়েছে মৃৎশিল্পে উৎকর্ষ লাভের ফলে।[১০৮] বাংলাদেশের মধ্যযুগে নির্মিত অনেক মসজিদ ও ধ্বংসাপ্রাপ্ত বাসভবন থেকে খসে পড়া মিনা করা টালির অংশ সংগৃহীত হয়েছে। এছাড়াও তৈজসপত্রে মিনার কাজ দেখা যায়। বিশেষ করে তরকরি তোলা কারি ডিশ উজ্জ্বল রংয়ের চিনামাটি দিয়ে তৈরি করা হতো অভিজাত পরিবারের ব্যবহারের জন্য। মধ্যযুগে টাকা পয়সা সাধারণত কোনো একটি নির্দিষ্টপাত্রে ভরে পাত্রে মুখ কাপড় দিয়ে বেঁধে মাটির নিচে গর্ত করে পুঁতে রাখত। যে পাত্রে টাকা পয়সা রাখা যায় তাকে বলা হতো সঞ্চয়পাত্র। সঞ্চয়পাত্রটি বেশিরভাগই মাটির তৈরি হতো। লালবাগের সংগ্রহশালায় যে সঞ্চয় পাত্র সংরক্ষিত আছে (চিত্র ৬২) সেই পাত্রগুলি সাদা সিরামিকের তৈরি এবং নীল রংয়ের আঁচড়ে অলংকরণ সমৃদ্ধ।[১০৯] বিশেষ করে এই অলংকরণের মধ্যে চৈনিক শিল্পভাবধারা ফুটে উঠেছে। এছাড়াও জাতীয় জাদুঘরের প্রদর্শনী রয়েছে চীনামাটির থালা। (চিত্র ৬৩) এই থালার মধ্যে

ক্যালিওগ্রাফি ও ফুল -লতাপাতা অলংকরণে সজ্জিত করা হয়েছে। বাংলা একাডেমির লোক ঐতিহ্য সংগ্রহশালায় রয়েছে মিনা (চিত্র ৬৪) একটি থালা। এই থালার মধ্যে উজ্জ্বল রংয়ের ব্যবহারে বাহারি চমৎকার জ্যামিতিক ও ফুল নকশায় তৈরি করা হয়েছে। পনের শতক থেকে ষোলো শতকের মধ্যে তৈরি কয়েকটি মিনা করা ইট গৌড় বরেন্দ্র গবেষণা সংগ্রহশালার প্রর্দশনীকক্ষে রয়েছে।

চিত্র-৬২: জার (সঞ্চয়পাত্র) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

wPÎ-63: RvZxq Rv`‡Ni msiwÿZ Av‡Q

চিত্র-৬৪: বাংলা একাডেমি লোক ঐতিহ্য সংগ্রহশালা

4(_) h‡×i A¯k¯

প্রাচীন বাংলায় কর্মকারের দক্ষতায় দা, কুড়াল কোদাল খুন্তা, লাঙল, তীর, বর্শা, দু'মুখো খুব ধারালো তলোয়ারসহ লোহা দিয়ে প্রচুর যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র তৈরি হয়েছে। ইসলাম ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করতে মহানবি হজরত মুহাম্মদ (স) স্বয়ং বদরের যুদ্ধ, খন্দুকের যুদ্ধ ও ওহুদের যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। প্রতিটি যুদ্ধে তিনি স্বয়ং অস্ত্রধারণ করে শত্রুর সাথে মোকাবেলা করেছেন। অতএব ইসলামে যুদ্ধ করা ধর্মের একটা অংশ। প্রাচীন যুগ থেকে আত্মরক্ষা এবং যুদ্ধের জন্য ছুরি, তরবারি ও ঢালের প্রয়োজন পড়তো। বিশেষ করে তলোয়ার এবং ছোরার ওপর অলংকরণ করা হতো। আরবিলিপিমালা ইসলামী নকশাকলার অপূর্ব সমন্বয় এখানে করা হতো। এ ধরনের ছুরির নমুনা (চিত্র ৬৫) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, বরেন্দ্র গবেষণা সংগ্রহশালা, আহসান মঞ্জিল সংগ্রহশালা ও লালবাগ দুর্গের সংগ্রহশালার নিচের তলার তিনটি কক্ষে প্রদর্শিত হচ্ছে।[১১০]

চিত্র-৬৫: অলংকৃত ছোরার বাট জাতীয় জাদুঘর

4(') AvBfwi †Lv'vB

মিসর, গ্রিক, ফিনিশিয় সভ্যতা থেকে হাতি, জলহস্তী, সিন্ধুঘোটক এবং এক ধরনের বিশেষ তিমির সাদা দাঁত এবং হাড় থেকে তৈরি অপূর্ব শিল্পসামগ্রী সাধারণ ভাবে আইভরিশিল্প নামে পরিচিত হয়েছে। প্রাচীনকালের আইভরিশিল্পের সেরা উদাহরণ পাওয়া যায় মিসরীয়দের কবরের মধ্যে। মিসরীরা শুধুমাত্র হস্তীদন্ত এবং হাড়ই ব্যবহার করত না এরা সিন্ধুঘোটকের দাঁত থেকে মন্ত্রপুত ছুরি তৈরি করতে পারতো। এসব ছুরির উপর সত্যি কারের জন্তু-জানোয়ারে এবং পৌরণিক জীব জানোয়ারের ছবি খোদাই করা হতো যাদুবিদ্যার জন্য। আইভরির ওপর চিত্র নির্মাণ, আইভরিকে রঙিন করা, আইভরির গায়ে আয়নার টুকরা ও মূল্যবান ধাতু যথা লার্পিস নাজুলি (নীলকান্তমণি) বসানো প্রভৃতি কাজ ফিনিসিয়রা নিখুঁতভাবে করতে পারতো। এদের পর গ্রিক ও রোমানরা আইভরিশিল্পে পারদর্শিতা অর্জন করে। [১১১] ইউরোপে খ্রিস্টধর্ম প্রচারিত হওয়ার পর সমগ্র আইভরি শিল্প ধর্মীয় কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। পরবর্তীকালে কনস্টান্টিনোপল আইভরিশিল্পের আর একটি বিশাল কেন্দ্রে পরিণত হয়। কনস্ট্যান্টিনোপল রোম বিজয়ের বহু পূর্ব থেকেই মুসলিম দেশগুলোতে আইভরি থেকে নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র তৈরির চেষ্টা নেয়া হয়েছিলো।

মুসলিম শিল্পীরা হাতির দাঁত ও হাড়ের চেয়ে সিন্ধুঘোটকের দাঁতকেই বেশি কাজে লাগাতেন। পারস্যের মুসলিম শিল্পীরা তবরারি এবং ছুরির বাঁট নির্মাণে সবচেয়ে বেশি প্রতিভা দেখিয়েছিলো। এছাড়াও মুসলিম শিল্পীরা তৈরি করতো আইভরির সুদৃশ্য চামচ (চিত্র ৬৬)। বাদশা ও ধনীদের খাদ্য পরিবেশনে আইভরি চামচের ব্যবহার ছিলো অনিবার্য। কারণ কোনো খাদ্যে বিষ দেয়া থাকলে আইভরি চামচ ব্যবহারে তা ধরা পড়ে যেত বলে বিশ্বাস করা হয়। পারস্যের মুসলিম শিল্পীরা সিন্দু ঘোটকের দাঁত থেকে আইভরিশিল্পের ধারাকে উত্তর ভারতে প্রচলন করেছিলো বলে ধারণা করা হয়।[১১২]

সুতরাং বাংলাদেশ, ভারত এবং পাকিস্তান মিলিয়ে এই উপমহাদেশে অতি প্রাচীনকাল থেকে হাতির দাঁত ও হাঁড় থেকে আইভরিশিল্পের বিকাশ ঘটেছে।[১১৩] মুঘল আমলে আইভরিশিল্পের ব্যাপক প্রভাব ছিলো। মুঘল আমলে আইভরির ওপর বিচিত্র নকশা ও মটিফকে ফুটিয়ে তোলা হতো। বিশেষ করে দোলায়িত লতাপাতা এবং ফুলের মটিফের মধ্যে ইসলামী এবং মুঘল ঐতিহ্য প্রতিফলিত হয়েছে।[১১৪]

আইভরিশিল্পের মাধ্যমে সাধারণত ব্যবহারযোগ্য এবং সৌখিন এই দু ধরনের জিনিস তৈরি হয়েছে। মেয়েদের হাতের ব্রেসলেট, নেকলেস, চিরুনি ও আয়না দণ্ড অলংকার রাখা বাক্স ছিলো সৌখিন জিনিস। সৈনিক ও যোদ্ধাদের জন্য তরবারি ও ছুরির বাঁটে আইভরি ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়াও

রাজা বাদশাদের জন্য তৈরি চেয়ার, টেবিল ও সিংহাসন, সিংহাসনের পা ও হাতল, শিকারিদের জন্য হর্ণ, তীরের ফলা, মাছ ধরার বড়শি, দাবার গুটি, বাদ্যযন্ত্রের ফলক, চামচ, দরজা, জানালা, বাদ্রযন্ত্র, খড়ম ইত্যাদি নির্মাণে আইভরিকে ব্যবহার করা হয়েছে।[১১৫] তবে বাংলাদেশে ব্রিটিশ আমলে আইভরি শিল্পের যেটুকু চর্চা হয়েছিলো তা প্রকৃতপক্ষে নবাব, রাম এবং সামন্ত জমিদারদের আমলেই। আজ এ শিল্প সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বিশেষ করে হাতির দাঁত ও হাড় এখন দুষ্প্রাপ্য এবং দুর্মূল্য জিনিস। কিন্তু সিন্ধুঘোটক ও তিমির দাঁত এখন আমদানি করা যেতে পারে। ইউরোপে হাতির দাঁত ও হাড়ের অভাব হলে তিমির দাঁত ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশে হরিণের শিং দিয়ে চমৎকার শিল্প গড়ে তোলা যেতে পারে।

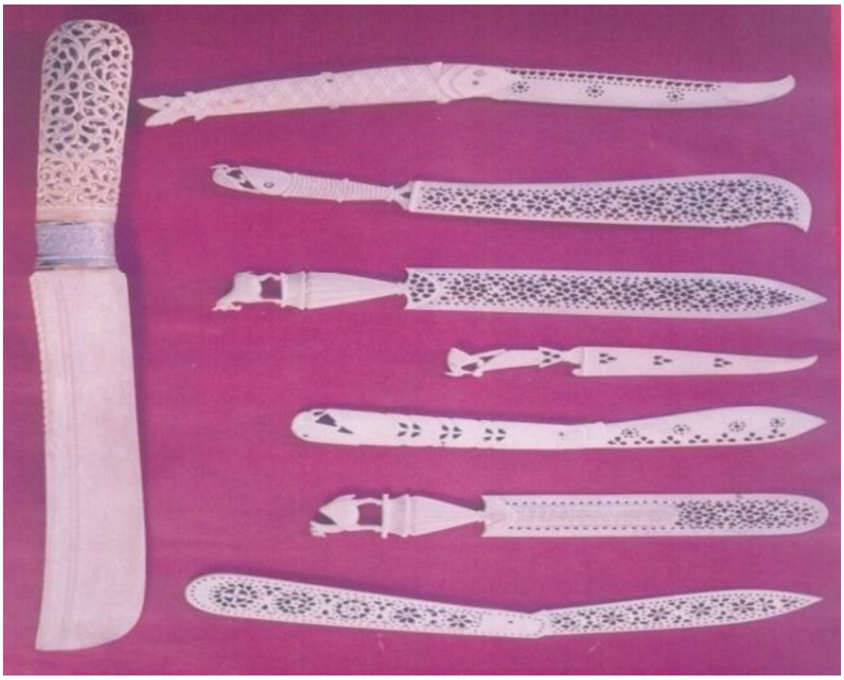

চিত্র-৬৮: হাতির দাঁতে তৈরি নকশাকৃত বিভিন্ন ধরনের ছোরা

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে (চিত্র ৬৬) হাতির দাঁতের তৈরি বহু নমুনা সুরক্ষিত রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হাঁতির দাঁতের তৈরি পাটি। ঢাকার নবাবদের জন্য হাতির দাঁত দিয়ে সুন্দর ও সুক্ষ্ম তন্তুতে বোনা তৈরি পাটি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের চমৎকার একটি নিদর্শন। হাতির দাঁত দিয়ে তৈরি উপাদান অত্যন্ত দামি। সুতরাং এ ধরনের পাটি গ্রামীণ সমাজের কারো পক্ষে ব্যবহার করা সম্ভব ছিলো না। বিশেষ করে অভিজাত নবাব পরিবারের বিবাহপর্বে বর ও কনেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই পাটির ওপর বসানো হতো।[১১৬]

wPÎ-67 nwZi ‘v‡Zi ˆZwi cwU (evsjv‡‘k RvZxq Rv‘Ni)

cwU

হাতীর দাঁত, দৈর্ঘ্যঃ ৯৪″, প্রস্থঃ ৭৪৯″, সিলেটে তৈরি, প্রাপ্তিস্থানঃ ঢাকা নবাব এস্টেট, উনবিংশ শতাব্দী, সংগ্রহ নং জ-৭০.৫৪৯

fv¯‹h

এটা ঠিক যে শিল্পকলা চর্চায় ভাস্কর্যের ইতিহাস অতিপ্রাচীন। বিশেষ করে সমাজ সভ্যতা, ধর্মীয় অনুভূতির স্বাক্ষর রাখতে গিয়ে এই ভাস্কর্যের মাধ্যমেই হতো। প্রাচীন ও প্রাগৈতিহাসিক কালের মিসরীয় সভ্যতা, ব্যবলিনীয় ও গ্রিক সভ্যতা, রোমীয় ও মেসোপটেমিয় সভ্যতা এবং সিন্ধু-সভ্যতাসহ ভারতের অজন্তা-ইলোরা এবং সেন শাসনামল থেকে মঠ-মন্দিরে প্রস্তর ও পোড়া মাটির নকশাচিত্র ভাস্কর্য স্থাপত্যের বিশেষ প্রসার ঘটে। পাক-ভারতে হিন্দু মুসলিম আমলের পর রাজনৈতিক পট পরিবর্তের কারণে এদেশে শিল্পকলায় ভাস্কর্য স্থাপত্যের একটানা বিরতি লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট বাংলাদেশে ধর্মীয় জীবনবোধের কারণেই। উনবিংশ শতাব্দী শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত বাঙালি মুসলমানদের আধুনিক চেতনার বিকাশ সাধিত হয়নি। সমসাময়িক হিন্দু সমাজ পাশ্চাত্য শিক্ষাকে গ্রহণ করলেও অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে মুসলমানদের তুলনায় অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিলো। হিন্দু ও মুসলমানরা ইংরেজি শিক্ষাকে শিক্ষার বাহন মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করলেও শিক্ষাকে উভয় সম্প্রদায় সাদরে গ্রহণ করতে পারেনি। বিশেষ করে ছবি আঁকা ও মূর্তিগড়া সম্পর্কে মুসলমান সমাজে ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে মুসলমান ছাত্রদের জন্য শিল্প শিক্ষা খুব কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা গেছে যে অন্ধ সংস্কারের অচলায়তন ভেঙ্গে উনিশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশক থেকে কিছু কিছু বাঙালি মুসলমান শিল্পকলার নিষিদ্ধ ভুবনে প্রবেশ করেছিলো। এ

শতকের দ্বিতীয় শতক থেকে মুসলমান সম্পাদিত বেশি কিছু প্রগতিশীল পত্রিকায় মুসলমানদের শিল্পকলা অধ্যয়ণের স্বপক্ষে অনেক যুক্তি- নির্ভর প্রবন্ধ ছাপানো শুরু হয়। ১৯৮১ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত মুসলমান সম্পাদিত পত্রিকা ‘সওগাত’ এ চিত্রকলা অংকণের পক্ষে যুক্তি দেখানো হয়। এই পত্রিকায় লেখা হয় যে ‘হজরত (স) এর সময় প্রাণী প্রতিকৃতি নিষিদ্ধ ছিলো মূলত প্রাণী পূজা নিষিদ্ধ করার জন্য। কারণ অধিকাংশ মানুষ ছিলো পৌত্তলিক মনোভাবাপন্ন।

বর্তমান মানুষ শিক্ষিত, সভ্য ও মার্জিত। সমাজের সেই অন্ধকার অবস্থাও এখন দূরীভূত। কাজেই সংস্কৃতি ও শিক্ষার বাহন হিসেবে চিত্রশিল্পকে ব্যবহার করে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। যা হোক, বাঙালি মুসলমান শিল্পী হিসেবে আবুল কাশেমের নাম পাওয়া যায়। বাঙালি মুসলমান সমাজ থেকে যে পেশাদার শিল্পী প্রথম কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন তাঁর নাম আব্দুল মঈন। আবুল মঈন প্রথমে মাদ্রাসা ছাত্র ছিলেন। যখন মাদ্রাসা ছাত্ররা ছবি আঁকা হারাম শ্লোগান দিচ্ছিল, সেই যুগে আব্দুল মঈন কলকাতা আর্ট স্কুলের প্রথম মুসলমান শিক্ষক হিসেবে যোগ দান করেন। ১৯৩৮ সালে জয়নুল আবেদিন মুসলমান শিল্পী কলকাতা আর্ট স্কুলে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। তাঁর নাম জয়নুল আবেদিন, যিনি পরবর্তীতে বাংলাদেশে শিল্পকলা চর্চার নেতৃত্ব দেন। বাংলার আধুনিক সংস্কৃতি বলতে সাধারণত ইংরেজ আমলের ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি সমাজের জীবনযাত্রা ও মানসিক সৃষ্টিসমূহকে বোঝানো হয়। শহুরে শিক্ষিতদের বাইরেও আর একটি সংস্কৃতির ধারা এখানে বিদ্যমান ছিলো তা হলো লোকসংস্কৃতি। এক সময় বাংলার উচ্চশিল্প ও লোকশিল্পের সম্পর্ক ভীষণ ঘনিষ্ঠ ছিলো। গ্রামীণ ও কৃষিপ্রধান সভ্যতায় মধ্যযুগে এই তফাৎ ছিলো না। এই তফাৎ লক্ষ করা যায় ঔপনিবেশিক ইংরেজ আমলে। পাকিস্তান আমলে ১৯৬৬ সালে ঢাকা চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ে নিয়মিত কারিকুলাম হিসাবে ভাস্কর্য পর্ব পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত হয়। এরপর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগে এই বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হয়। বাংলাদেশে ভাস্কর্যশিল্পের ইতিহাসে যাঁরা খ্যাতি অর্জনে সক্ষম হয়েছেন তাঁরা হলেন- নভেরা আহমদ, আব্দুর রাজ্জাক, আনোয়ার জাহান, সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ, শামীম সিকদার, হামিদুজ্জামান, আনোয়ারুল হক প্রমূখ মুসলিম ভাস্কর্য শিল্পীবৃন্দ। যদিও ভাস্কর্য ও স্থাপত্যশিল্পে বাংলাদেশ এখনও পিছিয়ে আছে।[১১৭]

বর্তমানে ইসলাম ধর্মের অনুসারীরা অঞ্চল ভেদে সে দেশের সংস্কৃতি প্রচলিত প্রথা রীতি নীতির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে ধর্ম পালন করেছে। সে জন্যে বিশ্বের সব দেশে ইসলাম পালন এক ভাবে হয়নি। সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যের সাথে ভারতীয় সংস্কৃতির যথেষ্ট পার্থক্য আছে। ইসলামের অনেক বিধিনিষেধকে সহজ করে দেখেছে। এ উদারতার পিছনে হয়ত দেখা যাবে বাঙালি সংস্কৃতি ও বাঙালি মূল্যবোধ। ইসলামে

ত্রিমার্তিক মূর্তি গড়া নিষেধ থাকলেও অগ্রগামী সংস্কৃতির সাথে তাল মিলিয়ে সে নিষেধ উপেক্ষা করা হয়েছে। বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা সকলের সামনে তুলে ধরতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুলার রোডে উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত 'স্বাধীনতার সংগ্রাম ভাস্কর্য ' সংগ্রহশালাটি সম্পূর্ণ ভাস্কর্যশিল্প নিয়ে গড়ে উঠেছে। ১৯৭১ সালে ১৪ ডিসেম্বর যে সব বুদ্ধিজীবিদের ধরে নিয়ে হত্যা করা হয়েছিলো সে সব শহীদদের ভাস্কর্যের মধ্যে স্মৃতি স্মরণীয় রাখার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। এ ছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের সামনে অপরাজেয় বাংলা, টিএসসির সামনে এবং নিউমার্কেট সংলগ্ন চীন মৈত্রী মেয়েদের হলের সামনে মুক্তিযোদ্ধাদের বৃহৎ আকারে ভাস্কর্য নির্মাণ করা হয়েছে। এ ছাড়াও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের ভাস্কর্য তৈরি করা হয়েছে। সুতরাং বাংলাদেশে শিল্পকলা চর্চার ক্ষেত্রে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি কট্টরভাবে দেখা হয়নি তারই প্রমাণ ভাস্কর্যচর্চার দৃষ্টান্তসমূহ।

চিত্র-৬৮: স্বাধীনতার সংগ্রাম ভাস্কর্য সংগ্রহশালা, ১৯৯৬

Dcmsnvi

এই অধ্যায়ে এটাই প্রতীয়মান হয়েছে লোকসংগ্রহশালার প্রতিটি উপাদান পৃথক বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত। নির্দিষ্টভাবে উপরোক্ত নিদর্শনগুলো ইসলামী উপাদান বলা হলেও প্রতিটি ধর্মের মানুষের কাছে এর আবেদন রয়েছে। ইসলামী বা মুসলিম শিল্পকলা বলতে এখানে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক থেকে সতের শতক পর্যন্ত ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত অঞ্চলের জনসমষ্টির মধ্যে গড়ে ওঠা শিল্পকলা। খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দী থেকে ষোলো শতকের মধ্যে এর চূড়ান্ত বিকাশ ঘটে এবং সতের শতকের পর থেকে এই

শিল্পে অবনতি ঘটে। বাংলায় ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার পর বহিরাগত মুসলিম শাসক, সূফি দরবেশ এবং হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত মুসলমানদের সম্মিলিত প্রয়াসে বাংলায় ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা ইসলামী শিল্পকলার বহিঃপ্রকাশ ঘটে মসজিদ স্থাপত্যের মাধ্যমে। কিন্তু স্থানীয় লোকসংস্কৃতির মধ্যে বেড়ে ওঠা জাতি হিন্দু ও মুসলমানরা একই ভূখণ্ডে বসবাস করার ফলে অনেক আচার-আচারণ দুই ধর্মের মানুষের মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটেছে। প্রতিটি শিল্প সৃষ্টির পেছনে থাকে শিল্পীর শ্রম ও দক্ষতা। ইসলাম প্রতিষ্ঠার পর বাংলায় আরবি ও ফার্সির প্রচলন ঘটে। বাঙালি মুসলমানগণ পবিত্র কোরআন চর্চা নিজেদের নিয়োজিত রাখে। বাংলাদেশের কারুশিল্পীদের তৈরি উপাদানের মধ্যে আরবি লিখনির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। বাঙালি মুসলমানগণ পোশাক পরিচ্ছেদে একটি পরিবর্তন আনে। এছাড়াও বস্ত্রশিল্প, হাতির দাঁতের তৈরি উপাদান, মিনিয়েচার, অস্ত্রশস্ত্র ইসলামী বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়।

Z_¨mÎ

১. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, evsjv‡`‡ki ivRbxwZ (ঢাকাঃ দিব্য প্রকাশ ২০০৩) পৃ. ১৯
২. কামাল আহমদ, wkíKjvi BwZnvm, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী,১৯৯৪) পৃ. 104
৩. Enamul Haque, ***Islamic Art Heritage of Bangladesh (*** Dhaka: Bangladesh national Museum,1983) p.12
৪. অলোক মুখোপাধ্যায়, wekwk‡íi i¨c‡iLv (কলকাতাঃ এ মুখার্জী এ্যাণ্ড কোং প্রা. লি. ১৩৯৫) পৃ. ৮১-৮২
৫. Enamul Haqued 74
৬. এবনে গোলাম সামাদ, Bmjvgx wkíKjv, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯) পৃ. ৯০
৭. ঐ পৃ.৭৪
৮ . Encyclopaedia, Britanica(1966) p.676-679
৯. মোহাম্মদ মোখলেসুর রহমান, mjZvbx Avg‡j ¯vc‡Z¨i wkKvk, প্রাগুক্ত, পৃ. ২
১০. অনুবাদ মওলানা শামসুল হক ও আজিজুল হক, †evLvix kwid (ঢাকাঃ হামিদিয়া লাইব্রেরি) পৃ. ২৯৯
১১. ঐ পৃ. ২
১২. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, gmwjg wPÎKjv (ঢাকাঃ ছাত্রবন্ধু পাবলিকেশন্স ১৯৯৪) পৃ. ৪
১৩. ঐ পৃ. ১৫
১৪. ঐ পৃ. ১৬
১৫. আবুল বাশার মোশাররফ হোসেন, Avie ¯vcZ¨ (ঢাকাঃ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৯৩) পৃ. ৭৬
১৬. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, fviZe‡l©i BwZnvm, gmwjg I weªwUk kvmb (ঢাকাঃ গ্লোব লাইব্রেরী প্রাঃ লিমিটেড, ১৯৭৬) প, ৩২৭
১৭. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান gmwjg wPÎKjv c.93
১৮. ঐ, c. 106
১৯. Muhammad Hafizullah Khan,***Terracotta ornamention in Muslim Architecture of Bengal*** (Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh,1988) p. 8
২০. Enamul Haque, ***Bengal Sculptures Hindu Iconography Upto C. 1250 AD (***Dhaka, Bangladesh National Museum, 1992) P. 27
২১. Enamul Haque ***Islamic Art Heritage of Bangladesh*** , p 13
২২. Saifuddin Chowdhury, ***Early Terracotta Figurines of Bangladesh***, (Dhaka: Bangla Academy 2000) p.81
২৩. মোঃ মোকাম্মেল হোসেন ভূঁইয়া, cvPxb evsjvi †cvovgvwUi wkí (ঢাকাঃ দিব্য প্রকাশক, ২০০৩) পৃ. ৭
২৪. গোলাম সামাদ, Bmjvgx wkíKjv, পৃ. ৯৭
২৫. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, fviZe‡l©i BwZnvm, gmwjg I weªwUk kvmb প্রাগুক্ত পৃ.৩৩১
২৬. মো. মোস্তাফিজুর রহমান, bKkvKjv (রাজশাহীঃ ২০০৮) পৃ. ৩৮
২৭. প্রমীলা, †জসমিন, evsjv‡`‡ki c"Q`wP‡Î †jvKKjvi cfve (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি ১৯৯৯)পৃ.৪০
২৮. এ.কে. এম ইয়াকুব আলী, gmwjg g‘`ªv I n¯ÍwjLb wkí (ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৮৯) পৃ. ৩৪৯-৫০
২৯. গোলাম সামাদ, Bmjvgx wkíKjv, পৃ.১২
৩০. আবুল বাশার মোশাররফ হোসেন, Avie ¯vcZ¨, পৃ. ৮
৩১. কামাল আহমদ wkíKjvi BwZnvm, পৃ. ৯৭
৩২. ঐ, পৃ. ৯৮
৩৩. ঐ পৃ.৯৭
৩৪. পবিত্র কুরআন miv Avj dvZn: 13, I miv Avj dvZn: 17
৩৫. পবিত্র কুরআন (সুরা ৯৬, আয়াত ১-৪)
৩৬. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, gmwjg wjwcKjv (ঢাকাঃ ছাত্রবন্ধু পাবলিকেশন্স, ১৯৯৫) পৃ. ১
৩৭. গোলাম সামাদ Bmjvgx wkíKjv,, পৃ. ৬০
৩৮. সৈয়দ, মাহমুদুল হাসান gmwjg wjwcKjv, পৃ. ১
৩৯. ঐ পৃ. ৩৬
উর্দু লেখা হয় নাস্তালিক লিপিতে। কিন্তু পাকিস্তানে সিন্ধী ও অন্যান্য কয়েকটি আঞ্চলিক ভাষা লিখিত হয় নাখস লিপিতে।
৪০. মোশারফ হোসেন, পৃ. ৯৪
৪১. wgkKvZ Avj-gvmvexn dvhv‡qj Avj-KiAvb, পৃ. ২০১
৪২. ফিওদর করোভকিন, cw_exi BwZnvm: cvPxb hM

Dhaka University Institutional Repository

৪৩. Enamul Haque, **Islamic Art** ***in Bangladesh Catalogue of a special Exhibition in Dacca Museum ,*** April-3-28 1978 p. 17
৪৪. মুর্তজা বশীর, g'v I wkjwjwci Av‡jv‡K evsjvi nvekx mjZvb I ZrKvjxb mgvR (ঢাকাঃঅ্যাডর্ন পাবলিকেশন ২০০৮) পৃ.১৩১
৪৫. এ কে এম ইয়াকুব আলী, e‡i›' AÂ‡j gmwjg-BwZnvm HwZn¨ (ঢাকাঃ সময় প্রকাশন, ২০০২) পৃ. ৫০
৪৬ . আল হাদিস
৪৭. আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, evsjv‡'‡ki cZmm¤ú' (ঢাকাঃ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৮৪) পৃ. ৩৪৯
৪৮. আবুল বাশার মোশাররফ হোসেন, Avie¯vcZ¨ , পৃ. ৮
৪৯. এ কে এম ইয়াকুল আলী, e‡i›' AÂ‡j gmwjg-BwZnvm HwZn¨, পৃ. ৭০
৫০. মুর্তজা বশীর, g'v I wkjwjwci Av‡jv‡K evsjvi nvekx mjZvb I ZrKvjxb mgvR c.132
৫১. Stanley Lane Poole (ed.), ***Conis And Medals in History and Art*** (Chacago:Argonaut,INC Publishers 1968)p.1
৫২. মোঃ মোশারফ হোসেন, cZZË D™e I weKvk cwi‡cw¶Z evsjv‡'k (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি, ১৯৯৮) পৃ. ১০০
৫৩. Enamul Haque, **Islamic Art** ***in Bangladesh Catalogue of a special Exhibition in Dacca Museum ,*** April-3-28 1978 p. 33
৫৪. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, gmwjg wPÎKjv, পৃ. ৭৭
৫৫. কামাল আহমদ, পৃ. ১০৮
৫৬. ফয়েজুল আজিম, PvighKjvi fwgKv, পৃ. ৭
৫৭. এ. কে. এস শামসুল আলম, jvjevM 'M I hv'Ni (ঢাকাঃ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার) পৃ. ১১
৫৮. Haque Enamul **Islamic Art** ***in Bangladesh Catalogue of a special Exhibition in Dacca Museum,*** April 3-28, 1978
৫৯. গোলাম সামাদ, পৃ. ৫৮
৬০. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান gmwjg wPÎKjv, ১০২
৬১. ঐ পৃ. ২৮
৬২. অশোক মিত্র fvi‡Zi wPÎKjv c_g LÐ (কলকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৫) পৃ. ২৮
৬৩. ঐ, পৃ. ২৮
৬৪. সম্পা মাহমুদুল হাসান, evsjv‡'‡ki †jvKwkí, পৃ. ৪৫
৬৫. বিমলেন্দু চক্রবর্তী, c. ২৪
৬৬. তোফায়েল আহমদ †jvK HwZ‡n¨i 'k w'Mšl, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি, ১৯৯৯) পৃ. ৯৭
৬৭. বিমলেন্দু চক্রবর্তী, †jvKqZ evsjvi wPÎwkíx I wPÎKjv (কলকাতাঃ স্ট্যান্ডার্ড পাবলিকেশন, ১৪০৩) পৃ. ২৪
৬৮. ফয়েজুল আজিম, PvighKjvi fwgKv, পৃ. ৬৯
৬৯. এম এ রহিম, evsjvi mvgwRK I mvs¯wZK BwZnvm c_g LÐ, পৃ. ১৯৯
৭০. ফয়েজুল আজিম, পৃ. ৭১
৭১. সরেজমিন পর্যবেক্ষণ (২০০৮) ।
নকশামণ্ডিত করে আল্লাহ, রাসুল, পবিত্র কোরআনের লিখিত আয়াত বিভিন্ন ধরনের ছবির ফ্রেমের মধ্যে আবদ্ধ করা হয় ঘরের দেয়ালে টাঙিয়ে রাখার জন্যে। বেশির ভাগ মুসলমানের বিশ্বাস কোরআনের আয়াত, আল্লাহর নাম ঘরে লেখা থাকলে সে ঘরে শয়তান প্রবেশ পারবে না। বর্তমানে বাজারে আল্লাহ, রাসুল ও কোরআনের আয়াত নানা ধরনের ফ্রেমে, কাগজে, কাঁসা পিতলে, কাঠের মধ্যে তৈরি করা অবস্থায় কিনতে পাওয়া যায়। এ ধরনের নিদর্শন অভিজাত মুসলিম পরিবার গুলোর বাসগৃহের বিভিন্ন স্থানে টাঙিয়ে প্রদর্শন করা হয়।
৭২. লোকশিল্প এ্যালবাম, †Zvdv‡qj Avng‡'i evsjvNi, পৃ. ৬০
৭৩. এম এ রহিম, evsjvi mvgwRK I mvs¯wZK BwZnvm, c_g LÐ, c.৩৯
৭৪. সামাদ, BmjvgxwkíKjv, পৃ. ৫১
৭৫. Firoz, Mahmud, ***Metal Work of Bangladesh; A Study in Material Folk Culture***, (Dhaka: Bangla Academy, 2003) p.19
৭৬. সরেজমিন পর্যবেক্ষণ (২০০৮)
৭৭. আব্দুল করিম, XvKvB gmwjb (ঢাকাঃ নগর জাদুঘর, ১৯৯০) পৃ. ১৫
৭৮. ঐ পৃ. ৪৬
৭৯. ঐ, পৃ. ৯৫
৮০. দূর্গাদাস লাহিড়ি, ভারত বর্ষের ইতিহাস, (হাওড়া, ১৩২১) পৃ. ১৫২
৮১. তোফায়েল আহমদ XvKvi ewYR¨K KvighKjv wcZj : Pvgov : KvZvb, (ঢাকাঃ এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯১)পৃ. ৬
৮২. সৈয়দ আলম মাহবুব, †jvKwkí (নারায়ণগঞ্জঃ সোনারগাঁও জাদুঘর ১৯৯৯)পৃ. ২৯

৮৩. Dr. Anjali Chatterjee, ***Bengal in the Reign of Aurangzeb*** (Calcutta: 1967) p. 21
৮৪. ঐ, পৃ. ১১৮
৮৫. ঐ পৃ. ১১৯
৮৬. তোফায়েল, আহমদ পৃ. ১১৮
৮৭. গোলাম মুরশিদ, nvRvi eQ‡ii evOwj ms¯‹…wZ (ঢাকাঃ প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা ২০০৬)পৃ. ৪৬২-৪৬৫
৮৮. পবিত্র আল কোরআন সূরা আরাফের ২৬ নং আয়াত
৮৯. Enamu Haque, ***Islamic* Art *in Bangladesh Catalogue of a special Exhibition in Dacca Museum,*** April 1978 p. 3-28,
৯০. Zuleka Haque ***Gahana Jewellery of Bangladesh (***Dhaka: Bangladesh small & Cottage Industries Corporation Pubished by Bscic 1984) p. 2
৯১. ঐ P. 7
৯২. নীহার রঞ্জন রায়, evOvjxi BwZnvm, Aw‘ce , c. 464
৯৩. লোকশিল্প এ্যালবাম, †Zvdv‡qj Avng‡‘i evsjv Ni, , পৃ. ১৬৭
৯৪. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান Bmjv‡gi BwZnvm (ঢাকাঃ গ্লোব লাইব্রেরি, ১৯৯২) পৃ. ৪৮৯
৯৫. ইফতিখার , উল-আউয়াল (সম্পাঃ) HwZnwmK XvKv gnvbMix: wbeZb I mw¤¢vebv (XvKv: জাতীয় জাদুঘর ২০০৩) পৃ. ৩১৩
৯৬. বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে জাতিতত্ত্ব ও অলংকরণ শিল্পকলা বিভাগ আয়োজিত বিশেষ অলংকার প্রদর্শনী ২০১২, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৯৭. ইবনে সামাদ, Bmjvgx wkíKjv, পৃ. ৫২
৯৮ . প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮
৯৯ . আবুল বাশার, Avie ¯’vcZ¨, পৃ. ৮
১০০. খগেশ কিরণ তালুকদার, evsjv‡‘‡ki †jvKvqZ wkíKjv (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি, ১৯৮৭) পৃ. ৬৪
১০১. তোফায়েল আহমদ, †jvK HwZ‡n¨i ‘kw‘MšÍ, c. 134
১০২. ঐ
১০৩. Enamul Haque, **Islamic Art** ***in Bangladesh Catalogue of a special Exhibition in Dacca Museum ,*** April-3-28 1978 p. 42
১০৪. বিশেষ প্রদর্শনী নিদর্শন সংগ্রহ ও কর্মকাণ্ড ২০০৩, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় শাহবাগ, ঢাকা, পৃ. ৪
১০৫. ইবনে সামাদ, Bmjvgx wkíKjv, পৃ. ৫০
১০৬. ঐ পৃ. ৪৬
১০৭. ঐ পৃ. ৪৭
১০৮. Enamul Haque, ***Islamic Art Heritage of Bangladesh, p. 187***
১০৯. ঐ ***p. 188***
১১০. সৈয়দ, মাহমুদুল হাসান, Bmjv‡gi BwZnvm,, পৃ. ১৪২
১১১. ফিওদর করোভকিন, cÖvPxb hM পৃ. ২২৬
১১২. আবদুল হাফিজ (সম্পা), †jvKKবাংলা evsjv, বাংলাদেশ ফোকলোর পরিষদ প্রথম বর্ষ, প্রথম-দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৯৭৮, পৃ. ৩২
১১৩. Enamul Haque, ***Islamic Art Heritage of Bangladesh, p. 206***
১১৪. ঐ, p. 13
১১৫. খগেশ কিরণ তালুকদার, evsjv‡‘‡ki †jvKvqZ wkíKjv , পৃ. ৭২
১১৬. জাতীয় জাদুঘর সরেজমিন
১১৭. ফয়েজুল আজিম, Pvi“Kjvi fwgKv, পৃ.৩৭

PZ_© Aa¨vq

evsjv‡`‡ki †jvKmsMÖnkvjv: Bmjvgx bKkvKjvi cÖfve

সুন্দরের প্রতি মানুষের সহজাত আকর্ষণ এবং সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রবল আকাঙ্ক্ষাই হলো শিল্পচর্চার অনুপ্রেরণা। বেঁচে থাকার প্রয়োজনে সৌন্দর্য চর্চাকে কেউ এড়িয়ে যেতে পারেনি। সুতরাং নকশাকলার জন্ম হয়েছে মানুষের মধ্যে যখন সৌন্দর্য চেতনার ব্যপ্তি ঘটেছে। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, আনন্দ থেকে বিশ্বজগতের উৎপত্তি। মনের প্রফুল্লতা, প্রেম এবং সৌন্দর্য-চেতনা হচ্ছে আনন্দের লক্ষণ। উপনিষদে বলা হয়েছে 'আনন্দদ্ধ্যেব খল্বিমানি বুতানি জায়ন্তে; আনন্দেন যাতানি জীবন্তি' অর্থাৎ আনন্দ হতেই এ বিশ্বের উদ্ভব হয়েছে।[১] ইসলামী নকশাকলার সৃষ্টি হয়েছে বিমূর্ত প্রতীকে আলংকারিক (Decoration) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। এদিক থেকে ইসলামী শিল্পকলা বিশেষভাবেই ধর্মনিরপেক্ষ শিল্পকলা (Secular art)। শিল্পকলা কথাটি আসলে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এর শ্রেণি বিভাজনও রয়েছে। আজকাল অনেকেই চারু ও কারু হিসেবে কোনো পার্থক্য করতে চান না।[২] কিন্তু মানুষ যখন কোনো কিছু সুন্দর করে গড়তে যায় তখন তার লক্ষ থাকে শিল্পবোধকেই (Aesthetic sense) পরিতৃপ্ত করা অন্য কিছু নয়। শরীরে স্থূল ও সূক্ষ্ম যে কটা ইন্দ্রিয় আছে সেগুলিকে আশ্রয় করে স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্র, সঙ্গীত, কাব্য, নৃত্য, অভিনয়, কারুকাজ যাবতীয় চৌষট্টি কলার সৃষ্টি হয়েছে।[৩] ওকাকুরা বলেছেন- স্বভাব, পরম্পরা ও স্বকীয়তা এ নিয়ে হয় পরিপূর্ণ আর্ট।[৪]

ইসলামী নকশাকলার কেন্দ্রবিন্দু হলো স্থাপত্য (Architecture)।[৫] প্রধানত স্থাপত্যকে নির্ভর করেই গড়ে উঠেছে ইসলামী নকশাকলা। এ শিল্পের জন্ম হয় রাজা বাদশাদের পৃষ্ঠপোষকতায়।[৬] অনেক সচেতনভাবে রাজশিল্পীরা এ শিল্প সৃষ্টি করেন রাজ রুচির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্দেশে। লোকশিল্পীর শিল্পকর্ম খুব একটা সচেতন প্রচেষ্টার ফল নয়। এর পিছনে কাজ করে বহুদিনের পরম্পরা (Tradition)। কিন্তু ইতিহাসে দেখা যায় লোকশিল্প ও রাজশিল্পের ব্যবধান সব সময় বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়নি। রাজার রুচির প্রভাব এসে পড়েছে প্রজার ওপর আবার প্রজার রুচি রাজাকে আকৃষ্ট করেছে।[৭]

বার শতকের সূচনালগ্নে বাংলায় ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পর পারস্য থেকে অনেক কারিগর এদেশে এসেছিলেন কাজের সন্ধানে। এই শ্রেণিটি মুসলিম শাসক কর্তৃক বাংলার স্থাপত্যশিল্পের নির্মাণ

কাজে নিয়োগ প্রাপ্ত হলে পারসিক নকশাকলা ধারা এদেশিয় শিল্পের মধ্যে বহিঃপ্রকাশ ঘটে। ইসলাম এদেশে আসার পূর্বে বৌদ্ধ বিহার ও মন্দিরের মধ্যে টেরাকোটা, প্রতিমা ঢালাই রীতিতে যে নকশা এদেশে প্রচলিত ছিলো তা হলো ভারতীয় ও বাংলার স্থানীয় বা লোক নকশা।[৮] বাংলায় যেহেতু পাথর পাওয়া যেত না এ কারণে স্থাপত্যের নির্মাণ উপাদান ছিলো ইট। বাংলার ইসলামী ও লোকনকশার অন্যতম নিদর্শন হলো টেরাকোটা নকশা। লক্ষণীয় হলো, বাংলায় মধ্যযুগে যেসব অঞ্চলে টেরাকোটা অলংকরণসমৃদ্ধ মসজিদ নির্মিত হয়েছে, দেখা গেছে সে সব অঞ্চলের গ্রামীণ সমাজের লোক ও কারুশিল্পের কাজ যথেষ্ট উন্নত। এর প্রমাণ পাওয়া যায় রাজশাহী, যশোর ও ঢাকা অঞ্চলের লোকশিল্পীদের নকশিকাঁথা, মৃৎশিল্প, ধাতব ও কাঠখোদাই কাজের নমুনায়। তবে টেরাকোটা নকশাসৃষ্টির পেছনে বাংলার কুম্ভকারদেরই অবদান বেশি ছিলো। স্থানীয় মন্দিরের গায়ে কারুকার্যমণ্ডিত অলংকরণ ও মসজিদের গায়ে ফুল লতা-পাতা ও জ্যামিতিক অলংকরণ আদর্শ নকশা রূপে স্বতঃস্ফূর্তভাবে লোকশিল্পীরা বিভিন্ন মাধ্যমে সেই নকশা চিত্রায়িত করার চেষ্টা করেছে। এই নকশা চিত্রই জীবন যাপনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দেখা যায়।

৫ (ক) ইসলামী ও লোক নকশাকলার বৈশিষ্ট্য

শিল্পী নন্দলাল বসুর মতে ‘শিল্প হলো কল্পনা’। রেখায়-রঙে-রূপে রসানুভূতির প্রকাশ। রসের উদ্রেক করাতেই তার সার্থকতা। প্রকাশের জন্যে করণ-কৌশলের প্রয়োজন আছে; সে হলো উপায়, উদ্দেশ্য নয়; করণ-কৌশলের জ্ঞান শিল্পের প্রেরণাও নয়।[৯] সনাতন ধর্ম মতে যিনি বিশ্ব সৃষ্টিকর্তা তিনি সবচেয়ে বড় নিপুণ কারিগর-বিশ্বকর্মা। আরবিতে যিনি নকশাকারী তাকে বলা হয় ‘নাক্‌কাশ’ অথবা ‘কারুশিল্পী’। ইংরেজি শব্দ Decoration, Ornamentation-এর বাংলা আভিধানিক অর্থ নকশা, মণ্ডন, অলংকার ইত্যাদি। নকশা শব্দটি বাংলায় ‘নক্‌শ’ শব্দ থেকে এসেছে। তেমনি বাংলায় নকশা বলতে মানচিত্র বোঝায়।[১০] আরবিতে নকশা হলো সাধারণভাবে কোনো স্থান বিশেষ বা জিনিস শোভা বর্ধনের জন্যে কৃত কারুকার্য (Abstract design) ও সাধারণ পরিকল্পনা (Plan Design) শব্দটি ল্যাটিন শব্দ Signum শব্দ থেকে উৎপত্তি যা অর্থ Mark। শিল্প চর্চার ভাষাই হচ্ছে Design। এ শব্দটি এসেছে ‘ডিসাইন’ থেকে যার অর্থ ‘প্রভুর স্বাক্ষর’। ‘ডি’ অর্থে সৃষ্টিকর্তাকে, জাইন থেকে সাইন, অর্থ স্বাক্ষর অর্থে সৃষ্টিকর্তার স্বাক্ষর। ডিজাইনকে এমনভাবে উপস্থাপন করা যায়।[১১] যেমন কোনো নির্দেশিত অভিযোজন যার মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব বিরাজমান।[১২] প্রতিটি নকশার আলাদা রূপকে বলা হয় মুদ্রা বা মটিফ (Motif) । এই মটিফ যখন একত্রে সাজিয়ে নকশায় রূপ দেয়া হয় তখন সেটা হয়ে যায় প্যাটার্ন (pattern), ছাঁচ, ডিজাইন (Design) পরিকল্পনা ইত্যাদি।

bKkvKjv wZb fv‡M wef³ প্রতীকমূলক (Symbolic), নিছক অলংকরণমূলক (Pure) ও কোনো কিছুর গড়নমূলক (Organic decoration).

ইসলামী শিল্পকলার মূল উপাদান চারটি:

১. উদ্ভিদীয় পরিকল্পনা

২. জ্যামিতিক আকার আকৃতি ও রেখা

৩. বিশুদ্ধ অবিমিশ্র রঙ

৪. আরবি বর্ণমালা[১৩]

যা হোক, ইসলামী নকশার পিছনে আছে বহু প্রাচীন সভ্যতার নকশাকলার প্রভাব।

ইসলামী নকশার বৈশিষ্ট্যগুলো স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে আলোকচিত্রের সাহায্যে নিম্নে দেখানো যেতে পারে।

উদ্ভিদীয় পরিকল্পনায় নির্মিত পাম অথবা পামেট (চিত্র ১) খেজুর পাতার নকশা। আরবিয়দের কাছে এ নকশা প্রাণ-বৃক্ষ নকশা নামে পরিচিত ছিলো। পরবর্তীতে বিশ্বের নানা জাতির মধ্যে পাম নকশার মুদ্রা ব্যবহার লক্ষ করা যায়। লিফ নকশা (চিত্র ২-৩) যে কোনো পাতা নকশা। স্টার মটিফ (চিত্র৪) তারকাকৃতি নকশা। রোজেট (চিত্র ৫) গোলাকার নকশা বাংলায় গোলাপ নকশা নামে পরিচিত। বিশেষ করে মেসোপটেমিয়রা (বর্তমান ইরান) রোজেট মুদ্রা বেশি ব্যবহার করেছে।[১৪] মধ্যযুগীয় মসজিদগুলোতে টেরাকোটায় নির্মিত রোজেট ও পদ্ম নকশা একরকম করে তৈরি। বেশির ভাগ সময় পদ্ম এবং রোজেট নকশার পার্থক্য নির্ণয় করা কঠিন হয়ে যায়। লজেঞ্জ মুদ্রা বাংলায় বরফি-নকশা (চিত্র ৬)। ওসমানী তুরস্কে বরফি নকশার ব্যবহার বেশি হয়েছে। রঁসো বিশেষ ধরনের লতা-নকশা (চিত্র ৭)। রোমান আমলের পরবর্তী যুগের বিভিন্ন সামগ্রীতে এ নকশার ব্যবহার লক্ষ করা গেছে। স্ক্রল নকশা পাক খাওয়া পাতা নকশা (চিত্র-৮-৯)। মেডেলিয়ন পদক নকশা (চিত্র ১০)। ইরানি গালিচার মধ্যে মেডেলিয়ন মটিফ বেশি ব্যবহার দেখা গেছে। বিড তসবি নকশা (চিত্র ১১) এবং তরসাদ (চিত্র ১২) মোটা দড়ির মতো নকশা। ওয়েভ (চিত্র ১৩) ঢেউ তোলা নকশা। তুর্কি গালিচায় এ নকশা দেখা যায়। কারতুস নকশা বিশেষভাবে কোনো কিছু লেখার জন্যে নির্দিষ্ট করে রাখা জায়গা (চিত্র ১৪)। আরবি বর্ণমালার বিশেষত্ব এই যে, অনেক সহজে ফুল, লতাপাতা ও জ্যামিতিক প্যার্টানের সংগে বর্ণের সামঞ্জস্য রেখে অলংকরণে ব্যবহার করা সম্ভব। অ্যারাবেস্ক হলো লতা-নকশা (চিত্র ১৫)। অ্যারাবেসক বাইজেন্টাইন, মিসর, গ্রিক রোমান, পারস্যের সাসানীয় শিল্পকলার প্রভাবে জন্ম নিয়েছিলো।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীনকাল থেকে আরবদের মধ্যে নানা রকম ফুল, লতা-পাতা মণ্ডিত করে আঙ্গুরলতার নকশা করার প্রচলন ছিলো। সাধারণভাবে লতাপাতা ও জ্যামিতিক আকার আকৃতির সাহায্যে করা এই জটিল বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত নকশা প্রাচীন মিসরীয়দের অ্যাকান্থাস মুদ্রা থেকে সৃষ্টি হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। অ্যাকান্থাস হারগোজা উদ্ভিদের নকশা (চিত্র ১৬)। নট নকশা হলো গিট নকশা। গোল-গিঁটের মতো যে কোনো নকশাকে গিট নকশা বোঝায়। সাধারণত এসব গিঁটের মধ্যে ফুল-লতার নকশার সম্মিলন করা হয়ে থাকে (চিত্র ১৭)। মিসর, স্পেন ও মুরদের মধ্যে এ নকশার ব্যবহার বেশি। ঝাপ্পা বা থুপি-নকশা হলো একটা মোটা দড়িমাথায় বড় গ্রন্থি থেকে ঝাকড়া চুলের মতো ঝুলে থাকা সরু দড়ির নকশা। দেখতে এটা খানিকটা ঝুমকো দুলের মতো লাগে (চিত্র ১৮)। প্রাচীন মেসোপটেমিয়বাসীরা একধরনের নকশা তৈরি করতো যা গিলোশ নামে পরিচিত (চিত্র ১৯)। গিলোশ দেখতে একাধিক জড়ানো ফিতাকে প্যাচানো মনে হয়। বাংলায় যাকে বলা হয় জড়ানো ফিতা নকশা । প্রাচীন এই নকশাকলাটি মেসোপটেমিয়াদের কাছ থেকে প্রথমে গ্রিকরা এবং পরে রোমানরা গ্রহণ করেছিলো। গালুন বলতে মতি নকশা বোঝায়। দেখতে কতকটা বিড-এর মতো লাগলেও এর দানাগুলো একসাথে গাঁথা থাকে না (চিত্র ২০)।

রেখা চিত্র-১: পাম

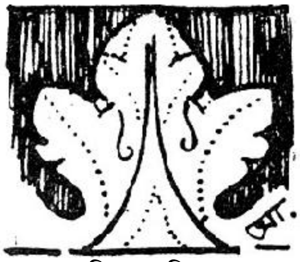

রেখা চিত্র-২: লিফ

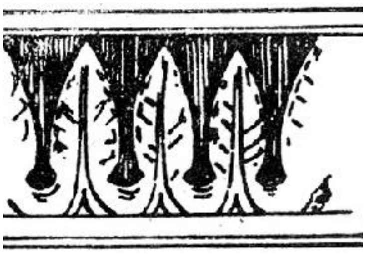

রেখা চিত্র-৩: ওয়াটার লিফ

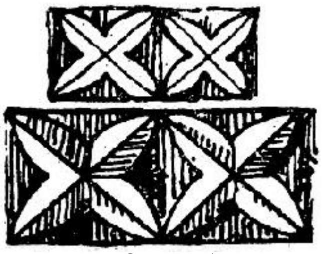

রেখা চিত্র-৪: স্টার

রেখা চিত্র-৫: রোজট

রেখা চিত্র-৬: লজেঞ্জ

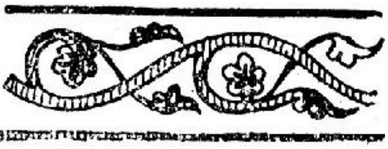
রেখা চিত্র-৭: রঁসো

†iLv wPÎ-8: রানিং স্ক্রল

রেখা চিত্র-৯: স্ক্রল

রেখা চিত্র-১০: মেডেলিয়ন

রেখা চিত্র-১১: বিড

রেখা চিত্র-১২: তরসাদ

চিত্র-১৩: ওয়েভ

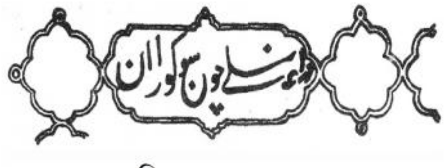
চিত্র-১৪: কারতুস

রেখা চিত্র-১৫: চিত্র-অ্যারাবেস্‌ক

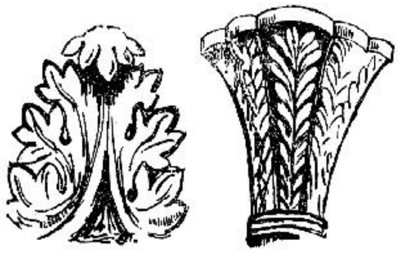
রেখা চিত্র-১৬: অ্যাকান্থাস

রেখা চিত্র-১৭: নট বা গিট-নকশা

রেখা চিত্র-১৮: টাসেল বা থুপি নকশা

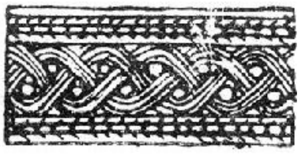
রেখা চিত্র-১৯: গিলোস

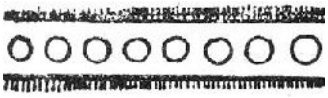
রেখা চিত্র-২০: গালুন বা মতি নকশা

৬৮৪ খ্রিস্টাব্দে উমাইয়া যুগে খলিফা আব্দুল মালিকের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় জেরুজালেমে নির্মিত হয় কাবার প্রতিভূ হিসেবে ধর্মীয় ইমারত কুব্বাত আস সাখরা। এ ইমারত ভবনের গাত্রের জ্যামিতিক নকশা, ফুল নকশা, আরব্য নকশা ও লিপি নকশাসমূহ বিশ্বের মুসলমানদের মনে বিশেষ সাড়া ফেলেছিলো (চিত্র ২১)। কুব্বাত আস সাখরার ভবনের অলংকরণ সম্পর্কে এ.বি. এম হোসেন তাঁর আরব স্থাপত্য গ্রন্থে বলেছেন, 'পুষ্পদানের ওপরে পাখির ডানার মতো নকশাটি আক্যান্থাস লতাপাতা ও ঝিনুকের সাথে কণাগুলো নকশার সাথে এমনভাবে বসানো হয়েছে দেখলে মনে হয় এদের গলায় মুক্তার মালা পরিয়ে দেয়া হয়েছে।'[১৫] তাঁর এমন বক্তব্যবের মধ্যদিয়ে এ ধারণায় প্রকাশ পেয়েছে যে, জামজমকভাবে কোনো রমণীকে পরিপূর্ণ অলংকরণ পরিয়ে বিয়ের সাজে তৈরি করা হয়েছে।

চিত্র-২১: কুব্বাত আস সাকরার খিলানের বর্হিভাগের অলংকরণ ও পুষ্পদান হতে উত্থিত কাল্পনিক অ্যাকান্থাস পাতা

অটোমান তুর্কিরা টিউলিপ ফুলের নকশা প্রচুর করেছে। তুর্কি মৃৎ পাত্রের গায়ে নকশার বিশেষ মুদ্রা হচ্ছে চন্দ্রমল্লিকা, গোলাপ, লিলি, কর্নেশন ও হায়সিনথ ফুলের নাম উল্লেখযোগ্য।[১৬]

বাংলাদেশের লোকশিল্প হলো লোকসমাজের জীবন ও জীবিকার বড় মাধ্যম। গ্রামীণ শিল্পীরা কোনো জ্যামিতিক মাপ ঝোপ না জেনেও মনের ভাষা ও সুরে তাল, লয়, ও ছন্দে সৃষ্টি করে নকশা।[১৭] বাংলার লোকনকশা মানেই পদ্ম, কলকা, বর্ফি, বুটি, তরঙ্গিত পুস্পিত লতা, পেঁচানো ফুল ও বৃত্ত ইত্যাদি।[১৮] এছাড়াও বাংলার লোকশিল্পের মধ্যে চাঁদ, তারা, মিনার, খিলান, ময়ূর, পাখি, নদী, মাছ, ধানের শীষ, গমের শীষ, কদম গাছ, বটগাছ, ময়ূর, গরু, লাঙ্গল, কাস্তে, ঢেকি ও গম্বুজ শাপলা, শিউলি, নারকেল গাছ, খেজুরগাছ, তালগাছ, বেলি, গাঁদা, রজনীগন্ধা ইত্যাদি নকশার ব্যবহার দেখা যায়। বিশেষ করে পদ্ম ফুল বাংলার নিজেস্ব নকশার মটিফ। পদ্ম জন্ম কাদায়, আবার বড় হয় পুকুরের কাদার মধ্যে। কিন্তু যখন পদ্ম বড় হয়ে পানির ওপর ভেসে ওঠে, পাপড়ি মেলে ফুল ফোটে তখন মনে হয় পৃথিবীর কোনো কিছুর সাথে পদ্মের সম্পর্ক নেই। পদ্ম এ পৃথিবীর ফুল নয়। সুতরাং বাংলায় স্থাপত্যের অলংকরণে, চিত্রে, আলপনায়, নকশিকাঁথায় পদ্ম আঁকার প্রেরণা বাংলার শিল্পীরা পেয়েছে নদ-নদী খাল বিলে ফুটে থাকা পদ্মফুল থেকে। বিষ্ণুপুরাণে পদ্ম লক্ষ্মীর আসনরূপে কল্পনা করা হয়।

আবার বৌদ্ধদের কাছে পদ্ম পবিত্রতার চিহ্ন। অজন্তার গুহাচিত্রের পদ্মের প্রাধান্য বেশি ছিলো। বাংলার 'তরঙ্গিত পুস্পিত লতা' নকশার মধ্যে ইসলামী অ্যারাবেকস নকশার সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। এই নকশা ইরানি ও তুর্ক গালিচায় ব্যবহৃত হলেও বাংলার নকশি কাঁথায় এ নকশার ব্যবহার বেশি দেখা যায়। 'বৃত্ত' হলো জ্যামিতিক নকশা। একই কেন্দ্রে একাধিক বৃত্ত এঁকে নানা ধরনের ডিজাইন এই বৃত্তকে ঘিরে করা হয়। আবার ইসলামী পাম নকশার সাথে বাংলার খেজুর পাতা, নারকেল পাতা ও তালপাতার নকশায় এর সাদৃশ্য রয়েছে। জ্যামিতিক চৌকোণা ছক বর্ফি ইসলামী নকশা বাংলার কাঠ, পাথরের লোকনকশায় বর্ফি মটিফ বিশেষভাবে দেখা যায়। আরবি বর্ণমালায় নকশায় রূপ সৃষ্টি করা ছাড়াও বাংলা বর্ণমালাকে নকশায় রূপ দিয়েছে বাঙালি লোকশিল্পীরা। উপরন্তু পেঁচানো রেখা, কলকা, বর্ফি, রোজেট ইত্যাদি নকশা বাংলায় মুসলমানরাই মধ্যযুগে আমদানি করে।

উল্লেখ্য যে, মধ্যযুগে বাংলায় নির্মিত মসজিদে যে ধরনের টেরাকোটার অলংকরণ এখনও দেখতে পাওয়া যায় সেই একই ধরনের নকশা নকশি কাঁথায়, নকশি পাখায়, শীতল পাটিতে, পিতল কাঁসার তৈরি তৈজসপত্রে হুবুহু দেখতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ রৈখিক আঁচড়ে ফুল-লতামণ্ডিত করে নকশা আঁকা। বর্তমান যুগে মেহেদি দিয়ে হাতে রাঙিয়েও এ ধরনের নকশা করা হয়। এই চিত্রনকে বলা হয় উল্কি। সম্প্রতি বিশ্বজুড়ে শহরে বিভিন্ন বয়সী ছেলেমেয়েরা শরীরের বিভিন্ন জায়গায় সুঁচ ফুটিয়ে অদ্ভুত ধরনের নকশা আঁকিয়ে নেবার প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। বাংলাদেশের অনেক অভিজাত পরিবারের সৌখিন ছেলেরা এ ধরনের নকশা আঁকিয়ে নিচ্ছে। বলা বাহুল্য, এই অংকনরীতি আধুনিক যুগের আলপনা নকশার ভিন্ন সংস্করণ। আবার কাপড়ের মধ্যেও এ নকশার ব্যবহার দেখা যায়। সুতরাং ফুল লতা-পাতা ও জ্যামিতিক প্যার্টানের ইসলামী নকশার প্রভাব লোকশিল্পেই শুধু নয় কারখানায় তৈরি ছাপা কাপড়েও পড়েছে।

৫(খ) লোকচিত্র

আলপনায় ইসলামী নকশা

'আলপনা' শব্দটির সাথে কৃষি কেন্দ্রিক জাদু বিশ্বাস জড়িত।[১৯] আইল প্রস্তুত করা বা আলপনা দিয়ে ছবির সীমারেখা অংকন করা হয়। ইসলামী নকশাকলার মূল বৈশিষ্ট্যই হলো বিমূর্ত মণ্ডনকলা। আলপনা নকশা মেয়েলি শিল্প । মূলত এ নকশা রৈখিক রেখা জ্যামিতিক ফর্মে তৈরি হয়।[২০] ফুল, লতা-পাতা ও জ্যামিতিক ফর্মে (Abstract design) আঁকা আলপনা চিত্রে রেখা, বৃত্ত, বিন্দু, কোনাকৃতি, বর্গাকার ইত্যাদির সাথে দেশিয় ফুলের আকার-আকৃতির ও রূপের আকৃতির মধ্যে ইসলামী নকশার প্রভাব বিশেষ লক্ষণীয়।

আলপনা চিত্রের মধ্যে আদিম চিত্ররীতির সাদৃশ্য রয়েছে। আদিম মানুষেরা রেখাচিত্রের মাধ্যমে বিচিত্র সব অনুভূতি ও বাস্তব পারিপার্শ্বিকতার সাথে তাল মিলিয়ে ছবি এঁকে সবকিছুর প্রতিফলন দেখাতে চাইত। গুহার গায়ে যে ধরনের মানুষের ছবি আঁকা ছিলো ঠিক সেই মানুষের অনুরূপ চিত্র দেখা যায় আলপনায়। হাতের ছাপ, পায়ের ছাপ আদিম সংস্কারগত ফর্মটাকে বজায় রেখে গুহায় আঁকা হতো। এ আদলে আঁকা সরীসৃপের চলে যাবার চিহ্নই আলপনার সর্পিল ভঙ্গির নকশায় এসেছে।[২১] হিন্দু সমাজে সারা বছর ধরে বিভিন্ন দেব-দেব- দেবীর ব্রত ও অনুষ্ঠান চলে। এর মধ্যে কুমারী ব্রত, হরির চরণ ব্রত, অশ্বথ পাতার ব্রত, গোকাল ব্রত, লক্ষ্মী পূজা ব্রত, দশপুতুল ব্রত, সেঁজুতি ব্রত (চিত্র ২২)।[২২] হিন্দু নারীরা আঁকে ষষ্ঠীর 'কোলে পো কাঁখে পো', লক্ষ্মীর পা, তারা, নক্ষত্র, ধানছড়া, লতাপাতা ইত্যাদি (চিত্র ২৩)।[২৩] মুসলমান মেয়েরা আঁকে বৃত্ত কোনো ধানের ছড়া ইত্যাদি।

আলপনা দুই প্রকারের। পিঠালীর সাথে সিন্দুর, আবির, লালমাটি, পোড়ামাটির গুড়া, শস্যাদির গুড়া, পোড়া ছাই, হলুদ ইত্যাদির ব্যবহারে তৈরি নকশা এবং আতপ চালের গুড়া পানিতে গুলিয়ে আলপনা আঁকা হয়।[২৪] ব্রতপালনের উদ্দেশ্যে আলপনা নকশারীতি পশ্চিম গুজরাট, তামিলরাড়ু, উড়িষ্যার লোক সংস্কৃতিতেও রয়েছে।

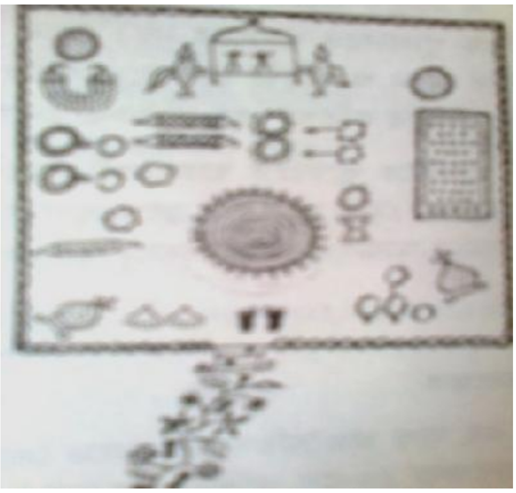

চিত্র-২২: হিন্দু মেয়েদের ব্রত পালনের উদ্দেশে চিত্রায়িত আলপনা

চিত্র-২৩: আলপনায় লক্ষ্মীর পা

মানুষ যখন কোনো ভাষায় কথা বলতে শেখেনি সে সময় একে অপররের সাথে মানুষের ভাবের আদান-প্রদানের জন্য ভাষার উৎপত্তি। এই ভাষাকে রূপের আকৃতিতে আনতে সৃষ্টি হয় রৈখিক চিত্র। কতকগুলো আলপনা রয়েছে যা দেখতে অক্ষর ও চিত্রের মতো। এই শ্রেণির আলপনায় ঘরবাড়ি, চন্দ্রসূর্যগ্রহ, গাছগাছড়া ইত্যাদির রূপায়ণ কতকটা মানচিত্রের মতো। আলপনার বৃত্তের কেন্দ্রে থাকে

শতদল পদ্ম, পূর্ণকুণ্ড, অষ্টকলসি, মঙ্গলকলসি, শাখা বিস্ফোরিত কদম অথবা বৃক্ষ। কেন্দ্রস্থ বৃত্তের চারপাশে শঙ্খলতা, যেখানে লোক নকশার স্পষ্ট ছাপ লক্ষ করা যায়। কলসিলতা, কলমিলতা, কলালতা, খুন্তিলতা, চালতালতা, দোপাটিলতা, চাঁপালতা, মোচালতা, শীষলতা ইত্যাদি বৃত্তকারে সজ্জিত হলে লতামঙ্গল হয়।[২৫] এভাবে পদ্মের চারদিকে বৃত্তাকারে সজ্জিত হলে হয় পদ্মচক্র।

ইসলামী নকশার অন্যতম আকর্ষণ থাকে গম্বুজের (Dome) মধ্যের অলংকরণে। এই ধারা উমাইয়া যুগে কুব্বাত আস সাখরার গম্বুজের মধ্যে জ্যামিতিক নকশায় অলংকরণ মুসলিম বিশ্বে প্রথম দেখা যায় (চিত্র ২৪)।

চিত্র-২৪: কুব্বাত আস সাকরার গম্বুজের অভ্যন্তরভার

এ ছাড়াও দাশেমক মসজিদ প্রকৃতপক্ষে মসজিদটির নামাজগৃহের মিহরাব, খিলানের চারিপাশে, গ্রানাডায় আল আলহামরা প্রাসাদে, আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদের জ্যামিতিক প্যার্টানের অলংকরণ আলপনার রৈখিক আঁচড়ের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।[২৬] তবে বাংলায় সুলতানী ও মুঘল আমলের মসজিদের মিহরাবে এবং গম্বুজের অলংকরণে জ্যামিতিক নকশার পরিবর্তে পদ্ম নকশার ব্যবহার বিশেষ লক্ষণীয়। এর কারণ বাংলার প্রাচীন বিহার ও মন্দিরের টেরাকোটায় শুধু পদ্ম ফুলেরই ব্যবহার ছিলো। পরবর্তীতে সুলতানী ও মুঘল আমলের নির্মিত স্থাপত্যে পদ্মেরই ব্যবহার হয়েছে। বাংলাদেশের ষাটগম্বুজ মসজিদ, ছোট সোনামসজিদসহ বেশিরভাগ তৈরি মসজিদের গম্বুজের গর্ভাংশের মাঝখানে আলপনা নকশায় পদ্মচক্র দেখতে পাওয়া যায়। সুতরাং এই ক্ষেত্রে বলা যেতেই পারে যে, বাংলার স্থানীয় কারিগরগণ পারসিক রোজেট নকশার সাথে পরিচিত ছিলো না বলে হয়ত দীর্ঘদিন ধরে এদেশে বিহার ও মন্দিরে ব্যবহৃত পদ্মের অনুকরণে রোজেট তৈরি করার চেষ্টা ছিলো কারিগরদের। পদ্ম ও রোজেটের অনুকরণে নকশা করার চেষ্টা তাদের থাকা সত্ত্বেও অবশেষে ভিন্ন ধরনের একটি কাল্পনিক ফুলে পরিণত হয়ে যেতো।

উদাহরণস্বরূপ কুষ্টিয়া জেলার ঝাউদিয়া মসজিদের গম্বুজের গর্ভাংশের নকশার নমুনা নিম্নে আলোকচিত্রের মাধ্যমে দেখানো যেতে পারে (চিত্র ২৫)।

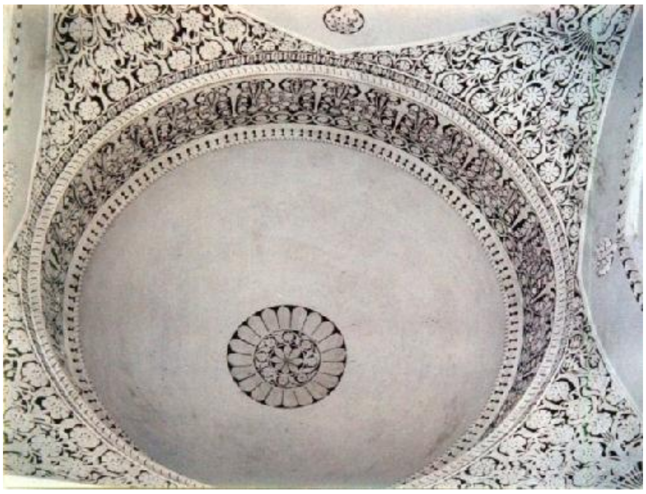

চিত্র-২৫: কুষ্টিয়া জেলার ঝাউদিয়া মসজিদের গম্বুজের অভ্যন্তর ভাগের অলংকরণ

ঝাউদিয়া মসজিদটির গম্বুজের পিপা (Drum) ও পান্দানতিফে (Pendentive) শ্বেত শুভ্র বাহারি পাতার এই নকশাগুলোর মধ্যে হিন্দু মেয়েদের ব্রত পালনের উদ্দেশ্যে চালের গুঁড়ি ভিজিয়ে এক টুকরা ন্যাকড়ার (পুরাতন কাপড়) সাহায্যে আঁকা আলপনার নকশার সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।[২৭] উল্লেখ্য যে, মসজিদের জন্য তৈরি অলংকরণ এবং মেয়েলি আলপনার মধ্যে বিশেষ একটি পার্থক্য রয়েছে। মসজিদে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন ধরনের নকশা আগে ছাঁচে তৈরি করে নেয়া হয়।এ ছাড়াও মসজিদের জন্য তৈরি নকশা দরবারি শিল্পের পর্যায়ভুক্ত। ফলে ছাঁচের তৈরি টেরাকোটা, পলেস্তরা, টাইলসে তৈরি এ ধরনের নকশা অত্যন্ত সাজুয্যপূর্ণ। অন্যদিকে মেয়েলি হাতে আঁকা আলপনা লোকনকশার পরিমাপ এক রকমের হয় না। এর স্থায়িত্বও তিন চারদিন মাত্র। উল্লেখ্য যে, বাঙালি হিন্দু ও মুসলমান বিয়েতে বিয়ের পাত্রীর হাতে মেহেদি দিয়ে আলপনা নকশা তৈরি এবং নববধূর কপালে সাদা ও লাল রঙে আলপনা নকশায় সাজিয়ে তোলা এ প্রথা দীর্ঘদিন ধরে সমাজে প্রচলিত রয়েছে। বিয়ের অনুষ্ঠান ঘিরে মাটিতে আলপনা আঁকা খুবই এ সমাজে প্রচলিত । হিন্দু বাড়িতে বরের বাড়ির উঠানে বার রকমের আলপনা দেওয়ার রীতি ও প্রথা রয়েছে। মুসলিম বিয়ে বাড়িতেও এ আলপনা নকশা বিয়ের উৎসব আমেজ অনেকখানি বাড়িয়ে দেয়।[২৮]

তবে যে কোনো উৎসবকে কেন্দ্র করে মুসলমান মেয়েরা মেহেদি দিয়ে বৈচিত্র্যময় আলপনা নকশায় নিজেদের সাজিয়ে আকর্ষণীয় করে তোলাটা সাম্প্রতিককালে নতুন সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে। এক সময় মুসলমানদের পায়ে মেহেদী দেয়া গোনাহর কাজ বলে মনে করা হতো। এখন মুসলিম সমাজে এটা কুসংস্কার বলে মনে করা হয়। রোজার ঈদের আগে সাতাশ রমজানের দিন সমগ্র বাঙালি মুসলমান মেয়েরা দুহাত বাহারি নকশায় রাঙিয়ে তোলা অনেকে সুন্নত বলে মনে করেন।

চিত্র-২৬: মেহেদি দিয়ে দুহাতে আলপনা নকশা

উল্লেখ্য, এই আলপনা শিল্পরীতিটির নাগরিক উজ্জীবন ঘটেছে সাম্প্রতিককালে। মহান ২১ ফেব্রুয়ারির আগের দিন রাতে শহীদ মিনার ও বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় যে বিপুল আলপনা চিত্র অংকন করা হয় তা শহীদ দিবসকে আমাদের ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়ারই এক চমৎকার নিদর্শন। আসলে ঐতিহ্য যে নতুন ঐতিহ্য নির্মাণ করে এ তারই এক উদাহরণ।[২৯] ২০১৩ ও ২০১৪ সালের ১৩ এপ্রিল ১লা বৈশাখ উপলক্ষে জাতীয়সংসদ ভবনের মানিক মিয়া এভিনিউয়ের রাস্তায় বাংলাদেশের অসংখ্য মানুষের অংশগ্রহণে সবচেয়ে বৃহত্তম আলপনা এঁকে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করা হয়। বলা বাহুল্য যে, এক সময় গ্রামীণ জীবনে যে আলপনা চিত্র সীমাবদ্ধ ছিলো সেটা বর্তমান শহুরে জীবনে নতুন বৈচিত্র এনে দিয়েছে। আলপনার ব্যবহার হিন্দু ধর্মের একটি অংশ হওয়া সত্ত্বেও বাঙালি মুসলমানদের জীবনের উৎসবের একটি অংশ হিসেবে আজ প্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে আলপনা হলো বাঙালির উৎসব কেন্দ্রিক চিত্ররীতি। লোকচিত্রের আলপনা যে কোনো বস্তু, স্থানের ওপর আঁকা যায়। অঙ্গচিত্র পিড়িচিত্র, পুঁথিচিত্র, পটচিত্র, ঘটচিত্র, সরাচিত্র, ঘুড়িচিত্র ও মুহররম সম্পর্কিত চিত্র মানেই আলপনার আঁচড়।[৩০]

wPÎ-27: knx` wgbvi cÖv½‡b AvKv Avjcbv

৫(গ) মৃৎশিল্প

শখের হাঁড়ি (Fancy Pot)

সাধারণ একটি মাটির তৈরি হাঁড়ির ওপর বিভিন্ন উজ্জল রঙের ব্যবহারে জ্যামিতিক প্যাটার্ন, লতাগুল্ম, তরঙ্গ, মাছ ইত্যাদি ইসলামী নকশার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ আঁকানো হাঁড়ি 'শখের হাঁড়ি' বাংলাদেশে শখের হাঁড়ি নামে পরিচিত। বিশেষ করে বরেন্দ্র অঞ্চলের চাঁপাই নবাবগঞ্জের মুসলিম পরিবারের মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানের পর শ্বশুর বাড়িতে শখের হাঁড়িতে করে নানারকম খাদ্যদ্রব্য পাঠানোর রেওয়াজ এ অঞ্চলে প্রচলিত। স্থানীয়ভাবে এই হাঁড়ির নাম সুখের চুকাই বা ঝাঁপি।[৩১] এ ধরনের চিত্রিত হাঁড়ি পশ্চিমবঙ্গে শখের হাঁড়ি নামে পরিচিত। শখের হাঁড়ি লোকচিত্রের অন্যতম অংশ।

সুদূর প্রাচীনকাল থেকে বাংলায় লাল, নীল, হলুদ, খয়েরি, সবুজ ও সাদা রঙের ব্যবহারে মাটির হাঁড়ি ওপর বাংলার লোকশিল্পীরা চিত্রিত করে আসছে। শখের হাঁড়ি ঘটচিত্রের অর্ন্তভুক্ত এবং লোকাচারসম্পৃক্ত। তবে আদিম সমাজে মৃৎশিল্পী এবং চিত্রশিল্পীর মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিলো না। লোকশিল্পী সম্পর্কে বলা হয়েছে Folk artist are ordinary people who create their works for other ordinary people (World Book of Encyclopeadia, Vol. 1, USA, 1940,p-249).

বাংলাদেশে বর্তমান সময়ে অনেক মৃৎশিল্পী ঘট তৈরির সাথে সমান দক্ষতার পরিচয় দিয়ে থাকেন চিত্র শিল্পে।[৩২] বাংলা একাডেমির লোক ঐতিহ্য সংগ্রহশালার কক্ষে শখের হাঁড়িটির পাশে কালো রঙের মাটির সুরাইটির মধ্যে (চিত্র ২৮) খোদাই করে ইসলামী মেডেলিয়ন মটিফ তৈরি করা হয়েছে। সুরাইয়ের পাশে চিত্রিত হাঁড়ির নকশার মটিফ হলো মাছ ও দড়ি নকশা। বাংলাদেশের জাতীয় ফুল শাপলা। লাল, হলুদ ও সবুজ রঙের ব্যবহারে চিত্রিত এই হাঁড়িতে বাংলার নদী, ও শাপলা ফুল (চিত্র ২৯) ঢেউ খেলানো নকশা ইসলামী এবং লোকনকশা পরিলক্ষিত হয়।[৩৩]

চিত্র-২৮: শখের হাঁড়ি

চিত্র-২৯: শখের হাঁড়ি

বাংলা একাডেমি লোক ঐতিহ্য সংগ্রহশালা

উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো যে, শখের হাঁড়ি মুসলিম পরিবারের ব্যবহারিক উপাদান হলেও বাংলাদেশে এই শিল্পের সাথে জড়িত রয়েছে হিন্দু সম্প্রদায়ের বেশির ভাগ কারুশিল্পী । তেমনি হিন্দু ধর্মবোধের আনুষঙ্গিক উপকরণ হিসেবে শীতলাঘট, বেড়াঘট, মনসাঘট, লক্ষ্মীসরা দেখতে পাওয়া যায়। যা হোক, বাংলাদেশে হিন্দু মুসলমান একসাথে দীর্ঘদিন এক সাথে বসবাস করার ফলে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মানোভাব কখনই কাজ করেনি। মুসলমান পরিবারগুলো চিত্রিত হাঁড়ি হিন্দু কুমারদের কাছ থেকে কিনে আনে। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, কারুপল্লী ফাউন্ডেশন ও বাংলা একাডেমি লোক ঐতিহ্য সংগ্রহশালার যে শখের হাঁড়ির নিদর্শন সংগৃহীত হয়েছে এগুলো চিত্রকর (চিত্র ৩০) ছিলেন কারুশিল্পী সুশান্ত পাল। তিনি জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন তিনবার। সুশান্ত পালের বাড়ি রাজশাহী জেলার বসন্তপুর গ্রামে। দাদু বন্যাশর পাল এবং দিদিমা বিমলা পালের কাছ থেকে তিনি মাটির হাঁড়ি তৈরি করা শিখে ছিলেন। ছোট বড় মাঝারি তিন ধরনের শখের হাঁড়ি তৈরিতে সুশান্ত পাল কালো আঠালো মাটি ব্যবহার করেন। ভালোভাবে মাটি ছেনে চাকের সাহায্যে বিভিন্ন আকারের হাঁড়িতে প্রথমে সাদা এবং পরে উজ্জল হলুদ রঙের প্রলেপ দেয়া হয়। হলুদ রঙ ভালোভাবে শুকিয়ে গেলে হাঁড়ির বিভিন্ন স্থানে কশি টেনে বিভিন্ন নকশা চিত্রিত করেন। তুলি তৈরি করতে সুশান্ত পাল বাঁশের কঞ্চি এবং ছাগলের ঘাড়ের এক গোছা চুল ব্যবহার করেন। তার নকশার মধ্যে পদ্মফুল, হাতি, ঘোড়া, পাখি, পেঁচা পাতা, চিরুনি এবং বৃত্ত নকশার প্রাধান্য বেশি থাকে।[৩৪]

চিত্র-৩০: চিত্রশিল্পী সুশান্ত পাল

বর্তমানে এ ধরনের শখের হাঁড়ির ব্যবহার গ্রামীণ সমাজে না থাকলেও শহুরে সৌখিন জীবনে এর ব্যাপ্তি ঘটেছে। বাঙালি সমাজে বিয়ের অনুষ্ঠান উপলক্ষে কলসিতে ও ঘটে নকশা এবং চিত্রাঙ্কন করার ব্যাপক প্রচলন ঘটেছে। বস্তুত শহরের বিয়েতে হিন্দু মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মানুষ গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানে বর কনের গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানের জায়গাটি সৌন্দর্যমণ্ডিত ও জাঁকজমক করে তুলতে শখের হাঁড়ির ব্যবহার রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ক্ষেত্রে এটা বলা যেতে পারে যে, আগে শুধু

গ্রামীণ জীবনে যে হাঁড়ির ব্যবহার ছিলো সেটা বরং শহুরে মানুষের জীবনে ভিন্ন আঙ্গিকে প্রচলিত হয়েছে। আসলে বাঙালি মুসলমান সমাজে এই শিল্পটির ব্যবহার রয়েছে সৌখিন কাজে, আনন্দ উৎসবে। ধর্মীয় উৎসবকে কেন্দ্র করে শখের হাঁড়ির ব্যবহার মুসলিম সমাজে প্রচলিত নয়।

চাড়ি

পৃথিবীতে বস্তুগত সংস্কৃতির বড় অংশজুড়ে আছে মৃৎশিল্প। সুতরাং মৃৎ শিল্পের ঐতিহ্য সবচেয়ে প্রাচীন। মৃৎশিল্পের গৃহস্থালির জিনিসপত্রের মধ্যে রয়েছে মাটির হাঁড়ি, কলসি, গেলাস, খুরি, জলনল, টালি, খোলা, ফুলদানি, টব, নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদি, পোড়ামাটির ফলক ইত্যাদি। মাটিকে দৃষ্টি নন্দন করে তোলার জন্য মৃৎশিল্পীরা পাত্রের গায়ে নানা ধরনের চিত্র আঁকে তখন সেটি চারুশিল্পের পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায়।[৩৫] মাটির তৈরি চাড়ি (বৃহৎ আকারে তৈরি গামলা) হলো গ্রাম বাংলার গরু, মহিষ, ভেড়া ও ছাগলের খাদ্যের পাত্র। এই পাত্রের মধ্যে তিন চারটা গরু একসাথে পানি, ভুষি, ঘাস খেতে পারে। বিশেষ করে এই চাড়ি গ্রাম বাংলার মৃৎ ও কারুশিল্পের ব্যবহারিক বিশেষ নির্দশন। চাড়ির আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো এটা উল্টিয়ে দিলে সুলতানী আমলের তৈরি (ষাটগম্বুজ মসজিদের গম্বুজ) মসজিদের গম্বুজাকৃতির মতো দেখতে মনে হয়। বাংলা একাডেমির লোক ঐতিহ্য সংগ্রহশালার মাটির তৈরি চাড়ির ওপর (চিত্র ৩১) আলপনা চিত্রটি আলপনার অন্যতম নিদর্শন। বস্তুত চাড়ির মধ্যে করা এই আলপনা চিত্রে লাল, সাদা, নীল ও হলুদ রঙের ব্যবহারে রৈখিক রেখা ও বৃত্ত এঁকে একটি নান্দনিকতার সুস্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। অন্যদিকে এই নকশায় বিমূর্ত প্রতীকে লোক ও ইসলামী নকশার বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব লক্ষ করা যায়।

চিত্র-৩১: চিত্রিত মাটির চাড়ি, বাংলা একাডেমি লোক ঐতিহ্য সংগ্রহশালা

চিত্রিত কলসি

আরব মরুবাসী যাযাবর শ্রেণি পানপাত্রের প্রয়োজন অনুভব করতো। পানিকে সঞ্চয় করে রাখতে সুন্দর মৃৎপাত্র গড়ার দিকে তাদের নজর ছিলো। মসজিদের মধ্যে গাছপালা ঘরবাড়ির অংকনের উদহরণ পাওয়া যায় দামেশক মসজিদে। সুতরাং গাছ-পালা, ঘরবাড়ি আঁকায় ইসলামে কোনো বিধিনিষেধ নেই। এ দেশে পানপাত্র হিসেবে মাটি ও ধাতব উপাদানে নির্মিত কলসের প্রচলন বেশি। চিত্রিত কলসি ও হাঁড়ি বিয়ের অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[৩৬] এ ধরনের চিত্রিত কলসির ব্যবহার হিন্দুদের বিয়েতে ব্যবহৃত হয়ে থাকলেও বাঙালি মুসলমানদের বিয়ের গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়। বাংলা একাডেমির সংগ্রহশালার চিত্রিত কলসিতে নদী, গাছপালা, গ্রামীণ ঘরবাড়ি, সূর্য চিত্রিত করা হয়েছে। উমাইয়া যুগ থেকে ইসলামী চিত্রকলার নতুন বৈশিষ্ট্য এনে দেয়। এক সময় মুসলমানরা চিত্রাঙ্কন সহজভাবে না দেখলেও ধীরে ধীরে আনন্দের খোরাক হিসেবে চিত্রকলা একটি বিশেষ মর্যাদা লাভ করে।

চিত্র-৩২: চিত্রিত কলসি বাংলা একাডেমি লোক ও ঐতিহ্য সংগ্রহশালা

৫(ঘ) নকশি পিঠার ছাঁচ

পিঠা বাংলাদেশের একটি মুখরোচক খাদ্য উপাদেয়। সাধারণভাবে চালের গুঁড়ি, ময়দা, সুজি, ও নারকেল নকশামণ্ডিত ছাঁচের মধ্যে রেখে পিঠার মধ্যে নকশা তোলা হয় সেটা নকশি পিঠার ছাঁচ নামে বাঙালি সমাজে পরিচিত। নকশি পিঠার ছাঁচের মধ্যে জ্যামিতিক প্যার্টানের মধ্যে ষষ্ঠভুজ, বর্গক্ষেত্র, অষ্টাভুজ, ও ফুল লতাপাতামণ্ডিত অলংকরণসমৃদ্ধ কাঠ, পাথর অথবা পোড়ামাটির ফলকে নকশা তৈরি করা হয়। পিঠার ছাঁচের অলংকরণ দেখতে মধ্যযুগীয় মসজিদ থেকে খসে পড়ে যাওয়া টেরাকোটার মতো দেখতে লাগে। সুতরাং এটি ইসলামী নকশার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। লোকশিল্পে দুই ধরনের ছাঁচ

প্রচলিত রয়েছে। পিঠার ছাঁচ এবং কাপড়ে নকশা করার জন্য ছাঁচ। পিঠার ছাঁচ লোকায়ত শিল্পকলার একটি স্থায়ী মাধ্যম। স্থায়ীভাবে নির্মাণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় পোড়ামাটি, কাঠ এবং সিমেন্ট। বর্তমানে বাজারে এ ধরনের ছাঁচ খুব সস্তায় কিনতে পাওয়া যায়।[৩৭]

পিঠার ওপর তৈরি এই নকশা খাওয়ার আগ পর্যন্ত টিকে থাকে। বিশেষ করে নকশি পিঠার ছাঁচের তৈরি পিঠা বেশির ভাগ উৎসব কেন্দ্রিক হয়। অতীতে বাংলাদেশের সকল উৎসব অনুষ্ঠানে, ব্রত পার্বণে, পূজা, ইফতার ঈদ, লৌকিক পির-ফকির আউলিয়া-দরবেশের সিন্নিতে লৌকিক দেবদেবীর পূজাতে পিঠা তৈরির রেওয়াজ প্রচলিত।[৩৮] বাঙালি মুসলমানদের সামাজিক অনুষ্ঠানে পিঠা দিয়ে অতিথি আপ্যায়নের প্রথা দীর্ঘদিন ধরে শহরে এবং গ্রামে চালু রয়েছে।

শবে বরাত মুসলমানদের কাছে খুব তাৎপর্যময় রজনী। আল্লাহ প্রত্যেক মুসলমানের ভাগ্য নির্ধারণ করেন বলে মুসলমানরা বিশ্বাস করে। ফকির মিসকিনদের মাঝে দান খয়রাত করা হয়। মসজিদে মসজিদে আলোকসজ্জা করা হয় এবং আতশবাজীর মাধ্যম বাচ্চারা আনন্দ উৎসব পালন করে। সুতরাং শবেবরাত মুসলমানদের ধর্মীয় এবং সামাজিক উৎসব। শবে বরাতের বিকেলে পাড়া প্রতিবেশি ও আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে নকশিমণ্ডিত বড় একটি থালার মধ্যে পিঠা, নকশা কাটা হলুয়া, রুটি পাঠানো হয়। পুরান ঢাকার বিভিন্ন দোকানে বিক্রি হয় বিভিন্ন ধরনের নকশামণ্ডিত রুটি। এর মধ্যে মাছ ও কুমীরের মুখ সম্বলিত নকশা রুটির মধ্যে তৈরি করা হয়। নারকেলের হালুয়া বলতে পিঠার ছাঁচে তৈরি নারকেলের নাড়ু বোঝায়। মুসলিম অভিজাত পরিবারে সাত রকমের পিঠা ও হালুয়া তৈরির প্রচলন রয়েছে।

অঞ্চল অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন এবং আলাদা রকমের পিঠা তৈরি হয়ে থাকে। পিঠার প্রধান ও মূল উপকরণ চালের গুড়া, আটা ময়দা অথবা অন্য কোনো শষ্যজাত গুঁড়া। এর সাথে গুড়, নারকেল দুধ, বা দুখের খিস্যা, তালের রস ইত্যাদি মিশিয়ে পিঠা তৈরি করা হয়। এছাড়াও তেল-ঘিতে ভাজা, পানিতে সিদ্ধ করে, তাপে সিদ্ধ করে, আগুনে সেঁকে কখনও পুড়িয়ে, কখনও বা গুড় চিনির সিরায় অথবা তাল-আখ-খেজুর কলার রসে জড়িয়ে নানা জাতের ও বৈশিষ্ট্যের পিঠা তৈরি করা হয়।

পিঠার নকশা বা কারুকর্মের উপকরণ খুবই কম। পিঠার কাই বেলার জন্য প্রয়োজন একটা বেলন ও একটা পিঁড়ি। খেজুরকাঁটা, মনকাঁটা, খড়িকা সুঁচ পাটসলা ইত্যাদির সাহায্যে অভিজ্ঞ হাতের নিপুণতায় অতিসূক্ষ্ম দাগ কেটে বিভিন্ন নকশা তোলা হয়। প্রচলিত পিঠার মধ্যে ও কাজললতা, শঙ্খলতা, হিজলপাতা, সজনেপাতা, চিরলপাতা, ভেটফুল, উড়িফুল, কন্যামুখ, জামাই মুচরা, সতীন মুচরা, সাগর দীঘি, পদ্মদিঘি, পাটিসাপটা, পাকান, গোকুল, নানতেসা, কুশলি, ফুলঝুড়ি, ছেচমা, কাঁঠাল

পাতা, চিতুই, দুধ চিতুই, ভাপা, আন্দশা, মুঠি, খিরসা পাকন, চাপড়ি, হাঁড়ি পিঠা, জামদানি, চুই, চুটকি, পয়সা, বিবিয়ানা, ধুবাইস, জামাই ভুলানো পিঠা, রাজদৌলা, জোড় কলই, তেসপাতা ও মোড়া পিঠা, মুখশলা পিঠা, মাছপিঠা, খেজুর পিঠা। এ সব অনেক পিঠায় নকশি পিঠা ছাঁচে তৈরি আবার হাতেও নকশা তৈরি হয়। কখনও কখনও হাতে তৈরি পিঠাও মসজিদের গায়ে তৈরি টেরাকোটা নকশার সাথে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় তা উদাহরণ স্বরূপ দেখানো যেতে পারে। নিম্নের আলোচ্য ৩৪নং আলোক চিত্রটি হলো হাতে তৈরি করা নকশাকৃত পিঠার এবং ৩৫নং চিত্রের মধ্যে মসজিদের গায়ে তৈরিকৃত টেরাকোটা অলংকরণের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে।

চিত্র-৩৩: মুখশলা পিঠা

চিত্র-৩৪: নকশি পিঠা

চিত্র-৩৫: টেরাকোটা অলংকরণ

কৃষিকেন্দ্রিক আদিম সমাজে কৃষির ফলপ্রসূতার সঙ্গে নারীর ফলপ্রসূতার কল্পনা করা হয়। বিশেষ করে এর মধ্যে আদিম মানুষের প্রজনন চেতনার কথা ভাবা হয়। পুলি পিঠাকে অনেকে পুরুষ জননাঙ্গ এবং চিতই পিঠাকে যোগীরূপে কল্পনা করেন।[৩৯]

গ্রামীণ সমাজে হিন্দু, মুসলমান কৃষক পরিবারে নবান্নের পরবর্তী সময় থেকে পুরা শীতকালে নানা ধরনের পিঠা খাওয়া চলে। তবে ঢাকার শহরের রাস্তার ধারে বসে পুরুষ ও মহিলারা পাকন, চিতুই, ভাপা, পুলি তৈরি করে বিক্রি করে। এই পিঠা বিশেষ করে রিকসাওয়ালা, শ্রমিক, অভিজাত পরিবারের মানুষেরাও কিনে খায়। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, বাংলা একাডেমি লোক ও ঐতিহ্য, ও

নারায়ণগঞ্জের লোকও কারুপল্লী ফাউন্ডেশনে পিঠার ছাঁচ সংরক্ষিত আছে। লোক ঐতিহ্য সংগ্রহশালার এই পিঠার ছাঁচে (চিত্র ৩৬) পদ্ম এবং পাতা নকশার সমন্বয়ে নকশা করা হয়েছে। আধুনিক যুগে ব্লক ছাঁচ কাপড়ের ওপর নকশা প্রিন্ট করার জন্য ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে ব্লক বাটিক প্রিন্ট করা কাপড়ের চাহিদা বাংলাদেশে এখন অনেক বেশি।

চিত্র-৩৬পিঠার ছাঁচ

চিত্র-৩৭ নকশি পিঠা তৈরি

চিত্র-৩৮ চালের গুড়ি ঢেঁকিতে তৈরি

চিত্র-৩৯: বরেন্দ্র গবেষণা সংগ্রহশালার ব্লক ছাঁচ

চিত্র-৪০ ব্লক ছাঁচ

৫(ঙ) নকশি পাখা

বাংলার ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্পের অন্যতম নির্দশন নকশি হাত পাখা। 'শীতে তুমি লুকিয়ে থাক গরমে দাও দেখা, আদর করে নাম রেখেছি তাইতো তোমার পাখা'। কোনো এক গ্রাম্য কবির এই সরল বাণীকে বুকে ধারণ করে আছে বাংলাদেশের কত অসংখ্য পাখা। আসলেও তাই, শীতে পাখা লুকিয়ে থাকে একান্ত অবহেলায়, শীতে প্রয়োজন কাঁথার। শীতে যেমন কাঁথার গরমে তেমন পাখার।[৪০] শিল্পযুক্তিকল্পতরুতে 'ব্যঞ্জন' এবং বিষ্ণুধর্শোত্তরে রাজার অভিষেক সামগ্রীর মধ্যে পাখার নাম উল্লেখ আছে-'ভদ্রাসনঞ্চ ছত্রঞ্চ বাল ব্যজনমেচব। রাজনির্মিত ত্রিবিধ ব্যজনের উল্লেখ আছে– পক্ষ, বস্ত্রখণ্ড এবং শলাকা।[৪১] বিখ্যাত ময়মনসিংহ গীতিকায় দেখা যায়ঃ

"আবের কাঁকই লইল রাজা আবের চিরুনী
আবেতে রাগিয়া লইল খাড়ি আর বিউনি (পাখা)।।

হাতির দঁতের পাটি লইল গজমতির মালা।

ভেট দিবে নবাবেরে করিল যে মেলা।"[৪২]

আধুনিক যুগে এটি হাত নামে পরিচিত। গ্রীষ্মের দাবদহে অথবা শরতের ভ্যাপসা গরমে মিষ্টি বাতাসের সান্নিধ্যের জন্য পাখার কোনো জুড়ি নেই। নতুন বউ বাপের বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার সময় তাকে নকশি পাখা উপহার স্বরূপ দেয়া হতো। তাই নকশি পাখা শুধু বাংলার কৃষকের ঘরেই নয়, প্রাচীনকাল থেকে হিন্দু রাজা এবং মধ্যযুগে ইসলামী শাসনকালে সুলতান, আমীর ওমরাহ, নবাব, জমিদারসহ সকল পরিবারে পাখার ব্যবহার ছিলো। প্রাচীন ও মধ্যযুগে রাজদরবারে পাখা দিয়ে বাতাস করবার জন্যে আলাদা কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হতো। এ কারণে রাজা বাদশাদের জন্য বিশেষভাবে ও পাখা বৃহৎ আকারে তৈরি করা হতো। সম্রাট আওরঙ্গজেবের জন্য নবাব জাফর আলী যে বার্ষিক নজরানা পাঠাতেন তাতে ঢাকাই জামদানি ও অন্যান্য সামগ্রির মধ্যে কয়েকটি মূল্যবান ও নকশি তাল পাতার পাখা। রাজপরিবারে সারারাত ঘরের বাইরে থেকে দড়ি দিয়ে টেনে পাখার বাতাস করা হতো।

পাখা দুই রকমের। সুতার পাখা আর বাঁশ বেতের পাখা। চাকের উপর সুঁচের সাহায্যে পুরানো কাপড়ে পাখার শিল্পরূপ দেয়া হয়। বাঁশের গোল চাকা ও হাতল পাখার মূল কাঠামো। বাঁশ ও নলের বেতি কিংবা সুতার সুচারু নকশা বুনট করা হয়। একটি কেন্দ্র বিন্দু থেকে বাঁশ বেতের সলা বৃত্তকারে ক্রমান্বয়ে প্রসারিত করেও পাখা তৈরি করা যায়। তবে নতুন কাপড় ফ্রেমে মুড়ে তার ওপর রুমালের মতো নতুন সুতার নকশা তুলেও পাখা তৈরি করা হয়। সুপারির খোল, শোলা এবং কাঁশ ও গমের ডাটা দিয়েও পাখা তৈরি হয়। তবে ময়ূরগুচ্ছ নির্মিত পাখায় আলাদা কোনো নকশার দরকার পড়ে না।[৪৩] পাখা নকশা আলপনা চিত্রে প্রভাবিত। সীমিত পরিসরে নকশা করা হয় বলে এতে নানা বৈচিত্রের নকশা তোলার অবকাশ কম। বিশেষ করে পাখা নকশায় থাকে তারা ফুল, ছিটা ফুল, পাখি। একই ধরনের দুটি পাখা মুখোমুখি এঁকে নকশা তৈরি করলে সে পাখার নাম হয় ভালোবাসা পাখা। পাখার নকশার মধ্যে প্রধানত কদমগাছ, পাতা (অধিকাংশ পান পাতা) মাছ, হাতি, মানুষ, গন্ধুজ ইত্যাদি আঁকা হয়। তবে লেখা পাখায় সাধারণত চিত্রাঙ্কন থাকে না। বস্তুত চিত্ররূপ অনুযায়ী পাখার বিভিন্ন রকমের নাম হয়। যেমন : ভালোবাসা কাকইর জালা, গুয়াপাতা, পালংপোষ, সুজনিফুল, বলদের চোখ, শঙ্খলতা, কাঞ্চন মালা, ছিটাফুল, তারাফুল, মনবিলাসী, মনবাহার, মনসুন্দরী, বাঘবন্দী, ষোলো কড়ির ঘর, সাগরাদঘি, হাঁড়ি, ফুল, মানুষ ও লেখা পাখা ইত্যাদি। হিন্দু মেয়েরা পাখার মধ্যে লক্ষ্মীর পা, রাঁধা কৃষ্ণ সরস্বতী ও দুর্গা চিত্র আঁকে।[৪৪]

বাংলা একাডেমি লোক ও ঐতিহ্য সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত পাখা চিত্রে (চিত্র ৪১) রয়েছে গাছে টিয়া পাখি এবং হাতি। লক্ষণীয় হলো মুঘল অনেক চিত্রকলায় পাখি গাছের দৃশ্য দেখা যায়। পাখা চিত্রের মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে আঁকা হয়েছে স্ক্রল (Scroll) পাকখাওয়া ইসলামী লতা নকশা যা মসজিদের অলংকরণে দেখা যায়। পাক খাওয়া এই নকশাটি ইসলামী নকশাকলার অন্যতম মটিভ। অপর পাখাটি তারা ফুল ও লতা নকশায় নির্মিত। ইসলামী নকশাকলার অন্যতম মটিফ হলো তারা নকশা। তারা নকশা মসজিদ অলংকরণেও জনপ্রিয়তা পেয়েছে। আরবি বর্ণমালায় আল্লাহু রাসুল লিখে নকশা করা ছাড়াও বাংলার মেয়েরা পাখার ওপর কখনও কখনও নিজের নাম, 'বন্ধু ভুলোনা আমায়' চিরসাথী, 'মা' ইত্যাদি বাংলা বর্ণমালা লেখায় প্রকাশ করে। জ্যামিতিক প্যার্টান নকশার মধ্যে ষষ্ঠভুজ, বর্গক্ষেত্র, অষ্টাভুজ লক্ষ করা যায়। এভাবে ইসলামী নকশাকলার প্রভাব লোকশিল্পে দেখা যায়। বাংলাদেশ হস্তশিল্প শল্প সমবায় ফেডারেশনের (কারিকার) লোক কারু জরিপ ও নকশা দলিলায়নের প্রকল্পে বাংলাদেশের গ্রামঞ্চল থেকে ৫০০০ এর অধিক লোক কারুকর্মের যে নমুনা নকশা সংগ্রহ করা হয়েছে অভিসন্দের্ভের পরিশিষ্টে সেই নকশার কিছু নমুনা নকশার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

চিত্র-৪১: নকশিপাখা

চিত্র-৪২ নকশি পাখা

চিত্র-৪৩: পাখা শিল্পী

5(P) bKwk Kv_v

কাঁথা সংস্কৃত 'কন্থা' শব্দ থেকে উৎপত্তি।[৪৫] যার অর্থ জীর্ণ এবং ছিন্ন বস্ত্র। অতি প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত এ দেশের সাধুসন্ন্যাসী, যোগী, আউল, বাউল, পির ফকিরদের পরিধেয় বলতে বোঝায় তা হলো কাঁথা। উপরন্তু, কাঁথা ত্যাগের, বৈরাগ্যের, নম্রতার এবং নিরাসক্তির প্রতীক।[৪৬] লোকশিল্পের অন্যতম একটি জগৎ হলো নকশি কাঁথা এবং বাংলার একান্ত নিজেস্ব ঐতিহ্যবাহী শিল্প।[৪৭] কাঁথা যে কোনো মাপের তৈরি করা যায়। তাই কাঁথার মধ্যে ফুটিয়ে তোলা যায় ইচ্ছামত নকশা। বাংলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের বসবাস এ কারণে মুসলমান মেয়েরা নকশি কাঁথা তৈরিতে অনেক বেশি জড়িত। নকশি কাঁথার উপকরণ হলো পুরাতন পরিত্যক্ত বস্ত্র এবং ছেঁড়া শাড়ির পাড়ের সুতা। সুঁচের এক একটি ফোড় বা ঘাই-ই কাঁথা শিল্পায়নের রূপায়ন।[৪৮] বিশেষ করে এই শিল্পের সাথে গ্রামীণ জীবনের সুখ দুঃখের নানা কাহিনি জড়িয়ে থাকে। দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলো ছাড়া এ ধরনের কাঁথার ব্যবহার অন্য কোনো রাষ্ট্রে লক্ষ করা যায় না। বাংলাদেশের নকশিকাঁথা পশ্চিম বাংলার গুরুসদয়, আশুতোষ এবং ভিক্টোরিয়ার মেমোরিয়াল মিউজিয়ামের প্রদর্শনী গ্যালারি রয়েছে। এই নকশি কাঁথা এটাই প্রমাণ করে যে, গ্রাম বাংলার অশিক্ষিত মুসলিম পরিবারের মহিলারা যাদের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই অথচ তাদের শিল্পবোধ ও পারদর্শিতা উচ্চমার্গের শিল্পীর পর্যায়ে নিয়ে গেছে। তাদের কাজের স্বীকৃতিই মিলেছে ঠিকই অথচ কাঁথা শিল্পীকে প্রদান করা যায়নি তার সঠিক মর্যাদা। লোকশিল্পীদের ক্ষেত্রে এটাই সবচেয়ে বড় দুঃখ।

চিত্র-৪৪: বাংলার মেয়েদের তৈরি নকশিকাঁথা (ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল সংগ্রহশালা, কলকাতা)

কাঁথায় আলপনা এবং প্রাকৃতিক দৃশ্য পশুপাখি,এবং মানুষ পর্যন্ত আঁকা যায়। বস্তুত আলপনাধর্মী নকশি কাঁথায় ইসলামী নকশার বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। বিশেষ করে ইসলামী খেজুর পাতা নকশা, লিফ নকশা বা পাতা নকশা, স্টার বা তারকাকৃতি, রোজেট, লজেঞ্জ বা বরফি-নকশা, স্ক্রল নকশা বা পাক খাওয়া পাতা নকশা, মেডেলিয়ন বা পদক নকশা, বিড তসবি-নকশা, তরসাদ মোটা

দড়ির মতো নকশা ওয়েভ ঢেউ তোলা নকশা অ্যারাবেসক বা লতা-নকশা প্রতিটি নকশার প্রভাব লক্ষ করা যায়। এ ধরনের নকশা আদিনা মসজিদের অংলকরণে দেখা যায়। জ্যামিতিক প্যার্টানের মধ্যে থাকে ষষ্ঠভুজ, বর্গক্ষেত্র, অষ্টাভুজ নকশা।

কাঁথা চারু এবং কারু দুটি রূপে তৈরি হয়। সুদুর অতীত কাল থেকে বাংলার ঘরে ঘরে এ কাঁথা তৈরি হতো। অবসরে বসে কাঁথা সেলাই করাই ছিলো গ্রামীণ মেয়েদের বড় কাজ। বাংলার গ্রামীণ সমাজ ছাড়িয়ে অভিজাত পরিবারেও নকশি কাঁথার ব্যবহার রয়েছে।

কাঁথা দুই প্রকার:

যেমন: (১) লেপ কাঁথা ও (২) সুজনি কাথাঁ

লেপ কাঁথার ব্যবহার হয় শীতকালে। তবে সুজনি কাঁথা সব ঋতুতে ব্যবহার উপযোগী। বাংলাদেশে কয়েক ধরনের কাঁথার প্রচলন রয়েছে।

ক. আরশিলতা (আয়নার আবরণী) ওয়ার বা বেটন বালিশের ঢাকনা

খ. লেপকাঁথা ও গায়ে দেয়া কাঁথা

গ. ছাপা ও খোল ও বালিশের আবরণী

ঘ. জায়নামাজ ও আসন- নামাজ ও পূজার জন্য

ঙ. দস্তরখানা ও খাওয়ার সময় ব্যবহার করা আস্তরণ

চ. গাটরি ও বস্তানি-বই ও তৈজসপত্র রাখার জন্য ব্যবহৃত[৪৯]

পানসুপারি রাখার জন্য তৈরি করা হয় 'খিচা'। আসনদস্তরখানায় খাবার পরিবেশনের জন্য ব্যবহার করা হয়। সারিন্দার জন্য ব্যবহার করা হয় নকশি আবরণী । তসবি অথবা জপমালার জন্য তৈরি হয় নকশি থলে। এ ছাড়াও পালকির কাঁথা, কোরআন ইত্যাদি পবিত্র গ্রন্থাদি রাখার জন্যে ঝোলা, বস্তানী, গাটরী, বোচকা ইত্যাদি নকশি কাঁথার মধ্যে পড়ে।[৫০]

আঞ্চলিকভাবে বাংলাদেশে নকশি কাঁথা সেলাইয়ের দুটি ধারার প্রচলন রয়েছে। একটি যশোরের অন্যটি রাজশাহীর।[৫১] যশোর রীতির কাঁথা তিন শ্রেণির যথা: চিত্রিত কাঁথা, মটিফ কাঁথা ও পাইড় কাঁথা। রাজশাহীতে সেলাই করা হয় চার ধরনের। যথা: লহরী কাঁথা, কার্পেট কাঁথা, সুজনী কাঁথা ও লেপ কাঁথা।

লেপকাথাঁর দুটি বৈশিষ্ট্য। দোরখা ও আঁচলবুননী। বুনন কৌশলে যে কাঁথার দুই পিঠেই চিত্র বা নকশা করা হয়ে থাকে। কোনোটি সদর কোনোটি উল্টো পার্থক্য করা যায় না। আর আঁচল বুননী কাঁথার অলংকরণ শাড়ির পাড় চিত্র বা নকশার ফ্রেমের কাজ। যশোর, কুষ্টিয়া, রাজশাহী, পাবনা, জামালপুর,

Dhaka University Institutional Repository

কিশোরগঞ্জ ও নরসিংদীর মেয়েরা নকশি কাঁথা নির্মাণে অনেক পারদর্শি। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের ওয়ার, থলে ইত্যাদি কাঁথা শিল্পভূক্ত।[৫২]

আলপনার মতো কাঁথা সমতলভিত্তিক চিত্র। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মেয়েদের মধ্যে কাঁথায় ব্যবহৃত বিভিন্ন নকশার নাম প্রচলন রয়েছে। শঙ্খলতা, কলমীলতা, কলসীলতা,খুন্তিলতা, মোচালতা, শীষলতা ইত্যাদি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাঁথা অলংকরণের কেন্দ্রবিন্দু তার মাঝখানের চিত্রটি (চিত্র ৪৫)। নারায়ণগঞ্জের কারুপল্লী ফাউন্ডেশনের জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালার প্রদর্শনীর নকশিকাঁথাটি কেন্দ্রের চিত্র বা নকশাকে ঘিরে রয়েছে নানা ধরনের লতা-পাতা, ফুল, ধানের ছড়া, চাঁদ, তারা, মাছ, প্রাণী ইত্যাদি। গেরস্থলীর সব বস্তু যেমন কুলা, পাখা, আয়না, কাঁকই, সরতা, লাংগল পালকি, গরু ছাগল, ঢেকি বিন্যস্থ করা হয়।[৫৩]

নকশিকাঁথায় হাতির চিত্রটিকে নকশা অনেক বেশি দেখা যায়। প্রাচীন কাল থেকে এ দেশে রাজা বাদশারা হাতিতে চলাফেরা করতো। রাজাকে হাতির পিঠে চড়িয়ে গ্রামীণ মেয়েরা কাঁথায় সে কল্পনা রূপায়িত করেছে। কাঁথা সেলাইয়ের মধ্যে জ্যামিতিক ছক বিন্যাস করে মাছের সারিতে মাছ, লতা সারিতে লতা দেখানো হয়। মাছ যখন সেলাইয়ের মধ্যে সৃষ্টি করা হয় তখন শিল্পীর মনে নদীতে মাছ খেলা করছে সেই অনুভূতিটিই কাজ করে। সে তার কল্পনার মাছ কাঁথার মধ্যে চিত্রনের মধ্যদিয়ে বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। বাংলাদেশে কারিকার জরিপকৃত কয়েকটি লোকনকশার উদাহরণ দেখানো যেতে পারে। কাঁথায় কলকা নকশার ব্যবহার ছাড়াও বালুচুড়ি শাড়িতে এ ধরনের দেখা যায়। সুতরাং এ ধরনের নকশার মধ্যে ইসলামী নকশাকলার প্রভাব স্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায়।

চিত্র-৪৫: নকশি কাঁথা কারুপল্লী ফাউন্ডেশন

চিত্র-৪৬

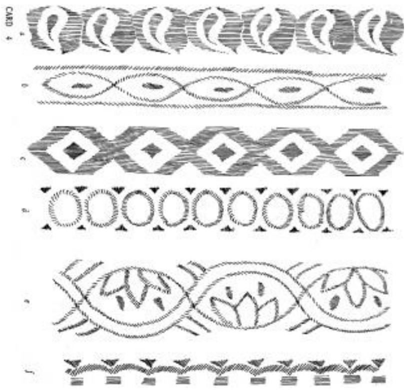

চিত্র-৪৭

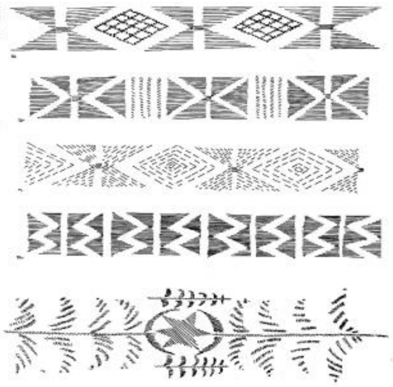

চিত্র-৪৮

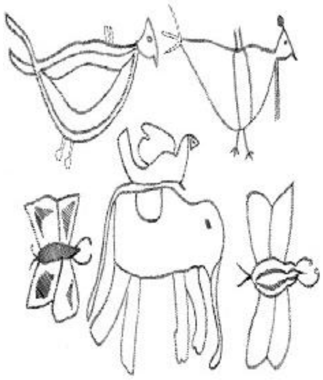

চিত্র-৪৯

চিত্র-৫০: কারুপল্লী ফাউন্ডেশন সংগ্রহশালা

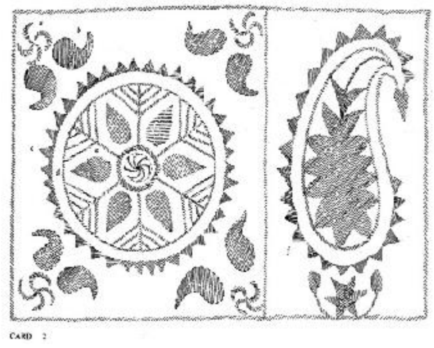

চিত্র-৫১:

বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কারিকার সংগৃহীত নকশি কাঁথায় ব্যবহৃত লোক নকশার মটিফে ইসলামী নকশার প্রভাব। কারুপল্লী ফাউন্ডেশনের প্রদর্শনী কক্ষের স্টার (Star) বা তারকাকৃতির নকশায় সেলাইকৃত কাঁথাটি (চিত্র ২) নকশা ইসলামী নকশার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বিশেষ করে ইসলামী স্থাপত্যে তারা নকশার প্রচলন অনেক বেশি। জ্যামিতিক আকার আকৃতির মধ্যে বহু কোণ বিশিষ্ট তারা ও পাঁচ কোণা তারার কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের পুরনো ঢাকায় অবস্থিত তারা মসজিদ (চিত্র ৫৩)। মসজিদ স্থাপনাটির সমস্ত গায়ে লাল নীল রঙের ব্যবহারে অসংখ্য তারা নকশায় সজ্জিত। তেমনি কাঁথার মধ্যে নীল ও লাল রঙের সুতার ব্যবহারে তৈরি এ কাঁথাটি একই রকমের প্রতিচ্ছবি বলে মনে হয়।

চিত্র-৫২: কারুপল্লী ফাউন্ডেশন

চিত্র-৫৩: তারা মসজিদ ঢাকা

মুরদের আমলে স্পেনে ফুল, লতা--পাতা ও জ্যামিতিক নানা আকার-আকৃতির সম্মিলিত নকশাকলা বিশেষভাবে প্রাধান্য পায়। মঙ্গোল পারস্যে পশু-পাখি ও মানুষও নকশাকলায় বিশেষভাবে স্থান পেতে থাকে। ওসমানী তুর্কি নকশাকলায় জ্যামিতিক আকৃতির মধ্যে বরফি প্রাধান্য বেশি পেয়েছে।[৫৪] বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে ৩০৮ নং কক্ষের গ্যালারিতে রয়েছে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা ও অঞ্চলের গ্রামীণ মেয়েদের তৈরি নকশি কাঁথার বিশাল সমাহার। বাংলাদেশে ব্যক্তিগত উদ্যোগে মোহাম্মদ সাইদুর তার নিজের গ্রামের বাড়ি কিশোরগঞ্জের বিন্নিগ্রামে নিজস্ব মোহাম্মদ সাইদুর লোকশিল্প সংগ্রহশালায় প্রায় ৩০০ নকশি কাঁথা সংগ্রহ করেছিলেন। বর্তমানে কাঁথা আবেদন শহরে মানুষের কাছ অনেক বেশি। গ্রামের অনেক মহিলা নকশি কাঁথা তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করছে। ঢাকা শহরের রাস্তায় রাস্তায় নতুন কাপড়ের তৈরি নকশি কাঁথা কিনতে পাওয়া যায়। ফলে এই ঐতিহ্যবাহী কাঁথা খুব সহজলভ্য হয়ে গেছে। শহুরে মধ্যবিত্ত মানুষের ড্রয়িংরুমে, নকশিকাঁথা ছোট আকারে তৈরি ওয়াল ম্যাট বাঁধিয়ে নান্দনিকতা ও গ্রামীণ ঐতিহ্য ধরে রাখার প্রচেষ্টা এখন অব্যহত রয়েছে। কারিকার জরিপকৃত কিছু নমুনা চিত্র পরিশিষ্টে দেখা হয়েছে।

৫(ছ) নকশি শিকা

গ্রামীণ মুসলিম পরিবারে শিকার ব্যবহার অনেক বেশি। অনেক শিকার মধ্যে পবিত্র কোরআন রেহেল, গুছিয়ে রাখেন। শিকা সুঁচিশল্প বা বয়নশিল্প কোনোটার মধ্যেই পড়ে না। শিকার মূল উপকরণ পাট, তবে কড়ি, উপকরণ ব্যবহার করা হয়। পাটের বদলে ক্ষেত্রবিশেষে শনও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পাটের গোছা দ্বিধাবিভক্ত করে দড়ির মতো পাকিয়ে, অথবা পাটের গোছায় বিভিন্ন কায়দায় সুতার দড়ি জড়িয়ে ফাঁস তোলার কৌশলে শিকার নকশা বিন্যাসিত করা হয়।[৫৫] নকশা বিন্যাস ফাঁস তোলা ও বিনুনি গাঁথার ওপর নির্ভর করে। ফুলের নামানুসারে কয়েক প্রকার শিকার নাম পাওয়া যায়। যেমন, তারাফুল, পুতিফুল, ছড়াঝুল, টাকাফুল ইত্যাদি। ফাঁসের কৌশলে টাকার মতো চাকতি, পুঁতির মতো দানা অথবা তারার মতো বুটি দিয়ে টাকাফুল, পুঁতিফুল ও তারাফুলের শিকা তৈরি হয়।[৫৬]

চিত্র-৫৪: পাটের পাপশ, খাবার টেবিলের ম্যাট

চিত্র- ৫৫: ভ্যনিটি ব্যাগ | নকশি শিকা তৈরি পদ্ধতি

নকশি শিকার ব্যবহার বর্তমানে ব্যবহারিক কাজে নেই বললেই চলে। শুধুমাত্র শহরে পরিবেশে অভিজাত পরিবারে ফুলের টব রাখার জন্য শিকার ব্যবহার দেখা যায়। তবে শিকার পরিবর্তে পাটের তৈরি ব্যাগের প্রচলন রয়েছে।

5(R) KvM‡Ri SvjU I wSbK bKkv

বাংলাদেশের অলংকরণ বা সাজ-সজ্জাগত লোকায়ত শিল্পকলার অন্যতম আকর্ষণ 'কাগজের ঝালট' বা কাগজ কাটা শিল্প মাধ্যমটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মীয়, সামাজিক, লৌকিক ও পারিবারিক উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে উৎসব অঙ্গনকে মোননীয় সাজ-সজ্জায় সজ্জিতকরণ হিসেবে এর বহুল ব্যবহার ও প্রচলন রয়েছে। কাগজ কাটা শিল্পটি খুবই সাদামাটা ব্যাপার হলেও একজন অভিজ্ঞ শিল্পীর কাছ থেকে না জেনে না শিখে কারো পক্ষেই এ কৌশলটি আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশে এ শিল্পে জন্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পেশাদারি একশ্রেণির শিল্পী রয়েছেন- এরা সাধারণত 'কাগজী' বা ঝালটি শিল্পী নামে পরিচিত। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ শিল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত অপেশাদার সৌখিন শিল্পীর ও সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। আন্যান্য লোকায়ত শিল্পকর্মের মতো কাগজের ঝালট শিল্পে ব্যবহৃত সাজ-সরঞ্জাম বা যন্ত্রপাতির ব্যবহারে যন্ত্রপাতির ব্যবহার খুবই নগণ্য। যন্ত্রপাতির মধ্যে দুই বাই দুই ফিট সাইজের দুটি কাঠের পাটাতন, ছোট বড় মিলিয়ে দু'তিন পদের কাঁচি, বাটালি, নরুণ, হাতুড়ি ও নকশা আঁকাশ পেন্সিল বা রেখা পরিস্ফুটনের জন্য বাঁশের শলাকার তৈরি চেকন একটি কাঠি। এগুলাই কাগজ বা ঝালট শিল্পের একমাত্র সাজ সরঞ্জাম। কাগজের ঝালট কাটা নকশায় অসংখ্য নকশা ও মটিফের সমাহার দেখা যায়-এর মধ্যে বিভিন্ন লতা-পাতা, ফুল-ফল, ফুলঝাড়, ফাথি, মাছ, শঙ্খ জ্যামিতিক নকশা পশুর প্রতিকৃতি, মই, মাথাল, শাবক, হরিণ ও হরিণের শাবক, নর নারীর প্রতিকৃতি, বিভিন্ন দেবদেবীর প্রতিকৃতি ইত্যাদি-বহুল প্রচলিত। এ ছাড়াও ভিন্ন ভিন্ন আচার অনুষ্ঠান অনুযায়ী–অনুষ্ঠান সম্পৃক্ত দৃশ্য ও কাগজ কাটায়

দেখা যায়- যেমন ধর্ম সম্পৃক্ত মহররমের তাজিয়া, কীর্ত্তণে-নৃত্যরত -গৌর নিতাই-রাধাকৃষ্ণ, বিয়ে অনুষ্ঠানে উড়ন্ত প্রজাপতি, ময়ূর ময়ূরী, শঙ্খ বাদনরতা, মালাহাতে পরী ও বিচিত্র আলপনার নকশা উল্লেখযোগ্য (নমুনা চিত্র পরিশিষ্টে)। বিশেষ করে মুসলিম পরিবারের বিয়েতে গরীব মধ্যবিত্ত ধনী সকল শ্রেণির বিয়েতে কাগজের ঝালর কেটে সমস্ত বিয়ে বাড়ি সুসজ্জিত করা হতো। বাসর সাজানোর জন্য নকশি কাগজ আলাদা রকম সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিত। এই নকশাগুলো কিছু নকশা ইসলামীর নকশাকলার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এ ছাড়ার মুসলমানীর অনুষ্ঠান উপলক্ষে উৎসব অঙ্গনকে মোহনীয় সাজসজ্জায় সজ্জিতকরণ হিসেবে এক সময় এর ব্যাপক প্রচলন গ্রাম গঞ্জে এখন রয়েছে। বর্তমানে শহরের বিয়েতে এই কাগজ নকশার চলন উঠে গেছে। এর পরিবর্তে তাজা ফুল দিয়ে বাসর সাজানো হয়। কাগজের নকশার অনুকরণে কাঠের আসবাবপত্রে কাঠখোদাই অলংকরণে ব্যবহার করা হয়। ঝিনুক শিল্পের বাংলাদেশে প্রচলন থাকলেও এর ব্যাপক প্রচলন দেখা যায় না। চিত্রের এই ঝিনুক দিয়ে তৈরি পদ্ম ফুল নকশাটি গুরুসদয় সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত আছে। এই ধরনের পদ্ম নকশা স্থাপত্য অলংকরণে নকশি কাঁথায় শীতলপাটিতে দেখা যায়।[৫৭] কাগজের ঝালট দিয়ে হুবুহু নকশা তৈরি দেখা যায়।

চিত্র-৫৬: ঝিনুক শিল্প গুরুসদয় সংগ্রহশালা

5(S) Rvg'wb kwo

তাঁতে রেখে বুটি তোলা মসলিনর নাম জামদানি। জগতে মনকারা নকশার জন্য ঢাকাই জামদানির জুড়ি মেলা ভার। শাড়ি বাঙালির ঐতিহ্য। এ ধরনের বসন সমগ্র ভারতবর্ষে এবং বাংলাদেশে প্রচলিত রয়েছে।[৫৮] জামদানির নকশা প্রধানত জ্যামিতিক প্যার্টানে তৈরি হয়। পরিমিত দূরত্বে জ্যামিতিক নকশার পুনরাবৃত্তি (Geometric, repotitive pattern) জামদানির বৈশিষ্ট্য।[৫৯] ফলে ইসলামী নকশাকলা লোক নকশায় প্রভাব দেখা যায়। এই মনোরম বস্ত্র বয়নকারীর শ্রেষ্ঠত্ব সারা বিশ্বে। এ সম্পর্কে ওয়াটের মতে 'The jamdani or figured mulline have been spoken of as the chef-de oeuvre and certainly they are the most artistic articles produced in Bengal'[৬০]

জামদানির নামকরণ নিয়ে বিভিন্ন ধরনের মতবাদ রয়েছে। একমত অনুসারে জামদানি শব্দটি ফার্সি ভাষা থেকে এসেছে। ফার্সি জামা অর্থ কাপড় এবং দানা অর্থ বুটি, সে অর্থে জামদানি অর্থ বুটিদার কাপড়। এ কারণে মনে করা হয় যে মুসলমানেরাই ভারত উপমহাদেশে জামদানির প্রচলন ও বিস্তার ঘটায়। আরেকটি মতে ফারসিতে 'জাম' অর্থ এক ধরনের উৎকৃষ্ট মদ এবং 'দানি' অর্থ এক ধরনের পেয়ালা। জাম পরিবেশনকারী ইরানি সাকির পরনের মসলিন থেকে জামদানি নামের উৎপত্তি।[৬১]

তবে মসলিন শব্দটি উৎপত্তি সম্ভবত ইরাকের মৌসুল শহর থেকে। আর জামদানি শব্দটি এসেছে পারস্য থেকে। বুটিদার জামা থেকে জামদানি শব্দটি পাঠান সুলতানদের আমলে বাংলায় প্রচলিত হয়। সতের শতকে জামদানি দিয়ে নকশাওয়ালা শেরওয়ানির প্রচলন ছিলো। তবে জামদানি দিয়ে নকশি ওড়না, কুর্তা, পাগড়ি, রুমাল, পর্দা প্রভৃতি তৈরি করা হতো। নবম শতকে আরব ভূগোলবিদ সুলাইমান বাংলাদেশের মসলিন ও জামদানির কথা উল্লেখ করেছেন তার গ্রন্থে। ইতিহাস থেকে জানা যায় খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে বঙ্গ থেকে সোনারগাঁও বন্দরের মাধ্যমে মসলিনের মতো সূক্ষ্ম বস্ত্র ইউরোপে রপ্তানি হতো। ইবনে বতুতা ১৪শ শতকে লেখা তার ভ্রমণ বৃত্তান্তে সোনারগাঁওয়ের বস্ত্রশিল্পের প্রশংসা করতে গিয়ে মসলিন ও জামদানির কথা বলেছেন। মুঘল আমলে মসলিন ও জামদানি শিল্পের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। সে সময় নকশা করা মসলিন ও জামদানি দিল্লী ও লখনৌ ও মুর্শিদাবাদে চড়াদামে বিক্রি হতো।[৬২]

প্রতিটি নকশার জ্যামিতিক বৈশিষ্ট্যের বয়নশিল্প হিসেবে প্রাচ্যের বয়নশিল্পের ধারাবাহিকতা রক্ষায় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলো জামদানি মটিফ। এই মটিফে খুব সহজেই কাপড়ের ভেতর ছায়ার মাঝে তৈরি করা যায় নকশার প্রতিবিম্ব। মটিফগুলো জ্যামিতিক আইন অনুসরণ করলেও তা শুধুমাত্র রেখা, চারকোনো কিংবা ত্রিভুজ নয় বরং তা দিয়ে ফুল লতা-পাতা থেকে শুরু করে ফুটে ওঠে নানা রকম ডিজাইন বিন্যাস।[৬৩] এটি মূলত বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারক মসলিনের একধরনের জাতি। তবে এর পাড় ও জমিনে অপেক্ষাকৃত মোটা সুতায় বুননের মাধ্যমে ডিজাইন ফুটিয়ে তোলা হয়। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে শতাধিক পণ্য বাংলা থেকে হামবুর্গ, লন্ডন, মাদ্রিদ, কোপেনহেগেন এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রপ্তানী করা হতো যার মধ্যে সবচেয়ে সমাদৃত ছিলো জামদানি। [৬৪]

প্রাচীনকাল থেকে মুসলিম কারিগরেরাই ছিলেন বিশেষ পারদর্শি। এখন মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকই এই শিল্পের সাথে দক্ষতার সাথে জড়িত। প্রাচীনকাল থেকেই এ ধরনের কাপড় তৈরির জন্য শীতলক্ষা নদীর পাড় বরাবর পুরাতন সোনারগাঁ অঞ্চলটিই ব্যাপক উৎপাদন কেন্দ্র। বর্তমানে রূপগঞ্জ সোনারগাঁও এবং সিদ্ধিরগঞ্জে প্রায় ১৫৫টি গ্রামে এ শিল্পের বর্তমান নিবাস। একটি জামদারি কাপড় বুনতে প্রতিটি তাঁতে দুজন করে কারিগর থাকেন। এদের একজন দক্ষ এবং একজন শিক্ষানবিশ একজন জামদানি শিল্পী প্রকৃত অর্থেই শিল্পী। বহু মেধা ও শ্রমের বিনিময়ে মনের মাধুরী মিশিয়ে

জামদানি শাড়ি সে তৈরি করে। জামদানি শিল্পের নান্দনিক মর্যাদাময় বয়ন নকশা এবং অসাধারণ কারিগরি নিপুণতা সব সময় আমাদের তাঁতশিল্পের এক উজ্জলতম অবিস্মরণীয় উদাহরণ। জামদানি বয়ন নকশা ইরানের কিংখাব বয়ন নকশা জামদানিকে প্রভাবিত করেছে। পুরনো জামদানি শিল্পকর্মগুলো পৃথিবীর বয়নশিল্পের ইতিহাসে এককেটি প্রামাণ্য দলিল। উন্নতমানের জামদানি তৈরিতে ১২০ কাউন্টের সুতা ব্যবহার করা হয়। সর্বোৎকৃষ্ট নিপুণ মসলিন জামদানি বুনন নকশা কাজকে আঞ্চলিক ভাষায় বলা হয় পডি। যারা জামদানি বয়ন শিল্পের সাথে জড়িত তাদেরকে বলা হয় পডিদার। এ অর্থে জামদানি গোটা বস্ত্রে তাঁত বোনার মাধ্যমেই ফুল তোলা নকশা। জামদানি কয়েক ধরনের নকশার মাধ্যমে বোনা হয়। বুটিদার নকশা, তেরছি নকশা ও জালি নকশা বা জাল নকশা। তেরছি নকশা শাড়ির জমিনের অংশে এক পাড় থেকে অন্য পাড় পর্যন্ত আড়াআড়ি করে হেলানো ভাবে বোনা নকশা যা কোনো ক্রমেই পাড়ের নিজস্ব নকশার ধারাকে বিঘ্নিত করে না। জালি নকশা বা জাল নকশা বলতে সারা শাড়ির জমিনে জালের মতো ছড়িয়ে থাকা রেখা চিত্রের নকশা।[৬৫]

তবে আঁচল ও পাড়ের নকশার সাথে জমিনের নকশার কোনো মিল থাকে না। সাধারণত জামদানির নামকরণ হয় জমিনের নাম অনুযায়ী। পরিবেশ, প্রকৃতি, ধর্মীয় বিশ্বাস, লোকাচার, সমসাময়িক ঘটনাকে কেন্দ্র করে।

জামদানি শাড়ির নকশা তৈরি হয় বংশপরম্পরায়। জামদানি শাড়ির পাড়ের অসংখ্য নাম রয়েছে। যেমন পুঁইলতা, শাপলা ফুল পাড়, কচিপাতা, সাজনা পাতা, গাছ পাইর, চশমা, ঢেকি, বটপাতা, বেলপাতা,কুলপাড়, পক্ষীপাড়, পুঁটিমাছ পাড়, ঝিনুক দানা পাড়, নিমপাতা পাড়, প্রজাপতি পাড়, টাংগাইল পড়, বৌপাড়, শঙ্খপাড়, চারপাতা পাড়, কচুরি পাড়, ময়ূর পেখম পাড়, সাবুদানা পাড়,কলকা পাড়, করলা বিচি পাড়, ঘুড়ি পাড়, দুবলা জাল পাড়, চাটাই পাড়, বাদাম পাড় ইত্যাদি। ২০১৩ সালের ৪ ডিসেম্বর বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী জামদানি ইউনেসকোর আওতাধীন বিশ্ব মানবতার অপরিমেয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতিনিতিত্বমূলক তালিকায় স্থান পেয়েছে। আজারবাইজানের রাজধানী বাকু শহরে অনুষ্ঠিত ইউনেসকোর অপরিমেয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিষয়ক আন্তর্জাতিক কমিটির অষ্টম বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।[৬৬]

জামদানির কদর শহরের হিন্দু মুসলমান ও অন্যান্য ধর্মালম্বী মেয়েদের সবচেয়ে পছন্দের শাড়ি। তবে জামদানি শাড়ির জমিন খুব হালকা হওয়ার কারণে মুসলিম মেয়েরা বড় হাতার ব্লাউজের সাথে মিল করে পরে। এছাড়া পশ্চিমবাংলায় জামদানি শাড়ির যথেষ্ট কদর রয়েছে। বর্তমানে একটি উন্নত মানের জামদানি শাড়ির দাম পঁচিশ ত্রিশ হাজার টাকা। বিয়ের অনুষ্ঠানে যে কোনো উৎসবে জামদানি শাড়ি আভিজাত্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। মূলত মসলিনের স্থান জামদানি শাড়ি অনেকটাই পুরণ করতে সক্ষম হয়েছে। [৬৭]

wPÎ-57: Rvg‘wb c¯‘ÍZKvix

wPÎ-58: Rvg‘wbi †ZiwQ bKkv

5(T) wPwÎZ kxZjcwU

শীতলপাটি বাংলাদেশে এক ঐতিহ্যবাহী নৃতাত্ত্বিক শিল্প। এই শিল্পের বুনন সম্পূর্ণ জ্যামিতিক প্যার্টানে তৈরি হয় বলে এটি ইসলামী নকশাকলার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো এই যে, পৃথিবীর অন্য কোথাও পাটি উৎপন্ন হয় না বলে অনেক ঐতিহাসিকরা এ ধারণা পোষণ করেন। সিলেটে মোর্তা, সিরাজদিখানে মোত্রাবেত, কুমিল্লার মোতাবাইক, নোয়াখালিতে মোস্তাক, ফরিদপুরের সাতেরে পাটি, ঝালকাঠিতে পাইত্তা, সিরাজগঞ্জে পাটি বেত নামে পরিচিত এক বীজপত্রী এ উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম ম্যারেন্ট ডিকোটমা (Maranta Dichotoma)। প্রায় চার পাঁচ ফুট উচু এক কাণ্ড বিশিষ্ট গুল্ম ছায়ায় ভালো জন্মে। দেখতে এই উদ্ভিদ সরল লাঠির মতো। ধারালো দা দিয়ে মুর্তার লাঠি কয়েক ফালি করে ছাল থেলে বুক আলগা করা হয়। ওপরের আবরণের তলায় সাদা ধবধবে নরম স্পঞ্জের মতো বস্তু থাকে। এ অংশ আলগা করে নিয়ে শুকিয়ে খড়ি হিসেবে ব্যবহার করা হয়।[৬৮] মূর্তার আসল বস্তু তার ওপরের তেলেতেলে মসৃণ বাকল। এ ছালকে কয়েক অংশে ভাগ করে খিল, বেত, বেতি বা পাতিতে ভাগ করে তা দিয়ে পাটি বোনানো হয়। এ পাতির তলার অংশ খসখসে। দুই হাতে চিরে নীচের অংশকে উপরের অংশ থেকে আলাদা করা হয়। শীতলপাটি বোনা হয় মূর্তার স্বাভাবিক রঙের বেতি বা পাতি দিয়ে। গাঢ় দুধের সরের রঙ বা হাল্কা ক্রিম কালার হলো শীতলপাটির স্বাভাবিক রঙ। ভাতের ফেনার সংগে টক মিশিয়ে সিদ্ধ করলে এর রং একটু সাটাটে হয় এবং এর মসৃণতা বেড়ে যায়। মাটির নিচে কাঁদায় কিছুদিন পুঁতে রাখলে বেতি কারো রং ধারণ করে।

পাটি বোনা শুরু হয় মাঝখান থেকে তির্যক বা তেছরা গতিতে। বুনন এইভাবে চলে, বোনার সময় ঘন ঘন পানি দিয়ে ভিজাতে হয়। ম্যাট বোনার ছয়টি পদ্ধতির মধ্যে (Chech, Willed, Twilled, Wrapped and Hexagonal) শীতল পাটি বুনন Willed বা Twilled বা দোধরা বুনন প্রয়োগ করতে হয়। তোধারা বুনটে বানান একটি বেতির নিচের তানার তিনটি একটি একটি করে ছিঁড়ে বুনট এগিয়ে চলে।

শীতলপাটির নকশার রেখা মোটা করার জন্যে দোধারা পরিবর্তন করে তেধালা বুনট করা হয়। চিউনি বা বোটনীর বুনট মূলত দোধারা। ৫ থেকে ৭ ফুট আকারের চিউনি বোটনী বোনা হয় সিদ্ধ ধান চাল ডাল ইত্যাদি রোদে শুকানোর জন্য এবং বিছানায় ব্যবহারের জন্য। বোটনী কেবল ছোট আকারের জায়নামাজ হিসেবে বর্ণিত হয়ে থাকে।[৬৯] মাদুর শিল্পের মধ্যে শীতলপাটি সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। বস্তুত পাটি অথবা মাদুর শিল্প বৃত্তিভুক্ত হলেও তা একান্তভাবেই নারী সমাজের সৃষ্টি। সুত্তার পাটি, নল-খাগড়ার দরজা, মলুয়ার পাটি, হোগলার ছাঁচ, বাঁশ বেতন এবং ক্ষেত্র বিশেষে তালপাতার ধাড়া-ধাড়ি চাটাই ইত্যাদি বিভিন্ন নামে বাংলার সর্বত্র অল্পবিস্তর পাটির ব্যবহার বিদ্যমান। তবে সিলেটের বালাগঞ্জের শীতলপাটি বিখ্যাত। বালাগঞ্জের গৌরিপুর ইউনিয়নের তেঘরিয়া গ্রাম ছিলো শীতলপাটি তৈরির প্রধান স্থান। এছাড়াও গৌরিপুর, আতাশন, চানপুর, শ্রীনাথপুর, মহিসাসি, লেহামুড়া, খুজকিপুর, কুয়ারগাঁও, খাশিপুর এবং তিলক চানপুর ছিলো শীতলপাটি তৈরির জন্য প্রসিদ্ধ। এ অঞ্চলের শীতলপাটি, জায়নামাজ, আসন পাটি ইত্যাদি নানা কারুকার্যে তৈরি হতো।[৭০] গ্রাম বাংলায় পাটির সবচেয়ে কদর বেশি। খাড়া ও আড়াভাবে বেতি সাজিয়ে বোনা পাটিকে বলা হয় চিউনি। শীতলপাটি মূলত গ্রীষ্মকালে বিছানার ওপর বিছিয়ে রাখা হয়। এ ধরনের পাটিতে ঘুমালে শরীর ঠান্ডা রাখে। সুতরাং গ্রাম বাংলার হিন্দু মুসলমান প্রতিটি ঘরে ঘরে এই শীতলপাটি ব্যবহার দেখা যায়। যদিও পাটি বয়ন শিল্পভুক্ত, তারপরও পাটি শিল্পায়নের চিত্র বা নকশা নির্মাণের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য নকশি কাঁথা সমগোত্রীয় এবং আলপনা চিত্রেরই অন্তর্ভুক্ত। আলোকচিত্রের এই শীতলপাটি ইসলামী উদ্ভিদীয় নকশায় নির্মিত (চিত্র ৫৯)। গাছ ও পাতা নকশার চমৎকার সাদৃশ্যতা বজায় রয়েছে। একাডেমি লোক ও ঐতিহ্য সংগ্রহশালার জন্য বালাগঞ্জ সিলেট থেকে ১৯৭৩ সালে মোহাম্মদ সাইদুর সংগ্রহ করেছিলেন।

চিত্র-৫৯: উদ্ভিদীয় নকশায় তৈরি শীতল পাটি

এ সংগ্রহশালার আরেকটি নিদর্শন হলো বিমূর্তভাবে লতাপাতা ও মসজিদ আঁকা চাউনি (চিত্র ৬০)। এটি আসলে ব্যবহারিক কাজের পরিবর্তে নান্দনিক ও সৌন্দর্য সৃষ্টির লক্ষে তৈরি। চাউনির এ নকশাটির সাথে ইসলামী ঢেউ তোলা নকশার সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

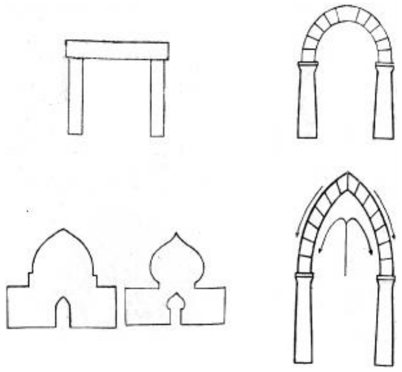

চিত্র-৬০: বোটনী   চিত্র-৬১: জায়নামাজ   রেখা চিত্র-৬২

শীতল পাটির জায়নামাজ বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে খুবই জনপ্রিয়। কারণ শীতলপাটিতে নামাজ আদায় করা ভীষণ আরামদায়ক। লোক ঐতিহ্য সংগ্রহশালার এই শীতলপাটিতে নির্মিত জায়নামাজটির মধ্যে সর্দল, সাধারণ ডিম্বাকৃতি গম্বুজ ও কন্দাকৃতি গম্বুজ নকশায় তৈরি করা হয়। সুতরাং ইসলামী নকশাকলার প্রভাব লোকশিল্পে দেখতে পাওয়া যায়।

চিত্র-৬৩: লিখিত শীতল পাটি

লোক ঐতিহ্য সংগ্রহশালার শীতলপাটির (চিত্র ৬৩) বুননির মধ্যে বাংলা কবিতা লেখা হয়েছে। মাদুরের মধ্যে বাংলা বর্ণমালার ব্যবহারে নকশা করার রীতি এই বৈশিষ্ট্যটি সম্পূর্ণ ইসলামী শিল্পকলার। বাংলা বর্ণমালায় লেখা হয়েছে পাখি, বসন্ত, ফুল নিয়ে ছন্দ। খুব দক্ষভাবে মাদুর তৈরি করতে পারলেও বাংলা হাতের লেখা পাকা হয় সেটা লেখনির মধ্যে স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশে পাটি বয়নশিল্পীদের মধ্যে রোশনা বেগমের নাম উল্লেখ করার মতো। তার জন্ম ফেনী জেলার মধ্যচাঁদপুর গ্রামে। পাটি পাতা দিয়ে মাদুর (বোটনি) বোনার কাজ তিনি শেখেন ননদের কাছ থেকে। এরপর তিনি নিজের চেষ্টায় মাদুরের বিভিন্ন নকশা তুলতে দক্ষ হয়ে ওঠেন।[৭১] তার বানানো মাদুর কারুপল্লী ফাউন্ডেশনের সর্দারবাড়ির গ্যালারিতে সংরক্ষিত আছে। তার নকশা করা জায়নামাজের পাটিতে ইসলামী বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়।

শতরঞ্জি

শতরঞ্জ শব্দটি ফার্সি ভাষার অর্ন্তগত। দাবা খেলার ছককে শতরঞ্জ বলা হয়ে থাকে। শতরঞ্জ বা ডুরি এক প্রকার কার্পেট যা সমাজের অভিজাত বা বিত্তবানদের গৃহে বিশেষ আসন হিসেবে এক সময় ব্যবহৃত হতো। ইংরেজিতে শতরঞ্জিকে বলা হয় Coarse striped cotton carpet. শতরঞ্জি তৈরি প্রক্রিয়া অত্যন্ত সরল সহজ এবং বৈচিত্র্যময়। এর তৈরির মূল উপকরণ হলো সুতা। বিশেষ করে শতরঞ্জি নকশা তৈরিতে বিভিন্ন রঙের উজ্জল সুতার ব্যবহার বেশি হয়। শতরঞ্জির নকশাসমূহের বিভিন্ন নাম রয়েছে। হাতির পা, ঘাটক, আতাই, আখিরা, পাটগ্রাম, খুলনা, পাবনা, যমুনা, মেঘনা, পদ্মা, তিস্তা, ধলেশ্বরী, নাফ ইত্যাদি। শতরঞ্জিতে ফুললতা পাতা, বিভিন্ন জ্যামিতিক আকার ছাড়াও মসজিদের মিনার, খিলান, মাছ, নৌকার নকশাও ফুটিয়ে তোলা হয়।[৭২] লক্ষণীয়, শতরঞ্জি নকশার সাথে ইরানি কার্পেটের খুরের নকশা ও কোনিয়ার কার্পেটের নকশার মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। বর্তমানে বাংলাদেশের রংপুর জেলার পীরগাছা থানার মংলাকুটি গ্রামের শতরঞ্জি শিল্পী আনোয়ার হোসেন এবং তার স্ত্রী বিউটি দক্ষ কারুশিল্পী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন।[৭৩] বিভিন্ন মেলায় এই দম্পতি অংশ গ্রহণ করে শতরঞ্জি তৈরি করে দেখিয়ে থাকে।

চিত্র-৬৪: বিউটি বেগমের শতরঞ্জি তৈরি পদ্ধতি

৫(ট) ঝুড়িবোনা শিল্প

বাংলার কারুশিল্পে অপূর্ব নিদর্শন পাওয়া যায় ঝুড়িবোনা শিল্পে। এই শিল্প তৈরি হয় সম্পূর্ণ জ্যামিতিক প্যার্টানে। সুতরাং ইসলামী নকশাকলাই হলো এই শিল্পের মূল বৈশিষ্ট্য। গ্রামীণ সমাজের কৃষক পরিবারে, কৃষি ক্ষেত খামারে এই শিল্পের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি।

বাংলাদেশের প্রচুর পরিমানে বাঁশ, বেত, মুর্তা, নল-খগড়া উদ্ভিদ পাওয়া যায়। বাংলাদেশে এগারো জাতের বাঁশ রয়েছে। বাংলাদেশে সিলেট জেলায় সবচেয়ে বেশি বেত জন্মায়। বাঁশ দিয়ে তৈরি হয়

দোতলা, চারচালা ঘর, দরজা, মাথাল, ডালা, কুলা, ঝুড়ি, চালনি, ধামা, সাজি, আড়বাঁশি, নৌকার ছই, মাছ ধরার ফাঁদ, গরুর মুখের ঠুসি ইত্যাদি। বাঁশের বেতি ও চিকন শলা দিয়ে তৈরি করা হয় কুলা। সকল ধর্মের এবং সকল শ্রেণির মানুষ ধান চাল ঝাড়ার কাজে কুলার ব্যবহার ছাড়াও মাঙ্গলিক আচারে কুলা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বাঁশের কুলার মধ্যে লাল সবুজ রঙে বেশিরভাগ বরফি প্যাটার্নের নকশা তৈরি করা হয়। বেতের তৈরি আসবাবপত্র ও তৈজসপত্র দেখতে খুবই আকর্ষনীয়। বেতের আসবাব পত্রের মধ্যে রয়েছে চেয়ার, টেবিল, মোড়া সোফা, আয়নার ফ্রেম ধামা, সাজি, পাতি, ঝুড়ি, বাক্স ইত্যাদি।[৭৪] ঝুড়ি, কুলো, ডালা, মাদুর এবং হাতপাখা ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহার হয় বাঁশ, শর, বেত, ঘাস, তালপাতা, খেজুরপাতা এবং নারকেলপাতা। ঝুড়ি, মাদুর এবং পাখার মধ্যে মধ্যে ফুটকি দিয়ে জ্যামিতিক অলংকরণে তৈরি করা হয় নানারকমের বর্ণাঢ্য নকশা।

চিত্র-৬৫, ৬৬: বংশপরম্পরায় ঝুড়িবোনা শিল্পে নিয়োজিত লোকশিল্পী

মাথাল

ঝুড়ি বোনা শিল্পের একটি নিদর্শন হলো মাথাল। কৃষকরা ধান ক্ষেতে কাজের সময় ও রোদ বৃষ্টি ঝড়ে রক্ষা পেতে মাথায় ছাতির পরিবর্তে মাথাল ব্যবহার করে। মাথাল সাধারণত বাঁশ দিয়ে তিন চার পাঁচ শলাবিশিষ্ট করে তে'ধারা বুননে তৈরি হয়।[৭৫] এই বুননের মধ্যে জ্যামিতিক প্যার্টানের নকশা তৈরি হয়। ফলে দেখা যায় এটি কখনো গোল গম্বুজ, কখনো টুপির আকৃতির মতো তৈরি করা হয় (চিত্র ৬৭)। বাংলা একাডেমির লোক ঐতিহ্য সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত মাথালটি কন্দাকৃতির গম্বুজের মতো দেখতে মনে হয়।[৭৬]

চিত্র-৬৭: বাংলা একাডেমি লোক ঐতিহ্য সংগ্রহশালা

৫(ঠ) শোলা শিল্প (Sponge-wood Work)

বাংলার মালাকারদের হাতের শোলার কাজ অর্থাৎ ডাকের কাজ চিরপ্রশংসিত শিল্পসৌন্দর্য। শোলা এক প্রকার নরম জলজ উদ্ভিদ। শোলার উপরের পাতলা খোসা ফেলে দিলে এক ধরনের দুধের মতো সাদা ঝকঝকে অংশ পাওয়া যায়। এই সাদা অংশ দিয়ে বাংলাদেশের মালাকার সম্প্রদায়ের শিল্পীরা নানা ধরনের জিনিস তৈরি করে থাকে (চিত্র ৬৮)। শোলা দিয়ে তৈরি হয় মুকুট, জীবজন্তু, মালা, অলংকার, খেলনা, পুতুল ও বিভিন্ন ধরনের ফুল।[৭৭] বাংলাদেশে এই মালাকার শ্রেণিটির বেশির ভাগই হলো কারিগর হিন্দু। বর্তমানে মুসলমানদের বিয়ের স্টেজ, জন্মদিনের অনুষ্ঠানে সোলার ওপর বর কনের নাম লেখা হয়। এই শিল্পের সমস্যা হলো বেশিদিন টিকে থাকে না। শোলা দিয়ে তৈরি গোলাপ ফুল, বেলি ফুলের গলার মালা দেখতে দারুণ চমৎকার। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে শোলার কাজের সামান্য উপাদান সংরক্ষিত আছে।

চিত্র-৬৮: কর্মরত শোলাশিল্পী

৫(ড) দারুশিল্পে নকশা

সুদুর প্রাচীন কাল থেকে মানুষের জীবনে কাঠ অপরিহার্য উপাদান হিসেবে ব্যবহার করে আসছে। সুতরাং কাঠের ব্যবহার জন্ম থেকে মৃত্যুর শেষ দিন পযন্ত। কাঠের তৈরি বাড়িঘর, আসবাবপত্র, যানবহন, ধর্মীয় অনুসঙ্গ, পুতুল, ভাস্কর্য ইত্যাদি দারুশিল্পের পর্যায়ভুক্ত করা হয়।[৭৮] ঢেঁকি, গাইল, নারকেল কোরানি, কারুকার্যশোভিত কাঠের দরজা-জানালা, সিন্দুক, খাট-পালক এবং অলংকৃত কাঠের ভিম উল্লেখযোগ্য। তোফায়েল আহমেদের ‘বাংলাঘর’ সংগ্রহশালার রেহেলের নকশার মধ্যে (চিত্র ৬৯) রোজেট ও লতা-পাতার সংবলিত অ্যারাবেকস নকশার মধ্যের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।[৭৯] বাংলা একাডেমির লোক ঐতিহ্য লোক সংগ্রহশালার রেহেলটির মধ্যে (চিত্র ৭০) তারা ফুল এবং ঢেউ খেলানোর নকশার সাথে জ্যামিতিক প্যান্টার্ন নকশার সম্মিলিত প্রয়োগে অলংকৃত করা হয়েছে। কারুপল্লী ফাউন্ডেশনের নকশাকৃত সিন্দুকটির (চিত্র৭১) মধ্যে যে নকশা দৃষ্টিগোচর হয় এর

মধ্যে সুলতানী আমলের মসজিদে ব্যবহৃত টেরাকোটা অলংকরণের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। এই সিন্দুকের মধ্যে কয়েকটি প্যানেলে বিভক্ত করে নকশা তৈরি করা হয়েছে। খেজুর গাছ বা পাম নকশা ইসলামী নকশার অন্যতম মটিফ। তেমনি বাংলার লোকশিল্পী বাংলার নারকেল গাছের পাতা, তাল গাছের পাতা নকশায় ব্যবহার করেছে। কাঠের নকশি পিঁড়ি চিত্রের (চিত্র ৭২) মধ্যে বাংলার বটপাতা সম্মলিত নকশা ইসলামী উদ্ভিদিয় নকশার সাথে সাদৃশ্য রয়েছে। এভাবে বাংলার দারুশিল্পে জ্যামিতিক নকশায় ইসলামী নকশাকলার প্রভাব পড়েছে।

চিত্র-৬৯: তোফায়েল আহমেদের বাংলা ঘরে সংরক্ষিত ছিলো

চিত্র-৭০: কাঠের ন্কশি রেহেল বাংলা একাডেমি ঐতিহ্য সংগ্রহশালা

চিত্র-৭১: সিন্দুকর প্যানেলের মধ্যে নকশাকৃত খেজুর পাতার নকশা

চিত্র-৭২: কাঠের নকশি পিঁড়ি

বাংলার শৌখিন শিল্পায়িত নৌকা

বাংলার সবচেয়ে লোকযান হলো নৌকা। নৌকায় করে মানুষ নদীপথে গ্রামের পরে গ্রাম পেরিয়ে সাগরের দিকে ছুটে গেছে। সুতরাং কাঠের তৈরি নৌকার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। এক সময় বাংলার মুসলমান শাসকদের সামরিক প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিলো নৌবহর। গিয়াসউদ্দিন আওয়াজ খালজি নৌবহর প্রতিষ্ঠা করেন। ফকরুদ্দিন মোবারক শাহ এবং শাসমুদ্দিন ইলিয়াস শাহের সময় নৌবহরের বিশেষ উন্নতি হয়। এভাবে তাদের প্রচেষ্টায় নৌবাহিনী একটি শক্তিশালী সামরিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। বাংলার অন্যান্য শিল্পের মতো নৌশিল্প একটি লোকায়ত শিল্প।[৮০]

বাঙালিরা নৌকা নির্মাণে যেমন দক্ষ ছিলো তেমনি নৌচালনায় ও নৌযুদ্ধে নিপুণ ছিলো। বাংলায় এখনো পর্যন্ত এই শিল্পকলা নিয়ে বিশেষ কাজ হয়নি। প্রাচীন ধর্ম, সাহিত্য, কাব্য, শিল্পকলা ও স্থাপত্যে নৌকা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। মধ্যযুগে যুগের কাব্যে শঙ্খচূড়, কাজলরেখা, আগলপাগল, রাজহংস, সাগরফেনা, লক্ষীপাশা ইত্যাদি ধরনের নাম পাওয়া যায়। নদীমাতৃক বাংলাদেশে অনেক নদীনালা শুকিয়ে যাওয়ার ফলে নৌকার সংখ্যা কমে গেছে। এখনও বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের অনেক স্থানে নৌকায় হলো চলাচলের বড় মাধ্যম। এ সব নৌকার মধ্যে কেরাই নৌকা কাঠ কাষাকোষি, ডিংগী, দোনাদোনি, ভেলা, বালাম, ছিপ, বজরা, পতেলা, সাম্পান, টালাই নৌকা পানসি, ময়ূরপঙ্খি, পাতাম, উরবী নৌকা, খেলুয়া, চাঁদপুর নৌকা, জেলে নৌকা, বজরা নৌকা, প্যাটের নৌকা, বালামী নৌকা, যশোর নৌকা, জয়নগর নৌকা, ভাওয়ালী ইত্যাদি নামে ভিন্নভিন্ন চেহারার হয়ে থাকে।[৮১]

সম্পান, পানসি, বজরা, ভাওয়ালীয়া, ময়ূরপঙ্খি ইত্যাদি শৌখিন শিল্পায়িত নৌকা। এ ধরনের নৌকার সামনে গলুই এ খোদাই করে কুমির, পাখি,চিল, ময়ূরের মুখ তৈরি করা হয়। নৌকার দুই পাশে যেটুকু পানির ওপর থাকে তাতে কাঠ খোদাই করে অথবা রং তুলি দিয়ে নানা রকম বাংলার লতাপাতা, মাছ, পাখি, চোখ, পদ্ম, আলপনা, জ্যামিতিক নকশা চিত্রিত করা হয় (চিত্র ৭৩)। আবার ধাতব পাতের সাহায্যে চাঁদ, তাঁরা, চোখ, ফুল, জ্যামিতিক নকশা নৌকার গলুই- এ স্থাপন করা হয় নৌকার ও গলুয়ের নকশার সাথে সাথে নৌকার ছই ও দাঁড় বিভিন্ন রঙে রাঙানো হয়। বাইচ নৌকা বিভিন্ন ধরনের নকশা করা হয়ে থাকে।[৮২] শরিয়তপুর, কুষ্টিয়া, পাবনা, বরিশাল জেলার নৌকার গলুই-ধাতব পাত দিয়ে চাঁদ, তাঁরা, পাখি, জাহাজ, চোখ অলংকরণ করা হয়। বাইচের নৌকা নির্মাণে ও অলংকরণে পূর্ববঙ্গের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি।[৮৩] সুনামগঞ্জ, নেত্রকোণা, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নৌকা সারিন্দা জাতীয়। এ সব নৌকার গলুই থেকে শুরু করে পানির ওপর নৌকার যে অংশটুকু থাকে তাতে রং বেরঙের আলপনা, জ্যামিতিক অলংকরণ পশুপাখি চিত্রিত থাকে। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের নৌকার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মডেল তৈরি করা আছে।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-৭৩: বাইচ নৌকার মডেল জাতীয় জাদুঘর

চিত্র-৭৪: বিভিন্ন নৌকার মডেল

৫(ঢ) লোক অলংকার (Folk Ornaments)

এক সময় ঢাকা ছিলো অলংকার শিল্পের জন্য শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। জাতীয় জাদুঘরের গলা হাঁসুলির (চিত্র ৭৫) মধ্যে ইসলামী নকশার সুস্পষ্ট ছাপ পরিলক্ষিত হয়। হারের মধ্যভাগের পেঁচানো লতার সাথে গোলাপফুল ও পাপড়ির সম্মিলিত নকশা করা। এ ধরনের নকশা ষাট গম্বুজের মসজিদের রোজেট নকশা সাথে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। হাসুলির উপরিভাগের দুই পার্শ্বে করা হয়েছে মাছ নকশা এবং হাঁসুলির আটকানো মুখে দুটি সাপের মুখাকৃতি দেয়া হয়েছে।[৮৪] সুতরাং এই নকশায় বাংলার দেশীয় শিল্প রীতি এবং ইসলামী অলংকরণের সংমিশ্রণে চমৎকার নকশার একটি নিদর্শন সৃষ্টি হয়েছে।

চিত্র-৭৫: জাতীয় জাদুঘর

চিত্র-৭৬: কারুপল্লী ফাউন্ডেশন

4(Y) avZe †Lv‘vB wkí

বাংলাদেশের লোকশিল্পীদের সবচেয়ে পুরাতন এবং ঐতিহ্যমণ্ডিত শিল্পগুলোর মধ্যে ধাতুশিল্প হলো অন্যতম। বর্তমানে বাংলাদেশের বিভিন্ন সংগ্রহশালায় কাঁসা পিতলের দ্রবাদির মধ্যে তৈজসপত্র সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কাঁসা পিতলের কাজ যারা তাদেরকে বলা হয় ঢোকরা কামার। বাংলাদেশে এই শ্রেনির কামার বেশিরভাগ হিন্দু। পশ্চিম বাংলা এ শিল্পের জন্যে খুব প্রসিদ্ধ। পিতল কাঁসার পারিবারিক ব্যবহার্য দ্রব্য তৈরির ক্ষেত্র হিসেবে বাঁকুড়া শহর, সোনামুখী, বিষ্ণুপুর, পাত্রসায়ের, কেঞ্জাকুড়া, অযোধ্য, মদনমোহনপুর, লক্ষ্মীসাগর প্রভৃতি বিখ্যাত।[৮৫] বাংলাদেশের কারিগরদের তৈরি কাঁসার কলস, গ্লাস, জগের মধ্যে খোদাইকৃত অসাধারণ নকশা যা ইসলামী নকশাকলার সাথে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। এ দেশের কারিগরদের নিখুঁত খোদাই অলংকরণ কৃতিত্বেই পরিচয় বহন করে থাকে[৮৬]। এক সময় পারস্যের মুসলমান শিল্পীদের তৈরি মাটির পাত্র রং এবং নকশার জন্য বিশ্বে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছিলো। তারা দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি এবং মসজিদের জন্য বাতিদান অত্যন্ত সুন্দর ও সুচারুরুপে নির্মাণ করতে পারতেন। ব্রোঞ্জ এবং পিতলে তৈরি দ্রব্যাদির উপরিভাগে স্বর্ণ ও রৌপ্যের আস্তর দেয়ার সুনিপুণ কৌশলে তারা অসংখ্য তৈজসপত্র ও সৌখিন দ্রব্য নির্মাণ করতেন।[৮৭]

দ্বাদশ শতকে সেলজুক আমলে একধাতুর পাত্রের গায়ে খোদাই করে অন্য ধাতু বসানো নকশার কাজে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিলো। এসব পাত্র সাধারণত তৈরি হতো পিতল ও কাঁসা দিয়ে। এসব ধাতু পাত্রের গায় নকশা করে তার মধ্যে তামা রুপার তার পিটিয়ে তৈরি করা হয়। অনেক সময় দামি ধাতব দ্রব্যের মধ্যে পাথরও বসানো হয়। বিশেষ করে মধ্যযুগে রাজা এবং অভিজাত শ্রেণির অনেকের ব্যক্তিগত

গৃহে ও দরবারে অসংখ্য মূল্যবান দূর্লভ নিদর্শন থাকত। অবসরে এসব নিদর্শন তারা দেখতেন এবং বিনোদনের জন্য সময় কাটাতেন। পাকিস্তান আমলে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আনা গৃহসজ্জার জন্য বহু ধাতব শিল্পকর্ম ঢাকার সম্ভ্রান্ত বিপণী কেন্দ্রগুলোতে শোভা পেতো। ব্যবসায়িক সাফল্যও ছিলো প্রচুর।[৮৮]

তামা এবং দস্তা মিশিয়ে পিতল তৈরি হয়। তামা এবং টিন মিশিয়ে তৈরি করা কাঁসার বাসনপত্রাদি। থালা, ঘটিবাটি, পানপাত্র এবং গৃহস্থালির অন্যান্য তৈজস তৈরিতে বাংলাদেশে এই কাঁসার প্রচলন ছিলো সবচেয়ে বেশি। বাংলাদেশের ধাতবশিল্পের যে সকল প্রতিষ্ঠান আছে তার অধিকাংশই মৃৎশিল্পের মতো গোষ্ঠীগত ব্যবসায় হিসেবে চলে আসছে।[৮৯]

অপেক্ষাকৃত কম মূল্যের ধাতু, তামা, কাঁস, ব্রোঞ্জ, পিতল প্রভৃতি ধাতব শিল্পে বহুল ব্যবহৃত উপকরণ। উল্লেখ্য যে, তামা লোহা, জিঙ্ক, এলুমিনিয়াম, সোনা, রুপা, সীসা ইত্যাদি একক ধাতু। পিতল, কাসাঁ, ব্রোঞ্জ, পঞ্চলোহা (তামা, পিতল, সীসা, রুপা, তামা, জিঙ্ক, সীসা টিন, লোহা, মারকার) মিশ্রধাতু। ধাতবশিল্পে পিতলের ব্যবহার অতীতকাল থেকে জনপ্রিয়। খোদাই, ইনলে, ঠোকাই এবং ঢালাই এ শিল্পের অলংকরণের কয়েকটি পদ্ধতি। পাত্রের গায়ে ধারাল কলম হাতে চালিয়ে অথবা ছোট ছেনি হাঁতুড়ি দিয়ে ঠুকে জ্যামিতিক ও ফুল, লতা-পাতার জটিল নকশা খোদাই করা হয়।

চিত্র-৭৭: ধাতব খোদাইচিত্র

এ ধরনের নকশা মসজিদ অলংকরণে দেখা যায়। বর্তমানে নকশার অংশ বাদ দিয়ে বাকি অংশ পিচ দিয়ে ঢেকে এসিড দ্রবণে ডুবিয়ে দিলে আবৃতাংশ বাদে নকশার স্থানে গর্ত হয়ে যায়। রাসায়নিক

প্রক্রিয়ায় পাত্রের গায়ে রং করা হয়। খোদাইয়ের আরেকটি নাম মোরাদাবাদী। ভারতের মোরাদাবাদে এ শিল্পের ঐতিহ্য দীর্ঘদিনের।[৯০] বরেন্দ্র গবেষণা সংগ্রহশালা, জাতীয় জাদুঘর, লোক ও কারুপল্লী ফাউন্ডেশন, লোক ঐতিহ্য সংগ্রহশালায় ধাতব গ্যালারিতে বহু নিদর্শন রয়েছে।

পানবাটা

পান খাওয়া বাঙালি সমাজে খুবই প্রচলিত। সকল শ্রেণির মধ্যে পান খাওয়ার রেওয়াজ প্রাচীন কাল থেকে। বিয়ের কথাবার্তা পাকা হলে উভয় পক্ষ পান আদান প্রদান করা হয়। এ কারণে ধাতব দিয়ে গড়ানো পান পাত্র তাদের আভিজাত্য বাড়িয়ে দিতো। প্রতিটি উপাদান চমৎকারভাবে নকশাকৃত বাঙালি সমাজের অভিজাত পরিবার থেকে অত্যন্ত দরিদ্র শ্রেণির মানুষের মধ্যে পান খাওয়ার প্রচলন রয়েছে। পান সংরক্ষণ করা হয় পাটাবাটায়। আগেকার দিনে পানের বাটা অভিজাত ও নবাব ও রাজপরিবারের মানুষের জন্য রুপা দিয়ে পাটা বাটা গড়িয়ে নিতেন। লোক ও কারুপল্লী ফাউন্ডেশনের পিতলের তৈরি নকশিমণ্ডিত বাহারি পান বাটার মধ্যে ইসলামী জাফরিকাটা নকশা লক্ষ করা যায়।

wPÎ-78: bKwk cvbevUv

নকশি জগ

পাকিস্তান আমলে এদেশে পিতল ও কাঁসার তৈরি জগ কলস (চিত্র ৭৯) বাংলার অভিজাত ঘরে শোভা পেতো। গ্রামে গঞ্জে শহরে অভিজাত পরিবারে পিতলের জগের ব্যবহার অনেক বেশি ছিলো। হিন্দু মুসলমানের বিয়ের অনুষ্ঠানে উপহার সামগ্রীর মধ্যে কাঁসার জগ, বদনা ও গ্লাস ছিলো চমৎকার উপহার। বর্তমানে কাঁসা পিতলের জগের প্রচলন একেবারে উঠে গেছে। ব্যবহারিক কাজে এ ধরনের জগের ব্যবহার একদম নেই। বাংলা একাডেমির লোক ও ঐতিহ্য সংগ্রহশালার এই জগটির মধ্যে খোদাই করে ইসলামী ফুল ও লতা অলংকরণের অ্যারাবেকস নকশা, মাকড়সার জাল, রোজেট নকশার কারুকার্য করা হয়েছে।[৯১]

চিত্র-৭৯: নকশি জগ

কুলা

বাংলাদেশে কুলার ব্যবহার সাধারণত ধান চাল, গম, ডাল ইত্যাদি কাজে ব্যবহারের জন্য। বাঁশের তৈরি ডালা, কুলা, ঝুড়ি চালনী বহু প্রাচীনকাল থেকে এখন পর্যন্ত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের অন্যতম। তবে অভিজাত বনেদি পরিবারের জন্য কুলা (চিত্র ৮০) তামা, কাঁসা পিতল দিয়ে তৈরি করা হতো। বাংলা একাডেমির লোক ঐতিহ্য সংগ্রহশালার নকশি কুলার কারুকার্যের মধ্যে রয়েছে দুটি নারকেলগাছ, মধ্যভাগে রয়েছে পদ্মচত্র। কুলার নিচের অংশে শাপলা ফুল, ঢেউ খেলানো নকশার মধ্যে নদী, এবং নদীতে শাপলা ফুটে আছে এবং তার চারপাশে ইলিশ মাছ খেলে বেড়ানোর দৃশ্যটি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। তবে এই চিত্রটির বাচ্চাদের আঁকা চিত্রের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। চিত্রকর এখানে কোনো পরিপ্রেক্ষিতের ব্যবহার করেনি। যা হোক কুলা চিত্রের মধ্যে বাঙালির জাতীয়বোধ ফুটে উঠেছে জাতীয় ফুল শাপলা জাতীয় মাছ ইলিশের প্রতিচ্ছবি অংকণের মধ্যে। এ ছাড়াও ইসলামী নকশারও স্পষ্টছাপ লক্ষ করা যায়। কুলায় বর্ডার লাইনে ইসলামী মতি নকশা (গালুন Galoon) বিড এর দানা নকশা করা হয়েছে বলা হয়। ম্যাডেলিয়ন (Medallion) পদক নকশা ।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-৮০: চিত্রিত কুলা

নকশি বটি

রান্নার তরকারি, পেঁয়াজ রসুন ইত্যাদি কাটাকুটি ছাড়াও মাছ কাটার জন্য বটি অপরিহার্য। বাংলার নদনদী পুকুরে অসংখ্য মাছ পাওয়া য়ায়। আর ছোট বড় যে ধরনের মাছই হোক না কেন বটি ছাড়া কোনো কাটাকুটি সম্ভব নয়। অভিজাত পরিবারের বউ ঝিয়ের জন্য সৌখিভাবে কারুকার্যখচিত নকশায় বটি তৈরি করা হয়। লোক ঐতিহ্য সংগ্রহশালায় এই বটিটি অভিজাত পরিবারের বউ-ঝিয়ের জন্য সৌখিনভাবে নির্মান করা হয়েছিলো। আলোচ্য বটির মাথার দিকটায় তৈরি করা হয়েছে ময়ূরের প্রতিচ্ছবি (চিত্র ৮১) এর মধ্যে ঢেউ তোলা নকশা, দড়ি নকশা এবং রোজেট নকশার অলংকরণের মধ্যে ময়ূরের পেখম নকশা তৈরি করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ময়ূরের মুখাকৃতি বাংলার অনেক নৌকার অলংকরণে দেখতে পাওয়া যায়।[৯২] এছাড়াও ময়ূরের মুখোচ্ছবিতে তুঘরা পদ্ধতি লিখিত আরবিলিপিমালার সাথে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

চিত্র-৮১: বাংলা একাডেমি লোক ঐতিহ্য সংগ্রহশালা

Dhaka University Institutional Repository

bKkk û°v

ষোড়শ শতকের শেষের দিকে বাঙালি সমাজে ধূমপানের অভ্যাস খুবই প্রচলিত হয়। বাংলার সাথে পর্তুগিজদের সাথে বাণিজ্যিক আদান-প্রদান শুরু হলে ষোড়শ শতকের তৃতীয় দশকে বাঙালি অধিবাসীরা ধুমপানের সাথে পরিচিতি লাভ করে। এই শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে ধূমপান প্রথা বাংলার সবখানে ছড়িয়ে পড়ে এবং ধীরে ধীরে সেটা সামাজিক জীবনের একটি অংশ হয়ে দাঁড়ায়। হুক্কা দিয়ে ধূমপান করা প্রত্যেক মুসলিম পরিবারের একটি ঐতিহ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিলো।[৯৩] হুক্কার নল তৈরি করতো শিল্পীদের বলা হতো নৈচাবন্দী। ঢাকার নৈচাবন্দি এই মুসলমান শিল্পীরা ছিলেন ভারতবর্ষে সেরা পরওয়ান, টাক, ইয়ারখামা, দেড় খামা, দোখামা, চোপাই, পাতাপেচ- এ ছিলো লুপ্ত এ শিল্পের নমুনা। ঢাকার চকবাজার ও মিটফোর্ড হাসপাতালের মাঝামাঝি স্থানে ছোট একটি খুপরিতে একজন নৈচাবন্দী এ শিল্পটিকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করে।[৯৪] লোক ঐতিহ্য সংগ্রহশালার নকশি হুক্কাটি মাটি এবং পিতলের তৈরি (চিত্র ৮২)। হুক্কার পিতলের অংশটির ওপর ফুল-লতা নকশামণ্ডিত করে অলংকরণ করা হয়েছে। এই নকশাটির মধ্যে ইসলামী নকশা কলার প্রভাব স্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায়।

চিত্র-৮২: নকশি হুক্কা

৫(ত) পাথর শিল্প

বাংলার পাথর শিল্প প্রাচীনকালে অনেক প্রসার লাভ করেছিলো। বাংলাদেশে পাথরের মধ্যে আরবি ও ফার্সিতে লিখিত বাণীসমূহ ও ফুল লতাপাতা অলংকরণ সমৃদ্ধ অনেক নিদর্শনই বাংলাদেশের সংগ্রহশালাগুলোতে রয়েছে। মুসলমানরা পাথরের তৈজসপত্র ব্যবহারে খুব বেশি স্বাচ্ছন্দ্য কখনই করেনি। হিন্দুদের মধ্যে পূজা, পার্বণ, ব্রত ইত্যাদি অনুষ্ঠানে পাথরের প্লেট, থালা ও বাটি এক সময় অনেক বেশি ব্যবহৃত হয়েছে। বর্তমানে পাথরের তৈরি নকশাকৃত বারকোশ (যার মধ্যে আটার ময়ান করা হয়) এর নমুনা বিভিন্ন সংগ্রহশালায় রয়েছে। তবে ব্যবহারিক কাজে শিলপাটা ছাড়া বাংলাদেশে

পাথরের তৈজস পত্রের নেই।[৯৫] লোক ঐতিহ্য সংগ্রহশালার সংগ্রহে থাকা এই পাথরের তৈরি নকশি টেবিলের (চিত্র ৮৩) মধ্যে পাথরখোদাই করে অপরূপ ফুল লতা-পাতায় সমৃদ্ধ অলংকরণ চমৎকার বৈশিষ্ট্যণ্ডিত উদাহরণ। টেবিলের মাঝখানের অলংকরণে রয়েছে রোজেট নকশা। উপরিভাগে রয়েছে বেলোন নকশা।

চিত্র-৮৩ঃ পাথরের ওপর খোদাই নকশাকৃত টেবিল বাংলা একাডেমি লোক ঐতিহ্য সংগ্রহশালা

৫(থ) লোকবাদ্য

বাংলাদেশের সঙ্গীত বাণী প্রধান, এখানে যন্ত্রসঙ্গীতের ভূমিকা সামান্য। গ্রাম বাংলার লোক সঙ্গীতের মধ্যে বাউলগান, জারিগান, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, মুর্শিদী, গম্ভীরা, কবিগান উল্লেখযোগ্য। লোকসঙ্গীতের সাথে থাকে বাদ্যযন্ত্র হিসাবে একতারা, দোতারা, ঢোল, বাঁশি। সুতরাং লোকবাদ্যের উপকরণ নিতান্তই সাধারন। মানুষ যেসব উপকরণ হাতের কাছে পাওয়া যায় এবং এগুলো পথে প্রান্তরে ছড়িয়ে আছে।[৯৬] লোকবাদ্যের বহু উপকরণের মধ্যে প্রধানত লাউয়ের খোল, বেল বা নারিকেলের মালা, বাঁশ, কাঠ, নল, পাতা, লোহা, পেতল, সুতা, তার, শিং, শঙ্খ ইত্যাদি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যবহার হয় বাঁশ এবং কাঠ। লাউয়ের খোল এবং নারকেলের মালা লোক বাদ্যের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। ঘন বাদ্য ধাতব পদার্থের তৈরি, তত বাদ্য তৈরিতে প্রয়োজন হয় তারের। আনন্দ বাদ্যের ছাউনি বা আবরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে গরু, ছাগল, ও সাপের চামড়া। শুষির বাদ্য তৈরির জন্য প্রয়োজন পড়ে বাঁশ, পাতা, নল ইত্যাদি উপকরণ। কোনো কোনো বাদ্যে প্রাকৃতিকবস্তু প্রায় অবিকৃতভাবে ব্যবহার করা হয়। শঙ্খ ফুঁ দিয়ে শঙ্খধ্বনি করা হয়, গরু বা মহিষের শিং ফুঁ দিয়ে বাজানো হয়।[৯৭] ঘাটু গানের সুর ও তালবাদ্য হিসেবে বাজানো হয় প্রধানত ঢোল, মন্দিরা, বাঁশি, ও সারিন্দা। নৌকা বাইচে বৈঠার তালে তালে নাচ হয় তার সঙ্গে তাল করে ঢোল ও কাসি বাজানো হয়। মুহরমের সময় অনুষ্ঠিত লাঠির নাচের উন্মাদনা সৃষ্টি করে ঢোল ও কাঁসি। বরেন্দ্র গবেষণা সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত কাঠের ঢোলের ওপর জ্যামিতিক নকশায় সজ্জিত (চিত্র ৮৪)। এ ধরনের নকশা ইসলামী নকশার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

চিত্র-৮৪: কাঠের ঢোল

চিত্র-৮৫: একতারা তৈরি পদ্ধতি

gnii‡gi XvK

ইমাম হোসেন (রা) এর কারবালা প্রান্তরে শাহাদাতবরণ উপলক্ষে প্রতিবছর মুহররম মাসে উদযাপিত হয়। মুহররমের ঢাক সাধারণত মহল্লার কিশোররা দড়ি কাপড় বেঁধে গলায় ঝুলিয়ে বাঁশের শলার দুটি কাঠি দিয়ে বাজায়।[৯৮] এ পর্বের অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে ১ থেকে ১০ মহররম পর্যন্ত ঝান্ডা নিয়ে ঢাক বাজিয়ে মহল্লায় মহল্লায় গিয়ে অর্থ সংগ্রহ করা হয়। মাটির সানকির উপরিভাগে ছাগলের শুকনা ভুড়ির আচ্ছাদনের ওপর রং দিয়ে ঢাক-এ বিভিন্ন চিত্র আঁকা হয়।[৯৯] তোফায়েল আহমেদের বাংলা ঘরের ঢাকের মধ্যে ফুল চিত্রটি ইসলামী নকশার বিশেষ বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছে (চিত্র ৮৬)

চিত্র-৮৬: মহররমের ঢাক

(দ) টেপা পুতুল

ইসলামে ভাস্কর্য নির্মাণে বিধিনিষেধ রয়েছে। তা সত্বেও ইসলামী শিল্পকলায় বাংলাদেশের মাটি দিয়ে বিভিন্ন ধরনের খেলনা পুতুল তৈরি হয়। এই খেলনা পুতুলের সাথে মানুষের দীর্ঘদিন দিনের লোকবিশ্বাস জড়িত। নির্ভেজাল নমনীয় মাটির তাল কুমোর রমণীর অভ্যস্ত হাতের দ্রুত আঙ্গুলের সঞ্চালনে এবং হাতের তালুর হালকা চাপে সুনির্দিষ্ট অবয়বে পুতুলের আকার ধারণ করে।[১০০] গঠন বৈশিষ্ট্যে পুতুল বিমূর্ত ; হাত পা সবই প্রতীকী। অধিকাংশ পুতুলের মুখ একেবারেই নেই, আবার ক্ষেত্র বিশেষে অস্পষ্ট আভাস দেখা যায়। সাঁচে গড়া পুতুল বংশ পরম্পরায় তৈরি হয়ে আসছে।[১০১] ইসলামে ধর্মীয় অনুভুতি নিয়ে কোনো ভাস্কর্য গড়া বিধিনিষেধ রয়েছে। তবে বাংলার লোক সমাজে বাচ্চাদের খেলনা হিসেবে প্রচলিত এই পুতুল নিছক আনন্দের খোরাক মেটাতে তৈরি হয়।

গ্রামীণ মানুষের কোনো কোনো পুতুলের আঙ্গুলের টিপায় অবয়ব সৃষ্টি করে তাতে মুখ চোখ, দেহভঙ্গি প্রভৃতির আকৃতি দেয় হয়। আগুনে পুড়িয়ে তারপর বিভিন্ন রং লাগানো হয়। অঞ্চলভেদে এসব পুতুল কনে পুতুল, টেপা পুতুল, গোয়ালিনী পুতুল, আহলাদি পুতুল, ইত্যাদি নামে পরিচিত। পুতুল নারী সমাজের সৃষ্টি আবার পুতুলগুলোর ফিগারও নারীর। কাঠের তৈরি পুতুল কাঠের নকশি পুতুল নামে পরিচিত। বরেন্দ্র গবেষণার সংগ্রহশালার মাটির তৈরি টেপা পুতুলের মধ্যে আছে হরিণ ও নারী। এখানকার পুতুলের সাথে আদিম যুগের মাটির পুতুলের মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া যায়।[১০২] বিশেষ করে এই খেলনা পুতুলের গায়ে রঙের আঁচরে নকশামণ্ডিত করা হয়েছে। সুতরাং এই আদিম শিল্পটি আজো একি ভাবে সক্রিয় রয়েছে। এ ধরনের পুতুল গ্রাম এবং শহরের মেলায়, পথে প্রান্তরে শো পিস হিসেবে বিক্রি হয়। মধ্যবিত্তরা ড্রয়িং রুমে সোকসে সাজিয়ে রাখে ঘরকে শোভামণ্ডিত করার জন্যে।

চিত্র-৮৭: নকশি পুতুল রাজশাহী বরেন্দ্র গবেষণা সংগ্রহশালা

g¨g cZj

কাঠ দিয়ে মেয়েদের অবয়বে তৈরি করা হয় মমি নকশি পুতুল (চিত্র ৮৭-৮৮)। এ ধরনের পুতুল দেখতে মিসরের মমির মতো এবং উজ্জল রঙের ব্যবহারে প্রাণচাঞ্চল্য স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। বাচ্চাদের খেলনার এবং গৃহসজ্জার উপকরণ হিসেবে কাঠের ঘোড়া ও এ ধরনের পুতুল হয় ব্যবহৃত হয়।[১০৩] মমি পুতুল বাংলাদেশের সোনারগাঁওয়ে তৈরি হয়। মমি পুতুলের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। এই পুতুলের চোখ আঁকা হয় বড় বড় করে। মেয়ে পুতুলের মাথায় রঙের ব্যবহার থাকে। শরীরের অংশ গুলো ভালোভাবে ঢাকা থাকে। পুতুলের গায়ে লাল এবং হলুদ রঙের ব্যবহারে অনেক উজ্জল করে বাহ্যিকভাবে প্রকাশ করা হয়। ঘোড়া এবং পুতুলের মধ্যে লোকনকশায় ইসলামী নকশার প্রভাব লক্ষ করা যায়।

চিত্র -৮৭: মমীপুতুল কারুপল্লী ফাউন্ডেশন

চিত্র- ৮৮: নকশি ঘোড়া

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

কোথায় কীভাবে এই অলংকরণ পদ্ধতির উদ্ভব ঘটেছিলো তা সঠিক করে বলা কঠিন। ধারণা করা হয় যে, প্রাচীন মিসর ছিলো নকশাকলার আদি ভূমি। কারণ মিসরীয়রাই চিত্রের সাহায্যে বিশ্বে প্রথম লিপিমালার সৃষ্টি করে নজির সৃষ্টি করেছিলো। এ ধরনের চিত্ররীতি চীন সভ্যতাতেও দেখা যায়। আবার সিন্ধু সভ্যতা থেকে আবিষ্কৃত অনেক মৃৎ পাত্রের মধ্যেও বর্তমান নকশার সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। মূলত যে কোনো নকশা সৃষ্টি হয় প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে। বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রের নিজশ্য ভৌগোলিক পরিবেশ আবহাওয়া জলবায়ু ভিন্ন। ভিন্ন প্রকৃতিতে ভিন্ন ধরনের ফুলপাতা মাঝে বেড়ে ওঠা মানুষ তার চারপাশে যা দেখে সেটাই সে আঁকতে চেষ্টা করে। বলা বাহুল্য, ইসলামী নকশাকলা একক ধরনের কোনো নকশাকলা নয়। গ্রিক, রোমান, মিসর এবং মেসোপটেমিয়ার নকশার প্রভাব ও বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণে বৃহৎ আকারে তৈরি মুসলিম স্থাপত্যসমূহে যে নকশাকলা তৈরি করা হয়েছিলো পরবর্তীতে সেটাই মানুষ ইসলামী নকশাকলা হিসেবে একটি আদর্শরূপে গ্রহণ করেছে। মধ্যযুগে বাংলায় ইসলাম সম্প্রসারিত হওয়ার পর বাঙালি মুসলমানগণ বাংলার প্রকৃতি থেকে গাছপালা ফুলকেই প্রাধান্য দিয়ে নকশা তৈরি করতে থাকে। সনাতন ধর্মালম্বীরা যখন পূজা, অর্চনা ও ব্রত পালনের উদ্দেশ্যে কোনো উপাদানের মধ্যে নকশা তৈরি করে তখন ঐ নকশাটিকে ধর্মীয় অনুভূতিতে উপস্থাপন করে। সেই অর্থে ইসলামী নকশাকলা কোনো ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় না। অন্যান্য ধর্মের সাথে ইসলাম ধর্মের এটাই পার্থক্য। বস্তুত ইসলামী নকশাকলার সৃষ্টিই হয় শুধুমাত্র নান্দনিকতার উদ্দেশ্যে। ব্যবহারিক ও নান্দনিকভাবে নির্মিত যে উপাদানই হোক না কেন বাংলার সকল ধর্মালম্বী ও সকল শ্রেণির মানুষের কাছে এর আবেদন একই রকম।

Z_¨mÎ

১. আশিস চৌধুরী, ieÞ'bv‡_i ce e½ ågY, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা থেকে উদ্ধৃত, পৃ. ৩৮
২. Herbert Read, ***Meaning of Art***, (Great Britan: penguin books Ltd.Mlddlesex,) 1956, p. 28
৩. মো. মোস্তাফিজুর রহমান bKkvKjv (রাজশাহী: ২০০৮) পৃ.১
৪ . নন্দলাল বসু, 'wó I mwó, শ্রী অম্লান দত্ত সম্পা (কোলকাতা: ১৩৯২) পৃ.৩৭
৫. রবিউল হুসাইন, evsjv‡'‡ki ¯'vcZ¨ ms¯'wZ , পৃ. ১৯৯৬
৬. Percy Brown, ***Indian Architecture (Islamic Period***) (Bombay, D.B Taraporevala Song pvt Lim 1956) p. 6
৭. সম্পা. সৈয়দ মাহমুমুদ হাসান, evsjv‡'‡ki †jvKwkí, পৃ. ৪৪
৮. নির্মল কুমার ঘোষ, fviZwkí (কলকাতা: কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড ১৯৮৩) পৃ. ২
৯. নন্দলাল বসু, wkíK_v (কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫১ বঙ্গাব্দ) পৃ. ৩৬
১০. গোলাম সামাদ, Bmjvgx wkíKjv, পৃ. ১১৭
১১. মোস্তাফিজুর রহমান, e‡i›' AÂ‡ji cvPxb I ga¨hMxq ¯'vc‡Z¨ AjsKiY অপ্রকাশিত পিইচ.ডি অভিসন্দর্ভ চারুকলা বিভাগ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৬ পৃ.১৭
১২. মো. মোস্তাফিজুর রহমান bKkvKjv (রাজশাহী: ২০০৮) পৃ. ১
১৩. গোলাম সামাদ, পৃ. ১৫
১৪. ঐ, পৃ. ১২১
১৫. আবুল বাশার মোশাররফ হোসেন, Avie ¯'vcZ¨, পৃ. ৮
১৬. গোলাম সামাদ, Bmjvgx wkíKjv, পৃ. ৬৮-৬৯
১৭. যোগেশরঞ্জন পাঠক, †jvKwkÿv I †jvKms¯'wZ (কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৯৭) পৃ. ২২
১৮. ওয়াকিল আহমদ, evsjv‡'‡ki †jvK-ms¯'wZ (ঢাকা: গতিধারা বাংলাবাজার, ২০০৪) পৃ. ৫২
২২. রঞ্জিতা মৈত্র, evOvjvi †jvKe‡Z Avjcbvi fwgKv (কলকাতা: পুস্তক বিপনি, ১৯৯৯) পৃ. পৃ. ১
২০. Sankar Sen Gupta, ***Folklore and Folk life in India An Objective Study In Indian Perspective*** (Calcutta: Indian Publications 1975) p. 94
২১. kumar, Benoy Sarkar, ***The Folk -Element in Hindu Culture***, Delhi ,Shri s-k Mehra at Taz offset Press 1972, Ibid, p.5
২২. রঞ্জিতা মৈত্র,পৃ৪১-৪৩
২৩. প্রদ্যোত ঘোষ, evsjvi †jvKwkí (কলকাতা: পুস্তক বিপনি, ২০০৪) পৃ. ৮৩
২৪. খগেশ কিরণ তালুকদার, পৃ. ৪৭
২৫. Gurusaday Dutt, ***Folk Arts and Crafts of Bengal: The collected papers*** (Calcutta: Seagull books,1990.) p. 95
২৬. আবুল বাশার মোশাররফ হোসেন, Avie ¯'vcZ¨ c.266
গম্বুজের মধ্যভাগে ছাড়াও দেয়ালের উপভাগের সরু জায়গায়, ছাদের ঠিক নিচে বিশেষ নকশার জায়গায়টির নাম ফ্রিজ (Friez)। এখানেও অসংখ্য পদ্ম, ফুল-লতাপাতার অলংকরণ তৈরি করা হয়।
২৭. Kumar, Benoy Sarkar, p. 6
২৮. বিনয় ঘোষ, evsjvi ms¯'wZ mgvRZË, পৃ. ৮
২৯. বাংলাদেশের সমকালীন HwZn¨evnx †jvKwkí c'kbx I †gjv, ২১ মে-২১ জুলাই ২০০০, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর পৃ. ৪
৩০. তোফায়েল, আহমদ †jvKHwZ‡n¨i 'kw'MšÍ (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৯) পৃ. ৯৭
৩১. মুহাম্মদ জলিল, ivRkvnx AÂ‡ji grwkí k‡Li nwo (ঢাকা: বাংলা একাডেমি ২০০৭) পৃ. ২৬
৩২. ঐ পৃ. ৪
৩৩. সরেজমিন
৩৪. সাক্ষাৎকার ১৫-৪-২০১০ সাল
৩৫. তোফায়েল আহমদ,পৃ.৮৯
৩৬. সৈয়দ আলম মাহবুব, †jvKwkí (নারায়ণগঞ্জ: সোনারগাঁও জাদুঘর ১৯৯৯)পৃ.১৪

৩৭. লোকশিল্প এ্যালবাম, †Zvdv‡qj Avng‡'i evsjv Ni, পৃ. ১২৭
৩৮. খগেশ কিরণ তালুকদার, পৃ. ৩৮
৩৯. ঐ পৃ. 39
৪০. প্রদ্যোত ঘোষ, evsjvi †jvKwkí, প্রাগুক্ত, ১২৯
৪১. মো. মোস্তাফিজুর রহমান bKkvKjv পৃ. ২৪
৪২. বাংলাদেশ হস্তশিল্প শিল্প সমবায় ফেডারেশনের (কারিকার) লোক কারু জরিপ ও নকশা দলিলায়নের প্রকল্প
৪৩. খগেশ কিরণ, পৃ. ২৫
৪৪. ঐ পৃ. ২৬
৪৫. Parveen Ahmad, ***The Aeshthetics & Vocabulary*** (Dhaka: Bangladesh National Museum, 1997) p. 3
৪৬. শিলা বসাক evsjvi bKkxKv_v, (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স ২০০২ ১ম সংস্কার) পৃ.৪
৪৭. Gurusaday Dutt, ***Folk Arts and Crafts of Bengal*** , Ibid 23
৪৮. খগেশ কিরণ তালুকদার c. ২৪
৪৯. পল্লব সেন গুপ্ত, পৃ. ২৬৬

কাঁথার মধ্যভাগটি হলো কেন্দ্রস্থল। কেউ যখন বর্গাকৃতির একখণ্ড ভূমির ওপর ফুলের বাগান তৈরি করে সেই বাগানের চারপাশে অসংখ্য পাতা বাহার গাছ লাগিয়ে বেঁড়া দিয়ে সীমানা নির্ধারণ করে। বাগানের সীমানার চারকোনে একই রকমের ফুল গাছ এবং মাঝখানে বৃত্তাকারে ফুলের গাছ লাগিয়ে বাগানটিকে নান্দনিক করে তোলা হয়। নকশিকাঁথা নির্মানের ক্ষেত্রেও এই একই বিষয় কাজ করে। যিনি কাঁথা তৈরি করেন তার কাছে কাঁথার জন্যে তৈরি কাপড়টি হয়ে যায় একটি বিশ্বজগৎ। গ্রামীণ কাঁথাশিল্পীর যা চোখে জগতের যা কিছু চোখে পড়ে সেটাই কাঁথার মধ্যে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। প্রথমে কাঁথার জমিন তৈরি করে এর পাশে বর্ডার লাইন বা পাড় তৈরি করা হয়। সূচি শিল্পীর যেহেতু ছবি আঁকার কোনো প্রশিক্ষণ থাকে না সেহেতু তিনি তার কল্পনা দিয়ে মানুষ, নদীনালা, গাছপালার ছবি কাঁথায় ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেন।

৫০. (jvKwkí G¨vjevg, †Zvdv‡qj Avng‡'i evsjv Ni, পৃ. ১২৭
৫১. বিলকিস বেগম, PvcvBbeveM‡Äi mwPwkí, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৬) পৃ.৪০
৫২. ওয়াকিল আহমদ, পৃ. ৫৯
৫৩. ঐ পৃ. ১২০
৫৪. গোলাম সামাদ, Bmjvgx wkíKjv পৃ.৩৪
৫৫. Gurusaday Dutt, p32
৫৬. Sankar Sen Gupta, p. 6
৫৭. নকশা দলিলায়ন প্রকল্প
৫৮. Enamul Haque **Islamic Art *in Bangladesh Catalogue of a special Exhibition in Dacca Museum ,*** April-3-28 1978
৫৯. ঐ p. 81
৬০. George C.M. Birdwoo,***The Arts of India***, (London: 1880) p.243
৬১. Directorate of Industries, Government o West Bengal, ***Designs In Traditional Arts of Bengal*** (Calcutta: Oxford book & Stationery-1963) p. 6
৬২. মোহাম্মদ সাইদুর, Rvg'vbx (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩) পৃ. ২৬
৬৩. Henry Glassie,***Traditional Art of Dhaka*** (Dhaka: Bangla Academy, 2000) p. 403
৬৪ . সৈয়দ মাহবুব আলম (সম্পাঃ) †jvKwkí (†jvKKvi³wkí †gjv I †jvKR Drme 2001) বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, পৃ. ৫০
৬৫. তোফায়েল, আহমদ †jvK HwZ‡n¨i 'kw'Mš' c. 125
৬৬. প্রথম আলো , ২০১৩ সালে ৪ ডিসেম্বর প্রকাশিত
৬৭. হোসনে আরা শাহেদ kwo (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩) পৃ. ২৪
৬৮. তোফায়েল আহমদ, †jvK HwZ‡n¨i 'kw'Mš' c.30
৬৯. লোকশিল্প এ্যালবাম, †Zvdv‡qj Avng‡'i evsjv Ni, পৃ. ১২৭

৭০. খগেশ কিরণ তালুকদার, পৃ. ২৯
৭১. বাংলাদেশের সমকালীন ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্প প্রদর্শনী ও মেলা, ২১ মে-২১ জুলাই ২০০০, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর পৃ.৭
৭২. সৈয়দ মাহবুব আলম (সম্পাঃ) †jvKwkí (†jvKKvi“wkí †gjv I †jvKR Drme¨ ২০০১) বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন পৃ.২২
৭৩. সাক্ষাৎকার, ১৬/০৪/২০০৯ সাল.
৭৪. বিনয় ঘোষ, evsjvi ms¯‹…wZ mgvRZË , পৃ. ৬০
৭৫. ঐ
৭৬. সরেজমিন
৭৭. রবীন্দ্রনাথ, mvgšÍ wkíqq evKov (কলকাতাঃ পুস্তক বিপনী, পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৪০০ বঙ্গাব্দ) পৃ. ৮৮
৭৮. Sankar Sen Gupta, ***Folklore and Folk life in India An Objective Study In Indian Perspective*** op, cit p13
৭৯. লোকশিল্প এ্যালবাম, †Zvdv‡qj Avng‡`i evsjvi Ni c. 37
৮০. জিনাত মাহরুখ বানু, evsjv‡`‡ki ‘vi“wkí (XvKv: বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ২০০৩) পৃ. ১৪৭
৮১. নীহার রঞ্জন রায়, evOvjxi BwZnvm, Avw`ce পৃ. ৩৩
৮২. মাহবুব আলম, †bŠKv Drme (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি, ১৯৯৮) পৃ. ৩১
৮৩. শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার, evsjv‡`‡ki BwZnvm wØZxq LÐ KjKvZv (কলকাতাঃ জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স) ১৯৮৭, পৃ. ৪৪৪
৮৪. বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে জাতিতত্ত্ব ও অলংকরণ শিল্পকলা বিভাগ আয়োজিত বিশেষ অলংকার প্রদর্শনী ২০১২, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৮৫. রবীন্দ্রনাথ সামন্ত wkíqq evKov (কলকাতাঃ পুস্তক বিপনী, পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৪০০ বঙ্গাব্দ,)৮৪
৮৬. Firoz, Mahmud, ***Metal Work of Bangladesh; A Study in Material Folk Culture***, (Dhaka: Bangla Academy, 2003) p. 19
৮৭. গোলাম সামাদ, Bmjvgx wkíKjv প্রাগুক্ত পৃ ৪৬
৮৮. শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার, ***বাংলাদেশের ইতিহাস*** c. 16
৮৯. খগেশ কিরণ তালুকদার পৃ. ৬২
৯০. তোফায়েল, আহমদ , c. 137
৯১. বাংলা একাডেমির লোক ঐতিহ্যসংগ্রহশালা সরেজমিন জরিপ
৯২. সরেজমিন জরিপ
৯৩. তোফায়েল, আহমদ c. 128
৯৪. ঐ পৃ. ১২৯
৯৫. খগেশ কিরণ তালুকদার, evsjv‡`‡ki †jvKvqZ wkíKjv , পৃ. ৭৩
৯৬. সম্পা. মাহমুদুল হাসান evsjv‡`‡ki †jvKwkí, পৃ. ৫৬
৯৭. Ajit Mookerjee, ***"Folk Art of India"*** (India: Clarion Books. Delhi –1986) p. 15
৯৮. লোকশিল্প এ্যালবাম, †Zvdv‡qj Avng‡`i evsjvi Ni, পৃ. ৬৬
৯৯. অধ্যক্ষ তোফায়েল আহমদের c_g gZ¨ ewlKx 28gvP 2003, ¯§iwYKv chZ cwil` বাংলাঘর লোক ও কারুশিল্প সংগ্রহ।
১০০. সৈয়দ আলম মাহবুব, †jvKwkí পৃ.২৯
১০১. Shilpakala Annual journal of Bangladesh Shilpakala Academy Masuda M. Rashid Chowdhury,Toys and Dolls of Bangladesh. p.71
১০২. Sankar Sen Gupta ***Folklore and Folk life in India An Objective Study In Indian Perspective*** Ibid,p37
১০৩. লোকশিল্প এ্যালবাম †Zvdv‡qj Avng‡`i evsjv, ঘর পৃ. ৫২

Dhaka University Institutional Repository

Dcmsnvi

‘বাংলাদেশের লোকসংগ্রহশালা: ইসলামী উপাদান’ বিশ্লেষণে তিনটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। প্রথমত, বাংলাদেশের লোকসংগ্রহশালা বাঙালি জাতিসত্তা ও লোকসাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অন্বেষণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থান। বস্তুত লোকবিদ্যা (Folklorology) এবং সংগ্রহবিদ্যা এই দুটি শাখার মিলনে সৃষ্টি হয়েছে লোকসংগ্রহশালা। ‘লোক’ শব্দটি গণসমাজকে নির্দেশ করে সেই জনগোষ্ঠীর আচার, আচরণ, ধর্মীয় রীতি-নীতি, কুসংস্কার ও তাদের ব্যবহারিক জীবনের নানা বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করে। অনেক সভ্যতার উত্থান পতনের পাদপীঠ এ বাংলাদেশ। কৃষি, শিক্ষা ব্যবসা-বাণিজ্য, ধর্ম-বিজ্ঞান ভাষা-সাহিত্যের মতো লোক ও কারুশিল্প এর সভ্যতার উন্নয়ন বিকাশে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে এসেছে। বাংলাদেশের লোকসংগ্রহশালার ধারাবাহিক বিবরণ তুলে ধরা কঠিন। কারণ প্রাচীন যুগে লোকসংগ্রহশালা ধরনের কোনো প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে ধারণা করা হয়ে থাকে যে, আদিম মানুষের বসবাস ছিলো এ ধরনের গুহা থেকে সংগ্রহশালার সূত্রপাত ঘটে।

বাংলাদেশের লোকায়ত সমাজ কৃষিভিত্তিক। প্রাত্যহিক জীবনযাপন প্রণালি থেকে শুরু করে লোকশিল্প, লোকসাহিত্য, লোকনৃত্য, লোকক্রীড়া প্রভৃতির পরিমণ্ডলে কৃষিভিত্তিক জনজীবনকে প্রতিফলিত করেছে। লোকসংস্কৃতির এই বিষয়গুলো আদিতে ছিলো জাদুবিশ্বাসভিত্তিক অথবা জাদুভিত্তিক। আদিম যুগের মানুষেরা প্রকৃতির সাথে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে সমাজে বাঁচতে শিখেছিলো। সময়ের সাথে সাথে একসময় কৃষিকাজ ও পশুপালনের সঙ্গে মানুষ বসবাসের জন্য গড়ে তুলেছিলো ঘরবাড়ি, গ্রাম, শহর, জনপদ ইত্যাদি। অর্থাৎ আদিম মানুষের মধ্যে যে যাদুর বিশ্বাস, শিল্পকলা ও আচার বা অনুষ্ঠান সৃষ্টি হয়েছিলো পরবর্তীতে সে সংস্কৃতিই সমাজে লোকসংস্কৃতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। আদিম মানুষেরা গুহা জীবন ত্যাগ করে যখন সভ্য জীবনে পদার্পণ করে এ সময় সমাজে ধর্ম প্রতিষ্ঠা পায়। প্রাচীনকালে শিল্পকলা সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে অনেকখানি সহায়তা করেছে।

বৈশ্বিক প্রেক্ষিতে সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠায় বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতাগুলোর মধ্যে প্রাচীন মিসর, মেসোপটেমিয়া, চীন, সিন্ধু, গ্রিক, রোমান, বৈদিক সভ্যতা, ইসলামী সভ্যতা ও রেঁনেসার গুরুত্ব ছিলো

অপরিসীম। মিশরের পিরামিড, গ্রিসের জেউসের মন্দির, রোমানদের প্যানথিওন মন্দির, আরবের কাবাগৃহ, মদিনা মসজিদ, কুব্বাত আস সাখরা, দামেশক মসজিদ, বায়তুল হিকমা ইত্যাদি সেই যুগে সংগ্রহশালার বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছিলো। উল্লেখ্য যে, সময়ের পরিক্রমায় বিশ্বের প্রাচীন সভ্যতাগুলো এক সময় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। বিশ্বে প্রাথমিকভাবে প্রত্নখননের মাধ্যমে সভ্যতাযুগের প্রাপ্ত নিদর্শন সংগ্রহ করে তা সংরক্ষণ, প্রদর্শন গবেষণার লক্ষ্যে গড়ে তোলা হয়েছিলো সংগ্রহশালা ধরনের প্রতিষ্ঠান। সতের শতকের প্রথমার্ধের মধ্যে বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রে বিখ্যাত প্রাতিষ্ঠানিক জাদুঘরগুলো প্রতিষ্ঠা পায়। এর মধ্যে ১৬৩৮ সালে অক্সফোর্ডে গড়ে ওঠে অ্যাসমোলিয়ার (Ashmolean) জাদুঘর এবং লন্ডনে ১৭৫৯ সালে প্রতিষ্ঠা পায় ব্রিটিশ (British) জাদুঘর। এ ছাড়াও ১৯৪৬ সালে সালে পৃথিবীর জাদুঘরগুলো উন্নয়নের উদ্দেশ্যে আইকম (ICOM- International Council of Museums) নামে একটি পেশাদারি প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়।

ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের (১৭৪০-১৭৮০) ফলে দীর্ঘদিনের হস্তশিল্প বিপর্যের মুখে পড়ে। বস্তুত শিল্প বিপ্লবের পূর্বে আধুনিক কলকারখানা না থাকায় উৎপাদন ব্যবস্থা কুটির শিল্পের ওপর নির্ভরশীল ছিলো। রেলপথ, আকাশ পথ ও নৌপথের যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন ও প্রসারের কারণে কুটির শিল্পের পরিবর্তে অনেক রাষ্ট্রে বৃহৎ আকারে কলকারখানা গড়ে ওঠে। ফলশ্রুতিতে বিশ্বের অনেক রাষ্ট্র ধনী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। বিত্তশালীরা গ্রামীণ জীবনের পরিবর্তে নগর জীবনের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। মানুষের জীবন ক্রমশ প্রযুক্তি নির্ভর হয়ে পড়ে। দীর্ঘদিনের লোক ও কারুশিল্প ও মানুষের ব্যবহারিক জীবন ও জীবিকার সাথে সম্পর্কিত অনেক উপকরণ অপ্রয়োজনীয় বস্তুতে পরিণত হয়। ইউরোপে যন্ত্রশিল্পের আবির্ভাবে (১৭৪০-১৭৮০) কুটিরশিল্পের পরিবর্তে বিশ্ব যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদনমূখী হয়ে উঠেছিলো। ফলে দীর্ঘদিনের বংশপরম্পরায় বহমান সংস্কৃতি এ সময় যান্ত্রিক সংস্কৃতিতে পরিণত হয়। উনিশ শতকের চতুর্থ পর্বে ইউরোপীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে ফোকলোর (Folklore) চর্চার সূত্রপাত ঘটে। লোককারুশিল্পের নিদর্শনাদি সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে বস্তুগত লোকসংস্কৃতি (Material Folklore) গবেষণার উদ্দেশ্যে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে লোকসংগ্রহশালার গড়ে তোলার উদ্যোগ লক্ষ করা যায়। সুইডিশ লোকসংস্কৃতিবিদ লিনিয়াস (Linnaeu) ও হিল্টেন ক্যাভেলিয়াস (Hylten-Cavallius,১৮১৮-৭৮) ছাড়াও প্রমূখ ব্যক্তিত্ব দেশীয় সংস্কৃতির নিদর্শন সংগ্রহে আগ্রহী হয়েছিলেন। সুইডিশ স্কুল শিক্ষক) অথর হেজেলিয়াস (Artur Hazelius) বিখ্যাত নরডিসকা মিউসেট (Nordiska Museet) লোকসংগ্রহশালাটির ভিত্তি স্থাপন করেন। এটি ছিলো একটি খামার বাড়ি (Folk park)। এভাবে

নিজেদের ঐতিহ্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে লোকসংগ্রহশালা উত্তর ইউরোপের অনেক দেশ ছাড়াও আমেরিকা, ইন্দোনেশিয়া, ইসরাইল, কোরিয়া, ভারত এবং বাংলাদেশে পর্যন্ত গড়ে উঠেছে।

ইংরেজ শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৭৮৪ সালে কলকাতার পার্ক স্ট্রিটে গড়ে ওঠে এশিয়াটিক সোসাইটি। এশিয়াটিক সোসাইটি গবেষণার জন্যে ভারতের নানা জাতি, জনগোষ্ঠী, ইতিহাস, সাহিত্য, শিল্প ও ঐতিহ্য সর্ম্পকিত বস্তুসামগ্রী সংগ্রহের নানা উদ্যোগ নেয়। এশিয়াটিক সোসাইটির সংগৃহীত উপাদানসমূহ নিয়ে ভারতবর্ষে ১৮১৪ সালে ২ ফেব্রুয়ারি প্রথম গড়ে ওঠে 'ওরিয়েন্টাল মিউজিয়াম অব দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি'। এভাবে দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথম সংগ্রহশালা গড়ে ওঠার ইতিহাস রচিত হয়। ১৮৬৭ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির এ সংগ্রহশালাটিকে নতুনভাবে উদ্বোধন করে এর নামকরণ করা হয় ভারতীয় সংগ্রহশালা (Indian Museum)। ইউরোপের অন্যান্য দেশের ন্যায় গ্রামীণ সাধারণ মানুষের শিল্পকলার নন্দনতাত্ত্বিক ও জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষের নিরিখে ভারতের আশুতোষ সংগ্রহশালাও গুরুসদয় লোকসংগ্রহশালা দুটি ছিলো দক্ষিণ এশিয়ায় গড়ে ওঠা লোকসংগ্রহশালার পথিকৃত। বস্তুত লোক ও কারুশিল্পের বিভিন্ন উপকরণ যথা নকশিকাঁথা, পটচিত্র, ধাতবের নির্মিত সামগ্রী, টেরাকোটা, বাঁশ ও বেতজাত দ্রব্য সামগ্রী সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে এ লোকসংগ্রহশালা দুটির বিকাশ ঘটে। পূর্ববাংলায় রাজশাহী জেলার ঘোষপাড়ায় ১৯১০ সালে প্রথম 'বরেন্দ্র গবেষণা' সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠা পায়। ১৯১৩ সালের ৭ আগস্ট লর্ড কারমাইকেল 'ঢাকা সংগ্রহশালা' আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। বর্তমানে এটি বাংলাদেশের জাতীয় জাদুঘর। ভারত বাংলাদেশ বিভক্তির পূর্বে পশ্চিম বাংলা ও পূর্ববাংলার মানুষের ভাষা, স্বভাব, আচার আচরণ ও লোকসংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য ছিলো না। এই বিভক্তি দুই দেশের মানুষের মধ্যে রাষ্ট্রের বিভক্তি ঘটাতে পেরেছে ঠিকই, কিন্ত দুই বাংলার সাংস্কৃতিক বিশেষ পার্থক্য এখন ঘটেনি। পূর্ববাংলায় বাঙালির লোকসংস্কৃতিচর্চা ও গবেষণার লক্ষ্যে বাংলা একাডেমির প্রাঙ্গনে গড়ে তোলা হয় বাংলা একাডেমি জাদুঘর। ১৯৭৮ সালে 'বাংলা একাডেমির জাদুঘর' নাম পরিবর্তন করে 'লোক ঐতিহ্য সংগ্রহশালা' নাম নির্ধারণ করা হয়। উল্লেখ্য যে, ২০১১ সাল থেকে এই সংগ্রহশালাটি সাময়িকভাবে বন্ধ রয়েছে।

পাকিস্তান শাসনামল থেকে বাংলাদেশে একটি প্রাতিষ্ঠানিক লোকসংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হবার পর ১৯৭৫ সালে সম্পূর্ণ গ্রামীণ পরিবেশে ও বৃহৎ পরিসরে নারায়ণগঞ্জের লোক ও কারুপল্লী ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার ভেতর দিয়ে এদেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে লোকসংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠা পায়। বিশেষ করে এই ফাউন্ডেশনের

লক্ষ ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ইউরোপের উন্মুক্ত সংগ্রহশালার open air museum- এর সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। তবে বাংলাদেশে এ ধরনের সংগ্রহশালা সোনারগাঁওয়ে ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না। বাংলায় সোনারগাঁও প্রাচীনকাল থেকেই ছিলো সমৃদ্ধ। সোনারগাঁওয়ে রাজধানী থাকাকালীন সময় এখানে একটি মনোরম শহর গড়ে উঠেছিলো যা পানাম নগর হিসেবে পরিচিত। ইবনে বতুতার সোনারগাঁও সম্পর্কে বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, বাংলার তাঁতিদের বোনা মসলিন একসময় জগৎখাতি অর্জন করেছিলো। গ্রামীণ পেশাজীবি মানুষের সঙ্গে বর্তমান আধুনিক মানুষের পরিচয় করিয়ে দেবার প্রয়াসে বাংলাদেশের কীর্তিমান লোক ও কারুশিল্পীদের তৈরি জামদানি মৃৎপাত্র তৈরি, শতরঞ্জি নির্মাণ, কাঠের পুতুল, নকশি কাঁথা তৈরি, শোলার কাজ তৈরি ইত্যাদি বিষয়গুলো স্বচক্ষে দর্শকদের সামনে মাঝে মধ্যে তুলে ধরা হয়। যা লোক ঐতিহ্যকে ধরে রাখারই প্রয়াসমাত্র। ব্যক্তিগত পর্যায়ে গড়ে ওঠা তোফায়েল আহমেদের 'বাংলার ঘর' ও মো. সাইদুরের 'লোক ঐতিহ্য সংগ্রহশালা' নামের লোকসংগ্রহশালা দুটি বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি চর্চায় ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিলো। তবে শেষ পর্যন্ত লোকসংগ্রহশালা দুটি টিকে থাকতে পারেনি। তোফায়েল আহমেদের বাংলার ঘরের যাবতীয় নিদর্শনসমূহ নিয়ে সম্প্রতি বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটিতে গড়ে তোলা হয়েছে এশিয়াটিক সোসাইটি জাদুঘর।

দ্বিতীয়ত, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা গড়ে ওঠার আগে বাংলার মানুষের ধর্ম ছিলো হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন। প্রাচীন যুগে রাজ-রাজড়া এবং সমাজের সমৃদ্ধ শ্রেণির পৃষ্ঠপোষকতায় অসংখ্য দেবমন্দির গড়ে উঠেছিলো। বিশেষ করে পাল ও সেন রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠে স্থাপত্যিক নিদর্শন স্তূপ, বিহার, মঠ ও মন্দির । শিল্পীরা বিহার ও মন্দির স্থাপত্য সম্পৃক্ত অলংকরণ ফলক-স্থাপত্যাংশ অথবা ধর্মগত পুরাণ কাহিনীর প্রস্তরীকৃত প্রতিকৃতিতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু দুর্গা, সরস্বতী, গণেশ এবং শিবলিঙ্গ ইত্যাদি পাথরে খোদাই করে দেব-দেবীর মূর্তি উৎকীর্ণ করতো। ধর্মগত স্থাপত্যের মধ্যে স্তূপ নির্মাণের প্রথা প্রথম চালু হয়। বৈদিক আমলে দেহাস্থি প্রোথিত করার জন্য শ্মশানের ওপর মাটির স্তূপ তৈরি করা হতো। প্রাচীন যুগে মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর, ময়নামতির দুর্লভ স্থাপত্য নিদর্শন এদেশে সৃষ্টি হয়েছিলো এবং কালের গর্ভে সে কীর্তি তলিয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত তার অস্তিত্ব লক্ষ করা।
১২০৪ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজির বাংলা বিজয়ের মধ্য দিয়ে এই অঞ্চলের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন ঘটে। রাজনৈতিক ভাবে হিন্দু-বৌদ্ধদের স্থলে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা ছাড়াও বাঙালি সমাজ ও ধর্মীয় জীবনে বিরাট পরিবর্তন আসে। বিশেষ করে মুসলিম শাসকগণ ইসলাম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে যে সমস্ত অঞ্চলে ইসলামী শাসন

ব্যবস্থা কায়েম করতে পেরেছিলো সে সব অঞ্চলের সংস্কৃতির সাথে নিজেদের খাপ খাপিয়ে নিয়েছে। যে কারণে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ ও ধর্ম পালন করলেও তারা তাদের হাজার বছরের নিজস্ব সংস্কৃতির বাইরে আসতে পারেনি। পোশাক পরিচ্ছেদ, কুসংস্কার, আচার আচরণ, রীতি-নীতি একটি রাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক পরিচয় বহন করে। ফলে বহিরাগত মুসলমান এবং বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে বিশেষ সাংস্কৃতিক পার্থক্য রয়েছে।

এদেশে মুসলমান শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় সুলতানী আমলে আদিনা মসজিদ, সোনা মসজিদ, বাঘা মসজিদ ও ষাটগম্বুজ মসজিদসহ অসংখ্য মসজিদ প্রতিষ্ঠা পায়। ১৫৩১ খ্রিস্টাব্দে নসরৎ শাহ ইট দিয়ে গৌড়ের কদম রসুল (আরবি ভাষায় 'কদম' মানে পা) নির্মাণ করেন। এর উপর আঁকা আছে নবির পদচিহ্ন। এ ধরনের আচরণ মূলত বাংলার লৌকিক সংস্কৃতিরই অংশ। মুঘল আমলে বাংলায় গড়ে ওঠে লালবাগেরকেল্লাসহ অসংখ্য মসজিদ। মুসলিম শিয়া সম্প্রদায় কারবালার নিষ্ঠুর ঘটনাকে স্মৃতিতে জাগরিত করে রাখতে ইমামবাড়া তৈরি করে থাকে। বাংলাদেশে এ ধরনের ইমারতের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ পুরানো ঢাকায় অবস্থিত হোসনী দালান। সুতরাং প্রাচীন ও মধ্যযুগে ধর্মীয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সেই যুগে সংগ্রহশালার বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছিলো। লক্ষণীয় যে, আরবরা যেখানেই গেছে, তাদের ধর্মের সাথে তাদের ভাষা ও আরবি অক্ষর সেখানে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছে। যেহেতু বহু বিবাহ ইসলামে নিষিদ্ধ নয়, তাই নানা জাতির রক্তের সাথে সংমিশ্রণ ঘটেছে আরব রক্তের। ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে দুটি বিভাগ আছে শিয়া ও সুন্নি। এই দুই বিভাগের চার খলিফার প্রতি বিশ্বাস ভিন্ন। শিয়া মতবাদ প্রথমে আরবদের মধ্যে দেখা দিলেও তা ইরানিদের কাছে বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। শিয়া মতবাদকে কেন্দ্র করে ইসলামে সৃষ্টি হয়েছে মরমীবাদ ও গুহ্যতত্ত্বের সাধনা। এই মরমীবাদের প্রভাব পড়েছে শিল্পকলায়। মুসলমান সমাজে দরবেশ, সূফি ও সাধকরা ছিলেন সম্মানিত ব্যক্তি। সূফিদের মৃত্যুর পর এদেশে অনেক সমাধি ও মাজার গড়ে ওঠে। ইসলামে মাজার কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি নিয়ে বিরোধ থাকলেও মাজার সংরক্ষিত হয়েছে পিরের ভক্তদের মাধ্যমে। মাজারে গিয়ে প্রার্থণা করা, গান পরিবেশন করা, সিন্নিপ্রদান করা, মানত করা ইত্যাদি অবস্তুগত লোকসংস্কৃতিচর্চা এখনও গ্রামীণ জীবন ছাড়াও বাংলাদেশের বৃহৎতম শহরগুলোতে অব্যাহত রয়েছে।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পূর্বে ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং আর্কিওলোজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া'র উদ্যোগে বাংলাদেশের প্রাচীন প্রত্নস্থলগুলো উন্মোচিত হয়েছে। এই উৎখনন ও অনুসন্ধানের মধ্যদিয়ে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন এলাকায় মহাস্থান, ময়নামতি ও পাহাড়পুর সাইট সংগ্রহশালা গড়ে ওঠে। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বর্তমানে এ সব ঐতিহাসিক স্থান ও ইমারতসমূহ বাংলাদেশ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ

নিয়ন্ত্রন করে থাকে। সরকারি মর্যাদাসম্পন্ন যে কোনো প্রতিষ্ঠান সরকারি আইন-কানুন, নিয়ম নীতিমালা ও সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত হয়ে থাকে। প্রাতিষ্ঠানিক সংগ্রহশালাসমূহ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধিনে পরিচালিত হয় । সরকারিভাবে পরিচালিত বহুবিদ্যাসম্বলিত 'বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরটি' বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ এবং শ্রেষ্ঠ জাদুঘর। অন্যদিকে স্বায়ত্তশাসিত সংগ্রহশালাসমূহ অত্র প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নে এবং সরকারি অনুদানে পরিচালিত হয়। এ ধরনের সংগ্রহশালাগুলোর মধ্যে বরেন্দ্র গবেষণা সংগ্রহশালা, ঢাকা মহানগর সংগ্রহশালা অন্যতম প্রতিষ্ঠান।লোকসংগ্রহশালা প্রশাসনিক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে থাকে সংগ্রহশালায় সংগৃহীত প্রতিটি নিদর্শনের ব্যাখ্যাকরণ, দলিলিকরণ, গুদামজাতকরণ, পুনরায়ন এবং নিদর্শন প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। পরিপূর্ণভাবে সংগ্রহশালা গড়ে তোলার পিছনে একজন সফল সংগ্রাহক সবচেয়ে বেশি অবদান থাকে । নিদর্শন সংগ্রহের সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হলো উপহার গ্রহণ। সমাজের অনেক বিদ্যোৎসায়ী, অভিজাত পরিবার তাদের পারিবারিক ঐতিহ্যের বিভিন্ন নিদর্শন সংগ্রহশালায় দান করে থাকেন। ইসলামী উপাদানের মধ্যে পবিত্র কোরআন শরিফ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। বরেন্দ্র গবেষণা সংগ্রহশালা, লালবাগদূর্গ ও জাতীয় জাদুঘরে পবিত্র কোরআনের যে নিদর্শনগুলো দেখতে পাওয়া যায় এর বেশিরভাগ নিদর্শন দানে প্রাপ্ত। সংগ্রহশালার জন্য নিদর্শন ক্রয় করে উপাদান সংগ্রহ করা হয়। সংগ্রহশালা কর্তৃপক্ষ (সরকার) নির্দিষ্ট অর্থ বাজেটের মাধ্যমে সংগ্রহশালার নিদর্শনের জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পছন্দমত উপাদান মালিকের কাছ থেকে দলিল করে ক্রয় করতে হয়। সংগ্রহশালার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজের অংশ হলো সংগ্রহশালার নিদর্শনসমূহ নথিভুক্ত বা দলিলিকরণ করে তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা। নষ্ট হয়ে যাওয়া উপাদান পুনরুদ্ধার করা যে কোনো সংগ্রহশালার জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজের অংশ।

লোকসংগ্রহশালার নিদর্শন দর্শকদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্যে অবশ্যই নির্দশনের পরিচিতি এবং ব্যাখ্যাকরণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যে কোনো লোক ও কারু শিল্পের নিদর্শন সংগ্রহের সময় স্থান, সময়, উপাদান বস্তুটিকে পুঙ্খানুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হয়। তাঁতে বুনানো কাপড়ের ঐতিহ্য আজো এ সমাজে টিকে আছে। তবে ঐতিহ্যবাহী মসলিন তৈরি এ সমাজ থেকে উঠে গেছে। এর পরিবর্তে জামদানি তৈরি টিকে আছে। বাংলাদেশের লোকশিল্পের মধ্যে মসলিন, জামদানি, নকশি কাঁথা বাঙালি জাতিসত্তারই পরিচয় দেয় যা পৃথিবীর অন্যকোনো দেশে এমন ঐতিহ্যের সন্ধান বিরল বলে মনে হয়। সম্প্রতি ইউনেসকো কর্তৃক জামদানি বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি লাভের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশের মর্যাদা আরো এক ধাপ এগিয়ে গেছে। বলাবাহুল্য যে এ দেশের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত গ্রামীণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বিশেষ করে লোক ও

কারুশিল্পগুলোকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে সেগুলো সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বাংলাদেশের লোকসংগ্রহশালাগুলো বাংলাদেশের জাতীয় উৎসবগুলো পালন ছাড়াও বাঙালির ঋতুভিত্তিক প্রধান উৎসব যথাঃ বসন্ত উৎসব, ১লা বৈশাখ, নবান্নের পিঠাপার্বণ ইত্যাদি লোকজ উৎসবে মেলার আয়োজন করে থাকে। উৎসবমূখর আমেজ সকল ধর্মের মানুষের মধ্যে আরো সম্প্রিতি বাড়িয়ে দেয়। গ্রামীণ মেলা এ উৎসবগুলো মনে করিয়ে দেয় কালবদলে আধুনিক সভ্যতা চরম শিখরে পৌঁছে গেলেও বাঙালি জাতি তার নিজস্ব সংস্কৃতিকে এখনও টিকিয়ে রেখেছে। লোকসঙ্গীত এখন আর কোনো উপেক্ষিত বিষয় নয়। আধুনিক সঙ্গীতের নামে যন্ত্রের ঝনঝনানির পরিবর্তে বাঁশি একতারা, দোতারা, ঢোল, হারমোনিয়মে পরিবেশিত এখন অনেক বেশি জনপ্রিয়।

তৃতীয়ত, বস্তুত আরবি ভাষায় লিখিত মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ কুরাআনের অনুলিপি তৈরি ও প্রচারের প্রয়োজনেই ইসলামী লিপিকলা বিকশিত হলেও পরবর্তীতে এর ব্যবহার কেবল ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং মুসলিম স্থাপত্যে, সিরামিক, কাঁচ, মৃৎশিল্প, ধাতুশিল্প, বয়নশিল্পসহ বিভিন্ন শিল্পমাধ্যমে ব্যবহৃত হয়েছে। ইসলামী নকশাকলার কেন্দ্রবিন্দু হলো স্থাপত্য (Architecture)। প্রধানত স্থাপত্যকে নির্ভর করেই গড়ে উঠেছে ইসলামী নকশাকলা। এ শিল্পের জন্ম হয় রাজা বাদশাদের পৃষ্ঠপোষকতায়। ইসলামী শিল্পকলার আদর্শ হলো সবকিছুতে সৌন্দর্য-আরোপ। বাংলায় ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পর পারস্য থেকে অনেক কারিগর এদেশে এসেছিলেন । এই শ্রেণিটি মুসলিম শাসক কর্তৃক বাংলার স্থাপত্যশিল্পের নির্মাণ কাজে নিয়োগ প্রাপ্ত হলে পারসিক নকশাকলা ধারা এদেশিয় শিল্পের মধ্যে বহিঃপ্রকাশ ঘটে। ইসলাম এদেশে আসার পূর্বে বৌদ্ধ বিহার ও মন্দিরের মধ্যে টেরাকোটা, প্রতিমা ঢালাই রীতিতে যে নকশা এদেশে প্রচলিত ছিলো তা হলো ভারতীয় ও বাংলার স্থানীয় বা লোক নকশা। তবে মুসলিম বিশ্বে ইসলামী শিল্পকলার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে ধর্মীয় অনুপ্রেরণা ছাড়াই কেবল সৃজনশীলতা এবং শৈল্পিক অভিব্যক্তির ভেতর দিয়ে। বিশেষ করে ইসলামী শিল্পকলায় মানুষ ও প্রাণীর মূর্তি নির্মাণে মুসলিম সমাজে বিশেষ আগ্রহ কম দেখা যায়। মুসলমানরা যদিও ভাস্কর্য তৈরি করেছে সেখানে মূর্তির সাথে বাস্তব চেহারার সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়না। ইসলাম ধর্মে মূর্তি পূজা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ধর্মীয় এই নিষেধাজ্ঞার কারণে মুসলমানরা তাদের ধর্মীয় উপাসনালয় মসজিদ সৌন্দর্যমণ্ডিত করার লক্ষ্যে জীবজন্তু ও প্রাণীর ছবির পরিবর্তে নান্দনিকভাবে লিখিত কোরআনের আয়াত ফুললতাপাতার অলংকরণে মণ্ডিত ছবি রাখতে বেশি আগ্রহ দেখিয়েছে। আরবি লিপিমালা তিন ধরনের। (১) কুফি, (২) নাখস, (৩) তুঘরা। তুঘরা লিপিমালা। কুফি আরবিলিপিমালা হস্তলিপির বর্ণগুলো চৌকো ও চোখাচোখা আকৃতিবিশিষ্ট। তুঘরা পদ্ধতিতে লেখা

Dhaka University Institutional Repository

লিপিমালা অত্যন্ত আলংকারিক ভাবে লেখা হয়ে থাকে। তুঘরা লিপিতে অলংকরণের প্রয়োজনে হরফগুলো কখনো লম্বা, কখনও বক্র আবার কখনো চিত্রাকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। নাখস হস্তলিপির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো গোল-বক্রাকৃতির বর্ণসজ্জা।

আরবিতে নকশা হলো সাধারণভাবে কোনো স্থান বিশেষ বা জিনিস শোভা বর্ধনের জন্যে কৃত কারুকার্য। ইসলামী নকশাকলা তিনভাগে বিভক্ত ১. উদ্ভিদীয় পরিকল্পনা ২. জ্যামিতিক আকার আকৃতি ও রেখা ৩. বিশুদ্ধ অবিমিশ্র রঙ ও আরবি বর্ণমালা(Calligraphy। বাংলাদেশের লোকশিল্প হলো লোকসমাজের জীবন ও জীবিকার বড় মাধ্যম। গ্রামীণ শিল্পীরা কোনো জ্যামিতিক মাপ ঝোপ না জেনেও মনের ভাষা ও সুরে তাল, লয়, ও ছন্দে সৃষ্টি করে নকশা। বাংলার লোকনকশা মানেই পদ্ম, কলকা, বর্ফি, বুটি, তরঙ্গিত পুস্পিত লতা, পেঁচানো ফুল ও বৃত্ত ইত্যাদি।

সুলতানী আমলে কোনো কোনো শাসকের অনুমতিতে স্থানীয় ধংসপ্রাপ্ত পরিত্যাক্ত মন্দির থেকে প্রাপ্ত পাথরের দেবদেবীর অংশটুকু বাদদিয়ে ফুল-লতামণ্ডিত অলংকৃত পাথর কিছু মসজিদে ব্যবহার করা হয়েছিলো। ফলে দেখা গেছে যে, সুলতানী আমলে ফুল লতাগুল্ম ও জ্যামিতিক প্যার্টানে তৈরি টেরাকোটা নকশাকলা বাংলার মুসলিম শাসকদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সুলতানী যুগে মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলায় গড়ে ওঠা মসজিদের অংলকরণ ইসলামী নকশাকলার অনন্য দৃষ্টান্তে পরিণত হয়। এটাই প্রতীয়মান হয়েছে যে, স্থাপত্যের বিভিন্ন ধরনের অলংকরণ সমাজের লোকশিল্পীদের ওপর প্রভাব ফেলেছিলো। হিন্দু রমনীদের ব্রত পালনের উদ্দেশ্যে আঁকা আলপনা মুসলমানদের ব্যবহারিক জীবনে পেয়েছে নান্দনিক রূপে। নকশি কাঁথা, শীতলপাটি, নকশি পিঠার ছাঁচ, কাঠের তৈরি রেহেল ও জায়নামাজের মধ্যে ইসলামী নকশাকলায় সৌন্দর্যবোধ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সাধারণত পবিত্র কোরআন এবং আরবি ভাষায় লেখা পুস্তকগুলোতে নাখসের ব্যবহার বেশি দেখা যায়। লোকশিল্পীরা নকশি কাঁথায়, নকশি পিঠার ছাঁচে, নকশি পাখায়, নানাধরনের ধাতবদ্রব্যে ও পোশাক পরিচ্ছেদে বিভিন্ন ধরনের ইসলামী ও লোক নকশায় সমৃদ্ধ করেছে।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো এই যে, সময়ের সাথে সাথে মৃৎ ও কাঁসা পিতল ও তারজালি কাজের তৈজসপত্রের পরিবর্তে বর্তমানে কাঁচ ও প্লাস্টিকজাত দ্রব্যের ব্যবহার সমাজে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। তবে ফুল লতা-পাতার সমন্বয়ে করা জটিল নকশা ও জ্যামিতিক নকশার ধারা পূর্বের মতো এখন রয়ে গেছে। বর্তমান যুগের আধুনিক আসবাবপত্রের মধ্যে শোফাসেট, শোকেস, টেবিল ল্যাম্প ইত্যাদির মধ্যেও দেখা যায় সেই মুসলিম শাসনামলের মসজিদে টেরাকোটা নকশা ও অলংকরনের নমুনা। অতএব, ইসলামী ও লোকনকশার ব্যাপ্তি আধুনিক সমাজের বিলাসী

Dhaka University Institutional Repository

জীবন যাপনের সাথে সংশ্লিষ্ট আসবাবপত্রে, উচ্চ দালালকোঠা, এমন কি মৃত ব্যক্তিকে কবরস্থানে নিয়ে যাওয়ার খাটিয়ার মধ্যেও সন্নিবেশ ঘটেছে।

বর্তমানে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, বরেন্দ্র গবেষণা সংগ্রহশালা, লোক ও কারুপল্লী ফাউন্ডেশন, লালবাগের কেল্লা, ঢাকা মহানগর সংগ্রহশালা, আহসান মঞ্জিল সংগ্রহশালা ও এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের ইসলামের ইতিহাস ও সভ্যতা বিভাগের সংগ্রহশালায় ইসলামী উপাদান খুঁজে পাওয়া যায়। বিশেষ করে বাংলাদেশের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহ্যবাহী মসজিদ ও ধ্বংসাপ্রাপ্ত বাসভবন থেকে খসে পড়া টেরাকোটা, মিনা করা ইসলামী উপাদানে সমৃদ্ধ টালির অংশ, শিলালিপি, পবিত্র কোরআন শরিফ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, বরেন্দ্র গবেষণা সংগ্রহশালায় পর্যাপ্ত পরিমানে সংগ্রহ করা হয়েছে। বরেন্দ্র গবেষণা সংগ্রহশালা, লালবাগদুর্গ ও বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে চমৎকার নকশামণ্ডিত প্রচ্ছদে মোড়ানো বেশকিছু পবিত্র কোরআন শরিফের নিদর্শন প্রদর্শনী হচ্ছে। এছাড়াও বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও বরেন্দ্র গবেষণা সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত আছে বিভিন্ন মসজিদের শিলালিপি, ঢাকার বড় কাটরার উত্তর দিকের ফটকের শিলালিপি,সমাধিলিপি, সেতুনির্মাণ উপলক্ষে সিলেট শিলালিপি, ইমারতের শিলালিপি ইত্যাদি। বাংলার সুলতানদের সময়কার কিছুসংখ্যক আকর্ষণীয় মুদ্রা বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, বরেন্দ্র গবেষণা সংগ্রহশালা, ও লালবাগদুর্গ ও আহসান মঞ্জিল সংগ্রহশালায় প্রদর্শন কক্ষে দেখা যায়। এসব অনেক মুদ্রার এক পিঠে প্রচলিত মুসলিম রীতি অনুযায়ী সুলতানের নাম, তারিখ, টাকশাল, সমকালীন বাগদাদের বা মিসরের ফাতমি খলিফাদের নাম এবং কলিমা খোদিত রয়েছে।

বরেন্দ্র গবেষণা সংগ্রহশালায় রয়েছে টেরাকোটার ওপর লিখিত কালেমা তাইয়্যব। এ ছাড়াও কাঠের ওপর ধাতু দিয়ে তৈরি চাঁদ ও তারা নকশাটির মধ্যে কোরআনের আয়াত লিখে চমৎকারভাবে নান্দনিক রূপ দেয়া হয়েছে। বরেন্দ্র সংগ্রহশালার আরো একটি অন্যতম নিদর্শন হলো পাক পাঞ্জাতন। এ ধরনের আরেকটি নিদর্শন তোফায়েল আহমেদের বাংলা ঘরের প্রদর্শনীতে ছিলো। বাংলা একাডেমি লোক ঐতিহ্য সংগ্রহশালায় ছিলো টিনের পাতের ওপর আল্লাহু ও রাসূলের লেখা নাম। তারজালি কাজের তৈরি আহসান মঞ্জিল ও হোসনী দালানের মডেল দুটি জাতীয় জাদুঘরের প্রদর্শনীতে রয়েছে। এ ছাড়াও গোলাপপাশ সুরমাদানী ও বিভিন্ন তৈজসপত্রাদি ঢাকা মহানগর জাদুঘর, লোক ও কারুপল্লী ফাউন্ডেশন ও জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।

ইসলামী চিত্রকলায় পুঁথিচিত্র যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে পুঁথিচিত্র সংরক্ষিত আছে। মুঘল আমলে কাগজে পাণ্ডুলিপি লিখন আরম্ভ হয়। সময়ের পরিবর্তনে বেশিরভাগ পাণ্ডুলিপিই আজ

ধ্বংসপ্রাপ্ত। এই দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপির কয়েকটি লালবাগদুর্গের সংগ্রহশালার দ্বিতলের দক্ষিণ কক্ষের পূর্ব পার্শ্বে প্রদর্শিত হচ্ছে। মুঘল শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় মিনিয়েচার চিত্ররীতি সমগ্র ভারতবর্ষে প্রচলিত হয়। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও বরেন্দ্র গবেষণা সংগ্রহশালায় রয়েছে। দুঃখের বিষয় হলো পটচিত্র বাংলার লোকশিল্পের অন্যতম নিদর্শন হওয়া সত্বেও পটচিত্রের কোনো নমুনা বাংলাদেশের লোকসংগ্রহশালাগুলো সংগ্রহ করেনি। তবে লোক ও কারুপল্লী ফাউন্ডেশনের সর্দার বাড়ির দেয়ালে পটচিত্রের নমুনা চিত্র এঁকে প্রদর্শন করা হচ্ছে। পটচিত্রের অন্যতম আকর্ষণ হলো গাজীর পট। গাজীর পট চিত্রের নিদর্শন এখানে দেখতে পাওয়া যায়। এ ছাড়াও জাতীয় জাদুঘর, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ও ঢাকা মহানগর জাদুঘরে শিল্পী মুসাব্বিরের আঁকা ঈদের দিনের চিত্রটি প্রদর্শনীতে দেখা যায়।

ইসলামে যুদ্ধের নির্দেশ রয়েছে। মহানবি (স) স্বয়ং যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে অস্ত্র ধরেছেন। বিভিন্ন ধরনের ছোরার বাটে কোরআনের বাণী ও ফুললতাপাতামণ্ডিত অলংকরণে সজ্জিত করা হয়েছে। এ ধরনের নিদর্শন লালবাগদূর্গ, জাতীয় জাদুঘর, বরেন্দ্র গবেষণা সংগ্রহশালায় দেখা যায়। ফুললতামণ্ডিত নকশা ও আরবি লিপিমালা ব্যবহার করে বিভিন্ন তৈজসপত্রের মধ্যে বিশেষ করে গ্লাস ও বাটিতে যে নান্দনিক রূপ ফুটিয়ে তোলা সম্ভব তার নিদর্শন জাতীয় জাদুঘরের প্রদর্শনীতে দেখা যায়। জাতীয় জাদুঘরে রয়েছে হাতির দাঁতের তৈরি একটি পাটি এবং বিভিন্ন ধরনের চামচ। ইসলাম বাংলায় প্রতিষ্ঠার পর এদেশীয় হিন্দুরা মুসলমানদের কাছ থেকে পোশাক পরিচ্ছেদ পরিধান ও পায়ে জুতা ব্যবহার করা শিখেছিলো। মুসলমানদের ধর্মীয় জীবনের সাথে পোশাক পরিচ্ছদের গুরুত্ব অনেক বেশি। জাতীয় জাদুঘর ও বরেন্দ্র গবেষণা সংগ্রহশালায় রয়েছে মুসলিম অভিজাতদের ব্যবহৃত কারচোপ কাজযুক্ত শেরওয়ানি, চোগা, টুপি, ও মসলিন কাপড়। পবিত্র কোরআন কাঠের তৈরি রেহেলের ওপর রেখে কোরআন তেলোয়াত করা মুসলিম সংস্কৃতির একটি অংশ। বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের জায়নামাজ তৈরি হয়ে থাকে। গ্রামীণ সমাজে খেজুরের পাটি, শীতলপাটি, নকশিকাঁথার জায়নামাজ বেশি ব্যবহৃত হয়। এ ধরনের নিদর্শন বরেন্দ্র গবেষণা সংগ্রহশালা, জাতীয় জাদুঘর, ও লোক ও কারুপল্লী ফাউন্ডেশনের গ্যালারি দেখতে পাওয়া যায়।

বাংলাদেশে মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় ইসলামী শিল্পকলার বহিঃপ্রকাশ ঘটে মসজিদ স্থাপত্যের মাধ্যমে। কিন্তু হিন্দু ও মুসলমানরা একই ভূখণ্ডে বসবাস করার ফলে অনেক আচার-আচারণ দুই ধর্মের মানুষের মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটেছে। শিল্পকলা ইসলামী নকশাকলার বেশিরভাগ সৃষ্টি হয়েছে বিমূর্ত প্রতীকে আলংকারিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। সেই অর্থে ইসলামী শিল্পকলা বিশেষভাবেই ধর্মনিরপেক্ষ শিল্পকলা। ইসলামী উপাদান আসলে শুধুমাত্র মুসলমানদের জীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ কোনো বিষয় নয়। এর ভেতর দিয়ে বাঙালি জাতির নিজেশ্য সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যেরই পরিচয় মেলে।

MšcÄx

অদুদ, মোহাম্মদ আবদুল, evsjv fvlvq Ki©Avb PPv: DrcwË I µgweKvk, আল-কুর'আন রিসার্চ একাডেমি, ঢাকা

আউয়াল, উল- ইফতিখার (সম্পা) HwZnwmK XvKv gnvbMix: weeZb I m¤¢vebv, জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা, ২০০৩

আলম, রফিকুল, wek mf¨Zv I wkíKjv, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০১

আলম, রফিকুল, cvðvZ¨ wk‡íi BwZnvm, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা ১৯৯৪

আলম, রফিকুল, Dcgnv‡`‡ki wkíKjv, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩

আলম সৈয়দ মাহবুব, †jvKwkí, সোনারগাঁও জাদুঘর, নারায়ণগঞ্জ, ২০০২

আলম সৈয়দ মাহবুব, †jvKwkí, সোনারগাঁও জাদুঘর, নারায়ণগঞ্জ, ১৯৯৯

আলম সৈয়দ মাহবুব, (সম্পা) Kvi“gq †dg c‘kbx I †mwgbvi, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, নারায়ণগঞ্জ, ১৯৯৬

আলম সৈয়দ মাহবুব, (সম্পা) †jvKwkí (†jvKKvi“wkí †gjv I †jvKR Drme, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, ২০০১

আলম, এ. কে. এস শামসুল, jvjevM `M I hv`Ni, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা

আলম, ড. মো. শফিকুল ও ইয়াসমিন, লাভলী, cZ¡PPv, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা

আলাউদ্দিন শেখ (m¤úv) gvme¨vcx †jvKKvi“wkí †gjv I †jvKR Drme, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, ২০০৮

আবদুল, জব্বার শেখ, Bmjvg-wPÎ I mgvR-wPÎ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৯৯

আবদুল, জলিল, মুহাম্মদ, evsjv‡`‡ki mvIZvj: mgvR I ms¯‹…wZ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৯

আহমদ, ওয়াকিল, †jvKKjv ZË I gZev`, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৯

আহমদ, ওয়াকিল, evsjv‡`‡ki †jvK- ms¯‹…wZ, গতিধারা বাংলাবাজার, ঢাকা, ৩য় সংস্করণ, ২০০৪

আহমদ তোফায়েল, XvKvi ewYR¨K Kvi“Kjv wcZj: Pvgov: KvZvb, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৯১

আহমদ, তোফায়েল, †jvK HwZ‡n¨i `k w`MšÍ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৯

আহমদ, তোফায়েল, Avgv‡`i cvPxb wkí, এ. এইচ. খান, ঢাকা, ১৯৬৪

আহমদ, তোফায়েল, †jvKwk‡íi fe‡b, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯১

আহমদ, মনসুর আবুল, evsjv‡`‡ki KvjPvi, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৭৬

আহমদ, কামাল, wkíKjvi BwZnvm, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৪

আহসান, সৈয়দ আলী, wkí‡eva I wkí ˆPZb¨, ঢাকা ১৩৯০ বঙ্গাব্দ

আলমগীর, জলিল, evsjv‡`‡ki MvgxY ms¯‹wZ, ঢাকা, ১৯৮৫

আজিম, ফয়েজুল, PviæKjvi fwgKv, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯২

আহমেদ, তোফায়েল, †jvKwk‡íi fe‡b, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৪

আহমেদ, নিজাম উদ্দিন, wK‡kvi wek mwnZ¨, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৫

আহমেদ, তোফায়েল, Avgv‡`i cvPxb wkí, এ.এইচ.খান, ঢাকা, ১৯৬৪

আহমেদ, নাজিমমুদ্দিন, gnv¯’vb gqbvgwZ cvnvoci, প্রত্মতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ও উপনিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রালয়, ঢাকা, ১৯৬৬

আকন্দ, সফর আলী (সম্পা),evOvjxi AvZ¥cwiPq, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ, রাজশাহী

আলী, কে. evsjv‡`‡ki BwZnvm, আলী পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৮৩

আলী, এ কে এম ইয়াকুব e‡i›` AÂ‡j gmwjg-BwZnvm HwZn¨, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০২

আলী, এ কে, এম ইয়াকুব, gmwjg g`v I n¯ÍwjLb wkí, ঢাকা, ১৯৮৯

আলী, এ কে, এম ইয়াকুব, gmwjg ¯’vcZ¨ ivRkvnx, ১৯৭৪

আলী মতলুব, wkíx I wkíKjv, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

ইসলাম, ডক্টর মযহারুল, †jvK Kwnbx msM‡ni BwZnvm, স্টুডেন্ট ওয়েজ, বাংলাবাজার, ঢাকা, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ

ইসলাম, সিরাজুল (সম্পাদিত), evsjv‡`‡ki BwZnvm (A_©bwZK BwZnvm) 1704-1971, দ্বিতীয় খন্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩

ইসলাম, সিরাজুল (সম্পাদিত), evsjv‡`‡ki BwZnvm (ivR‰bwZK BwZnvm) 1704-1971, প্রথম খন্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩

ইসলাম, সিরাজুল (সম্পাদিত), evsjv‡`‡ki BwZnvm (mvgwRK I mvs¯‹wZK BwZnvm) 1704-1971 দ্বিতীয় খন্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩

ইসলাম, সিরাজুল (সম্পাদিত), evsjv‡'‡ki BwZnvm, 1704-1971, তৃতীয় খন্ড, mvgwRK I mvs¯‹…wZK BwZnvm, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩

ইসলাম ডক্টর মাযহাররুল †dvK‡jvi cwiwPwZ Ges †jvK mvwn‡Z¨I cVb-cvVb, বাংলা একাডেমি ঢাকা, ১৯৬৭, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৩

ইসলাম, সৈয়দ আমীরুল evsjv‡'‡k wgDwRqvg, জ্যোতিপ্রকাশ ঢাকা, ২০০৬

ইসলাম সৈয়দ আমীরুল, (সম্পা) evsjv‡'‡ki Rv'Ni, সময় প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০২

ইসলাম, মোহাম্মদ সিরাজুল, evsjvi wgDwRqvg, evsjvi †jvKwkí, বিশ্ব সাহিত্য ভবন, ঢাকা, ২০০২

করিম আব্দুল, XvKvB gmwjb, ঢাকা নগর জাদুঘর, ১৯৯০

করিম মোহাম্মদ রেজাউল (সম্পা) এবং ড. সৈকত আজগর, †mvbviMv‡qi BwZnvm, Drm I Dcv'vb, ১৯৯৩, ঢাকা

করোভকিন, ফিওদর cw_exi BwZnvm: cvPxb hM, প্রগতি প্রকাশন, g‡¯‹v, 1983

কর, চিন্তামনি, aæc'x fviZxq fv¯‹h, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৪

কিরণ তালুকদার, খগেশ, evsjv‡'‡ki †jvKvqZ wkíKjv, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৭

ক্যাহনেল, আর্নষ্ট, BmjvgxwkíKjv I ¯'vcZ¨, বইঘর বিপনী বিতান, চট্টগ্রাম, ১৯৭৮

কামিল্যা, ড. মিহির চৌধুরী, evsjvi bvix ms¯‹…wZ, ভোলানাথ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৩

কৃষ্ণ দাস, গোপাল ও জেন্নিরা কুমকুম, HwZnwmK gnv¯'vb (cwi‡cÖwÿZ: cÛ bMi, cÛeab) বাংলা বাজার, ঢাকা, ২০০১

করিম, আবদুল, gmwjg evsjvi BwZnvm I HwZn¨, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৪

খান, কে. এম. রইছ উদ্দিন, evsjv‡'‡ki BwZnvm cwiµgv, cvPxb, ga¨ I AvaywbK hM, খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানী, ঢাকা, ১৮৮৬

খান শামসুজ্জামান, AvaywbK †dvK‡jvi wPšÍv, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০১

খান শামসুজ্জামান (সম্পা) †gvnv¤§' mvB'i ¯§viKMš', সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১২

খাতুন, শাহিদা (সম্পাদিত) †dvK‡jvi msKjb: 71 (†jvK Kwnbx), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৮

গঙ্গোপাধ্যয়, কল্যাণকুমার evsjvi fv¯‹h , সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ১৯৮৬

গোপ, রবীন্দ্র, †jvKwk‡íi wbewPZ ceÜ, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ২০১০

ঘোষ, বিনয়, evsjvi ms¯‹…wZ mgvRZË, তরুণ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ

ঘোষ. প্রদ্যোত, evsjvi †jvKwkí, পুস্তক বিপনি, কলকাতা, ২০০৪

ঘোষ, নির্মল কুমার, fviZwkí, কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮৩

সাঁতরা, তারাপদ, evsjvi ‘viæ-fv¯‹h, আনন্দ নিকেতন কীর্তিশালা, বাগনান, হাওড়া, ভারত ১৯৮০

সরকার, শিপ্রা, k•L wkí: wdì I qvK wfwËK g‡bvMvd, ঢাকা বাংলা একাডেমি, ১৯৯৭

চৌধুরী, মোমেন, evsjv‡‘‡ki †jŠwKK AvPvi-Abôvb, Rb¨ I weevn, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৮

চৌধুরী, মোমেন, †jvKms¯‹…wZ I wewea cm½, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৭

চৌধুরী, আবুল আহসান, †jvK ms¯‹…wZ we‡ePbv I Ab¨vb¨ cm½, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৭

চক্রবর্তী ডি. লিট ড. বরুনকুমার, সম্পা, e½xq †jvK ms¯‹…wZ †KvI, অর্পনা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, ভারত

চক্রবর্তী, সুনীল, †jvKvqZ evsjv, কল্যাণী, কলিকাতা, ১৯৬১

চৌধুরী, দুলাল, evsjvi †jvK Drme, পুস্তক বিপণী, কলকাতা, ১৯৮৭

চট্টপাধ্যায়, তুষার, †jvK ms¯‹…wZi ZËi/c I ¯‹i/c mÜvb, এ মুখার্জী, কলিকাতা, ১৯৮৫

চক্রবর্তী, বিমলেন্দু, †jvKqZ evsjvi wPÎwkíx I wPÎKjv, স্টান্ডার্ড পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৪০৩

জামান, ফরিদা, AvawbK wPÎKjvq †jvK wk‡íi cfve, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৮

জাহাঙ্গীর খান, বোরহান উদ্দিন, wPÎwkí, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৪

জলিল, মুহম্মদ আবদুল, †jvK ms¯‹…wZi bvbv cm½, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৫

জলিল, মুহম্মদ আবদুল, k‡Li nwo ivRkvnx AÂ‡ji grwkí, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৭

জেসমিন, প্রমীলা, evsjv‡‘‡ki c”Q‘wP‡Î †jvKKjvi cfve, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৯

RvZxq Kvi“cY¨ c‘kbx, 1998 ®§iwYKv, রপ্তাণী উন্নয়ন ব্যুরো, বাংলা ক্রাফট, ঢাকা, ১৯৮৮

তরু, মাযহারুল ইসলাম, PvcvBbeveM‡Äi †jvKms¯‹…wZ cwiwPwZ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৯

তালুকদার, খগেশকিরণ,evsjv‡‘‡ki †jvKvqZ wkíKjv, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৭

তরফদার, মমতাজুর রহমান, †nvmb kvnx Avg‡j evsjv 1494-1538 GKwU mvgwRK ivR‰bwZK c‡hlYv, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০১

দাস রঞ্জন সুবীর, DrLbb weÁvb, নব ভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৭৫

প্রধান, সুধী (সম্পা) †jvKkæwZ, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, ১৯৯৬

পাঠক, ড. যোগেশরঞ্জন, †jvKwkíÿv I †jvKms¯‹…wZ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৭

Dhaka University Institutional Repository

মজুমদার, শ্রী রমেশচন্দ্র, evsjv‡'‡ki BwZnvm, জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮৭

ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় †jvKwkí ebvg D"P gvMxq wkí লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, ১৯৯৯

সিরাজুল ইসলাম (সম্পা) evsjv wcwWqv evsjv‡'k RvZxq Ávb‡Kvl ৪র্থ খন্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা

বেদান্ততীর্থ, গিরীশচন্দ্র, cvPxb wkí cwiPq, ক্ষিতীশচন্দ্র, কলিকাতা, ১৩২৯ বঙ্গাব্দ

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসুরেশ চন্দ্র, wZb nvRvi eQ‡ii †jvKwqZ Rxeb, ms¯‹Z mwnZ¨ Aej‡b, এ মুখার্জী কলিকাতা, ১৩৮৩

বসাক শিলা, evsjvi bKkxKv_v, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০2

বন্দোপাধ্যায়, অমীয় কুমার, e½ j ²xi Swc, কলকাতা, ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ

বানু জিনাত মাহরুখ, evsjv‡'‡ki 'viæwkí, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা, ২০০৩

বিলকিস বেগম, PvcvBbeveM‡Äi mwPwkí, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৬

ভূই শ্রাবণী, bKkx Kv_vi KíK_v, লোকসংস্কৃতি, শৈলেনদাস (সম্পা), কলকাতা, ১৯৯৯

ভট্টাচার্য্য ভোলানাথ, wkí fvebv, ইন্ডিয়ান পাবলিকেশন্স, কলকাতা

ভট্টাচার্য আশুতোশ, evsjvi †jvK-ms¯wZ, ন্যাশনাল বুক স্ট্রাস্ট ইন্ডিয়া, ১৯৮২

মন্ডল, বিজন কুমার, msMnkvjv I †jvKwkí, ব-দ্বীপ প্রকাশনা, কলকাতা, ১৯১৯

মজুমদার, কমলকুমার (সম্পা) ev0jvi g‡bv‡jvK I Ab¨vb¨ †jvKwPÎ, কলকাতা, ১৪০৫ বাং

মামুন, মুনতাসির, XvKvi gmwjb: BwZnvm HwZn¨-1, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা

মাসুম, নূরুল্লাহ, 'wÿ‡Yi ev'kv Lvb Rvnvb Avjx (in), ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৯৬

মজুমদার, মানস, †jvK HwZ‡n¨i 'c‡Y, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৩

মজুমদার, শ্রী রমেশ চন্দ্র, evsjv‡'‡ki BwZnvm (wØZxq LÐ) কলকাতা জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স ১৯৮৭

মল্লিক, কুমুদনাথ, b'xqv Kwnbx, পুস্তক বিপণী, কলকাতা, ১৯৮৬

মাইতি, প্রভাতাংশু BI‡iv‡ci BwZnv‡mi i/c‡iLv, শ্রী ধর প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৯৫

মিত্র অশোক, fvi‡Zi wPÎKjv c_g LÐ (Aw' hM †_‡K Lx÷xq AvVv‡iv kZ‡Ki c_gva), কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৫

মুরশিদ, গোলাম, nvRvi eQ‡ii evOwj ms¯‹…wZ, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ২০০৬

মুখোপাধ্যায় অলোক, wekwk‡íi i/c‡iLv, এ মুখার্জী এন্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৩৯৫

মুখোপাধ্যায়, বতীন্দ্রনাথ, †jvKwkí ebvg D"P gvMxq wkí, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র কলকাতা ১৯৯৯

মুখোপাধ্যায়, সুখময়, evsjvi BwZnv‡mi ‘‡kv eQi ¯^vaxb mjZvb‡‘i Avgj, আরজী বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৮৮

মুসা, মনসুর (সম্পা), †jvK wkí G¨vjevg, Avng‡‘i †Zvdv‡qj evsjv Ni †_‡K wbewPZ msMn, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৪

মৈত্র, রঞ্জিতা, evOvjvi †jvKe‡Z Avjcbvi fwgKv, পুস্তক বিপনি, কলকাতা, ১৯৯৯

হাসান মাহমুদুল সৈয়দ (সম্পা), evsjv‡‘‡ki †jvKwkí, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, ১৯৮৩

হালিম, আবদুল, বেগম নূরুননাহার, gvb‡li BwZnvm cvPxb hM, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৩

লাহিড়ী, অরুণ কুমার, KvV msi¶Y weÁvb (wØZxq LÛ), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৫

লাল চক্রবর্তী, রতন, evsjv‡‘‡ki gw›‘i, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৫

সাইদুর, মোহাম্মদ, Rvg‘vbx, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩

সামাদ, ড. এবনে গোলাম, Bmjvgx wkíKjv, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৯

সামন্ত রবীন্দ্রনাথ, wkígq evKov, পুস্তক বিপনী, পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৪০০ বঙ্গাব্দ

সাঁতরা তারাপদ, cwðge‡½i †jvKwkí I wkíx mgvR, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র কলকাতা ২০০০

সেনগুপ্ত, শঙ্কর, evsjvi gL Awg †‘wLqwQ, ইন্ডিয়ান পাবলিকেশনস, কলকাতা, ২০০১

সেন গুপ্ত শঙ্কর, †jvKeË: †¶Î wbix¶vi gjmÎô ইন্ডিয়ান পাবলিকেশনস, কলকাতা, ১৯৭৮

সেনগুপ্ত, পল্লব (সমা) †jvKcivb I ms¯‹…wZ, পুস্তক বিপনী কলকাতা, ১৯৮২

শাহেদ, হোসনে আরা, kwo, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৫

সিরাজ, সৈয়দ মুস্তফা, gmwjg wPÎKjvi Aw‘ce Ges Ab¨vb¨, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা

শাহনাওয়াজ, এ কে এম, evsjv‡‘‡ki mvs¯‹…wZK HwZn¨ নভেল পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ২০১০

যাকারিয়া, আব্দুল কালাম মোহাম্মদ, w‘bvRci wgDwRqvg, দিনাজপুর

যাকারিয়া মোহাম্মদ, আবুল কালাম, evsjv‡‘‡ki cZm¤ú‘, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৪

রহমান, হাবিবুর, BU‡Lvjv wenvi, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা, ১৯৯২

রহমান, হাবিবুর, evsjv‡'‡ki †jvKmsMxZ I †fŠMwjK cwi‡ek, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮২

রহমান, মোখলেছুর, ড. মুহাম্মদ, mjZvbx Avg‡j gmwjg ¯vc‡Z¨i wbKvk, প্রেস প্রকাশনা ও জনসংযোগ দপ্তর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, ১৯৯৬

রহমান, ড. মোকলেসুর, evsjvi †jvKwk‡íi bKkxKv_v, বরেন্দ্র সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, রাজশাহী

রহিম, ড. এম এ, evsjvi mvgwRK I mvs¯‹…wZK BwZnvm (c_g LÐ), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৬

রায়, নীহার রঞ্জন, evOvjxi BwZnvm, Awv'ce, দেজ পাবলিশিং, কলিকাতা, ১৪০০ বঙ্গাব্দ

রায়, মোহিত, b'xqv †Rjvi civKxwZ, পূর্ত (পুরাতত্ত্ব) বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ১৯৭৫

রায়, শ্রী অতুল চন্দ্র, fvi‡Zi BwZnvm, মৌলিক লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৯০

রহমান এ.এইচ.এম. হাবিবুর, wk‡ív'¨vM cwiwPwZ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মঞ্জুরীকমিশন, ১৯৮৯

রহমান, হাবিবুর, BUv‡Lvjv wenvi (7g-13k kZK chš— †eŠ× mf¨Zvi wb'kb) cZZ¡ অধিদপ্তর, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৯২

হক, মুহাম্মদ ইনাম উল, evsjvi BwZnvm: fvi‡Z Bs‡iR ivR‡Zi mPbvce, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৯

হক, মাহমুদুল, evsjv‡'k RvZxq Rv'Ni cwiwPwZ, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা, ২০০৫

হাসান সৈয়দ আলী, wkí †eva I wkí ˆPZb¨, ঢাকা, ১৩৯০ বঙ্গাব্দ

হাসান, সৈয়দ মাহমুদুল (সম্পা), evsjv‡'‡ki †jvKwkí, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন, ঢাকা ১৯৮৩

হাসান, মাহমুদুল সৈয়দ, Bmjv‡gi BwZnvm, গ্লোব লাইব্রেরি, ঢাকা, ১৯৯২

হাসান, মাহমুদুল সৈয়দ, gmwjg wjwcKjv, ছাত্রবন্ধু পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৯৫

হাফিজ, আবদুল (সম্পা) †jŠwKK evsjv, বাংলাদেশ ফোকলোর পরিষদ, প্রথম বর্ষ, প্রথম-দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৯৭৮

হাফিজ আব্দুল, evsjv‡'‡ki bKkxKv_v, রোববার, ঢাকা, ২৮ চৈত্র, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ

হালিম আব্দুল, বেগম নাহার নুরুন, gvb‡li BwZnvm cvPxb hM, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৫

হাফিজ, আব্দুল, evOvjv‡'‡ki †jŠwKK HwZn¨, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৫

হুসাইন, রবিউল, evsjv‡'‡ki ¯vcZ¨ ms¯‹…wZ, সন্দেশ আজিজ সুপার মার্কেট, ঢাকা, ১৯৯৬

হোসেন, মোবারক, evsjv‡'‡ki †gjv, মিতা প্রিন্টার্স, বাংলাবাজার, ঢাকা

হোসেন, আনোয়ার সৈয়দ, cvPxb Pxb mf¨Zv, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৫

হোসেন, মোঃ মোশারফ এবং আলম, মোঃ শফিকুল, cvnvoci, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা, ১৯৯২

হোসেন ভূঁইয়া, মোঃ মোকাম্মেল, cvPxb evsjvi †cvovgwUi wkí, দিব্য প্রকাশক, ঢাকা, ২০০৩

হোসেন আবুল বাশার, Avie ¯vcZ¨, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩

হোসেন, মোঃ মোশারফ, cZZË D™e I weKvk cwi‡cw¶Z evsjv‡'k, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ১৯৯৮

হোয়াইট জে. ম্যানচিপ (মাহমুদা ইসলাম অনূদিত) bZ‡Ëi mnR cvV, জে. কে. প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮১

Ahmad, Parveen, ***The Aesthetics & Vocabulary***, Bangladesh National Museum, Dhaka, 1997

Alam, Rafiqul, ***Folk Painting in Bangladesh*** Bangla Academy, Dhaka, 2001

Alam, Syed Mahbub, ***Bangladesh Folk Art and Crafts Foundation***, Dhaka.

Anguli, Kalyankumar, ***Designs in traditional Art of Bengal,*** Directorate of Industries, Government of West Bengal, 1963.

Arts of Bengal: ***The Heritage of Bangladesh and Eastern India***, (Ids, Shelton and Francis M) Trustees wite capel Art Gallery, London, 1979.

Aryan, K.C. ***Folk bronzes of North Western India***, Delhi, Rekha Prakashan.

August Panyella, ***Folk Art of the Americans***, New Your, 1981

Barnard, Nicholas, ***Living with Folk Art. Ethnic Styles from around the word London, Thames and Mudson***, 1998.

Baxi J. smita & Dwivedi P. Vinod ***Modern Museum*** Abhinav Publications Delhi India 1973

Blair S. Sheila & Bloom M. Jonathan ***The art and Architecture of Islam 1250-1800'*** Yale University Press Pelican History of Art, 1994.

Brown, Percy, Indian ***Architecture (Islamic Period) Bombay, D.B Taraporevala Song pvt Lim 1956***

Bussabarager, Robert, ***The everyday art of India & Betty Dashew Robins***, 1964.

Chowdhury, Saifuddin, ***Aspects of Material and Folk culture in Bangladesh,*** Bangla Academy, Dhaka, 2003

Chowdhury, Saifuddin, ***Early Terracotta Figurines of Bangladesh***, Bangla Academy, Dhaka, 2000

Cres wall, K.A.C. Early Muslim Architecture, VolI ***engal. Directorate of Industries. Government o West Bengal. Oxford book & Stationery Co. Calcutta***-16, New Delhi, Kharaapur-1963.

Deutsches Museum Guide Through The Collections, Verlag C.H. Beck Munich, 1987

David Dean & Gary Edson, ***The Handbook for Museums***, Landon, Routledge, 1996

David Dean, ***Museum Exhibition Theory and Practice***, London Routledge

Dhanmija, Ram***, Image India, heritage of Indian art & Craft,.*** Delhi, Vikas, 1971.

Director Cart Germaine ***Museums and Young People*** Paris International Council of Museums 1952

Dundes Alan, ***The Study of Folklore,*** London Prentice of International, Inch

Dutt, Gurusaday. ***Folk Arts and Crafts of Bengal: The collected papers***, Seagull books, Calcutta, 1990.

Dutt, Gurusaday, ***The Art of kantha, Modern Review Calcutta,*** 1939.

E.W. Collins, ***Report on the Existing Art and Industries of Bengal***, London, 1889.

Edward Maria Leach (Edited) ***Standard Dictionary of Folklore,*** Mythology and Legends, Vol. New Your, 1949,

Fist World War ***Museum Kavanagh, Gaynor, Museum and the First world War,*** Leicester University Press, 1994.

Fontein, Jan, ***Museum of Fine Arts***, Boston Oriental Art, Boston, the Museum, 1969.

Francis Lee Uley, ***Folk Literature***: An Operational Definition: The study of Folklore (Alan Dundes Edited) 1965, P. 8.

Ganguli, ***Kalyankumar Design in Traditional Arts of Bengal,*** Calcutta Directorate of Industires.

German Museum of Master Works of Science and Technology

Glassic, Henry, ***Spirit of Folk Art,*** New York, 1989.

Glassic, Henry, ***Turkish Traditional art Today,*** America, Indiana University Press, 1993.

Glassie, Henry, ***Traditional Art of Dhaka,*** Bangla Academy, Dhaka, 2000

Gupta, Sankar Sen ***Studies in Indian Folk Culture: Folk Songs, Folk Arts Folk literature***, Calcutta, Indian Publications, 1964.

Gupta, Sankar Sen, ***Folklore and Folk life in India an Objective Study In Indian Perspective,*** Calcutta, Indian Publications, 1975.

Gupta, Shankar Sen, ***Folklore Research in India,*** Official Preceding, 1963

Gombrich. H.E The Story of Art, London New York, Phaidon Reprinted, 1979

Hameeda Hossain, ***Organizing Women's Employment through Kantha Production, Woven Ari,*** London, 1988.

Handa, O.C. ***Pahiari Folk Art***, Bombay, Taraporevala, 1975.

Haque Zuleka ***Gahana Jewellery of Bangladesh,*** Bangladesh small & Cottage Industries Corporation Punished by Bscic, Dhaka, 1984

Haque Enamul ***Survey of Museums & Archaeological Education & Training,*** East Pakistan**,** 1970.

Haque Enamul ***The Art Heritage of Bangladesh*** The International centre for study of Bengal Art Dhaka, 2007

Haque Enamul **Islamic Art** ***in Bangladesh Catalogue of a special Exhibition in Dacca Museum,*** April-3-28 1978

Haque Enamul **Islamic Art** ***Heritage of Bangladesh, Dhaka, Bangladesh national Museum,1983***

Haque, Enamul, ***Bengal Sculptures Hindu Iconography Upto c. 1250 A.D.*** Bangladesh National Museum, Dhaka, 1992

Huque, Mahmudul, ***Introducing Bangladesh National Museum***, 2005

Harbest Halpert ***Folklore Breadth Versus Depth,*** Journal of American Folklore, Vol. 7, No. 280, April - June, 1958. 1

Hasan. S.M. Dr. ***Sonargaon Bangladesh Folk Art & Crafts Foundation***, Sonargaon, Dhaka, 1982.

Hayward, J.C. ***Victoria and Albert Museum European Firearms***, London, H.M. So 1969.

Heinz Mode/ Subodu Chandra, ***Indian Folk Art***, Taraporevala; Bombay, 1985.

Higgs, J.W.Y. ***Folk Life Collection and Classification,*** London, Museum Association 1963.

Historical Studies in the Cult of Goodess Manasa, Cultutta, 1966.

Husain, A.B.M. (Edited by), ***Sonar Gaon Panam***, A survey of historical monuments and sites in Bangladesh, SHMSB, 003" Asiatic Society of Bangladesh

International Dictionary of Regional European Ethnology and Folklore, Vo. 1, Copehagen, 1960.

Islam Mazharul, ***History of Folktale collection,*** Bangla Academy 1970

Ismail R. Al Faruqi and Lois Lamya al Faruqi ***The Cultural Atlas of Islam. Macmillan publishing Company New York Collier Macmillan*** Pubishers London. 1986.

J.L. Yward, ***Victoria & Albert Museum,*** European Firearms, by ., London, 1969.

Jamdani Figured Muslin of Dhaka, BRAC, Dhaka, 1981.

Jane Keller***, The Folk Art Tradition***, M.Y. 1981.

Joshi, O.P. ***Painted Folklore and Folklore Painters of India*** (A Study with reference to Rajasthan) Delhi, Conceetp Publishing.

Khan, Shamsuzzaman (Edited by), ***Folklore of Bangladesh***, Bangla Academy, Dhaka, 1987 (Volume one)

Khan, Shamsuzzaman (Edited by), ***Folklore of Bangladesh***, Bangla Academy, Dhaka, 1992 (Volume Two)

Khan, Muhammad Hafizullah "***Terracotta Ornamentation in Muslim Architecture of Bengal"*** Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka 1988.

Kumar, Benoy Sarkar, ***The Folk -Element in Hindu Culture***, Delhi, Shri s-k Mehra at Taz offset Press, 1972

Lutz Rohrich ***"Folktales & Reality"*** Indiana University Press, Bloomington and Indiana Polis.

Mahaatra, Piyush Kanti ***"Folklore Library Calcutta,*** Indian Publications, 1966.

Mahmud, Firoz, ***Metal Work of Bangladesh: A Study in Material Folk Culture***, Bangla Academy, Dhaka, 2003

Mahmund, Firoz &, Rahman Habibur, ***The Museums in Bangladesh,*** Bangla Academy, Dhaka, 1987

Maity P.K. ***"The Folk Cultures of West Bengal,*** in Studies in Oriento logy.

Maitya, P.K. ***Folk Rituals of Eastern India***, Avhinav Publications, 1988.

Maxwell, Robyn, ***Textiles of Southeast Asia Tradition***, Trade and transformation Network, Oxford University,1990

Mode, H. and Chandra ***S. Indian Folk Art***, Tarapordh Bomby, 1985.

Mode, Heinz ***"Indian Folk art, Bombay"*** Taraporevala Song & Co., 1985.

Mode, Henz, ***Indian Folk Art, D.B. Taraporevala Sons & Co. Ltd***. Bombay, 1985.

Mohammad Sayeedur, ***The Common Ground***, Woven Air: ***The Muslin and Kantha Tradition of Bangladesh***, London, 1988,

Mookerjee, Ajit ***Folk toys of India, Calcutta, Oxford book and stationery***, 1956.

Mookerjee, Ajit ***"Folk Art Bengal***: a study of an art for, and of the people, Calcutta, university 1946.

Mookerjee, Ajit ***"Folk Art of India"*** Clarion Books. Delhi – India, 1986,

Mortimer A. Kristin ***Harvard University Art Museums a Guide to the Collections.*** *Massachusetts Abbeville Press, New York, 1985.*

Mukherjee, Shyam Chand. ***Folklore Museum Calcutta,*** Indian Publication. 1969.

Myth "Folklore Forum Volume 29, Number-2, 1998 Editor Matt Bradley, Folklore Publications Group, Bloomington, America.

Pal, Mrinal Kanti ***Catalogue of Folk Art in The Asutosh Museum***, Calcutta, University of Calcutta, 1962.

Punja Shobita ***Museums Of India*** The Guidebook Company Limited . Hong Kong 1990

R.V. Villiams, ***Folklore, Encyclopedia Britannica***, Chicago-1992,

Rahaman, kazi Sufior, ***Understanding the Muslims District Burdwan (1857-1947),*** Kolkata, Books way 2013

Ragghi Ludovico Carlo Editor ***National Archaeological Museum,*** Athens, Newsweek, INc & Arnoldo Editor 1980

Ragghinti Ludovico Editor Carlo Editor ***Art History Museum Vienna, Newsweek INc & Arnoldo Mondadori,*** 3rd printing 1978

Robert Hillenbreand ***Islamic Art and Architecture*** Thames and Hudson Ltd. London, 1999.

Sarkar H. ***Museums & Protection of monuments & antiquates in India",*** Sundeep Prakashan Delhi 1981.

Shsfique Mahud, ***Intangible Cultural Heritage and Sonargaon Folk Museum,*** Bangladesh Folk Art & Crafts Foundation Sonargaon Narayangonj Ministre of Cultural Affairs,2004

Shah, Shampa & Aashi Manohar (Editor), ***Tribal Art and Crafts of Madhya Pradesh,*** Ahmedabad; Mapin Publishing. 1996.

Siddiqui, Dr Ashraf ***Bangali Folklore Collections and Studies,*** Bangla Academy, Dhaka, 1800-1917

Talukder, Shahariar ***Folk art of Bangladesh,*** Bangla Academy, Dhaka .2001

The collection of the National Folk Museum of Korea. *Copyright 2007 by the National Folk Museum of Korea.*

The National Gallery ***Illustrated General Catalogue order of the Trustees Publications Department,*** The National Gallery London 1973

Vastsyayan, Kapila, ***Traditions of India Folk Dance New Delhi, Clarion Books***, 1976.

Vogel, O.J.Ph ***Catalogue of the Archaeological Museum of Mathura, Allahabad, 1910.***

Warren, William, ***Arts and Crafts of Thailand San Francisco, Charonicle Books***, C-1994.

Webster's New Collegiate Dictionary 8th edition.

Wittlin, S Alma ***The Museum*** London Routledge & Kegan paul limited First publised 1949 .

Y.M. Sokolov, ***Russian Folklore,*** New York, 1950,

Zaman, Niaz, ***The Art of Kantha Embroidery,*** Dhaka, 1981, 1993.

Zbavital, Susan, ***Bengali Folk ballads from Mymensingh and the problem of their Authenticity,*** Calcutta University, West Bengal. 1963.

Journal

Akram Ali, Shaikh (Edited by), A Journal of The Bangladesh National Museum ***Bangladesh Lalita Kala***, Volume -2, Number-1, January 1994

Haque, Enamul (Edited by), A Journal of The Bangladesh National Museum ***Bangladesh Lalita Kala,*** Volume -1, Number-2, July 1975

Haque, Mahmudul (Edited by), ***The Journal of Bangladesh National Museum***; No. 4, January - June 2005

Haque, Mahmudul (Edited by), ***The Journal of Bangladesh National Museum***; No. 4, January-June, 2005

Folklore Journal, Department of Folklore, University of Ragshahi vol. 5, 2013

আহমেদ ওয়াকিল (সম্পাদিত), evsjv‡'k GwkqvwUK †mvmvBwU cwÎKv, সপ্তদশ খন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৯৯৯

আহমেদ ওয়াকিল (সম্পাদিত) evsjv‡'k GwkqvwUK †mvmvBwU cwÎKv একবিংশ খন্ড, প্রথম সংখ্যা, ২০০৩

খান হোসেন, মোবারক সম্পাদক, wkí Kjv Ivb‡wIK cwÎKv, বাংলাদেশের শিল্পকলা একাডেমি, ষষ্ঠদশ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৯৯২

রহমান, আজাদ (সম্পাদিত), wkíKjv IvbwIK cwÎKv, অষ্টাদশ বর্ষ ২য় সংখ্যা বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ১৯৯৮,

Dhaka University Institutional Repository

নজীর, আহমেদ (সম্পাদিত), wkíKjv IvbwmK cwÎKv, চতুর্বিংশ বর্ষ, দ্বিতীয় ও পঞ্চবিংশ বর্ষ, প্রথম যুক্তসংখ্যা, ২০০৫

বাংলাদেশের সমকালীন HwZn¨evnx †jvKwkí c'kbx I †gjv 21 †g-21 RjvB ২০০০, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

ভৌমিক, দুলাল (সম্পাদিত), evsjv‡'k GwkqwUK †mvmvBwU cwÎKv, চতুবিংশ খন্ড, ২য় সংখ্যা

লোহানী, কামাল (সম্পাদিত), wkíKjv IvbwIK cwÎKv, ষষ্ঠদশ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বাংলাদেশ শিল্পকলা

ড. আবদুল ওয়াহাব (সম্পা) evsjv GKv‡Wwg cwÎKv, ৫০ বর্ষ, ৩য়-৪র্থ সংখ্যা, জুলাই-ডিসেম্বর

cÎ-cwÎKv

Catalogue of Indian Museum publications (1867-1989)

Celebration of Dhaka Lsimic Culture Capital for Asian Region 2012 **Calligraphy & Photography Exhibition Exhibition**,Ministry of Cultural Affairs Government of the Peope's Repblic of Bangladesh

evsjv‡'‡ki DcRvZxq ms¯'wZ, HwZn¨ I RxebhvÎv we‡kl c'kbx, ২৩ ডিসেম্বর থেকে ৭ জানুয়ারি ১৯৯৪, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, শাহবাগ, ঢাকা

Rv'Ni mgvPvi, অক্টেবর- ডিসেম্বর ২০০৫, নিউজ লেটার, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর, ৮৫ তম cwZôvewlKx D'hvcb, ০৭ আগস্ট

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে জাতিতত্ত্ব ও অলংকরণ শিল্পকলা বিভাগ আয়োজিত we‡kl AjsKvi c'kbx 2012, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, সোনারগাঁও-নারায়ণগঞ্জ, evsjv‡'‡ki †jvK I Kviæwk‡íi bw_f³KiY c_g chvq: XvKv AÂj

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, সোনারগাঁও-নারায়ণগঞ্জ, লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব আয়োজিত সেমিনারে উপস্থাপিত প্রবন্ধ সংকলন ঐতিহ্য

অধ্যক্ষ তোফায়েল আহমদের প্রথম মৃত্যু বার্ষিকী ২৮ মার্চ ২০০৩ উপলক্ষে স্মরণিকা, chZ cwil' evsjvNi †jvK I Kviæwkí msMn

we‡kl c‘kbx wb‘kb msMn I KgKvÐ 2003 বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় শাহবাগ, ঢাকা ১০০০

HwZn¨ msiÿ‡Y Rv‘Ni, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের শততম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে দু'বছরব্যাপী অনুষ্ঠানমালার অংশ হিসেবে দুর্লভ বই ও সাময়িকীর বিশেষ প্রদর্শনী, ২০১৩

সুধীর চৌধুরী (সম্পা) AvšÍRwZK †jvK I Kvi‌æwkí †mwgbvi: Gwkqv c¨vwmwdK AÂj evsjv‡‘k 1994 RvZxq †jvK I Kvi‌æwkí c‘kbx, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি বাংলাদেশ হস্তশিল্প সমবায় ফেডারেশনের যৌথ উদ্যোগে Av‡qwRZ wkívPvh Rqbj Av‡ew‘b Ges †gvnv¤§‘ mvB‘i ingv‡bi msM‡ni bKkx Kv_v c‘kbx, 1 থেকে ৭ বৈশাখ ১৩৯০

bKwk Kv_vi বিশেষ প্রদর্শনী, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘ,র শাহবাগ, ঢাকা, ৬ আগস্ট ২০০৮

gvme¨vcx †jvKKvi‌æwkí †gjv I †jvKR Drme 2008, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

gvme¨vcx †jvKKvi‌æwkí †gjv I †jvKR Drme 2011, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

gvme¨vcx †jvKKvi‌æwkí †gjv I †jvKR Drme 2014, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

¯§iwYKv, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, সাতাশতম বার্ষিক সম্মেলন, ২৫-২৬ জানুয়ারি ২০১১, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, শহীদ ক্ষুদিরাম বসু শিক্ষা প্রাঙ্গণ (আলিপুর)

স্মরণিকা, যুগপূর্তি উৎসব ১৯৯৮-২০১০, ফোকলোর বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

AcKwkZ Awfm›‘f

আবেদিন জয়নুল মো. ‘wÿYe‡½ Bmjvg cPv‡i nhiZ Lvb Rvnvb Avjx (in.) Gi Ae‘vb, আরবী বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৪

ইসলাম, আমীরুল, h‡kvi †Rjvi BwZnvm I HwZn¨, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ২০০২

খালেক, বেগম সেলিমা, RmxgD‘‘x‡bi KweZv: AjsKvi I wPšÍvKí, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৯

চৌধুরী, সুরমা জাকারিয়া, evsjv‡`k-†bcvj m¤úK, 1971-1981, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৫

রহমান, মোস্তাফিজুর e‡i›` AÂ‡ji cvPxb I ga¨hMxq ¯vc‡Z¨ AjsKiY,, চারুকলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৬

রহমান, ফাতিমা তুজ জহুরা, Kwóqv †Rjvi BwZnvm HwZn¨, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া, ২০০৬

রহমান আতিয়ার, `w¶Y evsjvi AwfRvZ †kYx, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া, ২০০৩

সিতারা সানিয়া, enËi w`bvRc‡ii civKwË mgxÿv (Øv`k-Aóv`k kZvãx) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মাওলা গোলাম, Avj KiAvbj Kix‡gi Gi AvjsKwiK ˆewkó¨, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০২

সালেহ, কুদ্দুস রুহুল মো., gmwjg Avg‡j evsjvi UvKkvj bMix GKwU g`wfwËK AbmÜvb, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৮

হোসেন, মো. ইমতাজ. evsjv‡`‡ki GKwU mxgvšÍeZx †Rjv w`bvRc‡ii Av_ mvgwRK I ivR‰bwZK BwZnvm (1765-1947) ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত মানচিত্র